# সুন্নতে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ও

# আধুনিক বিজ্ঞান

ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ

# এই বই

- যারা রাসূলের সুন্নতকে ভালবাসেন এ বই তাদের জন্য।
- যারা রাসূলের সুন্নতের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন এ বই তাদের জন্য।
- যারা রাসূলের সুন্নতকে বিজ্ঞানের নিরিখে যাচাই করতে চান এ বই তাদের জন্য।
- যারা বিজ্ঞানের অনুসারী সুন্নতের বিরোধী এ বই তাদের জন্য।
- যারা সুন্নতকে প্রগতির অন্তরায় মনে করেন এ বই তাদের জন্য।
- যারা সুন্নতের অনুকরণকেই উভয় জাহানের কল্যাণ মনে করেন এ বই তাদের জন্য।

১০ খন্ডের বইটি যিনি পিডিএফ করেছেন ; আমাদের এডিট করা পিডিএফটি যদি আপনার নজরে পরে তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ।

https://t.me/islaMic_fdf

# অনুবাদকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। মানবকুলের নিয়ন্ত্রণ ও সার্বক্ষণিক শান্তির জন্য তিনি দিয়েছেন তাদের কালজয়ী মহান আদর্শ ইসলাম। এ আদর্শের বাস্তব রূপকার হিসেবে পাঠিয়েছেন লক্ষাধিক পয়গাম্বর ও তার বাণী সম্বলিত সহস্রাধিক কিতাব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আখেরী পয়গাম্বর। আল-কুরআন তার সর্বশেষ কালাম। তাই কিয়ামত পর্যন্ত সকল দেশের সকল মানুষের একমাত্র গাইড বা পথনির্দেশনা হচ্ছে, আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ্।

এ গাইড অনুসরণ করেই তৈরি হয়েছেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানবশ্রেণী হযরত সাহাবায়ে কিরাম, গঠিত হয়েছে মুসলিম উম্মাহ। তারা রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সাস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কারিগরী ও এর সাধনা-গবেষণায় অনন্য সাধারণ অবদান রেখে অর্জন করেছেন সারা বিশ্বের পথিকৃৎ হওয়ার মহান গৌরব।

এরই ধারাবাহিকতায় অতীত হয়েছে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। আর নন্দিত হয়েছে গোটা মুসলিম মিল্লাত জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাহানে।

কিন্তু একসময় বিজাতীয় কুটিল ষড়যন্ত্র ও বিলাস-বাসনের আপাত মধুর আকর্ষণে এ মিল্লাতের আধিপত্য হয় খর্বিত। রাজনৈতিক প্রভাব হয় সঙ্কীর্ণ এবং সাধনা-গবেষণা হয় সঙ্কুচিত।

তবে বেঁচে থাকার জন্যই যে মিল্লাতের জন্ম, নেতৃত্বের জন্যেই যে উম্মতের উদ্ভব, তারা তো নিশ্চিহ্ন হতে পারে না; পারে না স্থবির হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে যেতে। তাই আজ সর্বত্র চলছে পুনরুত্থানের সংগ্রাম। চলছে সাধনা ও গবেষণার জগতে এক বিস্ময়কর জাগরণ।

এ সংগ্রামেরই এক নব অধ্যায় রচনা করে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন আমাদের উপ-মাহাদেশের এক মহান ব্যক্তিত্ব বিখ্যাত গবেষক ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমূদ। তিনি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র আমলসমূহ। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের

নিরিখে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন মানবজাতির সুন্নাতানুযায়ী এক একটি কাজের অভাবনীয় উপকারের তথ্যাবলী। এর পাশাপাশি উপস্থাপন করেছেন তার বিরোধী তৎপরতার অকল্পনীয় ক্ষতি ও দুরারোগ্য ব্যাধির করুণ পরিণতির মর্মস্পর্শী ইতিহাস।

বিজ্ঞানের আলোকে ইসলামের মহত্ত্বের বিষয়টি অনেকেই তুলে ধরেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে লেখক ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমূদ এর কোনো নযির আছে বলে আমার জানা নেই। তাই তার মূল্যবান গবেষণা পুস্তক 'সুন্নতে নববী আওর জাদীদ সাইন্স' কিতাবটি বাংলাভাষী ভাইবোনদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সুন্নত অনুসরণ কোনো বৈজ্ঞানিক লাভ-ক্ষতির উপর আদৌ নির্ভরশীল নয়। এ সংক্রান্ত জ্ঞান শুধু আত্মতুষ্টির কারণ হলেও হতে পারে। কিন্তু সে প্রেক্ষাপটে আমরা কখনো অগ্রসর হই না। অগ্রসর হই এ প্রত্যয় নিয়ে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের আদর্শ। তাঁর আনুগত্যেই আমাদের জীবন, আমাদের সুখ, আমাদের আনন্দ। তাঁর অনুসরণেই আমাদের নাজাত ও আমাদের মহান পালনকর্তার পরম সন্তুষ্টি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত অনুসরণ করার তাওফীক দিন। আমীন!

তারিখ

১৪/০৮/৯৭ সম্পাদক

# সূচীপত্র

## মিস্ওয়াক ও আধুনিক বিজ্ঞান

## MISWAK AND MODERN SCIENCE


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| মিস্ওয়াকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য | ৩৩ |
| রাত ও মিস্ওয়াক | ৩৪ |
| নামাযের পূর্বে মিস্ওয়াক | ৩৫ |
| সুইজারল্যাণ্ডের জনৈক ডাক্তার ও মিস্ওয়াক | ৩৫ |
| গুরু নানক ও মিস্ওয়াক | ৩৬ |
| মুখের দুর্গন্ধ ও মিস্ওয়াক | ৩৬ |
| হৃৎপিণ্ডের ঝিল্লিতে পুঁজ ও মিস্ওয়াক | ৩৭ |
| দন্ত চিকিৎসা ও দশ হাজার দিরহাম | ৩৭ |
| মুখের স্বাদ বৃদ্ধি ও মিস্ওয়াক | ৩৭ |
| গলা ও মিস্ওয়াক | ৩৮ |
| একটা জটিল কেস ( A STRONG CASE) | ৩৮ |
| গালের ঘা নিরাময়ে মিস্ওয়াক | ৩৮ |
| দাঁতের হরিদ্রতা দূরীকরণে মিসওয়াক | ৩৯ |
| রোগজীবাণু রোধে মিসওয়াক | ৩৯ |
| মস্তিষ্ক ও মিস্ওয়াক | ৩৯ |
| বাবলা ও নীম গাছ | ৩৯ |
| দাঁত ও মস্তিষ্ক | ৪০ |
| দাঁত ও কান | ৪০ |
| দাঁত ও দৃষ্টিশক্তি | ৪১ |
| দাঁত ও পাকস্থলী | ৪১ |
| সামাজিক জীবন | ৪১ |
| ব্রাশ ও মিস্ওয়াকের মধ্যে পার্থক্য | ৪২ |
| ব্রাশ | ৪২ |
| মিস্ওয়াক | ৪২ |
| পীলু গাছের মিস্ওয়াক | ৪২ |
| সর্দি-কাশি ও মিস্ওয়াক | ৪২ |
| দাঁতের সুরক্ষায় মিস্ওয়াক | ৪৩ |

# উযু ও আধুনিক বিজ্ঞান

(WAZOO AND MODERN SCIENCE)

উযুর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ....................................................৪৩
হাত ধৌত করা ....................................................৪৪
কুলি করা (MOUTH WASH) ....................................................৪৫
মুখের রোগ (STOMATITIS THRUSH) ....................................................৪৫
নাকে পানি দেওয়া (NOSE WASH) ....................................................৪৫
মুখ ধৌত করা (FACE WASH) ....................................................৪৭
ক্যামিক্যাল এর ক্ষতি থেকে সুরক্ষা ....................................................৪৭
মুখের ব্রণ ....................................................৪৭
চেহারার এলার্জি (ALLARGY OF FACE) ....................................................৪৮
চেহারার ম্যাসেজ ....................................................৪৮
ভ্রূতে পানি আবদ্ধ থাকা ....................................................৪৮
চক্ষু রোগ থেকে হেফাযত (PROTECTION FROM EYE DISEASES) ..........৪৮
উযুর হেকমত ও চক্ষুর ছানির চিকিৎসা ....................................................৪৯
দাঁড়ি খিলাল করা ....................................................৪৯
কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করা ....................................................৪৯
মাথা মাসাহ্ করা ....................................................৫০
চিন্তার বিষয় ....................................................৫১
পা ধৌত করা ....................................................৫১
উযু ও উচ্চ রক্তচাপ (WAZOO AND HIGH BLOOD PRESSURE) ..............৫২
জনৈক হৃদপিণ্ড বিশেষজ্ঞ (HEART SPECIALIST) ..............................৫২
একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব ....................................................৫২
উযুর অতিরিক্ত পানি ....................................................৫৩
পশ্চিম জার্মানীর একটি কনফারেন্সে উযু ....................................................৫৩

# নামায ও আধুনিক বিজ্ঞান

(PRAYER AND MODERN SCIENCE)

নামাযের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ....................................................৫৪
একটি চমৎকার ঘটনা ....................................................৫৬
নামায ও দৈহিক সুস্থতা (PRAYER AND BODY HEALTH) ..................৫৬
বয়স নির্ধারণ (AGE FACTOR) ....................................................৫৭
ব্যায়ামের চার্ট (EXERCISE CHART) ....................................................৫৮

কিংকর্তব্যবিমূঢ় এক অমুসলিম বিশেষজ্ঞ ....................৫৭
একজন ফিজিশিয়ানের কাণ্ড ....................৫৮
অস্ট্রেলিয়ান এক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ....................৫৮
হতবাক এক ফিজিওথেরাপিস্ট....................৫৯
একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা (SPECIAL EXPERIENCE) ....................৬০
প্রফেসর ডা. বার্থম জোযিফ এর অভিজ্ঞতা ....................৬০
নামায ও ইউগা (PRAYER AND YOGA) ....................৬০
ইতালীর বিশেষজ্ঞগণের অভিমত ....................৬১

## নামাযের শর্তাবলী ও আধুনিক বিজ্ঞান

### (THE CONDITIONS FOR PRAYER AND MODERN SCIENCE)

গুরুত্ব ও তাৎপর্য ....................৬১
নামাযের ফরয ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ....................৬২
স্থান পবিত্র হওয়া ....................৬২
সামাজিক প্রতিক্রিয়া (SOCIAL EFFECTS) ....................৬৩
নামাযের মানসিক প্রতিক্রিয়া ....................৬৩
ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নামায পড়া ....................৬৩
দু'হাত কান পর্যন্ত উঠানো ....................৬৪
তাকবীরে তাহরীমার সময় মাথা না ঝুঁকানো ....................৬৪
ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা ....................৬৪
নামায এবং দেওয়ান শিং মাফতুন ....................৬৫
নামায ও মানসিক রোগের চিকিৎসা ....................৬৫
ফলাফল ....................৬৬

## নামাযের সময় সূচি ও আধুনিক বিজ্ঞান

### (TIMINGS OF PRAYERS AND MODERN SCIENCE)

সময়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ....................৬৮
ফজরের নামায ....................৬৮
যোহরের নামায ....................৬৯
আছরের নামায ....................৭০
দরূদ শরীফের আশ্চর্য ফল ....................৭০
আছরের নামাযের পর অযীফা পড়ার কারণ ....................৭১
মাগরিবের নামায ও আধ্যাত্মিক রশ্মি ....................৭১
ইশার নামায ....................৭২
তাহাজ্জুদ নামায ....................৭২

## নামাযের রুকন ও আধুনিক বিজ্ঞান
(THE ROKON FOR PRAYER AND MODERN SCIENCE)


কিয়াম বা দাঁড়ানো ....................৭৩
মহিলাদের সিনার উপর হাত বাঁধা ....................৭৩
পুরুষের নাভীর নিচে হাত বাঁধা ....................৭৪
রুকু ....................৭৪
সিজদা ....................৭৫
স্থায়ী সৌন্দর্যের রহস্য ....................৭৫
মহিলাদের সিজদা ও ওয়াশিংটনের ডাক্তার ....................৭৫
সিজদা ও আত্মিক সম্পর্ক ....................৭৫
সালাম ....................৭৬
ডা. নূরীর বিশ্লেষণ ....................৭৬
তাহাজ্জুদ নামাযের পার্থিব উপকারিতা ....................৭৬
পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের রহস্য ....................৭৭
অন্তরের রোগ থেকে মুক্তি ....................৭৭
নামায হাই ব্লাড প্রেসার রোগের চিকিৎসা স্বরূপ....................৭৮
দাঁড়িয়ে নামায পড়া গিটের ব্যথার উপশম ঘটায় ....................৭৮
রুকুর মাধ্যমে যকৃতের ব্যাধির চিকিৎসা ....................৭৯
ভুঁড়ি কমানোর মাধ্যম ....................৭৯
একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ....................৮০
আলসারের চিকিৎসা সিজদার মধ্যে ....................৮০
মস্তিষ্কের যাবতীয় রোগ-ব্যাধি ....................৮০
চেহারা কুচকে যাওয়া ....................৮০
যৌনরোগ ....................৮১
বক্ষব্যাধি ....................৮১
ওয়াশিংটনের জনৈক ডাক্তার ও নামায ....................৮১


## নামায ও আধুনিক বিজ্ঞান
(PRAYERS AND MODERN SCIENCE)


নামায একটি পূর্ণ মুরাকাবা ....................৮৩
নামায বিস্ময়ের সমষ্টির নাম ....................৮৩
সিজদাবস্থায় হস্তযুগল সোজা রাখা ....................৮৪
একাগ্রতা, স্থিরতা ও আভ্যন্তরীণরোগ-ব্যাধি ....................৮৪
আত্মহত্যার ইচ্ছা হ্রাস ....................৮৫
স্যার উইলিয়াম ক্রাক্সের গবেষণা ....................৮৫

## ইমামের তিলাওয়াত ও আধুনিক বিজ্ঞান


তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ........................................৮৬
নামাযের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে পা ফাঁক করে রাখা ..............................৮৭
মহিলাদের নামাযের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ........................................৮৭
তারাবীহ্ নামায ও আধুনিক বিজ্ঞান ........................................৮৮


## খাদ্য গ্রহণ ও আধুনিক বিজ্ঞান

(MEAL AND MODERN SCIENCE)


খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ........................................৮৯
ওয়াশিংটনের ডাইরেক্টর ও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ..............................৮৯
আহারের পূর্বে হাত ধৌত করা ........................................৯০
আহারের পূর্বে ও পরে লবণ মুখে দেওয়া ........................................৯১
আহারের পূর্বে কুলী করা ........................................৯১
আহারের সময় ডান হাত ব্যবহার করা ........................................৯১
খাবারে ফুঁক দেওয়া ........................................৯২
একত্রে খাওয়া-উচ্ছিষ্ট খাওয়া ........................................৯২
খানা খাওয়ার পদ্ধতি (WAYS OF HAVING MEAL) ..............................৯৩
(১) উভয় হাঁটু উঠিয়ে বসা ........................................৯৩
(২) এক হাঁটু উঠিয়ে বসা ........................................৯৩
(৩) দুই হাঁটু গেড়ে বসা ........................................৯৩
কোরিয়ার খানার টেবিলে ........................................৯৩
খানা চিবিয়ে খাওয়া ........................................৯৪
প্লেট পরিষ্কার করা ........................................৯৪
ঠেস দিয়ে বসে খাওয়া উচিত নয় ........................................৯৫
খানার সময় আঙ্গুল চালনায় সতর্কতা ........................................৯৫
বাদশাহ্ হারুনুর রশীদের শিক্ষণীয় ঘটনা ........................................৯৬


## খাদ্য গ্রহণে সাবধানতা ও আধুনিক বিজ্ঞান


আধুনিক বিজ্ঞান (MODERN SCIENCE) ........................................৯৬
পেটের এক তৃতীয়াংশ ও আধুনিক বিজ্ঞান ........................................৯৭
ডা. ব্লান কিউবের দৃষ্টিতে দাড়িয়ে খাদ্য গ্রহণ ........................................৯৮
স্লিমিং সেন্টার ও ইমাম গাযালী রহ. ........................................৯৮
হযরত হাসান বসরী রহ.-এর মতাদর্শ ........................................৯৮
খ্রিস্টান মিশনারীগণের খাদ্যের প্রচারণা........................................৯৯

## উপবাস ও আধুনিক বিজ্ঞান


উপবাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ............ ৯৯
উপবাস-কারামত ............ ১০০
ইসলামি শিক্ষা সোশ্যালিজম ............ ১০০
অতিভোজন ও ইসলামের প্রথম বিদ'আত ............ ১০১
প্রফেসর ব্রাউন ও ইসলামি বিশ্ব ............ ১০১


## যব ও আধুনিক বিজ্ঞান

(BARLEY AND MODERN SCIENCE)


যব খাওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ............ ১০২
খাবারের মাঝে আনন্দদায়ক কথাবার্তা ............ ১০৩
খানা খাওয়ার পর মুখের উপর হাত মালিশ করা ............ ১০৪
হাত দিয়ে খাওয়া ও আঙ্গুল চাটা ............ ১০৪
ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণের গবেষণা ও অভিজ্ঞতা ............ ১০৫
খাবারের সঠিক পদ্ধতি ............ ১০৫
খাবার কখন খাওয়া উচিত ............ ১০৬
শয়নের পূর্বে খাদ্যগ্রহণ ............ ১০৭
খাদ্যগ্রহণের মৌলিক নিয়মাবলী ............ ১০৮
পাকস্থলীর দুর্বলতা থেকে বাঁচার উপায় ............ ১০৮
পাকস্থলীর বিকৃতি ও মানসিক দুর্বলতার কারণ ............ ১১০
খাদ্য কিভাবে গ্রহণ করা উচিত ............ ১১৪
খাদ্যগ্রহণের পর খিলাল করা ............ ১১৫
খিলালের মধ্যে সতর্কতা ............ ১১৬
খাওয়ার পর হাত ধোয়া ও পরিষ্কার করা ............ ১১৬
খাদ্যগ্রহণের পরপরই পানি পান না করা ............ ১১৭
ডাক্তার কর্ণেল চোপড়া ও ইসলামি বিধান ............ ১১৭
খাদ্যগ্রহণের পরপরই শয়ন করা ............ ১১৮
কায়লুলাহ নবীজীর সুন্নত ............ ১১৮
সতর্কবাণী ............ ১১৯

## পানি ও আধুনিক বিজ্ঞান
(WATER AND MODERN SCIENCE)


চুষে পানি পান করা ........................................১১৯
পানি দেখে পান করা ........................................১২০
বসা অবস্থায় পানি পান না করা ........................................১২১
দাঁড়িয়ে পানি পান করা ........................................১২১
তিন শ্বাসে পানি পান করা ........................................১২১
খোলা পাত্রে পানি পান করা ........................................১২২
পীসা গোর্স-এর একটি বিশেষ আমল ........................................১২২
পানির পাত্রের মধ্যে শ্বাস ত্যাগ করা ........................................১২২
মিঠা পানি পান করা ........................................১২২


## বিশ্রাম ও আধুনিক বিজ্ঞান
(REST AND MODERN SCIENCE)


গুরুত্ব ও তাৎপর্য ........................................১২৩
ডান পার্শ্বে শয়ন করা ........................................১২৩
উপুড় হয়ে শয়ন করা ........................................১২৪
অধিক ঘুম নিষিদ্ধ ........................................১২৫
চামড়া ও খেজুর ছালের বিছানা ........................................১২৫
আমেরিকান স্বাস্থ্য কাউন্সিল ........................................১২৫
ঈশার নামাযের পূর্বে শয়ন করা নিষিদ্ধ........................................১২৫
অযু করে শয়ন করা........................................১২৬
শয়নের পূর্বে কাপড় পরিবর্তন ........................................১২৬
বিছানাপত্র ঝাড়ু দেওয়া ........................................১২৬
এক ব্যক্তির ঘটনা ........................................১২৭
পেশাবদানী ........................................১২৭
পানির পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখা ........................................১২৭
ঘুম থেকে উঠার পর তৎক্ষণাত হাত ধৌত করা ........................................১২৮
শক্ত মাটিতে শয়ন করা ........................................১২৮
বাতি নিভিয়ে রাখা ........................................১২৮

## শোয়ার সুন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞান
(SLEEP AND MODERN SCIENCE)

ডান কাতে শোয়া ............................................................................১২৯
ভয়াবহ স্বপ্ন দেখা ............................................................................১২৯

## ইসলামি পোশাক ও আধুনিক বিজ্ঞান
(DRESS AND MODERN SCIENCE)

সাদা পোশাক ............................................................................১৩০
ক্রোমোপ্যাথীর অভিমত (LOWS OF CHROMPATHY) ..........................১৩০
ইবনে বতুতার অভিজ্ঞতা ............................................................................১৩০
খলিল জিবরান ও সাদা পোশাক ............................................................১৩০
ডা. লূহী কূনীর গবেষণা ............................................................................১৩১
সুতী কাপড় (COTTON DRESS) ............................................................১৩১
মোটা কাপড় ............................................................................১৩১
ডা. লূথর এম এর গবেষণা ............................................................................১৩২
রং পরিবর্তন ............................................................................১৩৩

## পাগড়ী ও আধুনিক বিজ্ঞান

গুরুত্ব ও তাৎপর্য ............................................................................১৩৩
মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে পাগড়ী ............................................১৩৪
সবুজ পোশাক ............................................................................১৩৪
লাল পোশাক অপছন্দনীয় ............................................................................১৩৫
টাখনুর উপর পোশাক পরিধান করা ............................................................১৩৫
আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রেশমী কাপড় ............................................১৩৬
মহিলাদের পায়ের পাতা পর্যন্ত কাপড় পরার বিধান ..............................১৩৬
পোশাকের পরিচ্ছন্নতা ও আধুনিক বিজ্ঞান ............................................১৩৭

## রোযা ও আধুনিক বিজ্ঞান
(FASTING AND MODERN SCIENCE)

রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ............................................................................১৩৮
রোযার পার্থিব উপকারিতা ............................................................................১৩৮
ফ্রান্সে ইহুদিদের রোযা রাখার ঘটনা ............................................................১৩৮
এক আমেরিকান অমুসলমানের ঘটনা ............................................................১৩৯
সিকান্দার আযম ও আরাসতু ............................................................................১৪০

গান্ধিজীর বাসনা ..........১৪৫
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিস্ময় ..........১৪০
পোপ এলফ গাল এর গবেষণা (P.E.G.'S ANALYSIS) ..........১৪১
ডা. লুথরজেম অব ক্যামব্রিজ ..........১৪১
সিগমণ্ড নারায়াড (SIGMOND NARAYAD)..........১৪২
প্যারাসাইক্লোজী রিসার্চ (Research of parapsychology)..........১৪২
এমন দিনও আসবে যখন সকল মানুষ রোযা রাখবে ..........১৪৪
(ক) হজম প্রক্রিয়ার উপর রোযার প্রভাব ..........১৪৪
(খ) রক্তের উপর রোযার প্রভাব ..........১৪৬
রোযার দ্বারা রক্তের পরিচ্ছন্নতা ..........১৪৭
কোষের (CELL) উপর রোযার প্রভাব ..........১৪৮
স্নায়ুবিক প্রক্রিয়ার (Nervous System) উপর রোযার প্রভাব ..........১৪৮
রোযার সামাজিক প্রভাব ..........১৪৯
বিদেশী পর্যবেক্ষকদের পাকিস্তানে সার্ভে রিপোর্ট ..........১৪৯
অভিজ্ঞতার আলোকে মানবদেহে রোযার প্রভাব..........১৫০
কর্মপদ্ধতি ও মাধ্যম ..........১৫১
ফলাফল ..........১৫১
দেহের আর্দ্রতা ও প্রস্রাব নির্গত হওয়া ..........১৫২
রোযা সুস্বাস্থ্যের এক নযিরবিহীন পদ্ধতি ..........১৫৩
একটি প্রশ্ন ..........১৫৫

## খেজুর দ্বারা ইফতার ও আধুনিক বিজ্ঞান

গুরুত্ব ও তাৎপর্য ..........১৫৬
খেজুরের রাসায়নিক উপাদানের তালিকা ..........১৫৭

## মানবীয় প্রয়োজন ও আধুনিক বিজ্ঞান

গুরুত্ব ও তাৎপর্য ..........১৫৮
মলত্যাগের জন্য দূরে গমন করা ..........১৫৮
কাঁচা মাটিতে মলত্যাগের উপকারিতা ..........১৫৯
বসার পদ্ধতি ..........১৫৯
ইস্তেঞ্জার জন্য ঢিলার ব্যবহার ..........১৬০

## টয়লেট পেপার ও আধুনিক বিজ্ঞান


গোবর ও হাড় দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা ........................................ ১৬২
দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার নিষেধাজ্ঞা ........................................ ১৬২
গোসলখানায় প্রস্রাব করা নিষেধ ........................................ ১৬২
কাঁচা ও পাকামাটির পার্থক্য ........................................ ১৬৩
পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা ........................................ ১৬৩
প্রস্রাব থেকে সতর্ক থাকুন, রোগ থেকে রক্ষা পাবেন ........................................ ১৬৪
বাতাসের দিকে মুখ করে প্রস্রাব করা ........................................ ১৬৪
গর্তে প্রস্রাব করার নিষেধাজ্ঞা ........................................ ১৬৫
প্রস্রাব-পায়খানার কতিপয় নিষিদ্ধ স্থান ........................................ ১৬৫
আবদ্ধ পানি ........................................ ১৬৫
প্রবাহমান পানি ........................................ ১৬৫
ছায়াদার ও ফলবান বৃক্ষের নিচে ও রাস্তায় ........................................ ১৬৫
নামাযের পূর্বে ইস্তেঞ্জা করা ........................................ ১৬৬
পায়খানার পর মাটি দ্বারা হাত পরিষ্কার করা ........................................ ১৬৬
ডব্লিউ. সি. এবং কমোড এর মধ্যে পার্থক্য ........................................ ১৬৬
কমোড (COMODE) ........................................ ১৬৭
পবিত্রতা অর্জনের জন্য বাম হাত নির্ধারণ ........................................ ১৬৭
কিবলার দিকে মুখ না করা ........................................ ১৬৭


## ইসলামি পবিত্রতা পদ্ধতি ও ইউরোপীয় সমাজ


ফারানির উপদেশ ........................................ ১৬৮
এক অমসুলিমের ঘটনা ........................................ ১৬৯
অবজ্ঞা ও তার পরিণাম ........................................ ১৭০


## মহানবীর সতর্কতা ও আধুনিক বিজ্ঞান


ডা. কোস্ট এর স্বীকারোক্তি ........................................ ১৭৯
নবীজীর পেয়ালা ও আধুনিক বিজ্ঞান ........................................ ১৭৯


## খাবারের সতর্কতা ও আধুনিক বিজ্ঞান


গুরুত্ব ও তাৎপর্য ........................................ ১৮০
তীব্র গরম খাবারের নিষেধাজ্ঞা ........................................ ১৮১
দুধ ও মাছ একত্রিত না করা ........................................ ১৮১
দুই গরম খাবার একত্রিত না করা ........................................ ১৮২
দুই ঠাণ্ডা জাতীয় খাবার একত্রিত না করা ........................................ ১৮২
দুই আঠাযুক্ত খাবার একত্রিত না করা ........................................ ১৮২
দুই কঠিন খাদ্য একত্রিত না করা ........................................ ১৮৩
দুই জোলাপ সৃষ্টিকারী খাবার একত্রিত না করা ........................................ ১৮৩

দুই স্থূল জাতীয় খাবার একত্রিত না করা ..................................... ১৮৩
দুই তরল খাবার একত্রে না খাওয়া ..................................... ১৮৩
পায়খানা কঠিন ও তরলকারী খাবার একত্রে না খাওয়া ..................................... ১৮৩
দ্রুত হজমশীল ও বিপরীত স্বভাবের খাবার একত্রে না খাওয়া ..................................... ১৮৩
ভুনা করা ও পানি দিয়ে রান্না করা খাবার একত্রে না খাওয়া ..................................... ১৮৪
তাজা ও বাসী খাদ্য একত্রিত করা অনুচিত ..................................... ১৮৪
অধিক মসলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য খাওয়া ক্ষতিকর ..................................... ১৮৪
মাটি ভক্ষণের নিষিদ্ধতা ..................................... ১৮৫
বিখ্যাত ফিজিউলজিষ্ট ড. কিউর-এর অভিজ্ঞতা ..................................... ১৮৫

## চারটি উপকারী বিষয় ও আধুনিক বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারী যৌক্তিকতা..................................... ১৮৬
নাসিকা ও কর্ণের চুলের গুরুত্ব ..................................... ১৮৮

## দৃষ্টির হেফাজত ও আধুনিক বিজ্ঞান

গুরুত্ব ও তাৎপর্য ..................................... ১৮৮
চিন্তার বিষয় ..................................... ১৮৯
একটি মজার ঘটনা ..................................... ১৮৯

## পিতা-মাতার আনুগত্য ও আধুনিক বিজ্ঞান

গুরুত্ব ও তাৎপর্য ..................................... ১৯০
মাতা-পিতার সহিত সদ্ব্যবহার ও তার ফলাফল ..................................... ১৯১

## মায়ের দু'আ

ঘটনা : ১ ..................................... ১৯২
ঘটনা : ২ ..................................... ১৯২
ঘটনা : ৩ ..................................... ১৯২
ঘটনা : ৪ ..................................... ১৯৩

## মাতাপিতার বদ-দু'আর ফল

প্রথম ঘটনা ..................................... ১৯৪
দ্বিতীয় ঘটনা ..................................... ১৯৪
তৃতীয় ঘটনা ..................................... ১৯৫
ইউরোপের শিক্ষণীয় একটি ঘটনা ..................................... ১৯৫
ইসলাম ও মাতাপিতার খেদমত ..................................... ১৯৮
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ..................................... ১৯৮

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

# দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র

## শরাব বা মদ এবং আধুনিক বিজ্ঞান
(ALCOHOL AND MODERN SCIENCE)


হাদীসে রাসূল ..................২০৩
শরাব সভ্যতা ও মানবতার দুশমন ..................২০৩
মানবদেহের উপর মদের প্রভাব ..................২০৪
রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার উপর শরাবের বিরূপ প্রভাব ..................২০৭
সমাজ জীবনের উপর মদের প্রভাব ..................২০৮


## নেশা, স্বাস্থ্য, ইসলাম এবং আধুনিক বিজ্ঞান


হালাল-হারামের তাৎপর্য ..................২০৯
নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার ..................২০৯


## বিবাহ ও আধুনিক বিজ্ঞান


সুন্নাতে রাসূল ..................২১৮
ডাক্তার ওয়াচার লোহাক এর তথ্য ..................২১৮
খাত্না (CIRE UMCISION) ..................২১৮
খাত্না ও বিশ্বের অন্যান্য জাতি ..................২১৯


## কুদৃষ্টি ও আধুনিক বিজ্ঞান


হাদীসে রাসূল ..................২২০
ষ্টিফেন গোলনের তেজ দীপ্ত চোখ ..................২২১
প্যারাসইক্লোজী এর গবেষণা (RESEARCH OF PARAPSYCHOLOGY) ......২২১


## লাঠির সুন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞান


সুন্নাতে রাসূল ..................২২২
লিপল গিরলিপ এর (THE CHIEFS OF PUNJAB)-এ প্রকাশিত অভিমত ......২২৩
মাঝে মধ্যে খালি পায়ে চলার উপদেশ ..................২২৩
রোগীকে অধিক খাওয়ার উপর পীড়াপীড়ি না করা ..................২২৪
বাস্তব অভিজ্ঞতা ..................২২৪


## গালী এবং আধুনিক বিজ্ঞান


সুন্নাতে রাসূল ..................২২৫
প্যারাসাইক্লোজী এর গবেষণা (RESEARCH OF PARAPSYCHOLOGY) .....২২৫

## মুচকি হাসি এবং আধুনিক বিজ্ঞান


সুন্নাতে রাসূল .................... ২২৬
জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে কিছু উপদেশ .................... ২২৬
সকাল সকাল দ্রুত কাজ শুরু করা .................... ২২৭
ইউলিয়াম থেরাপ নামক অর্থনীতিবিদের অভিজ্ঞতা .................... ২২৭


## বংশগত বা ছোয়াছে রোগ ও আধুনিক বিজ্ঞান


বিজ্ঞানের অভিমত .................... ২৩০
হাই-কে হাত দ্বারা প্রতিরোধ করা .................... ২৩০
হাদীসে রাসূল .................... ২৩০


## কুকুরের ঝুটা মাটি দ্বারা পবিত্র করা ও আধুনিক বিজ্ঞান


নবীজীর উপর এক চিকিৎসাবিদের আস্থা .................... ২৩১
মাছি ডুবিয়ে দেওয়ার রহস্য .................... ২৩৩
বিজ্ঞানের আলোকে শেভ করার ক্ষতি .................... ২৩৩
ডাক্তার মোর এর গবেষণা .................... ২৩৪
চর্মরোগ (SKEENDISEASES) .................... ২৩৪
অ্যালট্রাভায়োলেট রশ্মির ক্ষতি .................... ২৩৫
সেভের একটি বিশেষ প্রভাব .................... ২৩৫


## শরঈ পর্দা ও আধুনিক বিজ্ঞান


সুন্নাতে রাসূল .................... ২৩৫
ডাক্তার স্টিফেন ক্লার্ক .................... ২৩৫


## অবাধ মিলন, ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান


ইহ্সানে রাসূল .................... ২৩৬
একটি প্রশ্ন সাতটি উত্তর .................... ২৩৭
আমেরিকার কয়েকটি ঘটনা .................... ২৩৯
একই ধ্যান একই মন .................... ২৪০
মারাজাল বাহরাইনের রহস্য .................... ২৪২
কুরআনই সঠিক পথ দেখিয়েছে .................... ২৪৩

## হাঁচির জবাবে আলহামদুলিল্লাহ্ বলা ও আধুনিক বিজ্ঞান

হাদীসে রাসূল ....................................................... ২৪৫
গবেষণার ফসল ....................................................... ২৪৫

## ভাল নাম ও আধুনিক বিজ্ঞান
(BEST NAME AND MODERN SCIENCE)

হাদীসে রাসূল ....................................................... ২৪৬
নাম এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য ....................................................... ২৪৭
শব্দেরও শক্তি আছে ....................................................... ২৪৭
বদ আমল কি মানুষকে বিষাক্ত বানিয়ে দেয়? ....................................................... ২৪৮
পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের গবেষণা ....................................................... ২৪৮
দু'আ ও ইবাদতের দর্শন ....................................................... ২৪৯
তাবীজের শক্তির রহস্য ....................................................... ২৪৯
এ জাতীয় আরও দুটি ঘটনা ....................................................... ২৫০
ব্যভিচার সকল রোগের মূল ....................................................... ২৫২
ইউরোপে ব্যভিচারের ধ্বংসাত্মক পরিণাম ....................................................... ২৫৩
আমেরিকা ....................................................... ২৫৩
শিক্ষা জীবন ....................................................... ২৫৪
তিনটি মারাত্মক উত্তেজনা সৃষ্টিকারক জিনিস ....................................................... ২৫৬
অশ্লীলতার সয়লাব ....................................................... ২৫৬
ঘৃণ্য রোগ-ব্যাধি ....................................................... ২৫৮
তালাক ও বিচ্ছেদ ....................................................... ২৫৯
জাতীয় আত্মহত্যা ....................................................... ২৬০
ইংল্যাণ্ডের অবস্থা ....................................................... ২৬১

## মাড় লাগানো কাপড় ও আধুনিক বিজ্ঞান

সুন্নতে রাসূল ....................................................... ২৬৪
ব্রেসিয়ারের ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহার ....................................................... ২৬৪
মায়েদের দুধ কমে যাওয়া ....................................................... ২৬৫
সুবিবেচনার জন্য একটি উদাহরণ ....................................................... ২৬৬
স্নায়ুবিক রোগসমূহ ....................................................... ২৬৭

## নখপালিশ ও আধুনিক বিজ্ঞান

রাসায়নিক চিকিৎসা পদ্ধতি ....................................................... ২৬৮

## মেকআপ ও আধুনি বিজ্ঞান

সুন্নাতে রাসূল ........................................ ২৬৮
ডেলকার্ণেগীর তথ্য ........................................ ২৬৯
হায়েয ও নেফাসের সময় সহবাস থেকে বিরত থাকা ........................................ ২৭০
জুতা মোজা ঝেড়ে পরা ........................................ ২৭১

## তাওয়াক্কুল ও আধুনিক বিজ্ঞান

সুন্নাতে রাসূল ........................................ ২৭১
খেজুর চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেওয়া ........................................ ২৭২

## সুগন্ধি ও আধুনিক বিজ্ঞান

(PERRUME AND MODERN SCIENCE)

সুন্নাতে রাসূল ........................................ ২৭৩
নেচারাল থেরাপি (NATURAL THERAPY) ........................................ ২৭৩
পারফিউম থেরাপি (PERFUME THERAPY) ........................................ ২৭৪

## নবীজীর জুতা ও আধুনিক বিজ্ঞান

হাদীসে রাসূল ........................................ ২৭৫
আশ্চর্য অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ ........................................ ২৭৫
বোনের উপর জুতার প্রভাব ........................................ ২৭৭
সিরা উপশিরার খিচুনি ........................................ ২৭৭
হিন্দুস্তানের বাদশাহদের পছন্দ ........................................ ২৭৭
ক্যানভাসের জুতা বাচ্চাদের জন্য ক্ষতিকর ........................................ ২৭৮
বাচ্চাদের ঘা অথবা চোট ........................................ ২৭৯
সোল নরম হওয়া ........................................ ২৭৯
উঁচু হিল জুতা ........................................ ২৮০

## নবীজীর চলার ধরন ও আধুনিক বিজ্ঞান

হাদীসে রাসূল ........................................ ২৮০
খালি পায়ে হাটার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ........................................ ২৮১
অনিদ্রা ........................................ ২৮২
গ্যাষ্টিক ........................................ ২৮৩
কোষ্ঠকাঠিন্য ........................................ ২৮৩
হৃৎপিণ্ডের রোগ-ব্যাধি ........................................ ২৮৩
মেদভুঁড়ি ........................................ ২৮৪
অর্শ্বরোগ ........................................ ২৮৪

## চোখে সুরমা ব্যবহার ও আধুনিক বিজ্ঞান


হাদীসে রাসূল ........................................২৮৪
দৃষ্টিশক্তি রক্ষা ........................................২৮৫
চোখ থেকে অশ্রু নির্গমন ........................................২৮৬
গোঁফ ছাটা ........................................২৮৭


## যিকির, অযীফা ও আধুনিক বিজ্ঞান


সুন্নাতে রাসূল ........................................২৮৭
জনৈক পাইলটের ঈমান ........................................২৮৯
দু'আর প্রভাব ........................................২৯০
বরকতময় আয়াতের প্রভাব ........................................২৯০
জনৈক প্রফেসরের আরোগ্য লাভ ........................................২৯১
সূরা ইয়াসীনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ........................................২৯২
জনৈক রোগীর করুণ কাহিনী ........................................২৯২
আরও একটি ঘটনা ........................................২৯২
কষ্টকর সফর ........................................২৯৩
জনৈক অলি আল্লাহর ঘটনা ........................................২৯৩
প্রসব কষ্ট লাঘবে ইয়াসীনের প্রভাব ........................................২৯৪
সুন্নত তরীকায় সফর করার কতিপয় ঘটনা ........................................২৯৫
দুর্ঘটনায় আমার জনৈক বন্ধুর নিরাপদ থাকা ........................................২৯৬
ফয়ছলাবাদ সফর ........................................২৯৬
রাত্রিকালীন সফর ........................................২৯৭
দুর্গম পাহাড় সফর ........................................২৯৭
মসজিদে আসা-যাওয়ার আদব ........................................২৯৮
কাপড় পরিধান করার তরীকা ........................................২৯৮
একটি সুন্নতের বরকত ........................................২৯৯


## যয়তুন তেলের মালিশ ও আধুনিক বিজ্ঞান


হাদীসে রাসূল ........................................২৯৯
মালিশ ও বিশেষজ্ঞগণ ........................................৩০১
ডাক্তার লেকসারের মতবাদ ........................................৩০২
ডা. স্যার ওলিয়াম এর অভিজ্ঞতা ........................................৩০২
শক্তি বৃদ্ধিতে মালিশের আশ্চর্য ক্ষমতা ........................................

## আংটির পাথর ও আধুনিক বিজ্ঞান


হাদীসে রাসূল ....................................................৩০৫
আকীক পাথর ....................................................৩০৬
প্রাপ্তিস্থান ....................................................৩০৬
আকীকের পরিচয় ....................................................৩০৬
আকীক পাথরের প্রকারভেদ ....................................................৩০৬
আকীকের রহস্যজনক বৈশিষ্ট্য ....................................................৩০৮
চিকিৎসা বিজ্ঞানে আকীকের বৈশিষ্ট্য ....................................................৩০৮


## তালবীনা ও আধুনিক বিজ্ঞান


হাদীসে রাসূল ....................................................৩০৯
পরিক্ষিত ঔষধ ....................................................৩০৯


## মায়ের দুধ ও আধুনিক বিজ্ঞান


বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ....................................................৩১০
মায়ের দুধ এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ....................................................৩১১


## ব্যবসা ও আধুনিক বিজ্ঞান


হাদীসে রাসূল ....................................................৩১৯
ববসায়ী ও ব্যবসার ভূমিকা ....................................................৩২২
ব্যবসার প্রতি ইউরোপীয়ান বিশেষজ্ঞদের মনোভাব ....................................................৩২৩
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ....................................................৩২৪
প্রতিশ্রুতি ....................................................৩২৫
ঋণ গ্রহণ ....................................................৩২৬


## ক্ষতিকর ঔষধ ও আধুনিক বিজ্ঞান


হারাম বস্তুতে আরোগ্য নেই ....................................................৩২৭
হারাম বস্তুর বৈজ্ঞানিক অবস্থান ....................................................৩২৮
রক্ত ....................................................৩২৯
শূকরের গোশত ....................................................৩৩০
গলা টিপে মারা প্রাণী ....................................................৩৩৩
আঘাতপ্রাপ্ত প্রাণী ....................................................৩৩৩
হিংস্র প্রাণীর ভুক্ত প্রাণী ....................................................৩৩৫
হারাম বস্তুর আসল রূপ ....................................................৩৩৭


## যবাই ও আধুনিক বিজ্ঞান


সুন্নাতে রাসূল ....................................................৩৩৮
ইহুদিদের জন্য হালাল প্রাণী তৈরি ....................................................৩৪০
যবাই করার ইসলামী নিয়মনীতি ....................................................৩৪২

## যবাইকৃত প্রাণী ও আধুনিক বিজ্ঞান

ইসলামের অবদান ..........৩৪৪

## রোগীর সেবা ও আধুনিক বিজ্ঞান

আমেরিকার কেনেডী হাসপাতালের কার্যবিধি ..........৩৪৬
আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা ..........৩৪৬
রোগীর সেবা করার উপকারিতা ..........৩৪৮
ইসলাম ও অনাড়ম্বর জীবন ..........৩৪৯
'ওয়াল বাহ্‌রিল মাসজূর' এর আশ্চর্যজনক তথ্য ..........৩৫১

## সাহাবায়ে কিরামের বাহাদুরী ও আধুনিক বিজ্ঞান

(SIX FOODS OF SAHABA AND MOERN SCICNCE)

সুন্নাতে রাসূল ..........৩৫২
সাহাবায়ে কিরামের ছয়টি খাদ্য ..........৩৫৩

## গরুর গোশত ও আধুনিক বিজ্ঞান

(BEEF AND MOERN SCICNCE)

হাদীসে রাসূল ..........৩৫৪
মেডিক্যাল টেস্ট ..........৩৫৫

## ছাগলের দুধ ও আধুনিক বিজ্ঞান

(GOATS MILK AND MOERN SCICNCE)

হাদীসে রাসূল ..........৩৫৫
বকরীর দুধ দ্রুত হজম হওয়ার কয়েকটি বিশেষ ..........৩৫৭
গর্ভবর্তী মহিলাদের জন্য আয়রণ ক্যাপসুল ..........৩৫৮
এফ. আর. সি. এস ডাক্তারদের প্রতি একটি বিশেষ অনুরোধ ..........৩৫৯

## ক্রোধ ও আধুনিক বিজ্ঞান

(DAMAGE FROM ANGER AND MOERN SCICNCE)

হাদীসে রাসূল ..........৩৬০
ফ্রাইড এবং ক্রোধ (FRIAD AND ANGER) ..........৩৬০
ক্রোধ জীবন ধ্বংসকারী ..........৩৬০

## তৈল ব্যবহার ও আধুনিক বিজ্ঞান

হাদীসে রাসূল ..........৩৬২
স্যার জেমস সাগমের পর্যবেক্ষণ

## নবীজীর বর্তন ও আধুনিক বিজ্ঞান
(UTENSILE OF PROPHAT AND MOERN SCICNCE)


সুন্নাতে রাসূল ..........৩৬৩
প্লাষ্টিকের পাত্র ..........৩৬৪
কোলেক্টিকাট ইউনিভার্সিটির গবেষণা ..........৩৬৪
এ্যালুমিনিয়ামের পাত্র স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ..........৩৬৬


## দুধের লাচ্ছি ও আধুনিক বিজ্ঞান


সুন্নাতে রাসূল ..........৩৬৮
ভলিম কিউর ও দুধের লাচ্ছি ..........৩৬৮
লাচ্ছি ..........৩৬৯


## মোটা আটা ও আধুনিক বিজ্ঞান


সুন্নাতে রাসূল ..........৩৭০
হৃদরোগ থেকে আত্মরক্ষা ..........৩৭০
স্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে আত্মরক্ষা ..........৩৭১
নখ কাটা ঔষধও বটে ..........৩৭১
সুন্নাতে রাসূল ও ফ্যামিলি প্লানিং ..........৩৭২
গাইনী কেলোজিস্টের ওয়ার্নিং ..........৩৭৩
W.H.O. এর উপদেশ ..........৩৭৩


## জ্বর, পানি ও অধুনিক বিজ্ঞান


হাদীসে রাসূল ..........৩৭৪
হাইড্রোপ্যাথির (পানি চিকিৎসা) নিয়ম ..........৩৭৪


## সংক্রামক ব্যাধি ও আধুনিক বিজ্ঞান


হাদীসে রাসূল ..........৩৭৫
আধুনিক বিজ্ঞানের স্বীকৃতি ..........৩৭৫


## ইসলামে পানির স্বচ্ছতা ও আধুনিক বিজ্ঞান


ইহ্সানে রাসূল ..........৩৭৭
দ্বীনদার লোকদের রোগ-ব্যাধি ..........৩৭৯
ইবাদত বন্দেগী ও শারীরিক সুস্থতা ..........৩৮০


## পরিশিষ্ট


দাড়ির অপরিহার্যতা ..........৩৮২
গাভী একটি বৈধ-হালাল প্রাণী ..........৩৮২
নামায ও ক্ষুধা ..........৩৮৩

## লক্ষ্য রাখতে হবে যে

- আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুন্নতের অনুসরণ ; বিজ্ঞানের অনুসরণ নয়।
- আখেরাতের ছওয়াব ও পুরস্কার সুন্নতের অনুসরণের মাঝেই নিহিত; বিজ্ঞানের অনুসরণের মাঝে নয়।
- দীন রোজ কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য দীন পূর্ণাঙ্গ। পক্ষান্তরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার শেষ কথা বলতে কিছুই নেই।
- সুন্নত কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার মুখাপেক্ষী নয়।
- মানুষের জ্ঞান অস্থায়ী; পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান চিরন্তন।
- সুন্নতের মধ্যে বৈজ্ঞানিক বা জাগতিক কল্যাণ নিহিত আছে বলে নয় বরং সুন্নত আমার মনিবের পবিত্র আদর্শ বলেই আমি সুন্নতের অনুসরণ করব।
- আর মনে করব, যেহেতু কৌতূহল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই ইসলামের প্রতিটি আচরণে কি কল্যাণ নিহিত রয়েছে, শুধু তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েই বৈজ্ঞানিকগণ সুন্নত সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। নতুবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সুন্নত আদৌ বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী নয়।

## গ্রন্থটি যেভাবে রচিত হয়

✪ বহুদিন আগের কথা। আমি একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের সাথে আলাপ করতে গিয়েছিলাম। কথার একপর্যায়ে তিনি বলতে লাগলেন, "দেখুন! ইদানিং খাদ্য গ্রহণের পর কিছু লোক আঙ্গুল চাটতে শুরু করে দিয়েছে। বাস্তবিকই যদি খাদ্য সামগ্রীর অভাব হত, তা হলে কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু প্রচুর পরিমাণ খাদ্য মজুদ থাকার পরও আঙ্গুল চাটা তো বড়ই অশোভনীয় ও দোষের ব্যাপার!" এসব কথা ধৈর্যের সাথে শ্রবণ করার পর আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট আরয করলাম, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরকতময় সুন্নত। কিন্তু এ কথা তাঁর বুঝে আসল না। তাই আমি যখন আঙ্গুল চাটার বৈজ্ঞানিক যুক্তি ব্যাখ্যা করলাম, তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। বলতে লাগলেন, বাস্তবেই এত মূল্যবান তথ্য আমার আদৌ জানা ছিল না। আজ থেকে আমিও আঙ্গুল চাটার উপর জোর দিব।

✪ একদা স্কটল্যাণ্ড থেকে এক ভদ্রলোক আমাদের মহল্লায় তার আত্মীয়দের বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি মুসলমান ছিলেন বটে; কিন্তু ইসলাম ও এর মৌলিক বিধান সম্পর্কে ছিলেন একেবারেই অজ্ঞ। তাই তার আত্মীয়রা আমার নিকট এসে বলল : আপনি যদি তাকে প্রত্যহ কিছু সময় দেন এবং ইসলামের প্রাথমিক ইলম শিক্ষাদান করেন, তাহলে বড়ই উপকার হয়। যা হোক, তিনি দৈনিক আসতে থাকলেন এবং প্রত্যহ বিভিন্ন সুন্নতের পার্থিব লাভ বা বৈজ্ঞানিক কারণ কি তা জিজ্ঞাসা করতেন। আমি যত্নের সাথে নিজের তাওফীক অনুযায়ী তাকে বুঝাতাম। ফলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যেতেন এবং বলতেন, আমি একা নই বরং আজ ইউরোপের প্রতিটি মুসলিম-অমুসলিম এভাবে জিজ্ঞাসা করে থাকে। তারা যখন উত্তর পেয়ে খুশি হন, তখন ইসলাম ভক্ত বরং মুসলমান হয়ে যান।

✪ একবার আমার এক বন্ধু বললেন, তারা বেলজিয়ামে এক ভদ্রলোককে দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি উযুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তলব করতে লাগলেন; কিন্তু এ বিষয়ে আমি কিছু জানতাম না। তাই তাকে অন্য এক আলেমের নিকট নিয়ে গেলাম; কিন্তু তাঁরও এ বিষয়ে বিশেষ কোনো জ্ঞান ছিল না। পরিশেষে অপর একভদ্র লোক তাকে উযু সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দিলেন। কিন্তু মাসাহ সম্পর্কে তেমন কিছু বলতে পারলেন না। তথাপি আমি হাল ছাড়লাম না। আমি বিরামহীনভাবে চেষ্টা চালাতে থাকলাম। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনা

পেলেন না। ঘটনার কিছুদিন পর তিনি আমাকে বলতে লাগলেন, আমাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করুন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তিনি বলতে লাগলেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করি। একদিন ক্লাসে আমাদের জনৈক প্রফেসর বললেন : যদি গর্দানের নিচে ও আশেপাশে দৈনিক কয়েকবার কয়েক ফোঁটা পানি পড়ে তাহলে মেরুদণ্ডের হাড়সমূহ মস্তিষ্কের হাড়ের সাথে পরিপূর্ণরূপে সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকবে। অস্থিমজ্জার ত্রুটিতে কোনো রোগব্যাধি হবে না। তখনই আমার মাসাহ করার উপকারিতা বুঝে আসে; তাই আমি মুসলমান হতে চাই। তারপর সে মুসলমান হয়ে যায়।

✪ লেখাপড়ার প্রতি আমার আগ্রহ-আকর্ষণ এবং পাশ্চাত্য ধাঁচের শিক্ষিত লোকদের সাথে আমার সম্পর্ক বেশি ছিল। তাই তাদের সাথে যখন দীন ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হত, তখন তাদের অসংখ্য ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ত। কিন্তু তাদের সাথে ওই বিষয়ে ইসলাম ও বিজ্ঞানের উদ্ধৃতি দিয়ে যখন বক্তব্য তুলে ধরতাম, তখন তারা খুব আগ্রহী হত। ফলে তাদের জীবন যাপনে ইসলামের সুস্পষ্ট ঝলক পরিদৃষ্ট হত। মানুষ স্বভাবগতভাবে লোভাতুর। সে যে দিকে লাভ দেখে, ওই দিকে উঠে পড়ে লাগে এবং তা নিয়েই আলোচনা করে। সে জন্য মানুষকে যখন পার্থিব লাভ-উপকারিতার সংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

✪ গ্রন্থখানা কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য এক ব্যক্তির নিকট গেলাম। প্রথম অধ্যায় ছিল মিস্ওয়াক সম্পর্কে। তিনি এ অধ্যায় কম্পোজ করার পর তার টেবিলে আমি মিস্ওয়াক দেখতে পেলাম। এ ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সে বলল, মেসওয়াকের উপকারিতা সম্পর্কে আমার ইতোপূর্বে কোনো ধারণা ছিল না। এখন মিস্ওয়াক করা আর আমি কখনো ত্যাগ করব না ইনশাআল্লাহ।

✪ আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ ঘটনাগুলো আমার মনকে দোলা দেয়। তাই আমি গবেষণার কাজে ঝুঁকে পড়ি। দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিরামহীনভাবে আমি এ কাজে নিয়োজিত থাকি।

✪ পরবর্তীকালে একপর্যায়ে আমি আমার মুর্শিদ মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল ওয়াহাব শাহ দা. বা. সাহেবের সাথে সফরে গমন করি। সে সময় আমার বন্ধুবর মুহাম্মদ জাহেদ রাশেদী হাশিমপুরী বিশেষ করে হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ

হাশিমপুরী এ গবেষণালব্ধ ফসলকে গ্রন্থাকারে বিন্যাস করার জন্য অধিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেন। মোটকথা, এ হল বইটি আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রাণপণ মেহনতের খণ্ড চিত্র।

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান বইটি এখন আপনাদের হাতে। এ গ্রন্থখানা রচনার পূর্বে আমি সারা দেশের আনুমানিক একশ ত্রিশ জন বিজ্ঞ আলেম, প্রফেসর, ডাক্তার ও সম্পাদকবৃন্দের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি এবং এ সংক্রান্ত তত্ত্ব ও তথ্য প্রার্থনা করি। সকলের একই জবাব ছিল আজ পর্যন্ত ইসলাম ও দশর্ন, ইসলাম ও মিরাজ, ইসলাম ও চিকিৎসা, ইসলাম ও মনোবিজ্ঞান' ইত্যাদি বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে 'সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান' সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোনো গ্রন্থ সামনে আসে নি। তবে পত্র-পত্রিকায় কখনো কখনো এ বিষয়ে ২/১টি ঘটনা পাওয়া গেছে। আবার কোনো কোনো গ্রন্থকারের গ্রন্থে সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ক ২/১টি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। কিন্তু পৃথকভাবে এ বিষয়ে বই বিলকুল নেই। সুতরাং বইটি সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে বিরাট ভূমিকা রাখবে। বইটি রচনায় সন্নিবেশিত হাদীসের রেফারেন্সের প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। অনেক পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের গবেষণালব্ধ বইপত্র থেকে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে এবং তাদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয় ঘাটাঘাটি ও গবেষণার পর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং শ্রবণ করেছি, শ্রবণ করা হয়েছে এবং অনির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য এখানে লিখা হয় নি। স্বল্প শিক্ষিতদের প্রতি লক্ষ্য রেখে সহজ সরল ভাষায় বইটি রচনা করতে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। যেন সকল শ্রেণীর পাঠক সহজে উপকৃত হতে পারেন।

প্রকাশ থাকে যে, আমার জানা ও অভিজ্ঞতা অপ্রতুল। আমার বিশ্বাস আমি ইলমের লাইনে আপনাদের মতো উচ্চে পৌছাতে পারি নি। কিন্তু আশা করি, আমার লেখা ও সীমাহীন পরিশ্রমের প্রতি লক্ষ্য করলে আপনারা বইটি থেকে যথেষ্ট উপকৃত হবেন। বইটি হচ্ছে এ বিষয়ে সর্বপ্রথম সোপান। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা একে অধিক উজ্জ্বল করবে।

আমি মনে করি, এখানেই আমার লেখা সমাপ্ত নয় তবে আমার গবেষণা

পূর্ণাঙ্গ তথ্যপূর্ণ নয় বরং অভিযাত্রা মাত্র। তাই আসুন, সামনে অগ্রসর হই। অন্যথায় অন্তত অনুগ্রহপূর্বক জ্ঞান-গবেষণামূলক এ অভিযানকে সমালোচনার লক্ষবস্তুতে পরিণত করবেন না। উল্লেখ্য যে, এ দেশে পরিশ্রমী লেখক খুব কম; কিন্তু সমালোচনাকারী অসংখ্য। তাই আমার সমালোচকদের প্রতি একটিমাত্র জবাব, বাস্তবেই আপনার দাবি যদি সঠিক হয়, তবে এর চেয়ে উত্তম সংকলন আপনিই করে দেখান। এটাই পাঠকদের প্রতি আমার দাবি।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমার আবেদন, আপনারা কোথাও সংযোজন বিয়োজনের প্রয়োজন মনে করলে এ বান্দাকে লিখবেন! তাহলে উদারতা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করা হবে। আপনাদের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবেদন হল, এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড গবেষণাধীন আছে এবং তা শীঘ্রই বের হবে। আপনিও এ কাজে শরীক হতে পারেন। সুতরাং "সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান" সংক্রান্ত কোনো প্রামাণ্য ব্যাখ্যা-বিবৃতি, পত্র-পত্রিকা, বইপুস্তক, পর্যবেক্ষণ, সমীক্ষা বা ব্যক্তিত্ব সম্পন্নদের সত্য কথা, প্রবন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত থাকলে লিখে বা ফটোকপি করে পাঠাবেন। আমি যথাসময়ে মূল্য পরিশোধ করে দিব।

পরিশেষে ওইসব সহযোগী ও শুভাকাঙ্খীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা আমাকে সর্বকাজে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তাদের অনেকেই আল্লাহর রাযী-খুশীর জন্য করেছেন। তাই নাম প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাদেরকেও সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। (আমীন)

দু'আ প্রার্থী

**ডা. মুহাম্মদ তারিক মাহমূদ (চুগতাই)**

আহমদপুর (পূর্ব), ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান।

# সুন্নতে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ও

# আধুনিক বিজ্ঞান

## প্রথম খণ্ড

মূল

ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমূদ

এম.বি.বি.এস. ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট (পাকিস্তান)

صلى الله عليه وسلم

# মিস্ওয়াক ও আধুনিক বিজ্ঞান

## MISWAK AND MODERN SCIENCE

### মিস্ওয়াকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

প্রকৃতি কখনো মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ নয় বরং তা সর্বদাই মানবস্বভাবের অনুকূল। শুধু তাই নয়, মানুষ যখন দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে গিয়ে একসময় নানাবিধ বিপদাপদের সম্মুখীন হয় এবং তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনোরূপ উপায়ান্তর না দেখে পুনরায় প্রকৃতির দিকে ফিরে আসে, প্রকৃতি তখনও মানুষকে পূর্বের মতো উপকার করে থাকে। চমকদার ও মহামূল্যবান হীরার টুকরোকে ফেলে দিয়ে সামান্য এক টুকরো কাঁচ খণ্ড গ্রহণ করা যেমনিভাবে বুদ্ধিহীনতা ও বোকামী, ঠিক তেমনি মিস্ওয়াকের মতো স্বভাবসুলভ আমলটিকে পরিত্যাগ করাও অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিচয়।

যখন থেকে আমরা এ মহান নেয়ামতটিকে হাতছাড়া করেছি, তখন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমরা নানাভাবে পেরেশান হচ্ছি। হাজার হাজার টাকা নষ্ট করেও দৈহিক সুস্থতার উৎসমূলে ফিরে যেতে সক্ষম হচ্ছি না।

মিস্ওয়াক সম্পর্কে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার পাণ্ডিত্যসুলভ উক্তি করেছেন : যেদিন থেকে আমরা মিস্ওয়াকের ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছি, সেদিন থেকেই "ডেন্টাল সার্জন"-এর সূত্রপাত হয়েছে।

এবার আসুন! আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত মানুষের স্বভাবসুলভ কি না? এ সুন্নত আমাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক, না পথ প্রদর্শক? এ সুন্নত আমাদেরকে প্রস্তর যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, না বিজ্ঞানের নিকটবর্তী করে দেয়? ফায়সালা আপনার হাতে ছেড়ে দেওয়া হল। গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যায়টি পড়ুন এবং নিজেই ফায়সালা করুন!

## রাত ও মিস্ওয়াক
(Miswak and night)

✪ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে ঘুম থেকে জেগে মিস্ওয়াক করতেন। রাতে শয়নকালে মিস্ওয়াক করা ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান অভ্যাস। (যাদুল মা'আদ)

জনৈক ইঞ্জিনিয়ার বলেন : ওয়াশিংটন (আমেরিকা) এর একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার একদা আমাকে বললেন, আপনি শয়নকালেও মিস্ওয়াক করবেন! আমি বললাম– এর কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন– বর্তমান যুগের গবেষণা বলে, মানুষ যা ভক্ষণ করে তার ময়লা কুলির দ্বারা পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার হয় না। তিনি আরো বলেন, সাধারণত মানুষের দাঁত নষ্ট হয় শয়নকালে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কী? তিনি বললেন, আপনি প্রত্যক্ষ করে থাকবেন, দিনের বেলায় মানুষ কখনো কথা বলছে, কখনো আহার করছে আবার কখনো পান করছে। তাই দিনের বেলায় মুখের গতিশীলতার কারণে রক্তরস/ রক্তলসিকা তার কাজ করার সুযোগ পায় না। কিন্তু রাতের বেলা যখন মুখ বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার সুযোগ এসে যায় কাজ করার। এ কারণেই দাঁত রাতের বেলায় অধিক খারাপ হয়। তিনি আরও বললেন, সকালে "টুথ পেস্ট" ব্যবহার করেন আর না করেন, শোয়ার সময় অবশ্যই মিস্ওয়াক করে ঘুমাবেন।

"বিজ্ঞ ডাক্তার সাহেবের মুখে একথা শুনে আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন স্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ পড়ে নিলাম। কেননা এটাই তো আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা ওযু অবস্থায় শয়ন করতেন আর মিস্ওয়াক করা ব্যতীত কখনো তিনি ওযু করতেন না। যদি কেউ খাবার শেষে ওযু করে এবং মিস্ওয়াক করে, তা হলে সে দন্ত রোগ থেকে রেহাই পাবে।"

✪ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের পূর্বে হাত ধৌত করতেন আর খাবার শেষে কুলি করতেন; কিন্তু বর্তমান যুগের মানুষেরা খানা খেয়ে কুলি না করেই চলে যায়। অথচ সে ব্যক্তি যদি মিষ্টি দ্রব্য খেয়ে থাকে, তা হলে তার প্রভাব মুখের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ অবশিষ্ট থাকে। আর যদি সাথে সাথে কুলি করার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়, তাহলে মহা ক্ষতির হাত থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়। তাছাড়া দিনে অন্তত পাঁচবার

ওযু করতে হয়, আবার পৃথকভাবে মুখ পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। এভাবে মানুষ (Electronic System) বিশেষ পদ্ধতিতে প্রতিনিয়ত মুখ, হাত, পা ইত্যাদি পরিষ্কার করে থাকে।

## নামাযের পূর্বে মিস্ওয়াক

(MISWAK BEFORE NAMAZ)

প্রকৃতপক্ষে নামায যেহেতু মহা পরক্রমশালী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের গুণ-গান করা, তাই নামাযের সময় মুখ পরিষ্কার থাকা অত্যাবশ্যক। যদি আহারের পর মিস্ওয়াক বিহীন উযু করে নামায আদায় করা হয়, তাহলে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো জিহ্বায় লেগে নামাযের একাগ্রতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

তাছাড়া নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় নামাযী ব্যক্তির মুখ থেকে যদি দুর্গন্ধ বের হয়, তাহলে তার দ্বারা অন্য নামাযীদেরও কষ্ট হয়। তাই মিস্ওয়াক দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ দূর করে নেওয়া উচিত। আর মিস্ওয়াক করার সময় মুখ এমনভাবে (Rays) হিল্লোলিত হয়, যদ্দরুন কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ্-তাহ্লীল ইত্যাদিতে পাওয়া যায় অনাবিল শান্তি। নামায হল মহান সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে হাজিরা দেওয়া আর সেই বিশেষ সময় যদি মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, তা হলে তা লজ্জারও কারণ বটে।

## সুইজারল্যাণ্ডের জনৈক ডাক্তার ও মিস্ওয়াক

বন্ধুবর মনসূর সাহেব ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সরল প্রকৃতির লোক। একদিন আমাকে বলতে লাগলেন, আমি একসময় সুইজারল্যাণ্ডে ছিলাম। সেখানে সাক্ষাৎ হল একজন নও মুসলিমের সাথে। আমি তাকে (পীলু বৃক্ষের) একটি মিস্ওয়াক উপহার দিলাম। মিস্ওয়াকটি পেয়ে সে মহা আবেগে আপ্লুত হয়ে সেটি চোখে-মুখে লাগাতে লাগল এবং আনন্দের আতিশয্যে তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। তারপর সে পকেট থেকে একটা রুমাল বের করল। তাতে দুই ইঞ্চি পরিমাণ একটা মিস্ওয়াক সযত্নে জড়ানো ছিল। মিস্ওয়াকটি বের করে সে বলতে লাগল, আমি যখন মুসলমান হয়েছিলাম, তখন এক মুসলমান ভাই এটি আমাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন। আমি অতি সাবধানতার সাথে এটি ব্যবহার করতে থাকি। এ খণ্ডটুকু তারই অবশিষ্ট অংশ। এখন আপনি আমার উপর বিরাট

বড় ইহসান করেছেন। তারপর সে তার জীবনের একটি ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে লাগল, একবার আমার দাঁতের মাড়ীতে এমন কঠিন রোগের সৃষ্টি হয়েছিল, যার চিকিৎসা তদানিন্তন ডাক্তারদের নিকট ছিল দুরূহ ব্যাপার। অগত্যা আমি এ মিস্ওয়াক ব্যবহার শুরু করে দিলাম। কিছু দিন পর গেলাম সেই ডাক্তারকে দাঁত দেখাতে। দাঁত দেখে তো ডাক্তার হতবাক। জিজ্ঞেস করল, আপনি এমন কী ঔষধ ব্যবহার করেছেন, যার ফলে আপনি এত দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে পারলেন? বললাম, আমি তো শধু আপনার দেওয়া ঔষধই ব্যবহার করেছি। ডাক্তার বললেন, কখনো না। আমার ঔষধে এত দ্রুত আরোগ্য লাভ সম্ভব নয় বরং আপনি চিন্তা করে বলুন! আমি গভীরভাবে চিন্তা করতেই স্মরণ হল আমি তো মুসলমান, আমি মিস্ওয়াক ব্যবহার করছি। এরপর যখন ডাক্তারকে মিস্ওয়াক দেখালাম। ডাক্তার খুবই আশ্বস্ত হলেন এবং নতুনভাবে রিসার্চ শুরু করে দিলেন।

## গুরু নানক ও মিস্ওয়াক

গুরু নানক সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি সর্বদা হাতে মিস্ওয়াক রাখতেন এবং মিস্ওয়াক করতেন। তিনি বলতেন, হয়তো এ লাকড়ি গ্রহণ কর, নতুবা রোগকে বরণ কর। দেখুন, কত সূক্ষ্ম কথা! তিনি বলেছেন, মিস্ওয়াক দ্বারা রোগ-ব্যাধি দূরীভূত হয়। নতুবা অসুস্থ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

## মুখের দুর্গন্ধ ও মিস্ওয়াক

এক ব্যক্তির মুখে ছিল খুবই দুর্গন্ধ। এর জন্য সে উন্নত মানের টুথপেস্ট, ঔষধ, মাজন এবং দুর্গন্ধনাশক বিভিন্ন ঔষধ (Medicine Antiseptic) ব্যবহার করে কিন্তু তাতে তার কোন উপকার হয় নি। তারপর সে এ ব্যাপারে আমার নিকট পরামর্শ চাইলে আমি তাকে পীলু বৃক্ষের মিস্ওয়াক ব্যবহাররের পরামর্শ দিলাম এবং পদ্ধতি বলে দিলাম যে, মিস্ওয়াকের আগার চিকন আঁশগুলো প্রত্যহ নতুন হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ প্রত্যহ সেই আঁশগুলো কেটে ফেলে নতুন আঁশগুলো ব্যবহার করতে থাকবেন, (এটা সকলের জন্য বাঞ্ছনীয়, নতুবা মিস্ওয়াকের কাঙ্ক্ষিত উপকার পাওয়া যাবে না)। এ পদ্ধতিতে মিস্ওয়াক ব্যবহারের পর অতি অল্প দিনের মধ্যেই সে আরোগ্য লাভ করে।

## হৃৎপিণ্ডের ঝিল্লিতে পুঁজ ও মিস্‌ওয়াক

হেকিম এস.এম. ইকবাল 'জাহান' নামক পত্রিকায় লিখেন : আমার নিকট একজন রোগী এল। তার হৃৎপিণ্ডের ঝিল্লিতে জমা হয়েছিল অনেক পুঁজ। এর জন্য লোকটি চিকিৎসাও নিচ্ছিল। কিন্তু কিছুতেই সে ফল পেল না। অবশেষে অপারেশনের মাধ্যমে পুঁজ বের করা হল। কিছুদিন পর আবার পুঁজ জমা হয়ে গেল। অবশেষে সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে সে আমার নিকট চলে এল। আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পেলাম তার দাঁতের মাড়ীতে ক্ষত আছে। তাতে পুঁজ ভর্তি। দাঁতের মাড়ীর ওই পুঁজই তার হৃৎপিণ্ডে গিয়ে জমা হচ্ছে। আমার এ রোগ নিরূপণ সকল ডাক্তারগণও একবাক্যে স্বীকার করে নিলেন।

এবার তার চিকিৎসার পালা। প্রথমে তার দাঁত ও মাড়ীর চিকিৎসা করা হল। সেবনের জন্য কিছু ঔষধ আর ব্যবহারের জন্য দেওয়া হল পীলু বৃক্ষের মিস্‌ওয়াক। ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তার রোগ নিরাময় হল।

## দন্ত চিকিৎসা ও দশ হাজার দিরহাম

আরব দেশ থেকে এক রোগী লিখে জানাল, সে দাঁতের জটিল রোগে ভুগছে। তার চিকিৎসার জন্য এ যাবৎ ১০ হাজার দিরহাম ব্যয় করা হয়ে গেছে; কিন্তু এর কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে চিঠির উত্তরে লিখলাম আপনি শুধু পীলু বৃক্ষের মিস্‌ওয়াক দুই মাস পর্যন্ত প্রত্যহ নামাযের প্রাক্কালে উযুর সময় ৫ বার আর তাহাজ্জুদ নামাযে একবার ব্যবহার করুন। অন্য কোনো ঔষধ সেবন করা যাবে না। অচিরেই রোগী কল্পনাতীতভাবে আরোগ্য লাভ করল। উল্লেখ্য যে, রোগ নিরাময়ের জন্য মিস্‌ওয়াক তরতাজা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

## মুখের স্বাদ বৃদ্ধি ও মিস্‌ওয়াক

জনৈক ব্যক্তি তার মুখের আস্বাদন শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। অনেক চিকিৎসার পরও কোনো ফল হল না। কেউ তাকে পরামর্শ দিল জিহবায় জোঁক লাগিয়ে দিতে। সে জিহবাতে জোঁক লাগিয়ে ক্ষত করল। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। অবশেষে আমি তাকে পরামর্শ দিলাম, আপনি প্রত্যহ পীলু গাছের তাজা মিস্‌ওয়াক ব্যবহার করুন। একমাস পর আমাকে আবার জানাবেন। একদিন রোগী বলল, এ এক টাকার মিস্‌ওয়াক

... ...র অধিক ফলপ্রদ। এভাবেই ফিরে পেল সে তার মুখের স্বাদ।

## গলা ও মিস্ওয়াক

টনসিলের (Tonsils) রোগীদেরকে মিস্ওয়াক ব্যবহার করিয়ে যথেষ্ট ফল পাওয়া গেছে। এক ব্যক্তি গলায় মাংসগ্রন্থি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে খুব পেরেশান ছিল। তাকে তুত ফলের শরবত ও মিস্ওয়াক ব্যবহার করতে দেওয়া হল। অর্থাৎ তুতের শরবত পান করবে আর তাজা মিস্ওয়াক দ্বারা দাঁত মাজবে এবং মিস্ওয়াক টুকরা টুকরা করে পানিতে জাল দিয়ে গড়গড়া করে কুলি করবে। এ পন্থা অবলম্বন করার পর ফলে অসুস্থ ব্যক্তি দ্রুত আরোগ্য লাভ করল।

## একটা জটিল কেস

(A STRONG CASE)

এক ব্যক্তি একাধিক জটিল রোগে আক্রান্ত ছিল। যেমন : ঘাড়ব্যথা, গলায় ব্যথা ও জ্বালাপোড়া, গলার স্বর হ্রাস পাওয়া, মস্তিষ্ক ও স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, মাথা ঘুরানো ইত্যাদি। ব্রেইন স্পেশালিস্ট (Brain Specialist) জেনারেল ফিজিশিয়ান (General Physician) বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা এসব রোগের অনেক চিকিৎসা করা হয়েছে। কিন্তু কোনো সুফল পাওয়া গেল না। আমি তার চিকিৎসার জন্য মিস্ওয়াক কেটে তা পানিতে ফুটিয়ে সেই পানি দ্বারা গড়গড়া করতে দিলাম। সাথে সাথে মিস্ওয়াক ব্যবহারেরও নির্দেশ দিলাম। আর থুতনীর নিচের উচু অংশে কিছু ঔষধ প্রলেপের জন্য দেওয়া হল। এভাবে খুব দ্রুত তার রোগ উপশম হল।

প্রকৃতপক্ষে লোকটা "থাইরাইড গ্ল্যাণ্ড" আক্রান্ত (Infected) ছিল। তার প্রতিক্রিয়া গোটা দেহে বিস্তার লাভ করার কারণে এসব রোগের সৃষ্টি হয়েছিল। সঠিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করার পর রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল।

## গালের ঘা নিরাময়ে মিস্ওয়াক

গালের ঘা অনেক ক্ষেত্রে গরমের তীব্রতা এবং প্রখরতার কারণে হয়ে থাকে। তন্মধ্যে বিশেষ একপ্রকার ঘা রয়েছে, যার বিষাক্ততা দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তার জন্য তাজা মিস্ওয়াক দ্বারা দাঁত মাজতে হবে এবং তখনকার সৃষ্ট মুখের লালাগুলো মুখের মধ্যে মলতে হবে। এ পদ্ধতিতে অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করেছে।

## দাঁতের হরিদ্রতা দূরীকরণে মিসওয়াক

অনেকের দাঁত হলুদ বর্ণ হয়ে যাওয়া এবং দাঁতের শুভ্র আস্তর বেরিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করে থাকেন। মিসওয়াকের নতুন নতুন আঁশ দাঁতের হরিদ্রতার জন্য খুবই উপযোগী

## রোগজীবাণু রোধে মিসওয়াক

মিস্ওয়াক হল দুর্গন্ধ প্রতিষেধক। মিস্ওয়াক মুখের ভিতরের রোগ জীবাণু ধ্বংস করে দেয়, ফলে নামাযী ব্যক্তি অসংখ্য রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পায়। আর অনেক রোগজীবাণু তো মিস্ওয়াকের প্রতিরোধক পদার্থ ক্রিয়াতে ধ্বংস হয়ে যায়।

## মস্তিস্ক ও মিস্ওয়াক

✪ হযরত আলী রাযি. বলেন, মিস্ওয়াক দ্বারা মস্তিষ্ক সতেজ হয়। প্রকৃতপক্ষে মিস্ওয়াকের মধ্যে থাকে ফস্ফোরাস জাতীয় পদার্থ। রিসার্চ ও অনুসন্ধানে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে, যেই জমিতে ক্যালসিয়াম ও ফসফোরাস অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, সেখানেই পীলু বৃক্ষ বেশি জন্মে। কবরস্থানের মাটিতে যেহেতু মানুষের হাড় বিগলিত হওয়ার ফলে ক্যালসিয়াম ও ফস্ফোরাস বেশি হয়ে থাকে, তাই সেখানে পীলু বৃক্ষও অধিক পরিমাণে জন্ম নিয়ে থাকে। দাঁতের প্রধান খাদ্যই হল ক্যালসিয়াম ও ফসফোরাস। আর বিশেষ করে পীলু বৃক্ষের জড়ে এ উপাদানগুলো সাধারণত বেশি পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, পীলু বৃক্ষের মিস্ওয়াক তাজা ও নরম অবস্থায় চাবালে তার মধ্যে হতে বেরিয়ে আসে তিক্ত ও তেজস্ক্রীয় এক প্রকারপদার্থ। এ পদার্থ মিস্ওয়াকের মধ্যে রোগ জীবাণুর ক্রমবিকাশকে প্রতিহত করে এবং দাঁতসমূহকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। এজন্য মিস্ওয়াকের ক্ষেত্রে বলতেই হয়, পীলু মিস্ওয়াকের অগ্রভাগের সূক্ষ্ম আঁশগুলো ভেঙে ভেঙে বা কেটে কেটে ব্যবহার করা উচিত যেন প্রত্যেকবারেই নতুন আঁশ ব্যবহার হয় এবং তার তিক্ত পদার্থ সুস্থতার ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়।

## বাবলা ও নীম গাছ

বাবলা ও নীম বৃক্ষের উপকারিতা ও গুণাগুন সম্পর্কে কে না জানে। কিন্তু আমি কাণীর বৃক্ষের (একপ্রকার তিতা গাছ) মিস্ওয়াক সম্পর্কে

আলোচনা করব। কাণীর বৃক্ষ দুই প্রকার। একপ্রকার লাল ফুল বিশিষ্ট আরেক প্রকার সাদা ফুল বিশিষ্ট। উভয় প্রকারই সাধারণত পার্ক এবং বাগানে পাওয়া যায়। বাগানের মালীর অনুমতিক্রমে সেখান থেকে মিস্ওয়াকের জন্য ডাল ভাঙা যেতে পারে।

জনৈক ব্যক্তি নিজের দাঁতের চিকিৎসার জন্য ১০ হাজার ডলার ব্যয় করে ফেলেছিল। অবশেষে তাকে কাণীর ও পীলু বৃক্ষের মিস্ওয়াক ব্যবহার করানো হলে সে পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। বিজ্ঞ ডাক্তারগণ দীর্ঘদিন যাবৎ পাইওরিয়ার রোগীদেরকে কাণীর মিস্ওয়াক ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে আসছেন এতে দূরারোগ্য রোগীও সুস্থ হয়ে উঠেছে।

এজন্য মিস্ওয়াক প্রথমে পানিতে ভিজিয়ে রাখবে, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে তা নরম করে ফেলবে। তারপর উপর থেকে নিচে এবং নিচে থেকে উপরের দিকে মিস্ওয়াক করবে। কাণীর মিস্ওয়াক যদিও শক্ত ও তিতা। তথাপি এটা দাঁতের জন্য খুবই উপকারী। এর মধ্যে এমন উপাদান রয়েছে, যা দাঁতকে করে মজবুত, উজ্জ্বল। উপরন্তু এটা পাইওরিয়ার মতো মারাত্মক রোগ-ব্যাধির জন্য মহৌষধ।

## দাঁত ও মস্তিষ্ক

অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধময় পুঁজযুক্ত দাঁত মস্তিষ্ক রোগের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আভ্যন্তরীণ রোগ– যেমন : উন্মাদনা, মস্তিষ্ক-বিকৃতিসহ আরও অনেক রোগ-ব্যাধিও এর থেকে জন্ম নেয়। জনৈক ব্যক্তির স্ত্রীর মস্তিষ্কে বিপত্তি ঘটে। তারপর পরীক্ষা দ্বারা ধরা পড়ল যে, মস্তিষ্কের পর্দায় পুঁজ জমা হয়েছে এবং রোগিনী দীর্ঘদিন যাবৎ পাইওরিয়া রোগে আক্রান্ত। সেই পুঁজই এ ধ্বংসাত্মক রোগের সৃষ্টি করেছে।

## দাঁত ও কান

যেসব রোগীদের কানে ফোলা, পুঁজ, রক্তিমতা, ব্যথা ইত্যাদি রয়েছে এবং ডাক্তারগণ তাদের চিকিৎসা করে ব্যর্থ হয়ে পড়েছেন, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেল রোগীর মাড়ীতে পুঁজ জমা হয়েছে। সুতরাং মাড়ীর চিকিৎসা করার পর অসুস্থ ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

## দাঁত ও দৃষ্টিশক্তি

দন্তরোগের সাথে রয়েছে চক্ষুরোগের গভীর সম্পর্ক। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে যখন খাবারের ছোট ছোট অংশ জমে থেকে দুর্গন্ধময় হয়ে পড়ে, তখন চক্ষুরোগ, দৃষ্টিশক্তি দুর্বল এবং অন্ধত্বের শিকার হয়ে পড়ে। চক্ষুরোগের আরও যত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে দাঁতের যত্নের প্রতি অমনোযোগই এর প্রধান কারণ বলে বিবেচিত হয়েছে। আর দাঁত পরিষ্কার করা হলেও তা করা হয় ব্রাশ দ্বারা। ব্রাশ কি দাঁতের জন্য উপকারী, না ক্ষতিকর তার বর্ণনা সামনে আসছে।

## দাঁত ও পাকস্থলী

অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের রিচার্স ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, পাকস্থলীর ৮০% রোগ দন্তরোগের কারণেই হয়ে থাকে, পাকস্থলীর রোগ বর্তমানে বিশ্বের এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁতের মাড়ীর ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ যখন খাদ্য-পানির সাথে মিলিত হয় অথবা লালার সংমিশ্রণে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, তখন ওই পুঁজ রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা সমস্ত খাদ্যসমূহকে দূষিত ও দুর্গন্ধময় করে তোলে। পাকস্থলী ও যকৃতের রোগের চিকিৎসার পূর্বে দাঁতের চিকিৎসার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এভাবেই পাকস্থলী বা পেটের পীড়ার তড়িৎ ও স্থায়ী চিকিৎসা সম্ভব।

## দাঁত ও সামাজিক জীবন

মানুষ যখন কোনো বৈঠকে আলোচনায় রত হয় অথবা যানবাহনে বিশেষ করে বিমানে অন্যের সাথে উপবেশন করে, তখন তার শ্বাস-প্রশ্বাসের দুর্গন্ধের কারণে পাশে উপবেশনকারীর ভীষণ কষ্ট হয়। আর যদি সে ব্যক্তির কাশি শুরু হয়ে যায়, তা হলে তো কথাই নেই। দুর্গন্ধের কারণে পূর্ণ পরিবেশটাই বিষাদময় হয়ে পড়ে। এ ধরনের রোগের চিকিৎসার জন্য সর্বপ্রথম দাঁতের কথা স্মরণে রাখা উচিত। কেননা দুর্গন্ধের প্রধান কারণ হল, দাঁত। এতে ফল না হলে পাকস্থলীর চিকিৎসা করা উচিত। মোটকথা, সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য দাঁতের যত্ন নেওয়া আবশ্যক। কেননা সুস্থতাই হলো সফল জীবনের চাবিকাঠি। ঐ জীবন কখনো সফলকাম হতে পারে না, যেখানে স্বাস্থ্য রক্ষার মূলনীতির প্রতি থাকে চরম উদাসীনতা।

## ব্রাশ ও মিস্ওয়াকের মধ্যে পার্থক্য

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, দাঁতের পরিচ্ছন্নতা ও সুরক্ষার জন্য ব্রাশ বেশি প্রয়োজনীয়, না মিস্ওয়াক? তাই আমরা এখানে সর্বপ্রথম ব্রাশের উপকারিতা ও ক্ষতি উভয় দিক নিয়ে আলোচনা করব।

## ব্রাশ

জীবাণু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের সুদীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, একবার ব্যবহার করা ব্রাশ স্বাস্থ্যের জন্য তখনই ক্ষতিকর, যখন তা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা হয়। কেননা ব্যবহারের দ্বারা তার মধ্যে জীবাণুর ভিত্তি স্থাপিত হয়। পানি দ্বারা পরিষ্কার করলেও তা থাকে ক্রমবর্ধমান। তাছাড়া ব্রাশ দাঁতের উপরের উজ্জ্বল স্তরকে দূরীভূত করে দেয়। ফলে দাঁতের মাঝে ফাঁকা সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে দাঁতগুলো মাড়ী থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকে। আর খাবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলো দাঁতের ফাঁকে জমে মাড়ী ও দাঁতের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

## মিস্ওয়াক

এমন বৃক্ষের মিস্ওয়াক দাঁতের জন্য উপযোগী, যার আঁশগুলো হয় কোমল, যা দাঁতের মাঝে ফাঁকা বৃদ্ধি করে না এবং মাড়ীতে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে না। তিনটি গাছের ডাল মিস্ওয়াকের জন্য উপযোগী।
(১) পীলু গাছ (২) নীম গাছ, (৩) বাবলা গাছ।

## পীলু গাছের মিস্ওয়াক

পীলু গাছের বিভিন্ন উপকারিতা আছে (ক) এর আঁশগুলো মসৃণ। (খ) এর মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ফসফোরাস। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে লবণাক্ত ও বিরাণ ভূমিতে এ বৃক্ষ পাওয়া যায়।

ভূ-তত্ত্ববিদগণের আধুনিক রিসার্চ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, মস্তিষ্কের অসংখ্য খোরাক এবং সহায়ক বস্তুর মধ্যে "ফসফোরাস" অন্যতম। আর এ ফসফরাস মুখের লালা ও লোমকূপের সাহায্যে মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। ফলে মস্তিষ্কে শক্তি সঞ্চিত হয়।

## সর্দি-কাশি ও মিস্ওয়াক

স্থায়ী সর্দি-কাশির রোগীর শ্লেষ্মা যদি জমাট বেঁধে থাকে, সে ক্ষেত্রে মিস্ওয়াক ব্যবহার করলে শ্লেষ্মা ভিতর থেকে বের হয়ে মস্তিষ্ক হালকা হয়ে

যায়। একজন প্যাথলজিস্ট বলেছেন : পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাকে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মিস্ওয়াক হল সর্দি-কাশির সর্বোচ্চ প্রতিরোধক। এমনকি সর্বদা মিস্ওয়াক ব্যবহার করলে নাক ও গলার অপারেশন করার মতো পরিস্থিতি খুব কমই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

### দাঁতের সুরক্ষায় মিস্ওয়াক

(অভিজ্ঞতায় দেখা যায়) মুচকি হাসি, হৃদয়ের প্রফুল্লতা ও মুক্তা ঝরানো হাসির জন্য দাঁত এক অমূল্য সম্পদ। এ মুচকি হাসিই এক সময় ঘৃণা ও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং মানুষের মহব্বত-ভালবাসা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ একজন সুদর্শন ও চরিত্রবান ব্যক্তি আভ্যন্তরীণ সুখ-শান্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে যখন মুচকি হাসি দেয়, তখন দাঁত সেখানে এক অতিরিক্ত মাত্রাযোগ করে তা আরো শক্তিশালী করে দেয়। পক্ষান্তরে সেই দাঁতই আবার মানুষের অলসতা ও মূর্খতার স্পষ্ট প্রমাণও বহন করে।

উল্লেখ্য যে, দেশীয় পদ্ধতিতে তেজস্ক্রীয় উপকরণবিহীন প্রস্তুত দাঁতের মাজনেও কিছু উপকারিতা রয়েছে। তবে পীলু ও নীমের মিস্ওয়াকে যে গুণাগুণ রয়েছে, তা অন্য কোনো কিছুতে পাওয়া খুবই দুষ্কর।

## ওযু ও আধুনিক বিজ্ঞান

(WAZOO AND MODERN SCIENCE)

### ওযুর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পরিচ্ছন্নতা হল ইসলামের এমন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আমল, যা অন্য কোনো ধর্মে পরিলক্ষিত হয় না। এর দ্বারা শরীরের ওই অংশ পরিষ্কার হয়, যেখান দিয়ে শরীরে রোগজীবাণু প্রবেশ করে। আর ওই অংশগুলোই রোগ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের প্রধান মাধ্যম। রোগ-ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে রাখার সহজ পদ্ধতি এটাই অর্থাৎ ওই অঙ্গগুলোর সংরক্ষণ করতে হবে। ওযু দেহে রোগব্যাধি প্রবেশের রাস্তাসমূহের অতন্দ্র প্রহরী। এর চেয়ে উত্তম প্রহরী পাওয়া খুবই দুষ্কর।

এবার বলুন! ইসলাম কি অগ্রগতির নাম না অধঃগতির নাম? ইসলামের ভবিষ্যত সমুজ্জ্বল না তিমিরাচ্ছন্ন? ইসলামি বিধি-নিষেধের মধ্যে সুস্থ্যতা রয়েছে, না রোগ-ব্যাধি? প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হল সুস্থ্যতার পথপ্রদর্শক।

কথাগুলো যদি সহজে বুঝে আসে, তা হলে তো ঠিকই আছে। নতুবা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে এ পুস্তকের সোনালী অধ্যায়গুলো অধ্যয়ন করুন। ইসলাম কি উপহার দিয়েছে মানবজাতিকে আর বিজ্ঞান কী দিতে চায়? আর ফ্যাশনইবা কি দিয়েছে আমাদেরকে?

## হাত ধৌত করা

ওযু করতে গিয়ে প্রথমেই হস্তদ্বয় ধৌত করতে হয়। কেননা তারপরই কুলি করতে হবে। আর যদি হাত থাকে অপরিচ্ছন্ন ও জীবাণু (Germs) মিশ্রিত, তা হলে সেই রোগজীবাণুই মুখের ভিতর দিয়ে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে জন্ম দিবে অসংখ্য ব্যাধি। মেশিন ও যন্ত্রপাতির এ যুগে মানুষ খুবই ব্যস্ত। এ রকম ব্যস্ত মানুষের করতে হয় নানাবিধ কাজকর্ম। আর কাজ করতে গিয়ে কখনো হাতে ক্যামিক্যাল লেগে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। ওই ক্যামিক্যাল দীর্ঘক্ষণ হাতে লেগে থাকাটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

একই অবস্থার সৃষ্টি হয় ওইসব কারবারী লোকদের, যারা সর্বদা থাকে কাজে ব্যস্ত, কোনো না কোনো কাজ তাদের হাতে লেগেই থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি একই অবস্থা চলতে থাকে, তাহলে অচিরেই তার হাত রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। উযুর মাধ্যমে হস্তসমূহ পরিষ্কার না করলে নিম্ন বর্ণিত রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনা।

(ক) চর্ম রোগ (Skin and diseases of skin)

(খ) ঘামাচি (Prikly heat),

(গ) চর্মের জ্বালা-যন্ত্রণা (Infections of skin)

(ঘ) ফাঙ্গাশ (Diseases of fungus)

তাছাড়া যখন আমরা ওযুতে হাত ধুই তখন আঙ্গুলের করের মধ্য হতে বের হয়ে আসা কিরণমালা (Rays) এমন একটি গোলাকার বৃত্ত সৃষ্টি করে যার ফলে মানবদেহে বিচরণশীল বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া হয়ে উঠে আরো গতিশীল। আর সেই বৈদ্যুতিক কিরণ (Electric Rays) একপর্যায়ে মানুষে হাতে মিশ্রিত হয়ে যায়। এভাবে হাত সুন্দর থেকে সুন্দর হয়ে উঠে। বস্তুত সঠিকভাবে ওযু করার দ্বারা আঙ্গুলসমূহে এমন নমনীয়তা সৃষ্টি হয়। এতে মানুষের জন্মগত কর্মদক্ষতা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে।

## কুলি করা

(MAUTH WASH)

কুলি করার পূর্বে মিস্‌ওয়াক করতে হয়। যার আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। বস্তুত কুলি করা কোনোভাবেই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। কেননা কুলির মাধ্যমে পানির স্বাদ, গন্ধ ও রং সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

আমরা যখন আহার গ্রহণ করি, তখন খাবারের ছোট ছোট কণা দাঁতের ফাঁকে আটকে থেকে দুর্গন্ধযুক্ত (Septic) এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে এবং থুথুর সাহায্যে তা পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। আর ওই দুর্গন্ধময়পদার্থ (Septic Meterial) ক্ষতি সাধন করে দন্ত ও মাড়ীর। কুলি ও মিস্‌ওয়াক দ্বারা এ থেকে মুক্ত থাকা যায়। বাতাসে অসংখ্য ধ্বংসাত্মক রোগজীবাণু উড়ে বেড়ায়; আমরা তা চর্মচোখে দেখতে পাই না। অথচ সেই রোগজীবাণু বাতাসের সাহায্যে আমাদের মুখের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে এবং থুথুর সাথে মুখে সংযুক্ত হয়ে যায়। সেগুলোকে পরিচ্ছন্ন না করলে নিম্নবর্ণিত রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

## মুখের রোগ

(STOMATITIS THRUSH)

মুখ পাকা (যা এইড্‌সের প্রাথমিক লক্ষণ) মুখের কিনারা ফেটে যাওয়া (Cheitlosis Angular Stomatitis) মুখে দাদ হওয়া ( Monilasis) মুখে ছেতো রোগ হওয়া (Diseases of Fungus)। মোটকথা কুলি করা এমনই একটি আমল, যার দ্বারা মানুষ এমন রোগ থেকে মুক্তি পায়, যা হলে মানুষের দীন-দুনিয়া উভয়ই বরবাদ হয়ে যায়। তদুপরি কুলির মধ্যে গড়গড়া করা, যা দ্বারা নামাযী ব্যক্তি "টনসিল" ও গলার অসংখ্য রোগ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। এমনকি বার বার গলায় পানি পৌছানো গলাকে ক্যানসার থেকেও রক্ষা করে।

## নাকে পানি দেওয়া

(NOSE WASH)

শ্বাস গ্রহণের একমাত্র পথ হল নাক। আর যেই বাতাস থেকে শ্বাস গ্রহণ করা হয়, তার মধ্যে লালিত-পালিত হয় অসংখ্য রোগজীবাণু যা নাকের ভিতর দিয়ে অতি সহজেই মানবদেহে প্রবেশ করে। সুতরাং এ রোগজীবাণু মিশ্রিত ধুলোবালি সর্বদা শ্বাসের সাহায্যে নাকের মধ্যে প্রবেশ

করছে। এভাবে যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করতেই থাকে, তাহলে বিপদজনক রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রবল আকার ধারণ করে। তাই স্থায়ী সর্দি-কাশি ও নাকের রোগীদের জন্য নাক ধৌত করা খুবই উপকারী।

আমরা তো ওযুর বরকতে দৈনন্দিন ৫ বার নাক পরিস্কার করে থাকি। তাই নাকের মধ্যে কোনো প্রকার রোগজীবাণু লালিত-পালিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। নাক হল মানবদেহের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল আওয়াজকে শ্রুতিমধুর করা। একবার নাকের ছিদ্রে একটু চাপ দিয়ে কথা বলে পরীক্ষা করে দেখুন, আপনার নিকট বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

নাকের ভিতরের পর্দা আওয়াজকে শ্রুতিমধুর করতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আর কান দেয় মস্তিষ্কে আলোর যোগান। পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে নাকের রয়েছে বলিষ্ঠ ভূমিকা। সে ফুসফুসের জন্য হাওয়াকে পরিষ্কার, আর্দ্র, উষ্ণ ও উপযোগী বানিয়ে দেয়। মানবদেহে প্রত্যহ কমপক্ষে ৫০০ ঘন ফুট বাতাস নাকের সাহায্যে প্রবেশ করে থাকে।

মানবদেহের ফুসফুস জীবাণু, ধোঁয়া, ধুলাবালি ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকতে চায়। হাওয়া শীতলকারী সাধারণ এয়ারকণ্ডিশনার (Air Conditoner) যা একটি ট্রাংকের সমান হয়ে থাকে। কিন্তু নাকের মধ্যের 'এয়ার কণ্ডিশনার'-কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এত ক্ষুদ্র অথচ ব্যাপক (Integreted) করে সৃষ্টি করেছেন, যা মাত্র কয়েক ইঞ্চি প্রসস্থ। এই নাক হাওয়াকে ঠাণ্ডা করার জন্য প্রতিদিন ১/২ গ্যালন আর্দ্র পদার্থ তৈরি করে থাকে।

পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য কঠিন কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব নাকের ছিদ্রের। নাকের মধ্যে রয়েছে এক অণুবীক্ষণ (Microscopic) ক্ষুদ্র মার্জনী, তার মধ্যে রয়েছে অদৃশ্য (Non Descreptive) পশম; যা হাওয়ার সাথে মিশ্রিত হয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশকারী ক্ষতিকর রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে দেয়। রোগজীবাণুকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আটক করা ছাড়াও তার রয়েছে আরো একটি প্রতিহতকরণ পদ্ধতি, যাকে ইংরেজিতে (Lysoziam) বলা হয়।

## মুখ ধৌত করা
(FACE WASH)

এক রোগীর মুখমণ্ডল সর্বদা গরম থাকত। তাকে সর্বপ্রকার ঠাণ্ডা ও এলার্জি প্রতিষেধক (Anti Allergy) ঔষধ দেওয়া হল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। অবশেষে তাকে বলা হল, তুমি নামায আদায় করবে। নামায শেষে নতুন করে উযু করবে এবং দরূদ শরীফ পড়ে হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে তা মুখের উপর ফিরিয়ে দিবে। এ পন্থা অবলম্বনে রোগী অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

## ক্যামিক্যাল এর ক্ষতি থেকে সুরক্ষা

বর্তমান এটমের যুগে সর্বত্র চলছে এটমের বিস্ফোরণ। তাই বিশেষজ্ঞগণ বলছেন অধিক পরিমাণে বৃক্ষ রোপণের প্রতি যত্নবান হতে, অপরিচ্ছন্নতা হ্রাস করতে এবং শরীরের খোলা অংশগুলোকে বার বার ধৌত করতে। যে ক্যামিক্যালগুলো ধোঁয়া, ধূলিকণা ইত্যাদির আকৃতিতে চেহারায় জমে যায়, তার একমাত্র চিকিৎসা ওযু। ধোঁয়ার মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো ধ্বংসাত্মক ক্যামিক্যাল। যেমন, Lead ইত্যাদি। যা কিছুক্ষণ চামড়ার উপর জমে থাকলে চর্মরোগ ও এলার্জি সৃষ্টি হয়।

## মুখের ব্রণ

নিয়মিত মুখ ধৌত করলে মুখে ব্রণ হয় না আর হলেও তার পরিমাণ থাকে খুব নগণ্য। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যাবতীয় ক্রীম, স্নো, লোশন চেহারায় দাগ সৃষ্টি করে। সৌন্দর্য ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যহ কয়েক বার করে চেহারা ধৌত করা খুবই ফলপ্রদ। আমেরিকান কাউন্সিল ফর বিউটি (American Council For Beauty) সংস্থার সম্মানিতা সদস্য লেডী হীচার বিস্ময়কর এক তথ্য উদঘাটন করেছেন। তিনি বলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো প্রকার রাসায়নিক লোশন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। ইসলামি উযু দ্বারাই তারা চেহারার যাবতীয় রোগ থেকে রক্ষা পায়।

রয়েছে। কনুইতে হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও যকৃতের সাথে সম্পৃক্ত তিন প্রকার বৃহৎ শিরা (Veins) থাকে। কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করলে উপরিউক্ত তিনটি অঙ্গে শক্তি সঞ্চার হয় এবং তা রোগ থেকে সরক্ষিত থাকে। এ ছাড়া কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়ার সুফলে প্রত্যক্ষভাবে সিনার মধ্যে পুঞ্জিভূত উজ্জ্বল আলোকরশ্মির সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সেই রশ্মিগুলো উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে। এতে হাতের মাংসপেশী শক্তিশালী হয়।

## মাথা মাসাহ্ করা

আমার একজন বন্ধু ফ্রান্স গিয়েছিল। সে বলল, আমি একদিন উযু করছিলাম। এক ব্যক্তি আমার এ উযু করার দৃশ্য গভীর মনোনিবেশ সহকারে প্রত্যক্ষ করছিল। আমি ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পেরেও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলাম না, উযু করতে থাকলাম। উযু শেষে লোকটি আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? বললাম, আমি একজন মুসলমান। সে বলল, তুমি কোথা থেকে এসেছ? আমি বললাম, পাকিস্তান থেকে এসেছি। লোকটি বলল, পাকিস্তানে মানসিক হাসপাতাল কয়টি আছে, বললাম, ২/৪টি হবে। এ ব্যাপারে আমার সঠিক কোনো ধারণা নেই। তারপর সে বলল, তুমি এখন এটা কি করলে? আমি বললাম, উযু করেছি। সে বলল, তুমি কি প্রত্যহ এরূপ করে থাক? বললাম, প্রত্যহ পাঁচবার করি।

একথা শুনে লোকটি বিস্মিত কণ্ঠে বলতে লাগল, আমাদের দেশে বহু মেন্টাল (Mental) বা মানসিক হাসপাতাল আছে। আমি হাসপাতালের সার্জন। অনেকদিন যাবৎ অনুসন্ধান করছি, মানুষ কেন পাগল হয়। পরে সে বলল, আমার গবেষণা অনুযায়ী তার কারণ হল, মানুষের মস্তিষ্ক থেকে সিগন্যাল পূর্ণ শরীরে বিস্তৃত হয়ে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্মক্ষম হয়। আর আমাদের মস্তিষ্ক সর্বক্ষণ Fluid- এর মধ্যে Float করতে থাকে। যার কারণে আমরা চলাফেরা করি, হাঁটি, দৌড়াই, লাফালাফি করি, অথচ মস্তিষ্কের কোনোই ক্ষতি সাধিত হয় না।

আর যদি সেটা কোনো Rigid জিনিস হতো , তা হলে এতদিনে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। আল্লাহ্ তা'আলা একে Fluid এর মধ্যে রেখেছেন। মস্তিষ্ক থেকে কতিপয় সূক্ষ্ম শিরা Conductor হয়ে আসতে থাকে আর সেই শিরাগুলো গর্দানের পৃষ্ঠ থেকে পূর্ণ শরীরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

লোকটি আরো বলল : আমার রিচার্স অনুযায়ী চুল যদি বৃদ্ধি করা হয় এবং গরদানের পৃষ্ঠ শুষ্ক রাখা হয়, তাহলে সেই শিরার মধ্যে (Condensation) শুষ্কতা সৃষ্টি হয়, যার প্রভাব মানবদেহে পড়ে। কখনো কখনো এতে মানুষের মস্তিষ্ক কর্মহীন হয়ে পড়ে। এ জন্য ডাক্তারগণ বলেন, এস্থান (মাসাহ এর স্থান) টুকু প্রত্যহ ২/৪ বার অবশ্যই ভিজাতে হবে। সে বলতে লাগল, এক্ষুনি আমি আপনাকে দেখলাম, আপনি হাত-মুখ তো ধৌত করলেনই, তারপর আবার ঘাড়ের পিছনেও যেন কিছু একটা করলেন। যদি এটা আপনাদের দৈনন্দিন কাজই হয়, তা হলে আমি ভেবে পাই না যে, আপনারা কিভাবে পাগল হতে পারেন। তিনি আরো বললেন, মাসাহ্ করার দ্বারা বাতাস লাগা (Sun Stroken) ও ঘাড়ভাঙা জ্বরের অবসান ঘটে।

## চিন্তার বিষয়

একজন ডাক্তারের পুরো জীবনের গবেষণা যদি একটি মুস্তাহাব আমলকে নিয়েই কেটে যায়, তা হলে সুন্নত, ওয়াজিব ও ফরজের কি অবস্থা (যার উপকারিতা বর্ণনাতীত)।

ঘাড় মাসাহ্ করার দ্বারা মানবদেহে বিশেষ এক শক্তি সঞ্চারিত হয়, যার সম্পর্ক রয়েছে মেরুদণ্ডের মধ্যকার অস্থি-মজ্জা (মস্তিষ্ক) এবং মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। নামাযী ব্যক্তি যখন ঘাড় মাসাহ করে, তখন হাতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে মেরুদণ্ডে পুঞ্জিভূত হয়ে যায় এবং মেরুদণ্ডের হাড়কে স্বীয় গমন পথ বানিয়ে পূর্ণ দেহের মাংশপেশী ও স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে। এতে মাংসপেশীগুলোতে শক্তি সঞ্চারিত হয়।

## পা ধৌত করা

জনৈক সার্জন ডায়াবেটিকস্ (বহুমূত্র) রোগীদেরকে বলতেন, আপনারা যেভাবে নিজের মুখমণ্ডল সংরক্ষণ করে থাকেন, তদ্রূপ পা দুটিও সংরক্ষণ করাও অত্যাবশ্যক। কেননা ডায়াবেটিকস্ রোগীদের পায়ে বেশি (Infection) ইনফেকশন হয়ে থাকে। সুতরাং রোগী যদি আবরণী জুতা ব্যবহার করে এবং শুধু সকাল-সন্ধ্যাতেই তা খোলে, তা হলে ভাল হয়। ইউরোপের উন্নত দেশের লোকেরা তো কয়েকদিনেও জুতা খোলে না বরং রাত্রেও জুতা পায়ে রেখেই শুয়ে পড়ে। এসব মানুষ অতি সত্তর পায়ের

ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বেশি ধূলাবালি ও জীবাণু আক্রান্ত হয় আমাদের পাসমূহ। মানবদেহের "ইনফেকশন" (Infection) সর্বপ্রথম শুরু হয় পায়ের আঙ্গুলের মধ্য হতে। তাই ইসলাম আমাদের জন্য দিনে পাঁচবার পা ধৌত করা ও আঙ্গুলসমূহ খেলালের নির্দেশ দিয়েছে, যেন আঙ্গুলের মধ্যে কোনো প্রকার জীবাণু আটকে না থাকে। পা ধৌত করার দ্বারা অসংখ্য রোগ-ব্যাধিরও অবসান ঘটে। যেমন, (Depression) অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, দুশ্চিন্তা, মস্তিষ্ক- শুষ্কতা, অনিদ্রা ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি নিঃশেষ হয়ে যায়।

## ওযু ও উচ্চ রক্তচাপ
(WAZOO AND HIGH BLOOD PRESSURE)

ক্রোধান্বিত অবস্থায় ওযু করা শরী'অতের বিধান আর উচ্চ রক্তচাপের সময় ওযু করা ডাক্তারদের নির্দেশ। এখন উভয় বিধান, লক্ষণ ও উপসর্গকে একত্র করলে অনুসন্ধানের অসংখ্য দিক উন্মুক্ত হয়ে উঠবে। ক্রোধের সময় উচ্চ রক্তচাপের সৃষ্টি হয়। তাই এ রোগের চিকিৎসা হল ওযু করা।

## জনৈক হৃদপিণ্ড বিশেষজ্ঞ
( HEART SPECIALIS )

জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেন : আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, হাই ব্লাড প্রেসার বা উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের ওযু করিয়ে তারপর তার ব্লাড প্রেসার টেস্ট করলে অবশ্যই প্রেসার হ্রাস পাবে।

তদ্রুপ একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন মনোবিজ্ঞানী ডা. সালামত আযীয। তিনি বলেন, ওযু মানসিক রোগ উপশমের একটি উত্তম ব্যবস্থাপত্র। পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানীরা মানসিক রোগীদেরকে প্রত্যহ কয়েকবার ওযুর মতো শরীরে পানি দিয়ে থাকে। আর ইসলাম তো পূর্বেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে ওযু করার।

## একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব

ওযুতে সর্বপ্রথম হাত ধৌত করতে হয়, তারপর কুলি করতে হয়, তারপর নাকে পানি দিতে হয়, এরপর মুখমণ্ডল ধৌত করতে হয়। এভাবে ক্রমানুযায়ী অন্যান্য অঙ্গসমূহ ধৌত করা হয়। এটি এমনই একটি সুবিন্যস্ত পদ্ধতি, যার দ্বারা অর্ধাঙ্গ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

## ওযুর অতিরিক্ত পানি

হাদীসের কিতাবে লিখা আছে, ওযু করার পর বেঁচে যাওয়া পানি পান করা রোগ মুক্তির কারণ। এ পরিপ্রেক্ষিতেই ডাক্তার ফারুক আহমদ তার রিসার্চের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, যে ব্যক্তি ওযুতে বেঁচে যাওয়া পানি পান করবে, নিম্নবর্ণিত অঙ্গসমূহের উপর এর সুপ্রভাব পড়বে।

- মূত্রথলীতে যার প্রভাবে অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হয়, এ প্রস্রাবের আধিক্য হ্রাস পায়।
- অবৈধ কামভাব খতম করতে খুবই পরীক্ষিত।
- প্রস্রাবের পর ফোঁটা ফোঁটা পড়া রোগ নির্মূল করে।
- হৃদপিণ্ড, পাকস্থলী এবং মূত্রথলীর উষ্ণতা ও শুষ্কতা বিদূরিত করে।

## পশ্চিম জার্মানীর একটি কনফারেন্সে ওযু

ডা. নূর আহমদ নূর সাহেব বলেন, (প্রফেসার, নাশতার মেডিকেল কলেজ, মুলতান) পাশ্চাত্যের দেশসমূহে নৈরাশ্য বা "ডিপ্রেশন" রোগ দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। সেখানে মহল্লায় মহল্লায় রয়েছে মানসিক হাসপাতাল আর মনস্তাত্ত্বিকগণ থাকেন সব সময় ব্যস্ত। পক্ষান্তরে এ রোগটি মুসলমানদের মধ্যে খুব কমই পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষ করে দীনদার লোকদের মাঝে। তাই পাশ্চাত্যের ডাক্তারগণ এর রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কয়েক বছর পূর্বে ফয়সালাবাদ গিয়েছিলাম। সেখানে পাঞ্জাব মেডিকেল কলেজের সম্মুখে একজন "ফিজিও থেরাপিস্ট" ক্লিনিক খুলেছেন। তার সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি পশ্চিম জার্মান থেকে ডিপ্লোমা করেছেন। তিনি বলেন : কোর্স চলাকালীন সময়ে জার্মানের ডাক্তারগণ বলেছেন, নৈরাশ্য রোগের চিকিৎসা তারা ঔষধ প্রয়োগ ব্যতীত অন্য পন্থায় আবিষ্কার করেছেন।

পশ্চিম জার্মানীতে একটা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যার বিষয়বস্তু ছিল "নৈরাশ্য বা Depression রোগের চিকিৎসা মেডিসিন ব্যতীত আর কি কি পদ্ধতিতে করা সম্ভব"। একজন ডাক্তার বললেন, তিনি কয়েকজন ডিপ্রেশন রোগীকে প্রত্যহ পাঁচবার মুখমণ্ডল ধৌত করিয়েছেন এবং এ পদ্ধতিতে কয়েকমাসের মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছে।

তিনি অবসাদগ্রস্থ রোগীদের অন্য একটি গ্রুপ বানিয়ে তাদেরকে হাত, মুখ এবং পা প্রত্যহ পাঁচবার ধৌত করালেন। এ পদ্ধতিতে রোগী আগের তুলনায় অধিক পরিমাণে সুস্থ হয়ে উঠল। তিনি তার প্রবন্ধটির উপসংহারে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এ রোগ মুসলমানদের মাঝে খুবই কম হয়, কেননা তারা প্রত্যহ কয়েকবার মুখ, হাত ও পা ধোয় অর্থাৎ ওযু করে।

# নামায ও আধুনিক বিজ্ঞান

(PRAYER AND MODERN SCIENCE)

## নামাযের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

নামায এমন একটি ইবাদত যা মানুষকে তার আত্মার নিকটবর্তী করে দেয়। মানুষ নিজের আত্মাকে জানতে পারলে তার সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাকে পথপ্রদর্শন করছেন। এখন আপনি চিন্তা করে দেখুন, আপনার অস্তিত্ব এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে এবং আপনি আল্লাহর কত নিকটে রয়েছেন? আসল কথা হল, ঘনিষ্ঠতার কারণে এ পদ্ধতির প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে।

নামাযের এ পদ্ধতিটাকে আপনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করুন! মানুষ যখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর হয়ে কাজ করে তখন সে কত আনন্দিত হয়ে থাকে। আনন্দ তখন তার মধ্যে স্থান করে নেয় এবং তার আত্মাকে আলোকিত করে দেয়। এ মহা আনন্দে তার আত্মা এত হালকা হয়ে যায় যে, নিজের দেহের কথাও ভুলে যায়।

আমরা যদি পূর্বপুরুষগণের জীবনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তা হলে আমাদের নিকট দিবালোকের মতো পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে যে, তারাও আমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করেছেন; কিন্তু পার্থক্য শুধু তারা ছিলেন এ পদ্ধতির প্রকৃত স্বাদের সাথে পরিচিত আর আমাদের সাথে নেই তার অনুরূপ পরিচয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিটি উম্মতের জন্য কি এটা সম্ভব নয়, যেটা আমাদের পূর্বপুরুষ বুযুর্গগণের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল? অবশ্যই এটা সম্ভব। তবে আমরা হলাম গাফেল উদাসীন।

আমাদের বুযুর্গগণ ইবাদতের প্রকৃত মজা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

গিয়েছিল বিশ্বের মানচিত্র। এ পবিত্র ইবাদতকে যখন আমরা রুসম-রেওয়াজে পরিণত করে নিয়েছি, তখনই মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হাত থেকে রাজত্ব আর সর্দারী ছিনিয়ে নিয়েছেন। নামাযী ব্যক্তির মধ্যে যদি না থাকে উৎসাহ ও অন্তরজ্বালা, গভীর মনোনিবেশ, ইলম ও আকাঙ্ক্ষা, বিনয় ও নম্রতাবোধ, বিচক্ষণতা ও সঠিক চিন্তা-চেতনা, মনোযোগ ও শ্রদ্ধাবোধ, স্রষ্টাজ্ঞান, সৃষ্ট বিস্মৃতি, হৃদয়ের কোমলতা, সর্বোপরি খুশু খুযু, তাহলে সেই নামায একটি নিষ্প্রাণ দেহের মতো।

আমরা যদি আমাদের নামাযকে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পন্থায় আদায় করি, তাহলে সেই নামায আমাদের প্রকৃত ও গ্রহণযোগ্য নামাযরূপে বিবেচিত হবে। আমরা কেন বঞ্চিত হব ঐ সমস্ত কল্যাণ ও পুরস্কার থেকে, যা লাভে ধন্য হয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষগণ?

মহান রাব্বুল আলামীন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পন্থার নামায আমাদের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার চিকিৎসা, ক্ষত শুকানোর মলম এবং যাবতীয় বেদনার উপশম। অথচ আমরা নিজেদের কল্যাণকামিতা ও পরিণামদর্শিতার অভাবে এহেন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকে বিনা দ্বিধায় নষ্ট করে যাচ্ছি।

বলা হয়েছে, নামায যাবতীয় দুঃখ বিমোচনকারী। এ দুঃখ কি শুধু পরকালেরই, নাকি দুনিয়ার দুঃখও এতে অন্তর্ভুক্ত? বস্তুত নামায ইহ-পরকালের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা বিমোচনকারী। যখন মুসলমানদের কালেমা, নামায সবকিছু দুরস্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ আমলের হাকীকত প্রকৃত ছাঁচে ঢালাই করা হবে, তখন মুসলমান হবে বিজয়ী আর কাফিররা হবে পরাজিত।

কিন্তু যখন থেকে আমরা কালেমা ও নামাযের মেহনত পরিত্যাগ করেছি, তখন থেকেই তার হাকীকত অন্তর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। কেননা যে জিনিসের হাকীকত (তাৎপর্য) হাকীকতরূপে না থাকে তা অবশ্যই হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয়।

আজ আমাদের নামায প্রাণময় হচ্ছে না কেন? তখনও তো এ চার সেজদা আর দুই রাকআতই ছিল, যদ্বারা সাহাবায়ে কিরাম, আহলে বাইত এবং আউলিয়ায়ে কিরাম সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনাকে পাল্টে দিয়েছিলেন।

বস্তুত তাদের নামায ছিল তাৎপর্যপূর্ণ আর আমাদের নামায হল তাৎপর্যহীন, নিষ্প্রাণ ও নিষ্ক্রিয়।

## একটি চমৎকার ঘটনা

এক ব্যক্তি রাইফেলের একটি গুলি হাতে নিয়ে বাঘের গায়ে ছুঁড়ে মারল। কেননা সে শুনেছিল গুলি দ্বারা বাঘ মারা যায়। কিন্তু বাঘ মারা যাওয়া তো দূরের কথা, তার নিজের জীবন বাঁচানোই দায় হয়ে গেল। এখন সে বলে বেড়াতে লাগল যে, গুলি দ্বারা বাঘ মরে এটা ডাহা মিথ্যা কথা।

এক বুদ্ধিমান তাকে বুঝালেন, গুলির কার্যকারিতা ঠিকই আছে। তবে তা সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হতে হবে। গুলিটি রাইফেলের মধ্যে ঢুকিয়ে ব্যবহার করতে হয়। কেননা রাইফেল বিহীন গুলি নিক্ষেপে কোনো ফায়দা নেই। তদ্রূপ আজ আমাদের নামায ঠিকই আছে; কিন্তু ঈমান, তাকওয়া, খুশু-খুযুর কার্যকারিতা হচ্ছে না। তাহলে নিষ্ক্রীয় নামায যেখানে দুনিয়ার কার্য সম্পাদনেই ব্যর্থ, তা এত বড় জান্নাত, যার প্রশস্ততা সমগ্র বিশ্ব অপেক্ষা অনেক বড়, সেই জান্নাত কিভাবে আমাদেরকে দিতে সক্ষম হবে। এটাই হল চিন্তার ব্যাপার।

মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল নামায। যদ্বারা মুসলমানদের ইহ-পরকাল সুখময় হয়। তাই আসুন! অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দেখি, নামায দ্বারা দুনিয়ার কত কত নেয়ামত অর্জিত হয়!

## নামায ও দৈহিক সুস্থতা
(PRAYER AND BODY HEALTH)

নামায হল এক উত্তম শরীর চর্চা। অলসতা, বিষণ্ণতা ও বে-আমলীর এ যুগ-সন্ধিক্ষণে নামাযই এমন এক ব্যায়াম, যা সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করা হলে তার দ্বারা ইহকালীন সকল ব্যথার উপশম সম্ভব। নামাযের ব্যায়াম যেমনিভাবে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণ, তেমনি আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন– হৃৎপিণ্ড, যকৃত, মূত্রাশয়, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, নাড়িভুঁড়ি, পাকস্থলী, মেরুদণ্ড, গর্দান, বক্ষ ও সর্বপ্রকার Glands-কে বর্ধিত করে শরীরকে সুঠাম ও সুন্দর করে তোলে। আর এ ব্যায়ামগুলির দ্বারা আয়ুও বৃদ্ধি পায়। পাওয়া যায় এক অসাধারণ শক্তি।

## বয়স নির্ধারণ

(AGE FACTOR)

শারীরিক ব্যায়ামের ক্ষেত্রে বয়সের তারতম্য লক্ষণীয়। বয়সের সাথে সাথে ব্যায়ামেরও পার্থক্য হয়ে থাকে। বড়দের ব্যায়াম ছোটদের ব্যায়াম থেকে আলাদা। এমনকি পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ব্যায়ামের পদ্ধতিও ভিন্ন। কিন্তু নামায এক সার্বজনীন ব্যায়াম; সব বয়স ও সব ধরনের মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

## ব্যায়ামের চার্ট

(EXERCISE CHART)

মানুষ সারা রাত্র শুয়ে থাকে। বিধায় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে পড়ে নিস্তেজ, অবসাদগ্রস্থ ও বিষণ্ন। সঠিক রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তাই শরীরের এখন এমন এক ব্যায়ামের প্রয়োজন, যাতে রক্ত পূর্ণ শরীরে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয় এবং শরীর নুতনভাবে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পায়। এ জন্য রাখা হয়েছে তাহাজ্জুদের নামায ও ফজরের নামায। তারপর বিরতি, তারপর ইশরাক নামায, পুনরায় বিরতি। তারপর চাশতের নামায, পুনরায় দীর্ঘ বিরতি। এতক্ষণে মানুষ কাজকর্ম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই যোহরের নামাযের জন্য ব্যায়ামের প্রোগ্রাম বানানো হয়েছে, এমনকি শয়নকালে ইশার নামাযের ব্যায়ামের প্রোগ্রাম একটু দীর্ঘ হয়। কেননা তখন মানুষ পানাহার সম্পন্ন করেছে। তাই ইশার নামাযের রাকআত একটু বেশি রাখা হয়েছে। যেন খাবারগুলি হজম হয়ে যায়।

## কিংকর্তব্যবিমূঢ় এক অমুসলিম বিশেষজ্ঞ

জনৈক ব্যক্তি (এ. আর. কমর) তার ইউরোপের ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন : একদিন আমি নামায পড়ছিলাম। এক ইংরেজ দীর্ঘক্ষণ যাবৎ দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিল। আমার নামায পড়া শেষ হলে সে আমাকে বলতে লাগল, ব্যায়ামের এ পদ্ধতি তুমি নিশ্চয় আমার পুস্তক থেকে শিখেছ। কেননা আমি এ নিয়মে ব্যায়ামের পদ্ধতি লিখেছি। যে ব্যক্তি এ পদ্ধতিতে ব্যায়াম করবে, সে কখনো দীর্ঘ মেয়াদী, মারাত্মক ও জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে না। তারপর সে এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলল: দণ্ডায়মান

ব্যক্তি যদি তৎক্ষণাৎ ব্যায়ামে গমন করে, তা হলে তার স্নায়ু ও হৃৎপিণ্ডের উপর এর প্রভাব মঙ্গলজনক হয় না। তাই আমি আমার পুস্তকে বিশেষভাবে লিখেছি, প্রথমে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করবে। তখন হাত বাঁধা থাকা বাঞ্ছনীয় (অর্থাৎ কিয়াম)। তারপর মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে ব্যায়াম করতে হবে (অর্থাৎ সিজদা)। এ ব্যায়াম কেবল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণই করতে পারবে। তার বক্তব্য শুনে নামাযী ব্যক্তি বলতে লাগল, আরে আমি তো মুসলমান। আমার ধর্ম ইসলাম আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছে। আমি আপনার পুস্তক কখনো পড়ি নি। আমি প্রত্যহ কমপক্ষে পাঁচবার এরকম করে থাকি।

একথা শুনতেই সেই ইংরেজ ব্যক্তি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তার কাছ থেকে ইসলামি জ্ঞান শিখতে শুরু করে।

## একজন ফিজিশিয়ানের কাণ্ড

একজন প্রখ্যাত ডাক্তার তার স্নায়ুবিক দুর্বলতা, জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা, এবং অন্যান্য মাংসপেশীর ব্যাধির জন্য নিজের চিকিৎসা নামায দ্বারা করেছেন। তিনি নামায দ্বারা একাধারে নিয়মতান্ত্রিক চিকিৎসার ফলে সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং যাবতীয় ঔষধ ব্যবহার বাদ দিয়ে শুধু নামাযের চিকিৎসাধীনই থাকলেন। তারপর থেকে তিনি প্রত্যেক রোগীকে নিয়মিত নামায আদায় এবং নামাযের প্রতিটি রুকন শান্ত ও পরিপূর্ণরূপে আদায় করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকেন। এভাবে তার সকল রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভে ধন্য হতে লাগল।

## অস্ট্রেলিয়ান এক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ

( OF AN AUSTRALIAN EXPERT OPINION )

পাকিস্তানের একজন হৃদরোগী নিজের চিকিৎসা করাতে করাতে অবশেষে চিকিৎসার জন্য অস্ট্রেলিয়া গিয়ে পৌঁছল। সেখানকার একজন বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ তাকে পূর্ণ পর্যবেক্ষণ করার পর তার জন্য কিছু ঔষধ ও একটি ব্যায়াম নির্ধারণ করে দিয়ে বললেন, আপনি আমার ফিজিও ওয়ার্ডে আমার তত্ত্বাবধানে আটদিন পর্যন্ত উক্ত ব্যায়াম করবেন। তাকে ব্যায়াম করানোর পর দেখা গেল, তা ছিল খুশু-খুযু ও সন্তোষজনক এক পূর্ণাঙ্গ নামায। এবার পাকিস্তানী রোগী সেই ব্যায়ামটাকে পরিপূর্ণ ও সঠিক

তা দেখে ডাক্তার সাহেব বললেন : আপনিই আমার প্রথম রোগী, যে এত দ্রুত আমার এ ব্যায়ামটা শিখে এত চমৎকারভাবে তা আদায় করতে পারলেন। বস্তুত এখানে আট দিন রোগী এ পদ্ধতিটা শিখে মাত্র। একথা শুনে রোগী বলল, আমি হলাম একজন মুসলমান আর এ পদ্ধতি হল আমাদের পূর্ণাঙ্গ নামায। তাই এটা শিখতে আমার মোটেই বেগ পেতে হয় নি। তারপর দ্বিতীয় দিনেই ডাক্তার তাকে ঔষধ ও (ব্যায়াম সম্পর্কে) বিশেষ কিছু দিকনির্দেশনা দিয়ে বিদায় দিলেন।

## হতবাক এক ফিজিওথেরাপিস্ট

একজন পাকিস্তানী ডাক্তার (ডা. মাজেদ যামান উসমানী) ইউরোপে ফিজিওথেরাপীতে উচ্চ ডিগ্রী অর্জনের জন্য গমন করেন। সেখানে তাকে হুবহু নামাযের মতো একটি ব্যায়াম পড়ানো হল তখন তিনি ওই ব্যায়াম দেখে হতবাক হয়ে পড়লেন; আশ্চর্য! আমরা তো এতদিন পর্যন্ত নামাযকে শুধু ধর্মীয় কতব্য মনে করেই আদায় করে আসছিলাম। কিন্তু এখন তো দেখছি এর মধ্যে আশ্চর্যজনক রহস্য আছে। এর দ্বারা বড় বড় রোগ-ব্যাধি নিঃশেষ হয়ে যায়। এ ব্যায়াম দ্বারা যে যে রোগ নিরাময় হয়, ডাক্তার সাহেব তার একটি লিস্ট দিলেন:

(১) মানসিক রোগ (Mental Disease)

(২) স্নায়ুবিক রোগ (Nerve Disease)

(৩) অস্থিরতা, ডিপ্রেশন, ব্যাকুলতার রোগ

(৪) মনস্তাত্ত্বিক রোগ (Psychiatric Diseases)

(৫) হার্ট এর রোগ (Heart Diseases)

(৬) জোড়া রোগ (Arthritis)

(৭) ইউরিক এসিড থেকে সৃষ্ট রোগ (Deseases Due to Uric Acid)

(৮) পাকস্থলী ও আলসার রোগ (Stomach Ulcer)

(৯) ডায়াবেটিস ও তার প্রভাব (Sugar and Its After Effects)

(১০) চক্ষু ও গলা রোগ (Eye and E.N.T. Diseases)

## একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা
(SPECIAL EXPERIENCE)

আমি যেহেতু গবেষণার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাই বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে প্রতিটি বস্তুকে দেখি। অভিজ্ঞতার আলোকে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আপনি যদি সারা দিন কাজ কারবারে নিমজ্জিত থাকার পর যোহরের সময় মসজিদে গিয়ে সুন্নত নামায আদায় করে জামাতের সাথে নামায পড়ার পর দেহের পূর্বের ও বর্তমান অবস্থার উপর অনুমান করে দেখেন, তা হলে বিরাট পার্থক্য খুঁজে পাবেন।

আমি একবার কোনো কাজে করাচী গিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে মার্কেটে ঘুরাঘুরি শুরু করে দিলাম। ঘুরতে ঘুরতে দৈহিক ও মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়লাম। বন্ধু বলল, চলো মসিজদে গিয়ে নামায আদায় করে নেই। নামায আদায় করার পর যেন আমি আমার হারানো শক্তি ফিরে পেলাম। নিজের মধ্যে খুঁজে পেলাম সতেজতা ও উৎফুল্লতা। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও তা আমার হৃদয়পটে ভেসে উঠছে।

## প্রফেসর ডা. বার্থম জোযিফ এর অভিজ্ঞতাঃ

তিনি ছিলেন একজন আমেরিকান প্রখ্যাত ডাক্তার। এক সাক্ষাৎকারে নামায ও ইসলাম সম্পর্কে তার জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়। তার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নামায হল, একটি পরিপূর্ণ ও উপযুক্ত শরীর চর্চা। এতে হ্রাস-বৃদ্ধির বা অসমতার কোনো প্রশ্নই উঠে না। মনে হয় যেন সৃষ্টিকর্তা বতর্মান যান্ত্রিক ও মনস্তাত্তিক যুগের কথা অনুধাবন করেই এর আবিষ্কার করেছেন। তাতে রয়েছে হস্ত উত্তোলন, পুনরায় তা বেঁধে ফেলা, দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা, পুনরায় হাত ছেড়ে দেওয়া, ঝুঁকে পড়া, আবার মস্তক অবনত করে মস্তিষ্কের দিকে রক্ত প্রবাহের সুযোগ সৃষ্টি করা, কিছুক্ষণ পর পর হাঁটু পেতে বসা, এসবই একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যায়াম পদ্ধতি।

## নামায ও ইউগা (PRAYER AND YOGA)

বিশেষজ্ঞগণ নামাযকে শ্বাস-প্রশ্বাস অনুশীলনের এক সহজ পদ্ধতি বলে অভিহিত করেছেন। তন্মধ্যে তারা তিনটি স্থানকে বিশেষভাবে উল্লেখ

(১) কিয়াম (দণ্ডায়মান) অবস্থায় সিজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।
(২) রুকুর অবস্থায় পায়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা এবং
(৩) সিজদার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন।

## ইতালীর বিশেষজ্ঞগণের অভিমত

( OPINION OF ITALIAN EXPERTS )

ইতালীর একজন নব মুসলিম মনস্তাত্ত্বিক ডা. জামাল আবদুর রহমান নামাযের ব্যায়ামের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ব্যায়ামের মূলনীতি হল যদি কোনো রক্তবাহী ধমনী বা অন্য কোনো বিশেষ অঙ্গের কষ্ট লাঘব করতে ইচ্ছা কর, তবে প্রথমে দেহকে শিথিল করে তারপর তাকে টানা করে পুনরায় শরীরকে শিথিল করতে হবে। ব্যায়ামের নীতিগত পদ্ধতি এবং তার জন্য কিছু আসনও আমি নির্ধারণ করেছি। একেক রোগের জন্য একেক আসন অপরিহার্য। উদাহরণত মেরুদণ্ডের হাড়ের রোগ নিবারণের জন্য রয়েছে এক বিশেষ আসন এবং হৃদরোগ থেকে মুক্তির জন্য ভিন্ন আসন। মূত্রাশয়ের রোগের জন্য এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যার দ্বারা মূত্রাশয় সুস্থ হয়।

# নামাযের শর্তাবলী ও আধুনিক বিজ্ঞান

(THE CONDITIONS FOR PRAYER
AND MODERN SCIENCE)

## গুরুত্ব ও তাৎপর্য

নামায হল একটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদত, সর্বোত্তম উপাসনা ও দু'জাহানের আলোর দিশারী। নামায আদায়ের পূর্বে ইসলাম কিছু শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছে। নামায ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ ইসলামী শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি। ব্যায়াম শুরু করার প্রারম্ভে তার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ ব্যায়ামের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অর্জন করে তারপর ব্যায়াম আরম্ভ করা হয়। ঠিক তদ্রুপ যেহেতু নামায হল একটি পূর্ণাঙ্গ ও উপযোগী ব্যায়াম, তাই তা শুরু করার পূর্বেও প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক।

যেহেতু নামায হল দুঃখী মানুষের চিকিৎসাস্বরূপ। তাই এ উপশমকারী আমল আরম্ভের পূর্বে যে জিনিসগুলো হওয়া অত্যাবশ্যক, সেগুলিই হল নামাযের শর্তাবলী।

## নামাযের ফরয ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

ইসলাম স্বভাব ধর্ম। তাই এর প্রতিটি নির্দেশ আদিকাল থেকে শুরু করে অনন্তকাল পর্যন্ত কল্যাণকামী হিসিবেই বিবেচিত থাকবে। যমীন পরিবর্তন হতে পারে, যমানা পরিবর্তন হতে পারে, অধিবাসী পরিবর্তিত হতে পারে, বাসস্থান পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু পরিবর্তন হবে না একমাত্র আল্লাহর বিধান।

## স্থান পবিত্র হওয়া

যেহেতু নামায আদায় হল একটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদত। তাই তার জন্য এমন স্থান হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেখানে থাকবে না কোনো রোগজীবাণু। কেননা নাপাক স্থানে প্যাথলজী (Pathology) অনুযায়ী সংক্রামক ব্যাধির (Deseas Contagious) জীবাণু মজুদ থাকে। যেমন, গোবরের মধ্যে (Tetanus) ক্রিমি পোকার ডিম (Eggs of Intestinal Worms) কলেরা (Cholera) ও টাইফয়েড জ্বরের (Typhoid) জীবাণু থাকে।

মানুষ সামাজিক জীব অর্থাৎ অন্যান্য মানুষের সাথে মিলে বসবাস করতে বাধ্য এ কথাই ইসলাম জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছে। হাদীসে রয়েছে "ইসলামে বৈরাগ্য নেই" অর্থাৎ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যতিক্রমী জীবন যাপন করা ইসলাম পছন্দ করে না। হাদীসের ভাষায় মুসলমান জাতি এক দেহতুল্য। যখন দেহের এক অংশ ব্যথা পায়, তখন অন্য অংশও ব্যথিত হয়ে উঠে। সেই সঙ্ঘবদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইসলাম জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের শুধু নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি বরং কঠোরভাবে গুরুত্বারোপ করেছে যে, নামায জামা'আতের সাথেই আদায় করতে হবে। যখন মুসলমান প্রত্যহ পাঁচবার একস্থানে একত্র হবে, তখন পরস্পরের মধ্যে হবে মতবিনিময়। একে অপরের সুখ-দুঃখের বিষয় জানতে পারবে এবং একে অপরের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবে।

একই কথা শরীর পবিত্র হওয়ার বেলায় প্রযোজ্য। কেননা একজন নামাযী মুসল্লী অপবিত্র শরীর ও কাপড় নিয়ে মসজিদে গেলে তার দ্বারা নিম্নোক্ত অনিষ্টতা বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে :

নামাযীর শরীর পরিচ্ছন্ন না হলে তার শরীরে থাকে অসংখ্য রোগ জীবাণু। ফলে এ মুসল্লী অন্যান্য নামাযীদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি

উল্লেখ্য যে, মসজিদের বহুজনের ব্যবহৃত টুপি ব্যবহার করলে মাথার টাক (Baldness), চর্মরোগ, খোস-পাচড়া (Dand Ruff) ছাড়াও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি (Contagious Diseases) বিস্তার লাভ করতে পারে। ডা. রবার্ট সামৃথ তার অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, আমরা পবিত্রতা অর্জন কার্য বস্তুত ইসলাম থেকে শিখেছি।

## সামাজিক প্রতিক্রিয়া
( SOCIAL EFFECTS )

একটি উন্নত সমাজের জন্য একথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, সেখানকার অধিবাসীগণ সকলে পরস্পরে প্রেম-প্রীতি ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে বসবাস করবে। একথা প্রণিধানযোগ্য যে, অপরিচ্ছন্ন শরীর ও ময়লাযুক্ত কাপড় পরিহিত ব্যক্তিকে প্রত্যেকেই ঘৃণা করে। ইসলাম নামাযের মাধ্যমে মানুষকে সমাজে বসবাস করা ও সসম্মানে জীবন-যাপনের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

## নামাযের মানসিক প্রতিক্রিয়া

মানুষ ইয্যত ও সম্ভ্রমের সাথে জীবন যাপন করবে, এটাই তাদের প্রকৃতিগত নিয়ম। কিন্তু সে যদি ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও পাক-পবিত্রতার বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলে কিংবা এ ব্যাপারে অবহেলা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তাহলে সে নানাবিধ মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। এ সকল মানসিক রোগের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হচ্ছে হীনমন্যতা (Inferjority complex)। কেননা একে কেন্দ্র করেই আরো অসংখ্য মানসিক রোগ মানবদেহে জন্ম নেয়।

## ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নামায পড়া

ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নামায আদায় করা নামাযের ওয়াজিবসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম জরুরি বিষয়। যদি নামাযের ধারাবাহিকতাকে পরিত্যাগ করা হয়, তা হলে দৈহিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক উপকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। কেননা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নামাযের মাধ্যমে অর্জিত ব্যায়াম একটি বিশেষ পদ্ধতির হয়ে থাকে, যার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি। যদি কেউ কেউ কেয়াম না করে প্রথমেই জিসদায় চলে যায়, তাহলে ওই সকল প্রয়োজনীয় বস্তু, যা একজন মানুষের সুস্থতার জন্য একান্ত প্রয়োজন, তা থেকে সে নিশ্চিত মাহরূম হবে। শুধু তা-ই নয়, এর দ্বারা তার নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হওয়ারও প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

## দু'হাত কান পর্যন্ত উঠানো

তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দু'হাত কান পর্যন্ত উঠানো সুন্নত। যখন হাতগুলোকে কান পর্যন্ত উঠানো হয়, তখন এর দ্বারা বাহু, ঘাড় ও কাঁধের ব্যায়াম হয়। মানসিক রোগের জন্য এ ধরনের ব্যায়াম অত্যন্ত উপকারী যা নামায পড়ার দ্বারা এমনিতেই হয়ে যায়। তাছাড়া এর দ্বারা অর্ধাঙ্গ রোগের আশঙ্কা থেকেও মুক্ত থাকা যায়।

## তাকবীরে তাহরীমার সময় মাথা না ঝুঁকানো

তাকবীরে তাহরীমার সময় যদি মাথা ডান-বাম বা নিচের দিকে ঝুঁকানো হয়, তা হলে যে সকল উপকারিতার কথা হস্তদ্বয়কে কান পর্যন্ত উঠানোর আলোচনায় বর্ণনা করা হয়েছে, তা পূর্ণরূপে অর্জিত হবে না। উপরন্তু এরূপ করার দ্বারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ, যা নামাযের মূল মাকসাদ তাও ব্যাহত হবে।

## ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা

ইসলাম যাবতীয় ভালো কাজে ডান হাত ব্যবহারের জোর তাগিদ দিয়েছে। কেননা ডান হাতে বরকত রয়েছে। বস্তুত মানবদেহে যতগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, তন্মধ্যে ডান দিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বাম দিকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে একটু পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বিশেষ করে ডান হাত থেকে এক প্রকার অদৃশ্য আলোকরশ্মি নির্গত হয়, যা ইতিবাচক (Positive) হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বাম হাত থেকে যে রশ্মি নির্গত হয়, তা (Negative) বা নেতিবাচক হয়ে থাকে।

নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখতে হয়। আর দৃষ্টি বাম হাতের উপর স্থাপিত ডান হাতের উপর দিয়ে সিজদার স্থানে পতিত হলে উক্ত দৃষ্টি (Positive বা) ইতিবাচক তরঙ্গমালা অতিক্রম করে, যা চোখের জন্য অত্যন্ত উপকারী। তাই ডান হাতকে বাম হাতের উপরে বাঁধার বিধান দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখার আরেকটি উপকারিতা রয়েছে। তা হল, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখার ফলে ডান থেকে এক প্রকার শক্তি উৎপাদন করে। ফলে হাত দ্বারা দৈনন্দিন বিভিন্ন কার্যাবলী

হয় না। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো চিকিৎসক ডান হাতের প্যারা লাইসিস রোগীদের জন্য এ পরামর্শ দিয়েছেন যে, তারা যেন ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে কিছুক্ষণ বসে থাকে। কেননা এর দ্বারা এক হাত থেকে নির্গত অদৃশ্য আলোক রশ্মিগুলো অপর হাতে স্থানান্তরিত হয়ে হাত নড়াচড়া করার শক্তি সঞ্চয়ে সহায়তা করে।

## নামায এবং দেওয়ান শিং মাফতুন

প্রখ্যাত সাংবাদিক দেওয়ান শিং মাফতুন ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা ভারতীয় নেতা। তিনি তার প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচারিত গ্রন্থ রিয়াসাত এ লিখেছেন, নামায এমন এক আমল যা মানুষকে সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়। যে ব্যক্তি শৃঙ্খলা শিখতে চায়, সে যেন নামাযের মধ্যে চিন্তা ফিকির করে। নামায বাদশাহ এবং ফকীরের পার্থক্যকে খতম করে দেয়। কেননা বাদশাহ্ ফকীর, ধনী-দরীদ্র, উস্তাদ-শাগরেদ নামাযের একই কাতারে দণ্ডায়মান হয়। যদি সমস্ত মুসলমান নামায পড়তে শুরু করে, তাহলে তারাই সমগ্র বিশ্বে বিজয়ী হবে। যেমন : তাদের পবিত্র কুরআনে একথা বর্ণিত আছে। দৈহিক আরাম ও সামাজিক ত্রুটি সংশোধনের জন্য নামায এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা খুশি হোন এবং সৃষ্টি জগতও খুশি হয়।

## নামায ও মানসিক রোগের চিকিৎসা

মানসিক রোগীদের জন্য আল্লামা ইকবাল কলেজ হাসপাতাল লাহোরের মানসিক ও মস্তিষ্ক চিকিৎসা শাখায় এক গবেষণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ৮ থেকে ৯ মাস ব্যাপী এ প্রোগ্রাম চলে।

প্রথমে সমস্ত রোগীকে একত্রিত করে দুটি জামাতে বা দলে বিভক্ত করা হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় জামাতের নাম যথাক্রমে এলাজ বিত তাহাজ্জুদ জামাত (মুতালাআতি জামাত) ও জুযবী মাহরুমী খাব জামাত (নেরানী জামাত) রাখা হয়। রোগীদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৬৪ জন এবং প্রত্যেক জামাতে রোগীর সংখ্যা ছিল ৩২ জন করে। এ ৩২ জনের মধ্যে আবার ২০ জন পুরুষ এবং ১২ জন মহিলা ছিল।

উল্লেখ্য যে, এসব মসানসিক রোগীকে সম্ভাব্য সকল প্রকার চিকিৎসা ও বিভিন্ন ধরনের ঔষধপত্র খাওয়ানোর পরও যখন কোনো উপকার হচ্ছিল না,

তখনই তাদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে চিকিৎসার এ নব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এ পরীক্ষা চালানোর সময় তাদের জন্য অন্যান্য সকল প্রকার ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং উভয় জামাতের সকল রোগীর জন্য রাত ২ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত রাত্রিজাগরণ অত্যাবশ্যক করা হয়।

প্রথম অর্থাৎ মুতালাআতি জামাতকে উক্ত সময়ে যিকির, ইবাদত, কালামে পাক তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ ও নির্ধারিত কিছু আয়াত বার বার পাঠ করার নির্দশ দেওয়া হয়।

তাছাড়া রোগীদেরকে আরও বলে দেওয়া হয় যে, তারা যেন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে যিকির ও অন্যান্য ইবাদতে মনোনিবেশ করে এবং মহান আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের আশায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রাণপণ চেষ্টা করে।

এদিকে দ্বিতীয় জামাতের জন্যও ২ঘণ্টা রাত্রিজাগরণ অত্যাবশ্যক ছিল। কিন্তু তাদেরকে প্রথম জামাতের ন্যায় যিকির, অযীফা, তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয় নি বরং তাদেরকে এ দুঘণ্টা অবসর বসে না থেকে ঘরের ছোট-খাট কাজ-কর্ম কিংবা পড়া লেখার কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

**ফলাফল**

| | চার সপ্তাহ চিকিৎসার পর আরোগ্য লাভকারী রোগীর সংখ্যা | আরোগ্যহীন রোগীর সংখ্যা | মোট |
|---|---|---|---|
| মুতালাআত জামাতা | ২৫ | ০৭ | ৩২ |
| নেগরান জামাত | ০৫ | ২৭ | ৩২ |
| সর্বমোট | ৩০ | ৩৪ | ৬৪ |

উপরিউক্ত তালিকায় দেখা যাচ্ছে, মুতালাআতী জামাতের ৩২ জন রোগীর মধ্যে ২৫ জন অর্থাৎ শতকরা ৭৮ জন (১৫ জন পুরুষ ও ১০ জন মহিলা) তাদের রোগ থেকে মুক্তি লাভ করেছে এবং অবশিষ্ট ৭ জন রোগীর অবস্থা পরিবর্তন হয় নি।

পক্ষান্তরে নেগরান জামাতের ৩২জন রোগী থেকে মাত্র ৫ জন রোগী সুস্থ হয়েছে। আর অবশিষ্ট ২৭ জন রোগীই (শতকরা ৮৪ জন ১৬ জন পুরুষ ও ১১ জন মহিলা) সুস্থ হয় নি।

তাহাজ্জুদ নামায মুসলমানদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দীনী আমল। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে বলেছেন– "আর রাতের বেলায় আপনি তাহাজ্জুদ নামায পড়বেন (যা) আপনার জন্য অতিরিক্ত।"

(বনী ইসরাঈল– ৭৯)

তাহাজ্জুদ নামায রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে সরল ও সোজা পথের মতো পথ প্রদর্শন করে। কোনো ব্যক্তি যদি আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও মহব্বতের সাথে নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে, তা হলে অবশ্যই সে সুখময় জীবন লাভ করবে এবং তার দেহে বিভিন্ন রোগের প্রতিক্রিয়াও কম হবে। কেননা এসব লো‌ক যি‌ক‌রে ইলাহীর মাধ্যমে অন্তরের এক অনাবিল প্রশান্তি অনুভব ক‌রে

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন– "আর আমি কুরআনের মধ্যে এমন সব জিনিস অবতীর্ণ করেছি, যেগুলো ঈমানদার লোকদের জন্য শিফা ও রহমত।"

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তা হচ্ছে, মুসলমানগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, রোগ-শোক, বালা-মসিবত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই আসে। আমরা যখন খাঁটি দিলে খালেছ নিয়তে যাবতীয় ভুলত্রুটি স্বীকার করে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং পরিপূর্ণ সুস্থ্যতার জন্য কায়মনোবাক্যে দু'আ করব, তখন আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তিনি তাঁর সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের যাবতীয় সমস্যা ও কষ্ট-মসিবত দূর করে দিবেন।

তাহাজ্জুদের মাধ্যমে রোগমুক্তি মূলত একটি আত্মিক চিকিৎসা। আর এ চিকিৎসা পদ্ধতি পবিত্র কুরআন থেকেই চয়িত। প্রত্যেক মুসলমান বিশ্বাস করে, আমি কেবলই আল্লাহ্ তা'আলারই একজন অধম বান্দা। আমার জীবন-মরণ সব কিছু একমাত্র তাঁরই হাতে। আমার জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কেবল তিনিই করে থাকেন। পবিত্র করআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে চয়িত ধর্মীয় পদ্ধতিতে এ চিকিৎসা যা বাস্তবিকই বর্তমান কালের অন্যান্য চিকিৎসা থেকে বহুগুণে উন্নত।

মোটকথা, এমন কোনো রোগ নেই, যার কোনো চিকিৎসা নেই। যেমন : হাদীস শরীফে আছে, প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সকল রোগীকে শেফা দান করুন।

অবশ্য বহু রোগ আছে, যেগুলোর সঠিক ও সফল চিকিৎসা মানুষ আজও বের করতে সক্ষম হয় নি। যেমন : ক্যান্সার, এইডস ইত্যাদি। কিন্তু উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে অকুণ্ঠ বলা যায়, এ সকল রোগেরও ঔষধ রয়েছে। সুতরাং মানসিক রোগের উত্তম চিকিৎসা অন্তরের প্রশান্তির মধ্যে। যিকির ও নামাযের মাধ্যমে তা লাভ করা সম্ভব। তাই আমরা যদি পূর্ণরূপে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো মেনে চলি, তা হলে ইন্‌শাআল্লাহ আমরা যাবতীয় রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারব। কুরআন-হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনাদর্শই এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ। (মাসিক ইশরাক)

## নামাযের সময়সূচি ও আধুনিক বিজ্ঞান

(TIMINGS OF PRAYERS AND MODERN SCIENCE)

### ময়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানুষকে প্রাকৃতিকভাবেই নড়াচড়া করার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানবদেহ যাবতীয় স্থবির ও জড় দেহের বিপরীত। মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়ার মধ্যেই নিহিত। আর বারবার এ নড়াচড়াই হচ্ছে নামায। আল্লাহ্ তা'আলা মানবজীবনের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত। বিধায় তিনি তার জন্য নামাযের সময়সূচি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

### ফজরের নামায

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাতের শেষ লগ্নে ফজরের নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সময় মানুষ রাতের আরাম শেষে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের নিয়ম হল, যে কোনো ব্যায়াম করার নিমিত্তে খুব ধীরে ধীরে অঙ্গ সঞ্চালন করতে হয় এবং পরে আস্তে আস্তে তা বাড়াতে হয়। এমনকি দৌড়ানোর ক্ষেত্রেও প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর আরেকটু জোরে তারপর আরও জোরে অর্থাৎ ধীরে ধীরে দৌড়ের গতিবেগ বৃদ্ধি করা

সুতরাং মানুষ যদি ঘুম থেকে উঠেই সতের রাকাত নামায পড়ে, তাহলে তার দৈহিক শক্তি অতি তাড়াতাড়ি লোপ পেয়ে যাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবে।

তাছাড়া একদিকে সারারাত নিদ্রা যাওয়ার পর ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময় পেট খাদ্যশূন্য থাকে। অপরদিকে দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাতভর কর্মহীন নিশ্চল থাকে। সুতরাং এমতাবস্থায় ঘুম থেকে উঠার পর পরই যদি এগুলোকে হঠাৎ বেশি পরিমাণে নাড়াচাড়া করা হয়, তাহলে অবশ্যই দেহের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা ফজরের নামাযকে খুবই সংক্ষিপ্ত রেখেছেন।

ফজরের নামাযের মূল উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে পাক-পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে আকৃষ্ট করা। সুতরাং যদি তারা নামাযের জন্য অযু ও মিস্ওয়াক না করে এবং এ অবস্থায় সকালের নাস্তা খেয়ে নেয় তাহলে রাতের বেলায় ঘুমের সময় মুখে সৃষ্ট বিশেষ এক শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া খাবার ও পানির সাথে ভিতরে প্রবেশ করে। ফলে পাকস্থলি ফুলে যাওয়া, নাড়ি ভুড়িতে জ্বালা ধরা এবং আলসারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা দেখা দেয়।

## যোহরের নামায

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত লোকজন কামাই রোজগারে ব্যস্ত থাকে। ফলে এ সময় তাদের শরীরে ধুলাবালি, মাটি প্রভৃতি লাগতে থাকে। কোনো কোনো সময় বাতাসের মাধ্যমেও উড়ে এসে এরূপ বিষাক্ত পদার্থ দেহের খোলা অংশে, চেহারা ও হাতে লেগে যায়। যদি তা অধিক সময় দেহের সাথে লেগে থাকে, তবে মানুষের ভয়ানক ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি মানুষ ওযু করে, তাহলে এর দ্বারা যাবতীয় বিষাক্ত পদার্থ, ময়লা ও ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং সে নব উদ্যমে কর্ম সম্পাদনের মতো এক নতুন ও আনন্দময় জীবন লাভ করে।

সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার সময় থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে যখন সূর্যের প্রখর উত্তাপ কমতে থাকে, তখন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে একপ্রকার গ্যাস নির্গত হয়। এ গ্যাস খুবই বিষাক্ত হয়ে থাকে। যদি মানব দেহ তাতে প্রভাবিত হয়, তা হলে সে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। মস্তিষ্কের

সুস্থতা এমনভাবে বিঘ্নিত হয় যে, তখন তাকে পাগলের মতো মনে হয়। সুতরাং এ সময় যদি কোনো লোক একাগ্রচিত্তে মহাপ্রভুর ইবাদত তথা নামাযে মশগুল হয়ে পড়ে, তাহলে নামাযের কারণে নির্গত নূরানী ও আলোকোজ্জ্বল রশ্মিগুলো ওই ভয়ানক ও ক্ষতিকর গ্যাস থেকে তাকে হেফাযত করে। উক্ত গ্যাস তার কোনোরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

## আছরের নামায

ভূ-পৃষ্ঠ স্থির নয় বরং সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সর্বদা সে চলছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তার এ চলা অব্যাহত থাকবে। ভূ-পৃষ্ঠ দু'ভাবে পরিভ্রমণ করছে। চক্রাকারে এবং লম্বালম্বিভাবে। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর ভূ-পৃষ্ঠের চক্রাকারে পরিভ্রমণে কমতি আসে এবং ক্রমান্বয়ে তা আরও বেশি কমে যায়। এমনকি আছরের সময় কমার পরিমাণ এত অল্প হয়ে যায় যে, দেহের ইন্দ্রিয়গুলোতে এর প্রভাব পড়ে।

মানুষ, জীবজন্তু, পশু-পাখি সকলের উদ্যম ও অনুভূতি শক্তিও তখন কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। প্রত্যেক অনুভূতি সম্পন্ন মানুষই টের পায় যে, আছরের সময় তাদের ক্লান্তি, অস্থিরতা ও অলসতা অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। সুতরাং যখন মানুষ আছরের নামায আদায় করে, তখন এর দ্বারা যাবতীয় ক্লান্তি ও অলসতা দূর হয়ে যায়। ফলে মস্তিষ্কে কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। শুধু তাই নয়, ওযু এবং আছরের নামায আদায়কারী ব্যক্তির অনুভূতিতে এমন এক নতুন শক্তির সঞ্চার হয়, যা দ্বারা যাবতীয় ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার সাথে সাথে আত্মিক শক্তিও বৃদ্ধি পায় এবং মন-মস্তিষ্কে প্রবল কর্মস্পৃহা জাগ্রত হয়।

## দরূদ শরীফের আশ্চর্য ফল

একদা আমার নিকট একজন নেতৃস্থানীয় লোক চিকিৎসার জন্য আগমন করে। তার রোগ ছিল আছরের সময় মস্তিষ্কের চাপ, অস্থিরতা ও অশান্তি লাগা এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পাওয়া। এভাবে কিছু সময় থাকার পর মাগরিবের পরে তা আবার ভাল হয়ে যেত। আমি তাকে চিকিৎসাস্বরূপ কিছু ঔষধ প্রদান করি আর বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়ার নির্দেশ দিই। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই উক্ত রোগী বিস্ময়করভাবে মুক্তি লাভ করে।

## আছরের নামাযের পর অযীফা পড়ার কারণ

আছরের নামাযের পর কিছুক্ষণ তাসবীহ্-তাহ্লীল ও যিকির-আযকার করা এবং এরপর দু'আ করা শরি'অতের নির্দেশ। এ যিকির ও অযীফার কারণে আগত নুরানী রশ্মিগুলো জমীনের নড়াচড়া করে। ফলে ওই নির্গত গ্যাসের ভয়ানক প্রতিক্রিয়া থেকে মানুষ রক্ষা পায়।

আল্লাহ্ওয়ালা ও বুযুর্গ লোকদের দেখা যায়, তারা আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত বিভিন্ন যিকির-আযকারে ও অযীফা আদায়ে মশগুল থাকেন। এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হল, তারা এসব অযীফা ও যিকির-আযকারের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের চক্রাকারে ও লম্বালম্বি ঘুরপাকের ফলে সৃষ্ট যাবতীয় ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেন।

## মাগরিবের নামায ও আধ্যাত্মিক রশ্মি

মানুষ এজন্য আল্লাহ তা'আলার প্রতি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যে, তিনি তাকে রিযিক দিয়েছেন এবং কায়-কারবারের মাধ্যমে তার ও তার পরিবার-পরিজনদের প্রয়োজনীয় উপকরণাদির সুব্যবস্থা করেছেন। শুধু তাই নয়, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পাশাপাশি সে সীমাহীন আনন্দিতও হয়। ফলে তার মধ্যে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার ওই সকল গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যেগুলো দ্বারা তিনি এ বিশ্ব-ভুমণ্ডলকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এ সকল অবস্থা নিয়ে সে যখন মাগরিবের নামায আদায় করে তার পরিবার-পরিজনদের নিকট গমন করে এবং তাদের সাথে বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তা বলতে থাকে, তখন তার আভ্যন্তরীণ আলোক রশ্মিগুলো তাদের উপর বিচ্ছুরিত হয় এবং এ রশ্মির প্রভাবে ছেলে-মেয়েদের অন্তরে পিতা-মাতার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ জন্ম লাভ করে। তখন তারা অজান্তেই পিতা-মাতার সদাভ্যাসগুলোও উত্তমরূপে গ্রহণ করে নেয়। তাছাড়া এর ফলে তাদের মনে মা-বাবাকে ভালবাসা ও মহব্বতের তীব্র আগ্রহও সৃষ্টি হয়।

মোটকথা, এহতেমাম ও গুরুত্বের সাথে মাগরিবের নামায আদায়কারী ব্যক্তির সন্তানগণ সৌভাগ্যশীল ও পিতামাতার অনুগত হয়ে থাকে।

## ইশার নামায

মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই লোভী। সে যখন দুনিয়ার কাজকর্ম থেকে অবসর হয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তন করে এবং খানা খেতে বসে, তখন মজা ও লোভের বশীভূত হয়ে সে বেশি খেয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় যদি সে খানা খাওয়ার পরপরই শুয়ে পড়ে, তা হলে তার নানাবিধ ধ্বংসাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাই আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে তাকে এশার নামায পড়ার বিধান দিয়েছেন, যাতে খানা ও শোয়ার মাঝে কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তাছাড়া মানুষ যদি গোটা দিনের ক্লান্তিকর মস্তিষ্ক নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে, তা হলে সে আরামে ঘুমাতে পারবে না। সুতরাং নামাযের মধ্যে তার আরাম মিলবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, খানা এবং আরামের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নামাযের মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু ইশার নামায আদায় করে সে যখন ঘুমাল, তখন যেমনিভাবে ভোর বেলা উঠেই ফজর নামাযের মাধ্যমে তার কিছুটা হালকা ব্যায়াম হয়ে যায়, তেমনি ইশার নামাযের পূর্ণ ব্যায়ামও তাকে অনাবিল প্রশান্তিতে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

বর্তমান যুগে ডাক্তারগণ শোয়ার পূর্বে কিছু হালকা ব্যায়ামের প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকেন। অনেকে তো আরোও বলেন, শোয়ার পূর্বে নামাযের চেয়ে উত্তম ও উৎকৃষ্ট কোনো ব্যায়াম নেই।

## তাহাজ্জুদ নামায

ধর্মপ্রাণ অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ বিভিন্ন গ্রন্থে তাহাজ্জুদ নামাযের নিম্নলিখিত উপকারগুলো বর্ণনা করেছেন–

১। তাহাজ্জুদ নামায অশান্তি ও অনিদ্রার মহৌষধ।

২। মানসিক রোগের জন্য এটা অব্যর্থ ঔষধ।

৩। রগের টানাপোড়েন রোগের জন্যও এটা পরম উপকারী।

৪। মস্তিষ্কের চিকিৎসা বিশেষ করে পাগলদের জন্য এটা সর্বশেষ চিকিৎসা।

৫। দৃষ্টিশক্তির সমস্যাগ্রস্ত লোকদের জন্যও তাহাজ্জুদ নামায উপকারী।

৬। তাহাজ্জুদ নামায মানবদেহে আনন্দ, উৎসাহ, কর্মস্পৃহা ও সীমাহীন শক্তি সঞ্চার করে, যা তাকে গোটা দিন হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল রাখে।

# নামাযের রুকন ও আধুনিক বিজ্ঞান

(THE ROKON FOR PRAYER AND MODERN SCIENCE)

## কিয়াম বা দাঁড়ানো

কিয়াম বা দাঁড়িয়ে নামায পড়া নামাযের সর্বপ্রথম অবস্থা। এ সময় দেহ সম্পূর্ণরূপে স্থির থাকে। ফলে নিম্নোক্ত উপকারগুলো হাসিল হয় :

(১) হাদীস শরীফে আছে– "যখন নামাযী কিরাত পড়ার সময় যেন এতটুকু জোরে পড়ে, যাতে সে নিজে তা শুনতে পায়।" সুতারাং কেরাত পাঠের সময় পবিত্র কুরআনের শব্দাবলী থেকে বিচ্ছুরিত নূরসমূহ নামাযী ব্যক্তির পূর্ণ শরীরে প্রবাহিত হয়ে থাকে, যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করে।

(২) দাঁড়ানোর মাধ্যমে শরীরে এক অনাবিল প্রশান্তি অনুভূত হয়।

(৩) নামাযী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার ফলে তার দেহ একটি নূরের বেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে এ অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিজ্ঞানের ভাষায় অদৃশ্য আলোক রশ্মির বেষ্টনীতে ঢাকা থাকে।

(৪) কিয়ামের মধ্যে নামাযী ব্যক্তি যে অবস্থায় থাকে, সে যদি প্রত্যহ এভাবে ৪৫ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে তার মস্তিষ্ক ও শিরা-উপশিরায় একপ্রকার শক্তির সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এর মাধ্যমে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

(৫) কিয়ামের মাধ্যমে মস্তিষ্কের পশ্চাৎ ভাগ শক্তিশালী হয় এবং এর দ্বারা এমন এক দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে বাঁচা সম্ভব হয়, যা মানবদেহের ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয়।

## মহিলাদের বুকের উপর হাত বাঁধা

মহিলারা যখন নিয়্যত করে বুকের উপর হাত বাঁধে, তখন একপ্রকার বিশুদ্ধ উত্তাপ তার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং মাংসগ্রন্থিতে বাড়তি শক্তির সঞ্চার হয়। আর এখানেই শিশুদের খাদ্যোপোকরণ সংরক্ষিত থাকে। তাছাড়া বুকের উপর হাত রাখা দুগ্ধদানকারী মায়ের দুধেও বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে। কেননা এর ফলে বাচ্চাদের ভিতরে নূর সঞ্চিত হতে থাকে,

যদ্বারা তাদের অভ্যন্তরে এমন একটি চিত্র অঙ্কিত হয়। ফলে তার ধ্যান-ধারণাও নূরানী হয়ে থাকে।

বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, মহিলারা যখন বুকের উপর হাত বাঁধে এবং আল্লাহ্ তা'আলার দিকে গভীর মনোযোগী হয়, তখন একপ্রকার বিশেষ ধরনের আলোক রশ্মির সৃষ্টি হয়। যা ডঃ ডারউইনের মতে হালকা নীল বা সাদা রংয়ের হয়ে থাকে। তা তাদের দেহাভ্যন্তরে আসা-যাওয়া করতে থাকে। ফলে তার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সে কখনো দূরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় না

## পুরুষের নাভীর নিচে হাত বাঁধা

নামাযী ব্যক্তি যখন নাভী কিংবা তার নিচে হাত বাঁধে, তখন উভয় হাত থেকে একপ্রকার আলোক রশ্মি নির্গত হয়, যা ইতিবাচক (Positive) ও নেতিবাচক (Negative) হয়ে থাকে। (একথা পূর্বেও বলা হয়েছে)। তারপর ওই আলোক রশ্মি একটি অপরটির সাথে মিশ্রিত হয়ে এমন এক ক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যা নাভীর মাধ্যমে উদরস্থ প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে হৃদপিণ্ডকে প্রবল শক্তিশালী করে তোলে। ফলে যৌনশক্তি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে

## রুকু

রাওয়ালপিন্ডি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিন্সিপ্যাল ডা. মুহাম্মদ নূর সাহেব বলেন– একদা এক সার্জন ডাক্তার যার স্ত্রীও সার্জন ছিল - আমার নিকট এসে বলতে লাগলেন ডাঃ সাহেব! গিরা ও কোমরের ব্যথার জন্য বহু চিকিৎসা করেছি; কিন্তু কোনো চিকিৎসা কাজ হয় নি। এতৎশ্রবণে পাশে উপবিষ্ট ডা. নওয়াজ সাহেব সার্জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি নামায পড়েন? সার্জন সাহেব বললেন, হ্যাঁ! আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি। এরপর ডা. নওয়াজ সাহেব পুনরায় বলতে লাগলেন, আপনি হয়ত উত্তমরূপে রুকু-সিজদা করেন না। এটা করলে ইনশাআল্লাহ্ আপনার ব্যথা ভালো হয়ে যাবে। কিছু দিন পর বাস্তবিকই দেখা গেল, তিনি ডা. নওয়াজ সাহেবের কথা মতো আমল করার কারণে তার ব্যথা দূর হয়ে গেছে।

রুকু মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে এবং যে রোগের কারণে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো নিস্তেজ ও দূর্বল হয়ে পড়ে; তা দ্রুত ভালো করে। রুকু হৃৎপিণ্ডে পাথর সৃষ্টি হওয়াকে বারণ করে। যাদের হৃৎপিণ্ডে পাথর হয়ে

গেছে, রুকুর মাধ্যমে উক্ত পাথর অতি তাড়াতাড়ি বের হয়ে যায়। তাছাড়া রুকুর মাধ্যমে পা অবশ হওয়া রোগী অতি তাড়াতাড়ি চলতে ফিরতে সক্ষম হয়। রুকুর দ্বারা মস্তিষ্কে ও চোখে রক্ত চলাচল হওয়ার কারণে মস্তিষ্ক ও চোখের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

## সিজদা

যখন নামাযী ব্যক্তি সিজদা করে, তখন তার মাথার শিরা-উপশিরাগুলোতে রক্ত চলাচল দারুণ বৃদ্ধি পায়; দেহের অন্য কোনো অবস্থায়ই তাতে এত বেশি রক্ত প্রবাহিত হয় না। ফলে চোখের দৃষ্টিশক্তি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

## স্থায়ী সৌন্দর্যের রহস্য

শায়খ যুলফিকার আহমদ সাহেব বলেন, নামাযী ব্যক্তির চেহারা সর্বদা কোমল থাকে। কেননা নামায ও সিজদার কারণে তার সম্পূর্ণ দেহের শিরায় শিরায় রক্ত পৌঁছতে থাকে। যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, তার চেহারায় একপ্রকার মলিনতা ছেয়ে যায়। এজন্য হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি নামায পড়ে তার চেহারার মধ্যে নেক্‌কার লোকদের নূর পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে।

## মহিলাদের সিজদা ও ওয়াশিংটনের ডাক্তার

জনৈক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলেন, একদিন আমার সাথে এক আমেরিকান ডাক্তারের সাক্ষাৎ হলে তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন– বিশ্বাস করুন! যদি মেয়েরা জানত যে, নামাযে লম্বা সিজদা করার কারণে চেহারা মসৃণ ও লাবণ্যময় হয় এবং তাতে নূর দেখা দেয়, তা হলে তারা সিজদা থেকে মাথাই উঠাত না (মাওয়ায়েযে শায়েখ ইঞ্জিনিয়ার নক্‌শবন্দি)।

## সিজদা ও আত্মিক সম্পর্ক

প্রতি সেকেণ্ডে আলোর গতি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৮২ মাইল। আর পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে আট বার ঘুরে। যখন নামাযী ব্যক্তি সিজদাবস্থায় জমিনে মাথা রাখে, তখন তার মস্তিষ্কের ভিতরে যে রশ্মি আছে, সেগুলো জমিনের সাথে মিশে যায়। ফলে মস্তিষ্কের গতিবেগ আলোর গতিবেগে

পরিণত হয়। তাছাড়া এ সময় মস্তিষ্কের ভিতর অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টিকারী চমক্‌কে জমিন শোষণ করে নেয়। ফলে নামাযী ব্যক্তির অজান্তেই চিন্তার প্রচণ্ড চাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। উপরন্তু সিজদার মাধ্যমে সৃষ্টি জগতের একক স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাথেও বান্দার সুমধুর সম্পর্ক কায়েম হয়। রূহানী শক্তি এ পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যে, তার সম্মুখ থেকে তখন যাবতীয় পর্দা সরে গিয়ে অদৃশ্য জগতের চিত্র উদ্ভাসিত হতে থাকে। যখন নামাযী ব্যক্তি শূন্য ও বাতাস থেকে আলোক রশ্মি নিয়ে মস্তক, নাক, হাঁটু, হাত ও পায়ের বিশটি আঙ্গুল জমিনে মিলিয়ে সিজদায় যায়, তখন শরীরের উপরাংশের রক্ত মস্তকে নেমে আসে এবং মস্তিষ্ককে অধিক শক্তিশালী করে।

### সালাম

নামাযী ব্যক্তির সালাম ফিরানোর জন্য মাথাকে ডান ও বাম দিকে ঘুরাতে হয় এবং এক ওয়াক্তের নামাযে কয়েকবার তা করতে হয়। ফলে তার হার্টের কোনো রোগ হয় না এবং হার্টের যাবতীয় সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

### ডাঃ নূরীর বিশ্লেষণ

মুলতান মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর ডা. নূর আহ্মদ নূর সাহেব নামাযের যে বিশ্লেষণ করেছেন, নিম্নে তা প্রদত্ত হল:

## তাহাজ্জুদ নামাযের পার্থিব উপকারিতা

পাশ্চাত্যের ডাক্তারগণ হতাশাগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসার আরেকটি তত্ত্ব পেশ করেছেন। খাইবার মেডিকেল কলেজের একজন মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ আমাকে এ বিষয়ে অবগত করেছেন। পাশ্চাত্যের ডাক্তারগণ দেখলেন যে, যেসব মুসলমান তাহাজ্জুদের সময় উঠেন, তারা হতাশাজনিত মানসিক রোগে আক্রান্ত হন না। ফলে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত হওয়া নৈরাশ্য রোগ আরোগ্যের অন্যতম মাধ্যম।

মনোবিশেষজ্ঞগণ (Psychology) হতাশাজনিত রোগীর ক্ষেত্রে বারবার এটি পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁরা এ ধরনের রোগীদেরকে তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত করতে শুরু করেন। রোগীরা জেগে সামান্য সময় নামায পড়ে

আবার শয়ন করত। কয়েক মাস পর্যন্ত নিয়মিত এ আমলটি চালু রাখার কারণে রোগীদের অনেক উপকার হল এবং কোনোরূপ ঔষধ ব্যতীত তারা সুস্থ হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের ডাক্তারগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, হতাশাজনিত রোগীর অন্যতম চিকিৎসা অর্ধরাতের পর জাগ্রত হওয়া।

## পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের রহস্য

প্রায় প্রতিটি ধর্মমতের অনুসারীগণই একথা স্বীকার করে যে, মানুষ দেহ ও আত্মা, এ দু'য়ের সমষ্টির নাম। ভূমি থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি হচ্ছে দেহের খাদ্য। পক্ষান্তরে আত্মার খাদ্য হচ্ছে নামায। ইসলামে দেহ এবং রূহ উভয়ের খাদ্যব্যবস্থা রয়েছে। সকালবেলা নাস্তা করে শরীরকে খাদ্য দেওয়া হয় আর নামায পড়ে আত্মিক শক্তির যোগান দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে দুপুর বেলা খানা খেয়ে শরীরে শক্তির সঞ্চার করা হয় আর যোহরের নামায হয় আত্মার খোরাক নামাযী ব্যক্তির জন্যে আছরের নামাযের পুরো সময়টুকু আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। সন্ধ্যার পর অনেক লোক প্রচুর পরিমাণে খানা খেয়ে থাকে। এ কারণে এশার নামাযে রাকাতের সংখ্যা বেশি রাখা হয়েছে।

## অন্তরের রোগ থেকে মুক্তি

মনোবিজ্ঞানে পারদর্শী ডাক্তারগণ দীর্ঘ কয়েক বছর প্রচেষ্টা ও গবেষণা করে এমন একটি শারীরিক ব্যায়ামের পরামর্শ দিয়েছেন, যার মাধ্যমে অন্তরের ব্যাধি অনেকটা হ্রাস পায়। আর সে ব্যায়ামটি নামাযের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আমরা যখন দণ্ডায়মান হই তখন আমাদের শরীরের নিম্নভাগে রক্তের চাপ বেশি থাকে। আবার যখন রুকুতে যাই, তখন শরীরের মধ্যভাগের উপকার হয়। এমনিভাবে যখন আমরা সিজদায় যাই, তখন উপরিভাগে রক্তের চাপ বেশি থাকে।

নামাযের মধ্যে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গে পরিমাণ মতো রক্ত আসা যাওয়া করতে পারে এ কারণে কোনো কোনো রোগ এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। বিশেষ করে অন্তরের ব্যাধি। বস্তুত আবেদগণ সাধারণত হালকা পাতলা হয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের অন্তর অত্যন্ত শক্তিশালী। ফলে তারা অন্তরের ব্যাধিতে খুব কমই আক্রান্ত হন।

## নামায হাই ব্লাড প্রেসার রোগের চিকিৎসা স্বরূপ

নামাযের জন্য সর্বপ্রথম আমরা অজু করে থাকি। অজু চলাকালীন আমরা যখন নিজেদের চেহারা, কনুই পর্যন্ত হাত ও পা ধৌত করি এবং মাথা মাসাহ্ করি। তখন আমাদের দেহের চলমান রক্ত এক নবজীবন লাভ করে, যার মাধ্যমে আমাদের প্রশান্তি লাভ হয়। ফলে আমাদের শিরা উপশিরার কর্মধারা প্রভাবান্বিত হয়। এদিকে শিরা ও স্নায়ুর স্থিরতায় মস্তিষ্ক আরাম পায়। আর প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ অর্থাৎ মাথা, ফুসফুস, অন্তর, কলিজা ইত্যাদির কর্ম স্ব-স্ব অবস্থায় চলতে থাকে। তাছাড়া রক্তের উচ্চচাপ কমে গিয়ে সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসে। চেহারায় উজ্জ্বলতা, সৌন্দর্য ও কমনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। অযুর দ্বারা স্নায়ুর শিথিলতা বিদূরিত হয়, চোখ আকর্ষণীয় হয় ও অলসতা দূর হয়। আপনি কখনো পরীক্ষামূলকভাবে হাই প্রেসারের রোগীকে অজু করালে দেখতে পাবেন যে, তার রক্তচাপ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

## দাঁড়িয়ে নামায পড়া গিটের ব্যথার উপশম ঘটায়

নামাযের মাধ্যমে শরীরের সংযোগ অংশের চিকিৎসা সম্ভব। অযু করার পর যখন আমরা নামাযে দণ্ডায়মান হই, তখন প্রথমে আমাদের শরীর ঢিলা হয়ে যায়। কিন্তু নামাযের নিয়ত বাঁধার জন্য যখন আমরা হাত উত্তোলন করি, তখন কুদরতীভাবে দেহে একপ্রকার রূহানী শক্তির সৃষ্টি হয়।

এ অবস্থায় মানুষের মধ্যকার আলস্যভাব কেটে যায়। আর হৃৎপিণ্ড থেকে রক্তের চাপ মেরুদণ্ডের দিকে ধাবিত হয়ে প্রতিটি পেশীতে ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই জানেন দৈহিক সুস্থতার জন্য মেরুদণ্ডের ভূমিকা অনন্য। পরিপূর্ণ সুস্থতার ভিত্তি মেরুদণ্ডের স্থিতিশীলতার ওপর। নামাযে দণ্ডায়মান হওয়া গিট, টাখনু, পায়ের গোছা, পাঞ্জা ও হাতের জোড়া শক্তিশালী করে। গিটের ব্যথা বিলুপ্ত করে। তবে শর্ত হল, দেহ সোজা থাকা ও পায়ের নলায় বক্রতা সৃষ্টি না হওয়া।

## রুকুর মাধ্যমে যকৃতের ব্যাধির চিকিৎসা

ঝুঁকে রুকু করার সময় উভয় হাত হাঁটুর উপর এমনভাবে রাখতে হয়, যাতে করে কোমর সম্পূর্ণরূপে সোজা থাকে এবং হাঁটুও ঝুঁকে না যায়। এ আমলটির দ্বারা পাকস্থলীতে শক্তির সঞ্চার হয়। হজমক্রিয়া ঠিক হয়ে যায়। সঙ্কোচন দূর হয়ে যায়, পাকস্থলীর অন্যান্য দোষত্রুটি– যেমন, অন্ত্র ও পেটের নাড়িভুঁড়ির শিথিলতার অবসান ঘটে। রুকুর আমলটি যকৃৎ ও কিডনীর কার্য ঠিক করে দেয়। তাছাড়া কোমর ও পেটের চর্বি হ্রাস পায়। রক্তের গতিবেগ তীব্র হয়।

যেহেতু হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক এ কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে, সেহেতু হৃৎপিণ্ড সহজেই মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন করতে সক্ষম হয়। ফলে মস্তিষ্কের দায়িত্ব কমে যায় ও প্রশান্তি লাভ করে। আর এতে করে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রুকুতে হাত নিচের দিকে নেমে যায়, যার ফলে কাঁধ থেকে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত পূর্ণ অংশের ব্যায়াম হয়ে যায়। শুধু তাই নয়। এতে করে বাহুর সংযোগ স্থল অত্যন্ত মজবুত হয় এবং বার্ধক্যের কারণে জোড়াসমূহের জমাটবদ্ধ দূষিত পদার্থ অনায়াসে বের হয়ে যায়।

## ভুঁড়ি কমানোর মাধ্যম

রুকুর পর সোজাভাবে দাঁড়িয়ে তারপর আমরা সিজদায় যাই। সিজদায় যাওয়ার সময় সর্বপ্রথম হাত মাটিতে রাখা হয় (বিশেষ করে মহিলাদের জন্য) এটি মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী ও মজবুত করে তুলে। মহিলাদের ভিতরগত শিরায় শক্তির যোগান দেয়। যদি রুকু থেকে উঠে সাথে সাথে সিজদায় না যাওয়া হয়, তাহলে এতে দেহের ভিতরগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যায়াম হয়ে যায়। সিজদার অবস্থাটিও একটি ব্যায়াম, যেটি উরুর অতিরিক্ত মাংসপিণ্ড কমিয়ে দেয় এবং জোড়াসমূহ খুলে দেয়। যদি চর্বির জোড়াসমূহ শুকিয়ে যায়, অথবা চর্বি কমে যায়, তাহলে এর দ্বারা ওই ঘাটতির পূরণ হয়ে যায় এবং ভুঁড়ি কমে যায়। উপযুক্ত ও স্বাভাবিক পেটে দেহ সুগঠিত ও সৌন্দর্য মণ্ডিত মনে হয়।

## একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা

আমার এক বন্ধু নিজের শরীর পাতলা ও হালকা করার জন্য আমেরিকা গিয়েছিল। সেখানকার একজন সুদক্ষ ডাক্তার বললেন : তোমরা মুসলমান, তোমাদের চিকিৎসা নামায। নামায পড়তে থাক, এতে তোমাদের দেহ ঠিক হয়ে যাবে। এরপরও যদি কিছু ত্রুটি থাকে, তাহলে তাহাজ্জুদ নামায পড়।

## আলসারের চিকিৎসা সিজদার মধ্যে

যে সকল মানুষের পাকস্থলী জ্বালাপোড়া করে এবং যখম হয়ে যায়, সঠিকভাবে সিজদা করার মাধ্যমে এ রোগের নিরসন ঘটে। সিজদার মধ্যে কপাল জমিনে রাখা হয়। যার ফলে মস্তিষ্কের তরঙ্গ জমিনের আভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎগতির সাথে সরাসরি মিলিত হয়ে মস্তিষ্ককে অনেক গুণ শক্তিশালী করে তোলে। এ অবস্থায় মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যায়। এ প্রশান্ত মস্তিষ্ক পাকস্থলীকে অধিক পরিমাণে এসিড সৃষ্টি করতে বাঁধা প্রদান করে। ফলে পাকস্থলীর ক্ষত ভালো হয়ে যায়।

## মস্তিষ্কের যাবতীয় রোগ ব্যধি

নম্রতা ও একাগ্রচিত্তে দীর্ঘসময় সিজদা করা মস্তিষ্কের যাবতীয় রোগ ব্যাধির চিকিৎসা। মস্তিষ্ক নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ত থেকে প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণ করে, অপ্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ রক্তের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডকে দিয়ে দেয়। যেন হৃৎপিণ্ড সেগুলো পেশাবের আকারে বের করে দিতে পারে। সিজদা থেকে ওঠার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন, মাথা ঝুঁকে থাকে এবং বাহু সোজা ও উভয়ের মাঝে কিঞ্চিত বিস্তৃতি থাকে। উঠার সময় উরুর উপর হাতের তালু রাখবে। কোমার যথাসম্ভব উপরের দিকে রাখবে এবং আস্তে আস্তে দাঁড়াবে অথবা বসে যাবে।

## চেহারা কুচকে যাওয়া

মেরুদণ্ডের হারাম মগজ বৈদ্যুতিক তারের মত, যার মাধ্যমে পূর্ণ দেহে জীবন ফিরে আসে। সিজদার সময় রক্তের গতি দেহের উপরিভাগে ধাবিত হয়, যার ফলে চোখ, দাঁত ও সম্পূর্ণ চেহারায় আর্দ্রতা ফিরে আসে ও সতেজ হয়ে উঠে। ফলে গালের কুঞ্চন দূর হয়ে যায়। বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সংযোজন ঘটে। মানুষের দূরদর্শিতা বেড়ে যায়। অধিক বয়স পর্যন্ত বার্ধক্য পরিলক্ষিত হয় না। একশত বৎসর বয়সপ্রাপ্ত ব্যক্তিও ঠিক মতো চলাফেরা

করতে পারে। শুধু তাই নয়, তার মাঝে একপ্রকার বজ্রস্রোত চলতে থাকে যেটি শিরাউপশিরায় শক্তির যোগান দেয়। সঠিকভাবে সিজদা করার মাধ্যমে সর্দিকাশি, কানে কম শোনা ও মাথাব্যথা ইত্যাদি রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

### যৌনরোগ

উভয় সিজদার মাঝে বসা গিট ও পায়ের নলা মজবুত করে। তাছাড়া বংশ বিস্তারের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা উরুর মাঝে যে মাংসপেশী সৃষ্টি করেছেন, তাকে বিশেষ শক্তি প্রদান করে। ফলে পুরুষত্বের দুর্বলতা দূর হয়ে যায়। আর দেহ ও মস্তিষ্ক সব দিক দিয়ে সবল হয়ে যায়।

### বক্ষব্যাধি

নামায শেষ হলে আমরা সালাম ফিরাই। গর্দান ফিরানোর দ্বারা গর্দানের রগ ও পেশীর শক্তি অর্জিত হয় এবং রগ ও পেশীর সাথে সম্পৃক্ত রোগ দেখা দেয় না। তদুপরি মানুষ উৎফুল্ল ও বলিষ্ঠ থাকে। বুক ও হাসুলীর (গলার নিচের হাড়) শিথিলতা দূর হয়ে যায়। সিনা চওড়া ও বড় হয়। এ সব পন্থা থেকে সে-সময় উপকৃত হওয়া যাবে, যখন আমরা নামায নামক ইবাদতটি তাড়াহুড়া না করে সমস্ত আদব ঠিক রেখে একাগ্রচিত্তে খুশু-খুযুর সাথে আদায় করব।

### ওয়াশিংটনের জনৈক ডাক্তার ও নামায

ওয়াশিংটনে একবার আমার সাথে এক ডাক্তারের সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন : আমার মনের আকাঙ্ক্ষা হল, সমগ্র বিশ্বে নামায চালু হয়ে যাক। আমি বললাম, কেন জনাব? তিনি বললেন, এতে অবর্ণনীয় হেকমত রয়েছে। তিনি ছিলেন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। আমাকে বললেন, আপনি তো ইঞ্জিনিয়ার। তাই আপনি এ হিকমত বুঝবেন। আমি বললাম, বলুন জনাব তিনি বলতে লাগলেন, মানুষের শরীরের বৃত্তের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মানুষের হৃৎপিণ্ডে এমন একটি পাম্প রয়েছে, যেটি কখনো নিজের মধ্যে রক্ত টেনে নেয় আবার কখনো সমগ্র দেহে ছড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ তা

হতে সারা দেহে তাজা রক্ত আসা যাওয়া করে। মানুষ যখন বসা অথবা দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে, তখন তুলনামূলকভাবে শরীরের নিম্নভাগে চাপ পড়ে।

তিনি বলেন, ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করছি। মনে করুন, তিন তলা একটি প্রাসাদের নিচ তলায় একটি স্বল্প ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প বসানো আছে। পাম্পটি নিচ তলায় তো পানি পৌছাবে, দ্বিতীয় তলায়ও কিছু পানি পৌছাবে। কিন্তু তৃতীয় তলায় মোটেও পানি পৌছাতে পারবে না। অথচ ওই পাম্পটিই নিচের তলায় পূর্ণরূপে পানি সরবরাহ করছে। এর কারণ, পানি আছে ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বস্থানে পানি পৌছানোর মতো শক্তি তার নেই।

এ উদাহরণটি সামনে রেখে চিন্তা করুন! মানুষের হৃৎপিণ্ড সর্বদা রক্ত সরবরাহ করে এবং এ রক্ত নিম্নভাগের অঙ্গসমূহে সহজেই পৌছে যায়। কিন্তু দেহের উপরিভাগে ঠিকমত পৌছে না। যখন এমন কোনো পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটে, যার মাধ্যমে মাথা নিচের দিকে চলে যায় এবং হৃৎপিণ্ড উপরের দিকে উঠে যায়, তখন রক্ত পরিপূর্ণভাবে মাথার মধ্যে পৌছে যায়।

এছাড়া মানুষ যখন সিজদায় যায়, তখন সে নিজেই অনুভব করে, কেমন যেন তার চেহারা রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সিজদা কিছুটা লম্বা হলে মনে হয়, রক্ত চেহারার চিকন রগসমূহেও পরিপূর্ণ রূপে পৌছে গেছে। তারপর তিনি আরও বললেন :

সাধারণত মানুষ বসা, দাঁড়ানো শোয়া অবস্থায় থাকে। এ তিন অবস্থায়ই মানুষের হৃৎপিণ্ড নিচে ও মাথা উপরের দিকে থাকে। একটি অবস্থা ই আছে, যখন মাথা নিচের দিকে ও হৃৎপিণ্ড উপরের দিকে থাকে। আর সেটি হল, সিজদাবস্থা। এতে প্রতিটি পেশী, শিরা ও ধমনীতে ঠিক মতো রক্ত পৌছে যায়।

আরেকটি পদ্ধতি হল, মাথা নিচু করে উল্টিয়ে দাঁড়ানো, তবে এটা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। নামাযী ব্যক্তির চেহারা সর্বদা উজ্জ্বল ও নূরানী থাকে। কেননা নামাযে বারবার সিজদা করার ফলে তার সব ক'টি শিরায় রক্ত পৌছে যায়। আর যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, সে ব্যক্তির চেহারায় একপ্রকার মলিন প্রকাশ পায়।

# নামায ও আধুনিক বিজ্ঞান

(PRAYERS AND MODERN SCIENCE)

## নামায একটি পূর্ণ মুরাকাবা

মোরাকাবাকে বর্তমানে পাশ্চাত্য জগৎ Meditation বা 'ধ্যান' নামে অভিহিত করে। তথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মেডিটেশন ক্লাব। নর-নারী সেখানে ভিড় জমায়। একদিন আমি ফ্লাজলফিয়া ইউনিভার্সিটিতে বক্তব্য দিচ্ছিলাম। লোকজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মেডিটেশন" কি? আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, তোমরা এ সম্পর্কে কী জান? তারা বলল, প্রতি মহল্লায় মেডিটেশন সেন্টার খোলা হয়েছে।

নর-নারীরা যেখানে গেলে তাদেরকে বসিয়ে দেওয়া হয় এবং কখনো বলা হয়, নিজ নিজ নাকের ডগায় মনোনিবেশ কর। আবার কখনো বলা হয়, নাভীর দিকে মনোনিবেশ কর ও অন্য সবকিছু ভুলে যাও। আগত লোকজন আধ-এক ঘণ্টা এভাবে বসে থাকে এবং চলে যাওয়ার সময় কিছু পয়সা দিয়ে যায়। তারা কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলে, আমরা এখানে কিছুটা প্রশান্তি (Relax feel ) অনুভব করেছি।

এখন চিন্তা করে দেখুন! বিধর্মীরা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের পথেই ফিরে আসছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার মধ্যে যে শান্তি রয়েছে, তা অন্য কোনো আমলেই নেই।

## নামায বিস্ময়ের সমষ্টির নাম

ইউরোপে কিছু ক্লাব রয়েছে, যেখানে পয়সা দিয়ে তারা এমন সেমিনারে অংশগ্রহণ করে, যেখানে তাদেরকে হাসানো হয় এবং তারা হাসতে হাসতে ক্লান্তিময় জীবন ক্ষণিকের জন্য হলেও ভুলে যায়। পরে আবার সেই পূর্বের বিষণ্ন জীবন ও আযাবে ফিরে যেতে হয়।

সেখানে এমন সেন্টারও রয়েছে, যেখানে তাদেরকে কাঁদানো হয়। তারা কাঁদতে কাঁদতে নিজেদের শ্রান্তি দূর করে। কিন্তু পেরেশানী কোথায় যাবে? জ্ঞানের চশমা দিয়ে গভীরভাবে অবলোকন করলে দেখা যাবে, নামাযের মধ্যে খুশি (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নেয়ামতের ওয়াদা) শান্তি ও কান্না (গুনাহের কারণে অশ্রু) রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা ও সাক্ষাতের অশ্রু নামাযেই বিসর্জন সম্ভব। বস্তুত নামায খুশি ও দুঃখের সংমিশ্রণে গঠিত

অবস্থার নাম। এমন দুঃখ, যার পরে শুধু সুখই সুখ। এরপর দুঃখের কোন বস্তু স্পর্শও করবে না।

## সিজদাবস্থায় হস্তযুগল সোজা রাখা

শরী'অত সিজদাবস্থায় হস্তযুগল সোজা রাখার নির্দেশই দিয়ে থাকে। স্বভাবত সারাদিন আমরা আমাদের হাতগুলো টান টান করে রাখি না বরং আমাদের হাত ঢিলা ও শিথিল অবস্থায় থাকে। এ অবস্থায় সর্বদা চলতে থাকলে হাতে একপ্রকার ব্যাধি দেখা দেয় আর তা হল হাতের আয়ত্ত শক্তি হ্রাস পাওয়া। হাতে প্রকৃতিগত শক্তি ও নড়াচড়ায় ঘাটতি দেখা দেওয়া। যখন আমরা সিজদাতে হাত সোজা রাখি, তখন তা হাত, আঙ্গুল ও জোড়াসমূহের জন্য এক বিশেষ প্রকারে ব্যায়াম হিসেবে পরিগণিত হয়, যার মাধ্যমে হাত উল্লিখিত ব্যাধি থেকে নিরাপদে থাকে এবং হাতের প্রাকৃতিক শক্তি ও বল স্থায়ী থাকে।

## একাগ্রতা, স্থিরতা ও আভ্যন্তরীণ রোগ-ব্যাধি

অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার ভোগ সামগ্রীর সাথে জড়িত হয়ে উহার ফাঁদে পড়ে বসেছে। যে পরিমাণ দুনিয়ার ফাঁদে পড়েছে, ঠিক সেই পরিমাণ অশান্তি ও অস্থিরতায় ভুগছে। এখন শান্তির অন্বেষণে বেশি পরিমাণ দুনিয়া অর্জন করছে। ফলে আর বেশি পরিমাণে ফাঁদে পড়ছে।

মাছি মিষ্টির উপর এসে বসল। কিছু খেল, কিন্তু পরক্ষণেই ফাঁদে ফসকে পড়ে গেল। এবার বের হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু যত চেষ্টা করে তত বেশি ফসকে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত রেশমপোকার মতো মরে গেলে। মানুষের অবস্থাও তদ্রুপ। এর একমাত্র চিকিৎসা নামায। এ নামাযই শান্তির ফয়সালা করতে পারে। তবে কোন ধরনের নামায এ ভূমিকা পালন করবে? আমার ও আপনার খুশু-খুযু বিহীন নামায? না, কখনো না বরং ওই নামায, যার মধ্যে খুশু ও খুযু রয়েছে।

খুশু আভ্যন্তরীণ প্রশান্তি, ধ্যান ও একাগ্রতার নাম। আর খুযু বাহ্যিক ধারাবাহিকতা ও মনোযোগের নাম। এ দুটি জিনিসই টেলিপেথি, হিপ্নাটিযম ও যোগশাস্ত্রে কাঙ্ক্ষিত আর এগুলোর সমষ্টিই মানবদেহের চিকিৎসা হিসেবে পরিগণিত।

মনোবিজ্ঞানে পারদর্শীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নামায একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশান্তির নাম। বর্তমানে আভ্যন্তরীণ রোগগ্রস্থদেরকে একাগ্রচিত্তে নামায পড়তে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

জনৈক মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ বলেন : যদি কোনো মানুষ জানত যে, খুশু ও খুযুর মধ্যে কি উপকার রয়েছে, তা হলে দুনিয়াবী সব কিছু ভুলে যেত।

তিনি আরও বলেন, আমার নিকট জনৈক রোগী আসলে আমি তাকে যাবতীয় ঔষধ সেবন করালাম। কিন্তু কোনো ফল না হওয়ায় তাকে বললাম, আমি তোমাকে তাহাজ্জুদ থেকে আরম্ভ করে আওয়াবীন পর্যন্ত যত প্রকার ফরয ও নফল নামায রয়েছে, সর্বপ্রকার নামায একাগ্রতার সাথে আদায় করার পরামর্শ দিচ্ছি। কিছু দিন পর সেই রোগী আমাকে বলল, আমার $^{১}/_{৩}$ অংশ রোগ ভাল হয়ে গিয়েছে।

## আত্মহত্যার ইচ্ছা হ্রাস

ফ্রান্সের কমপোর্ট সেন্টারের গবেষণা অনুযায়ী যারা আত্মহত্যার ইচ্ছা পোষণ করে, তাদেরকে এমন মুরাকাবায় লিপ্ত করা প্রয়োজন, যা শুধু নামাযের দ্বারা হাসিল হয় না বরং ভিন্ন প্রক্রিয়ায় তাদেরকে ধ্যানে লিপ্ত রাখতে হবে। তাদের দৃষ্টি আমলের প্রতি এমনভাবে নিবিষ্ট করতে হবে যাতে তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও ধ্যান সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে রোগী নিজে নিজে আত্মহত্যাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে।

ডা. আলেকজাণ্ডার বলেছেন, আমরা ইসলামে আত্মহত্যা কম দেখি। গবেষণা করে দেখা গেল, অযু নামায এবং বিশেষ করে ধ্যানওয়ালা নামাযের মাধ্যমে আত্মহত্যার প্রতি ঝুঁকি কমে যায় এবং শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

## স্যার উইলিয়াম ক্রাক্সের গবেষণা

ইউরোপে জনৈক আধ্যাত্মিক রোগ বিশেষজ্ঞ দ্যা রিসার্চ ইন দ্যা ফিনোমেনন অফ স্প্রিচালিজম নামক বইয়ে লিখেছেন- লোভলালসা মিথ্যা, কার্পণ্য, হিংসা-বিদ্বেষ প্রতিশোধ স্পৃহা প্রভৃতি এমন নিম্নমানের ব্যাধি যার কারণে মানুষ মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়, যা থেকে বের হওয়া দুষ্কর। এ থেকে রক্ষা পেতে জীবন বাজি রাখতে হয়। কিন্তু এ লোকটিই যদি

মুসলমানদের নামায একাগ্রচিত্তে পড়া শুরু করে দেয়, তাহলে অতি শীঘ্রই উক্ত ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ ওয়াইস এডমিরাল তার পুস্তকে লিখেছেন, ধ্যান ও মনোনিবেশ নামাযের অংশ নয় বরং স্থিরতার অংশ। তিনি আরও বলেন, আধ্যাত্মিক জগতের গভীরে পৌঁছতে চাইলে নামায পড়, নামায পড়, নামায পড়।

## ইমামের তিলাওয়াত ও আধুনিক বিজ্ঞান

### তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইমাম যখন তিলওয়াত করেন আর মুক্তাদীগণ ধ্যান সহকারে তা শুনতে থাকেন, তখন এ পড়া ও শ্রবণ করা উভয়ের মাঝে এক বিশেষ প্রকারের তরঙ্গের সৃষ্টি করে ও উক্ত তরঙ্গ উভয়ের মাঝে আলোকোজ্জ্বল রশ্মি ছড়াতে থাকে। এক্ষেত্রে যদি ইমাম সাহেবের বিজলী শক্তিশালী ও মজবুত হয়, তা হলে সেটি মুক্তাদীদের মাঝে প্রতিফলিত হয়। আর যদি মুক্তাদীদের তরঙ্গশক্তি প্রবল হয়, তা হলে সেটি ইমাম সাহেবের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে।

আধ্যাত্মিক চিকিৎসক লেডবীর লিখেছেন, প্রতিটি শব্দ এক একটি ইউনিট যার থেকে প্রবল আলোক রশ্মি নির্গত হয় যেটি ইতিবাচক ও নেতিবাচক হয়ে থাকে। কুরআন থেকে নির্গত শব্দ ইতিবাচক। মুক্তাদীদের উপর যখন এর প্রভাব পড়বে, তখন তাদের রোগ দূর হয়ে যাবে। গবেষণা করে দেখা গিয়েছে, রক্তের লোহিত কণিকা একপ্রকার অদৃশ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে নষ্ট হতে থাকে এবং এতে একপর্যায়ে ব্লাড ক্যান্সারের উদ্ভব ঘটে। আর নামাযের মধ্যকার তিলাওয়াতের তরঙ্গ এ রোগ থেকে নিরাপত্তা দান করে। বর্তমানে আভ্যন্তরীণ ব্যাধিসমূহ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। এ রোগ থেকে একমাত্র নিজের মধ্যে উক্ত তরঙ্গ সৃষ্টি করে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

রক্তের নিম্নচাপ, অস্থিরতা ও এ ধরনের রোগ-ব্যাধি নামাযের মাধ্যমে ভালো হয়ে যায়। যদি ধ্যান খেয়াল ও একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করা হত, তা হলে এ ধরনের ব্যাধি সমূলে ধ্বংস হয়ে যেত। সাধারণ নামাযীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, আস্তে আস্তে তাদের চিন্তাধারা আত্মহত্যা থেকে ফিরে এসে একসময় পরিপূর্ণভাবে ঠিক হয়ে যায়।

## নামাযের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে পা ফাঁক করে রাখা

শরী'আত নামাযের মধ্যে যেভাবে পা ফাঁক করে দাঁড়াতে আদেশ রয়েছে নামাযী ব্যক্তি যদি তার চেয়ে কম পরিমাণে পা ফাঁক করে দাঁড়ায় তাহলে শারীরিক দিক দিয়ে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। পা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সঙ্কীর্ণ করে রাখলে বেশি ক্ষতি হয় শিরা ও মাংসপেশীর। তাছাড়া এতে শরীরের নিম্নভাগ দুর্বল হয়ে যায়। উপরন্তু এতে অণ্ডকোষেরও প্রচুর ক্ষতি হয়। বহিরাংশের চামড়া আক্রান্ত হয়ে পানিজমা ব্যাধির সৃষ্টি হয় আর ভিতরের দিকে দাগ পড়ে যায়, যাতে প্রজনন ক্ষমতা প্রভাবান্বিত হয়ে তা বিনষ্ট হয়ে যায়।

এমনিভাবে যদি পা অধিক পরিমাণে ফাঁক করে রাখা হয় তখনও অণ্ডকোষের ক্ষতি হয়। এতে শরীরের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। এ ধরনের লোকের চালচলন নড়বড়ে এবং দেহ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। পায়ের জোড়ার উপরও এর প্রভাব পড়ে। ফলে পায়ের গোঁড়ালী ও পৃষ্ঠে চাপ বেড়ে যায়। এ কারণে পায়ের জোড়ার স্বাভাবিক আকৃতির পরিবর্তন হয় এবং গোঁড়ালীর সংযোগস্থলের মোড় ঘুরে যায়।

## মহিলাদের নামাযের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

মহিলাদের জন্য শরীঅতের নির্দেশ হল, তারা সিজদায় হাতের কনুইসমূহকে ছড়িয়ে রাখবে না বরং কনুই শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখবে। এমন করার দ্বারা মহিলাদের স্নায়ু, দুধ সৃষ্টিকারী মাংসপেশী, বক্ষ, স্নায়ু ও মেয়েলী সৌন্দর্যের উপর গভীর প্রভাব পড়ে।

একই অবস্থা সিজদায় উরুদ্বয়কে পৃথক না করার বেলায়। কেননা মহিলারা যদি শরঈ হুকুম মোতাবেক সিজদা করে, তাহলে তারা অগণিত মেয়েলী রোগ থেকে রক্ষা পায়; নতুবা এমন গোপন মেয়েলী রোগ সৃষ্টি হয়, যা জীবনকে আশঙ্কার দিকে ঠেলে দেয়।

# তারাবীহ্ নামায ও আধুনিক বিজ্ঞান

রমাযানুল মোবারক মাস ও তার আমল এর প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকালে একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তাতে তারাবীহ্ নামাযের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ইফতারের সময় হরেক রকমের খাবার সামনে উপস্থিত থাকে। আর এ স্বভাবজাত লোভী মানুষ আহার গ্রহণের সময় এদিকে খেয়াল রাখে না যে, সারাদিন পাকস্থলী খালি ছিল, এখন যদি অধিক খাবার এক সাথে গ্রহণ করে ফেলে, তখন তার অবস্থা কি হতে পারে। অথচ এ বে-খবর মানুষ নিজের উপর একের পর এক জুলুম করেই চলেছে।

মহান রাব্বুল আলামীন হলেন মানুষের পরম বন্ধু আবার ডাক্তার। তার চিকিৎসার ধরন বিভিন্ন প্রকারের ও অন্য সকলের থেকে পৃথক। তিনি মানুষের পাকস্থলীর চিকিৎসা এভাবেই করেছেন যে, তাদেরকে ইশার নামাযের পর এমন ব্যায়াম দিয়েছেন, যাতে সেই ক্ষতিকর প্রভাবগুলি দূর হয়ে যায় এবং তারা পূর্বের মতো হাসি-খুশী ও উৎফুল্ল চিত্তে ঘরে ফিরে।

তারাবীহের নামায না হলে সাহরী খাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ত। আর খেতে পারলেও অসংখ্য রোগ-ব্যাধি এসে শরীরে বাসা বাঁধত। তারাবীহ্‌র নামায না হলে মানুষ খাওয়ার পর শুয়ে পড়ত। ফলে নিম্নোক্ত ব্যাধিসমূহ সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা ছিল: হৃদরোগ ও সঙ্কীর্ণতা, হৃদকম্পন বৃদ্ধি ও উচ্চ রক্তচাপ, হৃদকম্পন হ্রাস ও নিম্ন রক্তচাপ, পাকস্থলীতে গ্যাস সৃষ্টি, মাথা ঘোরা ও বমি বমি ভাব, দাঁতের মাড়ীর রোগ বিশেষত পাইওরিয়া, শ্লৈষ্মিক আর্দ্রতা ও স্থায়ী সর্দি, কাশি, দৈহিক অবসন্নতা ও শুষ্কতা, ডাইরিয়া, অতিসার ইত্যাদি।

আপনি একটু উপরিউক্ত মারাত্মক রোগগুলির প্রতি গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন, তা হলে বুঝতে পারবেন, একটি মাত্র সুন্নত তারাবীহ্ নামায দ্বারা আমরা কতগুলি মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছি।

তারাবীহ্ হল একপ্রকার হালকা ব্যায়াম, যা আদায়ের পর মনে আসে প্রশান্তি আর আরামের ঘুম। ঘুম হয় না এমন রোগীর জন্য তারাবীহ্ নামায একটি মহৌষধ স্বরূপ। আর স্বপ্নদোষের রোগীদের জন্য তারাবীহ্ এক অতি কার্যকরী ঔষধ। জনৈক ফার্মাসিস্ট বলেন– তারাবীহ্ নামাযের দ্বারা যৌনরোগ নিঃশেষ হয়, স্নায়ুবিক আকর্ষণ ও তাপ হ্রাস পায়। উরু ও

পায়ের গোছার অস্থি-মজ্জা (Muscles) মজবুত হয়, পাকস্থলীর সমস্যা ও হৃদরোগ হ্রাস পায়। যেহেতু পবিত্র রমাযান মাসে সন্ধ্যার পর শরীরে চলে আসে অবসন্নতা। আর তার সর্বোত্তম চিকিৎসাই হল তারাবীর নামায।

## খাদ্য গ্রহণ ও আধুনিক বিজ্ঞান

(MEAL AND MODERN SCIENCE)

### খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

শরীরের জন্য খাবার প্রয়োজন। তাই সকলেই খাবার গ্রহণ করে। খাবার যদি স্বাস্থ্যরক্ষার মূলনীতি অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়, তাহলে তো স্বাস্থ্য সুস্থতার অধিকারী হবে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হল, এ খাবারই আল্লাহর হুকুম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর তরীকা অনুযায়ী গ্রহণ করলে তা হবে সুন্নত ও বিজ্ঞান সম্মত।

খাদ্য বিশেষজ্ঞগণের ঐকমত্যে ৮০% রোগব্যাধি খাবারের কারণেই হয়ে থাকে। বর্তমানে ইউরোপীয়গণ গভীরভাবে গবেষণা করছেন যে, মানুষের দেহে কি ধরনের খাবার প্রয়োজন, মানুষ কি খাবে আর কি খাবে না বরং একটি খাবারের উপর বিশেষজ্ঞগণ ডক্টরেট (পি.এইচ.ডি.) পর্যন্ত করেছেন। জনৈক ব্যক্তি যবের উপর ডক্টরেট করেছেন। তার বিষয় ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে যবের রুটি আহার করতেন, তার কী উপকারিতা?

### ওয়াশিংটনের ডাইরেক্টর ও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

জনৈক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলেন : একবার ওয়াশিংটনে মিটিং ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিল আমেরিকার তিনজন বড় কোম্পানীর ডাইরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার। আমরা সকলে একই টেবিলে আহার করছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, আমরা মুসলমানরা হাত দিয়ে খানা শুরু করার সাথে সাথে তারাও হাত দিয়ে খানা শুরু করে দিল। কাঁটা চামচ পড়ে রইল একপার্শ্বে। এ দেখে আমি খুব বিস্মিত হলাম।

এটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ (ভি.আই.পি.) ব্যক্তিদের মিটিং। তারাও চেয়ারে বসে হাত দ্বারা খাবার গ্রহণ করছেন, রুটি ছিড়ছেন আর গোশতের টুকরা

দাঁত দিয়ে টেনে টেনে খাচ্ছেন। আমি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কাটা চামচ ব্যবহার করছেন না কেন? একথা শুনে তিনি বললেন, হাত দ্বারা খাবার গ্রহণ করা আমাদের নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়। আরও একজনকে তাকিয়ে দেখলাম, সেও এভাবে খাবার খাচ্ছে। তৃতীয় একজনকে দেখলাম সেও এভাবে খাবার খাচ্ছে। আমি বিস্মিত হলাম। এমনকি আমার জন্য নিজের খাবার গ্রহনই দুষ্কর হয়ে পড়ল। সর্বপ্রথম আজই আমি দেখলাম, তারা কাঁটা চামচ বাদ দিয়ে খানা খাচ্ছে। খাবার পর্ব সমাপ্তির পর দেখতে পেলাম সকলের আশেপাশে পেপার রাখা আছে, আমি তাদেরকে হাত পরিষ্কার করার জন্য পেপারটা এগিয়ে দিলাম।

কিন্তু তারা এর দ্বারা হাত পরিষ্কার না করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আঙ্গুলগুলি চেটে খেয়ে নিল। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনারা এ নিয়ম কোত্থেকে শিখলেন? (Where you learnt it) প্রশ্ন শুনে তিনি উত্তরে বললেন, এটা আমেরিকান বিজ্ঞানীদের রিসার্চ যে, যখন হাত দ্বারা খাওয়া হয়, তখন আঙ্গুলের লোমকূপ থেকে যে Plama বিশেষভাবে বের হয়, সেগুলিকে যদি মাইক্রোস্কোপ (Microscope) দ্বারা দেখা হয়, তাহলে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হবে। তিনি বলেন, এখন আমরা কাটা চামচের স্থলে হাত দ্বারা খাওয়াটাই বেশি পছন্দ করি।

## আহারের পূর্বে হাত ধৌত করা

আহারের পূর্বে হাত ধৌত করা ইসলামি জীবনের দৈনন্দিন কর্ম পদ্ধতি। মানুষের হাত কোথায় কোথায় লাগে তার ইয়ত্তা নেই। যেহেতু হাতের উপর জীবাণু লেগে থাকে এজন্যই শরী'আতের নির্দেশ হল হাতকে পানি দ্বারা ধৌত করা।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় হুকুম হল ধোয়ার পর কাপড় দ্বারা পরিষ্কার করবে না বরং প্রথমে পায়ে মুছে নিবে। কেননা কাপড়ে জীবাণু লেগে থাকতে পারে তা আবার হাতে লেগে যাবে।

জনৈক ট্রাক ড্রাইভার খাবারের জন্য একটি হোটেলের নিকট তার ট্রাকটা দাঁড় করিয়ে নিচে নেমে এসে প্রথমে সে গাড়ীর টায়ার চেক করল। তারপর গিয়ে খাবার খেল। খাবার খাওয়ার সাথে সাথেই সে মৃত্যুর কোলে ... । অথচ সেই হোটেলে আরও লোকজন অহরহ খানা খেয়ে

চলেছে তাদের কিছুই হয় নি। অনেক চিন্তা-গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানোর পর জানা গেল যে, মৃত ড্রাইভার টায়ার চেক করার জন্য তাতে হাত লাগায়। টায়ারে একটি বিষাক্ত সাপ পিষ্ট হয়ে তার তাজা বিষ টায়ারের সাথে লেগে ছিল। সেই বিষ হাতে লেগে গেল এবং হাত না ধোয়ার ফলে তা খাবার দ্রব্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল।

## আহারের পূর্বে ও পরে লবণ মুখে দেওয়া

আহারের পূর্বে সামান্য লবণ মুখে দেওয়া হয়। কেননা লবণের (Salt) মধ্যে রয়েছে খানার চাহিদা বৃদ্ধি করার উপকরণ। আর লবণ চাটার সাথে সাথেই লালা সৃষ্টিকারী মাংসপেশী হজমকারী অম্লকে বের করতে থাকে, যার কারণে খাওয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, খাবার সুস্বাদু মনে হয়, ক্ষুধা মিটে যায় এবং আল্লাহর নেয়ামতের মূল্যায়ণ করা সম্ভব হয়। খাবারের শেষে যেহেতু জিহবা, গলা ও খাদ্য নালীতে খাদ্যদ্রব্য, ঘৃত ও অন্যান্য তৈলাক্ত খাবার লেগে থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই লবণ দিয়ে সেগুলিকে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়।

## আহারের পূর্বে কুলী করা

আহারের পূর্বে কুলি করা ইসলামী বিধান। সারাদিন হাওয়া ও শ্বাস-প্রশ্বাস এর মাধ্যমে ধুলা, বালি এবং রোগ-জীবাণু (Germs) ভিতরে প্রবেশ করে। এ অবস্থায় খাবারের লোকমা গ্রহণ করার সময় ঐ জীবাণুগুলিও ভিতরে প্রবেশ করে, এ জন্যই কুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে মুখ পরিষ্কার হয়ে যায়।

## আহারের সময় ডান হাত ব্যবহার করা

নামাযের অধ্যায়ে এ কথা বলা হয়েছে যে, ডান এবং বাম হাতের তালু থেকে কিছু অদৃশ্য আলোক রশ্মি (Invisible Rays) বিচ্ছুরিত হয়। তবে ডান হাতের রশ্মি পজিটিভ বা ইতিবাচক আর বাম হাতের রশ্মিগুলি নেগেটিভ বা নেতিবাচক এবং ডান হাতের রশ্মিগুলিতে রয়েছে শেফা বা রোগমুক্তি আর বাম হাতের রশ্মিতে রয়েছে রোগ ব্যাধি। সুতরাং ডান হাতে খানা খাওয়া দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে, পক্ষান্তরে বাম হাতে খানা খাওয়া দেহে বিভিন্ন রোগ জন্মানোর কারণ হয়।

## খাবারে ফুঁক দেওয়া

মানুষ অক্সিজেন গ্রহণ করে, আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। কার্বণ ডাই-অক্সাইডে রয়েছে অসংখ্য রোগ জীবাণু। তাই যদি খাবারে ফুঁক দেওয়া হয়, তাহলে রোগজীবাণু খাবারে মিশ্রিত হয়ে খাবার বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া কখনো সম্মিলিত খাবারে যদি ফুঁক দেওয়া হয় আর সেই ফুঁকের কারণে রোগজীবাণু পূর্ণ খাবারের সাথে মিশ্রিত হয়ে পড়ে, তা হলে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কারণেই ফুঁক দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

## একত্রে খাওয়া-উচ্ছিষ্ট খাওয়া

প্যাথলজী (Pathology) এর প্রফেসর এ রহস্য উদঘাটন করেছেন যে, যদি সকলে একত্রে খাবার খায়, তা হলে সকল খাবার গ্রহণকারীদের জীবাণু খাবারে মিলিত হয়ে যায়, যা অন্য সকল রোগ-জীবাণুকে নিঃশেষ করে দেয়, এভাবে ওই খাবার দূষণমুক্ত হয়ে যায়। আবার কখনো খাবারে রোগ আরোগ্যের জীবাণু মিলিত হয়ে সমগ্র খাবারকে প্রতিষেধক বানিয়ে দেয়, যা পাকস্থলীর রোগের জন্য খুবই উপকারী।

একবার মিষ্টভাষী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এক ব্যাক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি বলেন যে, আমি একসময় পাগল ছিলাম এবং দীর্ঘ দিন মেটাল হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম, এই বলে তিনি সেই হাসপাতালের ফর্ম আমাকে দেখালেন। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আপনি সুস্থ্য হলেন কিভাবে? তিনি বললেন, পরিবারের লোকজন চিকিৎসা করাতে করাতে যখন অস্থির হয়ে উঠল, তখন আমাকে নিয়ে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়।

একদা আমি সেই হাসপাতালে স্বজ্ঞানে বসেছিলাম । এমন সময় একজন লোক কথা প্রসঙ্গে বলল, মুসলমানদের উচ্ছিষ্টে রোগমুক্তি রয়েছে। তার কথা শ্রবণ করে সেদিন থেকে আমি মানুষের খাবারের উচ্ছিষ্ট সুন্নত মনে করে খেতে থাকি। মাত্র ৭ মাসে আমি পূর্ণ আরোগ্য লাভ করি।

গুজরান ওয়ালা এলাকার অন্য এক ব্যক্তির সাথে একবার সাক্ষাৎ হল। তিনি ছিলেন জটিল হৃদরোগে আক্রান্ত। তিনি বলেন, যখন থেকে আমি সুন্নত মনে করে ঝুটা খাওয়া আরম্ভ করেছি। তখন থেকে অদ্যাবধি

এক ব্যক্তি বলছিলেন, আমার এক বন্ধু ছিল। ১৯৭০ সনের শেষের দিকে সে টিবি রোগে আক্রান্ত হয়। সে চিকিৎসা গ্রহণ করতে করতে অস্থির হয়ে পড়ল অথচ আরোগ্য লাভ হল না। অবশেষে কারো কাছে শুনে ঔষধ পথ্য ত্যাগ করে মুসলমানদের উচ্ছিষ্ট খেতে শুরু করে দিল। এরপর মাত্র চার মাসের মধ্যে সে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করল। ১৯৯৬ সনে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে দেখলাম সে পূর্ণ সুস্থ।

## খানা খাওয়ার পদ্ধতি

(WAYS OF HAVING MEAL)

হাদীস শরীফে খাবারের তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যথা :

### (১) উভয় হাঁটু উঠিয়ে বসা

এ পদ্ধতিতে বসে খাবার খেলে পরিমিত খাবারই মানুষের পেটে প্রবেশ করতে পারে, অতিরিক্ত খাবার প্রবেশ করতে পারে না। আর যত কম খাবার পাকস্থলীতে প্রবেশ করানো যায়, ততই রোগ-ব্যাধি কম হবে।

### (২) এক হাঁটু উঠিয়ে বসা

এ পদ্ধতিতে বসে খাবার খেলে পরিমাণের চেয়ে কিছু বেশি খাবার গ্রহণ করা যায়। এ পদ্ধতিতে বসে আহারকারী ব্যক্তি প্লীহা রোগ (Spllen) থেকে মুক্ত থাকে এবং তার উরুর মাংসপেশী মজবুত ও দৃঢ় হয়।

### (৩) দুই হাঁটু গেড়ে বসা

এ পদ্ধতিতে খাবার কিছু বেশিই খাওয়া যায়। এ পদ্ধতি শুধু ওই সমস্ত লোকদের জন্য প্রযোজ্য, যারা কঠোর পরিশ্রমী, পায়ে হেঁটে চলেন বা নিয়মিত ব্যায়াম করেন। চেয়ারে ও গাড়ীতে উপবিষ্ট লোকদের জন্য এ পদ্ধতিতে খাবার গ্রহণ রোগ-ব্যাধির প্রধান কারণ। আর প্রথম পদ্ধতিতে বসে খেলে কখনো রোগ-ব্যাধি হবে না ইনশাআল্লাহ।

## কোরিয়ার খানার টেবিলে

আমি একবার কোরিয়া ভ্রমণে গিয়ে সেখানকার কিছু লোককে দুই হাঁটু উঠিয়ে, এক পা উঠিয়ে ও দুই পা গেড়ে বসে খানা খেতে দেখলাম। এমন কি চেয়ারে বসে আহারকারীগণও এ পদ্ধতি অবলম্বন করে খানা খাচ্ছে।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম– আপনারা এ পদ্ধতি কিভাবে গ্রহণ করলেন? তারা বললেন, বর্তমান যুগে মোটা হয়ে যাওয়া একটা জীবন

নাশক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। গবেষণা দ্বারা জানা গেছে, এ ধ্বংসাত্মক রোগ থেকে মুক্তির পথ এটাই। এ সংক্রান্ত সকল চিকিৎসা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে বরং তা এ রোগকে আরও বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি করে থাকে। আধুনিক গবেষণা আমাদেরকে এ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। এখন থেকে আমরা এ পদ্ধতির প্রচারণায় বই লিখে সারা বিশ্বে বণ্টন করে দিব।

যখন আমি তাদেরকে বললাম : এ পদ্ধতি তো আজ থেকে শত শত বৎসর পূর্বে ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। এ কথা শুনে তারা বিস্মিত হয়ে বলল, তা হলে আপনারা আমাদেরকে কেন তা শিক্ষা দেন নি? আমি এক ইংরেজকে দেখলাম, দুই হাঁটু উঠিয়ে বসে খানা খাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এভাবে বসে খানা খাচ্ছেন কেন? তক্ষুনি সে পেটের উপর হাত রেখে বলল, এর জন্য। (চশমেদীদ ওয়াকেআত ঃ ১০৬)

## খানা চিবিয়ে খাওয়া

হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে উলামায়ে কিরাম খানা চিবিয়ে খাওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আধুনিক গবেষণা (Modern Research) এ কথার সত্যতা স্বীকার করেছে যে, যারা খানা কম চিবিয়ে খায় তাদের দাঁত দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। আর এক পাশ দিয়ে চিবালে অন্য দিকের দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। তাই উভয় পাশের দাঁত দ্বারা খানা চিবিয়ে খেতে হবে। খাবার না চিবিয়ে পাকস্থলীতে পৌছে দিলে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে দাঁতের উপর। যার ফলে পেট ফুলে যাওয়া, (Stomach Inflamation) এবং পেটে গ্যাস হওয়া (Stomach Acidity) ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

মোটকথা, আমরা যদি আমাদের হজম প্রক্রিয়া (Digestive System) সুস্থ রাখতে চাই, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই চিবানোর সুন্নতকে চালু করা দরকার।

## প্লেট পরিষ্কার করা

খানা খাবারের পর ওই প্লেটকে পরিষ্কার করে খাওয়া উচিত। সাহাবায়ে কিরামগণ বলেন, অনেক প্লেটের মধ্যে হুযুরের প্লেট সনাক্ত করা যেত, কেননা তা হত সবচেয়ে বেশি পরিচ্ছন্ন। আর প্লেটে পরিষ্কার করার পদ্ধতি হল আঙ্গুল দ্বারা।

আধুনিক বিজ্ঞানের (Modern Science) গবেষণা মতে, খানার প্লেটের তলানীতে থাকে ভিটামিন (Vitamin) আর প্লেট লেগে থাকা খাবারের অংশে থাকে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স (Vitamin B Complex) আর তার মধ্যে থাকে এমন খাদ্যের উপাদান যা পূর্ণ খাবারের মধ্যে থাকে না। খাবারের মধ্যে বিদ্যমান খনিজ লবণ (Mineral Salts) তো শুধু সে অংশেই থাকে।

## ঠেস দিয়ে বসে খাওয়া উচিত নয়

ইসলাম হেলান দিয়ে বসে খানা খেতে নিষেধ করেছে। কেননা ঠেস দিয়ে বসে খাদ্য গ্রহণের মধ্যে তিনটি অপকারিতা রয়েছে ঃ

১। সঠিকভাবে খাবার চিবানো যায় না। ফলে যে পরিমাণ লালা খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হওয়ার কথা ছিল, তা হয় না। যার কারণে পাকস্থলীতে মাড় বিশিষ্ট খাবার (Carbohydrates) হজম হয় না, ফলে হজম প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২। ঠেস দিয়ে বসলে পাকস্থলী প্রশস্ত হয়ে যায়। যার ফলে অপ্রয়োজনীয় খাবার পেটে চলে যাবে এবং হজম প্রক্রিয়াতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে।

৩। ঠেস দিয়ে খাবারের ফলে অন্ত্র এবং যকৃতের (Liver) কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এ কথা অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত।

## খানার সময় আঙ্গুল চালনায় সতর্কতা

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, খানার মধ্যে আঙ্গুল চালনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। খাবারের মধ্যে আঙ্গুল রাখার সময় পূর্ণ আঙ্গুল খানার মধ্যে ডুবিয়ে দিবে না। (উসওয়াহ)

বস্তুত খাবারের পর আঙ্গুল চেটে খাওয়া জরুরি। খানার পর যদি আঙ্গুল চেটে না খাওয়া হয়, তাহলে এ উপকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে। তাছাড়া গোড়া পর্যন্ত আঙ্গুল চেটে খাওয়া সম্ভব নয়। তদুপরি কখনো আঙ্গুলের গোঁড়ায় ও দুই আঙ্গুলের গোঁড়ায় ও দুই আঙ্গুলের মধ্যে জীবাণু লেগে থাকে। তাই যদি কেউ সম্পূর্ণ আঙ্গুল খাবারের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়, তাহলে খাবারের সাথে রোগ জীবাণু মিলিত হয়ে যায়।

### বাদশাহ হারুনুর রশীদের শিক্ষণীয় ঘটনা

বাদশাহ হারুনুর রশীদ একবার চারজন অভিজ্ঞ ডাক্তারকে একত্রিত করলেন। তন্মধ্যে একজন ছিল হিন্দুস্তানী, দ্বিতীয় জন রোমীয় (ইংরেজী), তৃতীয়জন ইরাকী এবং চুতর্থজন সওয়াদী। তারপর চারজনকেই সম্বোধন করে বললেন, আপনারা এমন একটি ঔষধের নাম বলুন, যা কোনো কিছুর জন্যই ক্ষতিকর নয়। হিন্দুস্থানী ডাক্তার বলল, আমার মতে সেই জিনিস হল হালীলাহ সিয়াহ বা কাল হালীলাহ। ইরাকী ডাক্তার বলল, আমার মতে সেই জিনিস হল হুববুর রালাদ। রোমীয় ডাক্তার বলল, যে ঔষধ কোনো কিছুর জন্যই ক্ষতিকর নয়, তা হল গরম পানি।

সর্বশেষে সওয়াদী ডাক্তারের পালা এলে সে বলল, উপরিউক্ত সকল মন্তব্য ভুল। কেননা কাল হালীলাহ পাকস্থলীতে ক্ষত সৃষ্টি করে আর গরম পানি পাকস্থলীকে করে দেয় শিথিল। তারপর সকল হাকীম মিলে বলল, তা হলে এবার আপনি বলুন, যে ঔষধটা কোনো কিছুর জন্যই ক্ষতিকর নয়? তখন সওয়াদী হাকীম বলল, তা হল অধিক আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত আহার না করা এবং খানার কিছু চাহিদা থাকা অবস্থায় খানা ত্যাগ করা। এ কথার উপর সকল ডাক্তারই একমত পোষণ করেন।

## খাদ্য গ্রহণে সাবধানতা ও আধুনিক বিজ্ঞান

### আধুনিক বিজ্ঞান
(MODERN SCIENCE)

বর্তমানে বারবার জোর দিয়ে বলা হচ্ছে, কম আহার করুন। (Dictiny) বেশিদিন বাঁচতে পারবেন। মানুষের কাছে বারবার এ কথার উপকারিতা বর্ণনা করা হচ্ছে। বেশি খেলে যেসব রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়, তার একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন প্রফেসর রিচার বার্ড। নিম্নে তা দেওয়া হল :

(১) মস্তিষ্কের ব্যাধি (Brain Diseases);

(২) চক্ষু রোগ (Eyes Diseases)

(৩) জিহবা ও গলার রোগ (E.N.T. Diseases)

(৪) বক্ষ ও ফুসফুসের ব্যাধি (Chest and Lungs Diseases)

(৫) হৃদ রোগ (Heart and Valves Diseases);

(৬) যকৃত ও পিত্তের রোগ (Liver and Gall bladder diseases);

(৭) ডায়াবেটিস ( Diabetec)

(৮) উচ্চ রক্তচাপ (High Blood Pressure);

(৯) মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ ((Brain Hemorrhage);

(১০) দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা (Depression)

(১১) অর্ধাঙ্গ রোগ (Paraliysis)

(১২) মনস্তাত্ত্বিক রোগ (Psychological Diseases)

১৩) দেহের নিম্নাংশ অবশ হয়ে যাওয়া। (সান উইকলি সুইডেন)

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এ লিস্ট প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর লিস্ট, যা প্রফেসর সাহেব গভীর চিন্তা ও গবেষণার পর প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অপর দিকে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বর্ণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

## পেটের এক-তৃতীয়াংশ ও আধুনিক বিজ্ঞান

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য আর এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য। (মযাকুল আরেফীন)

একজন দার্শনিকের নিকট যখন হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশ শুনানো হল তখন সে বলতে লাগল, এর চেয়ে উত্তম ও শক্তিশালী কথা আমি আজ পর্যন্ত শ্রবণ করি নি।

### ডা. ব্লান কিউবের দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে খাদ্য গ্রহণ

তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ খাদ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। তার আন্দোলনের মূলনীতি হল, তোমরা স্বল্প পরিমাণে আহার কর। দাঁড়িয়ে খাবার খেও না, বসে খাবার খাও এবং কম খাবার খাও। কেননা দাঁড়িয়ে খাবার খেলে মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে এবং এমন একটি রোগ সৃষ্টি হবে, যদ্বারা মানুষের পরিচিতি নিঃশেষ হয়ে যায়। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে

সূচনা লগ্ন থেকেই দাঁড়িয়ে খাবার খেতে নিষেধ করেছে। আর বিজ্ঞান সবেমাত্র নিষেধাজ্ঞা শুরু করেছে। তাহলে ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট।

## স্লিমিং সেন্টার ও ইমাম গাযালী রহ.

প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাযালী রহ. বলেন, ধীরে ধীরে কম খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি অধিক খাওয়ায় অভ্যস্থ হয়ে পড়ে, সে যদি হঠাৎ করে খাবার কমিয়ে দেয়, তা হলে তা তার সহ্য হবে না দুর্বলতা সৃষ্টি হবে এবং কষ্ট বৃদ্ধি পাবে। (ইয়াইইয়াউল উলূম)

আজ থেকে দশ বৎসর পূর্বে ইউরোপে বিশেষ কেমিক্যাল দ্বারা মোটা হওয়া রোগের ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। তারপর ধরা পড়েছে, সেই কেমিক্যাল দ্বারা কিডনি নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ আনুসন্ধান চালিয়ে এর খাদ্য নিয়ন্ত্রণ জাতীয় চিকিৎসা নির্ধারণ করেছেন এবং রোগীকে কিছু পথ্য, ব্যায়াম এবং বিশেষ করে খাদ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ করানো হয়েছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত খাবারের উপর সতকর্তা অবলম্বন করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মোটা হয়ে যাওয়া রোগের কোনো চিকিৎসা হবে না। ময়দা, ঘৃত ও মিষ্ট জাতীয় দ্রব্য এ তিন প্রকার জিনিস থেকে সংযমী হওয়া উচিৎ এবং সাথে সাথে খাবার কম খাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। খাদ্য দ্রব্যের সিডিউলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ছিল, খাবার ধীরে ধীরে হ্রাস করতে হবে আর যদি তৎক্ষণাত খাবার হ্রাস করা হয়, তা হলে শরীর নিয়ন্ত্রণহীন, দুর্বল ও রোগ-ব্যাধি ধারণের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়বে। উক্ত সিডিউলে প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ সপ্তাহান্তরে হ্রাস করে দেখানো হয়েছে। (Heath and Life)

## হযরত হাসান বসরী রহ.-এর মতাদর্শ

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন– মুসলমানের দৃষ্টান্ত হল বকরি ছানার মতো, যার জন্য এক মুষ্ঠি পুরাতন খেজুর, এক মুষ্ঠি ছাতু ও এক ঢোক পানিই যথেষ্ট। (ফাযায়েলে সাদাকাত)

এটা হল ইসলামি শিক্ষার একটি দৃষ্টান্ত, যার উপর আমল করে মুসলমানগণ হয়েছেন সফলকাম ও কৃতকার্য। আর আজকের বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব এর প্রচলনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে 'প্রচার-প্রসারের' প্রস্তুতি নিচ্ছে মাত্র। (ফাযায়েলে সাদাকাত)

## খ্রিস্টান মিশনারীগণের খাদ্যের প্রচারণা

খ্রিস্টান মিশনারীগণ বিশিষ্ট ডাক্তারদেরকে নির্বাচন করে ব্যাপক ভিত্তিতে প্রচারণা শুরু করেছে কম খাও, নিজে খাও, অপরকে খাওয়াও, সতর্কতা অবলম্বন করে খাও, বাঁচার জন্য খাও, জীবিকার প্রতি লক্ষ্য রেখে খাও, সমাজকে বাঁচতে দিয়ে নিজে খাও, অপরকে আহার করাও, সামাজিক মানুষ হও, নিজে সুস্থ থাক, অন্যের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখ।

এগুলি বর্তমান যুগের ডাক্তারগণ বলছেন। চিন্তা করুন! এগুলিই কি ইসলামি শিক্ষা নয়?

# উপবাস ও আধুনিক বিজ্ঞান

## উপবাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

উপবাস করা একপ্রকার চিকিৎসা। রোগীদেরকে উপবাস যাপনের মাধ্যমে চিকিৎসা করুন। হাদীস শাস্ত্রবিদগণ একথা বারবার বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম ও স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপবাস করতেন, ফলে রোগ-ব্যাধি খুব কমই তাদেরকে আক্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমান যুগে উদরপূর্তি করে খাওয়াটা হচ্ছে সকল প্রকার রোগের কারণ। অথচ উপবাস যাপনের উপকারিতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

যেরুজালেমের প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ ডা. ইউসুফ খান ছিলেন একজন ইহুদি ধর্ম প্রচারক ও ডাক্তার। তিনি উপবাস যাপন দ্বারা চিকিৎসা করতেন। ডায়াবেটিস (Diabatic) হৃদরোগ (Heart diseases) ইত্যাদির সম্পর্ক হল খাবারের অসংযমিতার ওপর। আধুনিক বিজ্ঞান এবার উপবাসের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত এবং আউলিয়াগণের জীবনী উপবাস যাপনের ঘটনায় পরিপূর্ণ। এতৎসত্ত্বেও তাদের জিহাদ, জ্ঞান চর্চা ও দীন প্রচারের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। আজ আমরা যে বিষয়ে লজ্জাবোধ করছি, আমাদের পূর্বপুরুষগণ তা কাজে পরিণত করে ইহকাল ও পরকালে ইয্যত ও সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ওই সমস্ত বিষয়গুলিকেই অমুসলিমরা গ্রহণ করে উপকৃত হয়ে চলেছে। অথচ মুসলমানরা তা হতে হচ্ছে পূর্ণভাবে

বঞ্চিত অর্থাৎ কুরআন ও ইসলামের অস্বীকারকারীরা দীন দ্বারা উপকৃত হচ্ছে আর কুরআন ও ইসলামের ধারক ও বাহকগণ তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

## উপবাস-কারামত

হযরত আ. ওয়াহিদ বিন যায়েদ শপথ করে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ক্ষুধার্ত থাকা ব্যতীত কোনো ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি করেন না। এ আত্মশুদ্ধি দ্বারা সে পানির উপর দিয়ে চলতে ও অতি দ্রুত পথ অতিক্রম করার বিশাল ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর ওয়ালিগণ খানা-পিনা পরিহার করে উপবাসী থেকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতেন। অন্য কথায়, রিযিক ছেড়ে দিয়ে তারা রিযিকের মালিকের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকতেন। সেই উপবাস যাপন দ্বারা তারা আল্লাহর নিকট এত বেশি মর্যাদা অর্জন করেছিলেন, যা বর্তমান জগতের মানুষদের নিকট অবিশ্বাস্য মনে হবে।

মুজাহাদা, সাধনা, (Sacrifices) আত্মত্যাগ এবং প্রবৃত্তির বিরোধিতাই হল নৈকট্যশীলদের আসনে উন্নীত হওয়ার প্রধান সোঁপান। আর সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা হল, ভোগবিলাসিতা পরিত্যাগ করা। এ কারণেই আউলিয়াগণ দরিদ্রতার জীবন গ্রহণ করেছেন। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহান সুন্নতও বটে। এ উপবাস যখন গান্ধীজী পালন করেছিল, তখন হিন্দুরা তার পূজা শুরু করে দিয়েছিল। আর এ উপবাস যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করেছিলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য খন্দক ও বদরে পৌঁছে গিয়েছিল। আর উপবাস যাপন করেই সাহাবায়ে কিরাম বিশ্ব বিজয়ে সক্ষম হয়েছিলেন।

## ইসলামি শিক্ষা সোশ্যালিজম

হযরত সালমান ফারসী রাযি.-কে কেউ বলল, দুনিয়ার কোষাগার তো আপনার নিয়ন্ত্রণে, তথাপি আপনি অনাহারে থাকেন কেন? তিনি বললেন, নিজের উদরপূর্তি করে ক্ষুধার্তদের কথা যেন ভুলে না যাই, এ জন্য ক্ষুধার্ত থাকি। তাছাড়া ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকলে কিয়ামতের দিনের ভুক-পিয়াসের স্মরণও জাগরিত হয় এবং আল্লাহর শাস্তির ভয়ও সৃষ্টি হয়। ইসলাম ন্যায়-নিষ্ঠা ও শান্তির ধর্ম। দুঃখী জনের সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন এবং লাওয়ারিশদের তত্ত্বাবধান করাই হল ইসলামের মূল লক্ষ্য।

স্ট্যালিন ও লেলিন এর মতবাদকেই সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম বলা হয়। ভাত-কাপড় ও বাসস্থান এটাই তাদের শ্লোগান। উল্লিখিত সমাজপতিগণ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যত পরিশ্রম করেছিল, ইসলাম মাত্র কয়েকটি শব্দের দ্বারা তার পূর্ণ বিশ্লেষণ করে দিয়েছে। "নিজের গৃহের ধোঁয়া দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিও না" (অর্থাৎ খানা পাকানোর সময় খাবারের খোশবু প্রতিবেশীর নাকে পৌঁছলে সে যদি তা খেতে না পায়, তা হলে দুঃখিত ও ব্যথিত হবে)।

"নিজের সন্তানদেরকে এমন কোনো খাবার দিও না, যা নিয়ে সে বাইরে গেলে প্রতিবেশীর বাচ্চারা তা দেখে মনঃক্ষুণ্ন হতে পারে"। তারপরও কি কেউ বলতে পারবে, ইসলামে ন্যায়-নীতি নেই, সমাজ ও সামাজিক জীবনে নেই শান্তি ও নিরাপত্তা? বস্তুত ইসলাম গরীবদেরও দীন আবার আমীরদেরও দীন।

## অতিভোজন ও ইসলামের প্রথম বিদ'আত

✪ হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর ইসলামে সর্বপ্রথম যে বিদআতের প্রচলন হয়েছিল, তা হল, উদরপূর্তি করে খানা খাওয়া। (ফাযায়েলে সাদাকাত)

বস্তুত সাহবায়ে কিরাম রাযী. ও আউলিয়ায়ে কিরাম পেট ভরে খাবার খুব কমই খেয়েছেন। পেট ভরে খানা খেলে রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়।

## প্রফেসার ব্রাউন ও ইসলামী বিশ্ব

প্রফেসর ব্রাউন নিজ Lectures of Prof. Browne গ্রন্থে লিখেছেন, হায়েছ ফালদা আল সাকাফী নামক এক হেকীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই বলে অভিযোগ করল যে, আমার নিকট কোনো রোগী কেন আসে না, এদের কি কোনো রোগ-ব্যাধি হয় না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এরা তখন খাবার খায় যখন তীব্র ক্ষুধা পায় আর ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকতেই খাবার ত্যাগ করে।" তা হলে আমাদের অধিক খাবার খাওয়াকে বিদআত মনে করা কি অন্যায়? অথচ আধুনিক বিজ্ঞান তো প্রতিটি মানুষের জন্য কে কতটুকু খাবার খেতে পারবে তার পরিমাপ নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

# যব ও আধুনিক বিজ্ঞান
## (BARLEY AND MODERN SCIENCE)

### যব খাওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে সাধারণ যবের রুটি খাওয়া হত, আর সেই রুটির শক্তি দ্বারা সাহাবায়ে কিরাম সমগ্র বিশ্বের ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন করেছেন।

আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী যব একপ্রকার বলবর্ধক খাদ্য। এটা পুরাতন আমাশয় রোগ ও কোষ্ট কাঠিন্য নিঃশেষ করে। প্রশান্তি দান করে। দুধের সাথে পাকালে উন্নত মানের বলবর্ধক খাবারে পরিণত হয়। আমেরিকাতে হৃদ রোগীদেরকে শুধু যবের খাদ্য পরিবেশন করা হয় এবং বিয়ার বার্লি নামক বন্ধ কৌটার মধ্যেই সচরাচর পাওয়া যায়।

শিশু রোগ (Children Diseases) বিশেষ করে শিশুদের লিবার (Liver) ফেল হয়ে গেলে তার জন্য যবের খাদ্য খুবই উপকারী। ইফনানে যখন অলিম্পিক খেলা আরম্ভ হত, তখন খেলোয়াড়দের শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ খাবার হিসাবে যবকে নির্বাচন করা হত।

আধুনিক গবেষণা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস অনুযায়ী যবের উপকারিতা অপরিসীম। পাকস্থলী এবং অন্ত্রতে আলসারের রোগীদেরকে সকালের নাস্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জামানায় উন্নত মানের ব্যবস্থাপত্র স্বরূপ তালবীনা প্রদান করা হত (যব পিষিয়ে দুধে পাকিয়ে তাতে মধু মিশ্রিত করলে একে তালবীনা বলা হয়) এতে আলসারের প্রতিটি রোগী ২/৩ মাসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করত।

জনৈক মহিলা যবের খাদ্যে চিন্তারোগ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে অধিক পর্যবেক্ষণের জন্য আমেরিকা চলে গেল। সেখানে তাকে বলা হল যে, পাকস্থলী ও অন্ত্র সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গেছে। অথচ চিকিৎসা দ্বারা এ রোগ ২ বৎসরের কমে সেরে ওঠে না।

প্রস্রাবের সাথে রক্ত ও পুঁজ পড়া রোগীদের জন্য, চাই তা যে কারণেই হোক না কেন, উপযুক্ত চিকিৎসার সাথে সাথে যবের পানি যদি মধুর সাথে মিশ্রণ করে পান করানো যায়, তা হলে এ রোগ পনের দিনের মধ্যে

নিঃশেষ হয়ে যাবে। আবার কখনো এ পদ্ধতি পেটের পাথর বের করার জন্যও খুব কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য যবের দলিয়া থেকে উত্তম কোনো ঔষধ পাওয়া মশকিল হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যবের তালবীনা খাওয়ার নির্দেশ দিতেন।

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলতেন, যার হাতের মুঠোয় আমার জীবন, তার শপথ করে বলছি, এটা তোমাদের পেটের যাবতীয় কলূষতাকে এভাবে দূরীভূত করে, যেভাবে তোমরা তোমাদের মুখ পানি দিয়ে পরিষ্কার করে থাক।

(তিব্বে নববী আওর জাদীদ সাইন্স)

## খাবারের মাঝে আনন্দদায়ক কথাবার্তা

ইসলামি শরী'আতের দৃষ্টিতে খানার সময় দুঃখজনক ও বিষাদময় কথাবার্তা বলা উচিৎ নয়। আধুনিক বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কি বলে, তা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরা হল। প্রখ্যাত ইউরোপিয়ান ডাক্তার কি ফন একজন এক্সরে বিশেষজ্ঞ। তিনি নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখেন যে, এক্সের মাধ্যমে আমি পাকস্থলী, কিডনী এবং অন্ত্রের বিভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, দুঃখ-কষ্ট ও ক্রোধের অবস্থায় হজম শক্তির উপর এমন কিছু স্নায়ুবিক প্রভাব পড়ে যদ্বারা তা অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। আর আনন্দ, উৎফুল্লতা ও খুশীর প্রভাব এমন পড়ে যে, পাকস্থলীর মাংসপেশী ও স্নায়ুসমূহ ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠে। আধুনিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধান অনুযায়ী যারা খাবার গ্রহণের সময় দুঃখিত ও বিষণ্ণতার কথা-বার্তা বলে এবং ক্রোধের শিকার হয়, এমন লোক শীঘ্রই পাকস্থলীর আলসার (stomach ulcer) এবং অন্ত্র শীর্ণতায় (T.B. of Intestines) আক্রান্ত হয়ে পড়বে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথা হল, খানা তখনই খেতে হবে যখন মানুষ দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই সুস্থ থাকবে।

হেকিম জালিনুস বলেন, আনন্দ ও খুশি খাদ্যকে হজম করে এবং শরীরের অঙ্গ গঠনে সহায়তা করে। আর দুঃখ-দুর্দশা খাবারকে শরীরের অঙ্গ গঠনে অসহযোগিতা করে।

## ...ওয়ার পর মুখের উপর হাত মালিশ করা

খাবারের পর তৈলাক্ত হাত মুখ, পায়ের গোছা ইত্যাদিতে মালিশ করে হাত পরিষ্কার করার কথা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেহেতু খাবারের সময় হাতের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের আর্দ্রতা আঙ্গুল থেকে বের হয়, যা দেহের জন্য উপকারি, তাই সেই তৈলাক্ত পদার্থ শরীরের বাহ্যিক অংশে মালিশ করা চর্ম রোগের (Skin Diseases) জন্য খুবই উপকারী।

চামড়ার ভিতরে থাকে একপ্রকার Sebeceous Gland যা হতে বের হয় এক প্রকার Sebom নামীয় আর্দ্র পদার্থ, যা অধিক হারে দেহের পানি নির্গত হওয়া এবং শুষ্ক আবহাওয়া দ্বারা হ্রাস পায়। তাই ইসলামি শরী'অত নির্দেশ দিয়েছে, হাতের উপর লেগে থাকা তৈলাক্ত পদার্থ চেহারা, হাত ও পায়ের উপর মুছে ফেলবে, তাতে উক্ত হ্রাস পাওয়া পদার্থের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে এবং চামড়া ফাটা ও চর্ম খসে যাওয়া রোগ নির্মূল হবে।

এ তৈলাক্ত পদার্থ শরীরে মোছার দ্বারা চামড়া সুন্দর হয়। এমনকি তার প্রভাব শরীরের জোড়ায় জোড়ায়, মাংসপেশী, স্নায়ু (Nerves and Muscles) ইত্যাদির উপর পড়ে। স্নায়ুবিক ব্যথা (Nerves Pain), পেশী টান, (MUscle Strech) জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা ও কোমর (Backache) ব্যথা রাগীদের জন্যও এটা খুবই উপকারী। তাছাড়া আঙ্গুলের করসমূহ হতে জীবাণু আকর্ষণকারী একপ্রকার পদার্থ বের হয়, যা সমস্ত রোগজীবাণুকে নির্মূল করে দেয়। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সেই পদার্থগুলি পাকস্থলীতে প্রবেশ করা একান্ত জরুরী।

## হাত দিয়ে খাওয়া ও আঙ্গুল চাটা

আমার জনৈক আত্মীয় একবার সফর থেকে ফিরে এসে বলতে লাগল- কানাডার শহর টরেন্টোতে এক ব্যক্তি আমার মেহমানদারি করল। আমি হাত দ্বারা খেতে শুরু করলে সে অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। খবার শেষ হলে সে বলল, আপনার হাত আমি চেটে খাব।

আমি শুনে তো হতবাক –এ আবার কেমন কথা! সে বলল, গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, মানুষ যখন খাবার ইচ্ছা করে তখন Pitutary Gland থেকে স্নায়ুবিক প্রভাব সমৃদ্ধ হজমকারী আর্দ্র পদার্থ আঙ্গুলের মাধ্যমে বের হয়ে থাকে। খাদ্যের সাথে যুক্ত হয়ে খাদ্যকে হজম করতে সাহায্য করে এবং

নিম্ন বর্ণিত আর্দ্রতার কারণ হয় : হযমকারী সেই আর্দ্র পদার্থের (Digestive Secretion) প্রভাব আঠাযুক্ত (Carbogydrates) পদার্থের উপর পড়ে। তদুপরি সেই আর্দ্রতার প্রভাব পড়ে এমন আঠাযুক্ত পর্দার্থের উপর যার দ্বারা ডায়াবেটিস রোগীর উপকার সাধিত হয় এবং দেহের ইনসুলিন (Insulin) হ্রাস পায় না। তাছাড়া আঙ্গুল চেটে খাওয়ার দ্বারা সেই হযমকারী আর্দ্রপদার্থ (Disestive Secretion) যা আঙ্গুলের সাথে লেগে থাকে, তার কিছু তো খাবারের সাথে ভেতরে চলে যায় আর অবশিষ্টগুলি আঙ্গুল চেটে খাওয়ার দ্বারা মুখে চলে যায়।

আশ্চার্যজনক Physiology হল, যতই খাবারে স্বাদ অনুভূত হয়, তত ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় আর ওই গতিতেই সেই আর্দ্র পদার্থ অধিক পরিমাণে বের হয়ে খাদ্যের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এবার যদি আঙ্গুল চেটে খাওয়া হয় তাহলে চক্ষু, মস্তিষ্ক ও পাকস্থলীতে এর গভীর প্রভাব পড়ে।

জনৈক ফিজিশিয়ান বলেছেন : আমার গবেষণা অনুযায়ী খাবারের পর আঙ্গুল চাটা হৃদরোগ, পেটের পীড়া ও মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য খুবই উপকারী।

## ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণের গবেষণা ও অভিজ্ঞতা

ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ আমেরিকানদের খাদ্য গ্রহণ করার বিজ্ঞানসম্মত নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেগুলি আমরা গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে তাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যাবতীয় সুন্নত ও আদবসমূহ স্পষ্ট হয়ে যাবে। নিম্নে ইউরোপী বিশেষজ্ঞগণের গবেষণাকর্মের কিছু নমুনা পেশ করা হল :

## খাবারের সঠিক পদ্ধতি

খাদ্য মানবদেহের এমন এক অত্যাবশ্যকীয় বস্তু, যা ব্যতীত মানুষ জীবিত থাকতে পারে না কিন্তু আমরা যা কিছু পানাহার করি তা নিজে নিজেই হজম হয়ে যায় না বরং তাকে হজম করে শরীরের উপযোগী বানাতে এবং গোশত ও চামড়ার আকৃতিতে রূপান্তরিত করতে যথেষ্ট দৈহিক পরিশ্রম করতে হয়। তাই খাদ্য দেহের বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনের বেশি গ্রহণ করলে বা খাদ্য নির্বাচনে এবং বিন্যাসে দেহের প্রয়োজনীয়তার

প্রতি দৃষ্টি না দিলে সেই খাদ্যই দেহকে দুর্বল করে দিয়ে দেহের শত্রুতে পরিণত হয়ে যায়। মানুষ যত রোগেই আক্রান্ত হয় তন্মধ্যে অধিকাংশই খাবারের আধিক্য, বিশৃঙ্খলা, বার বার খাওয়া এবং হজম হওয়ার পূর্বেই পুনরায় খাওয়া –এ সবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া মাত্র।

## খানা কখন খাওয়া উচিৎ

সুস্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য গ্রহণ করার সময়সূচি অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি। সুতরাং দৈনন্দিন খাদ্য গ্রহণের একটি নির্ধারিত সময়সূচি থাকা বাঞ্ছনীয়। নির্ধারিত সময়ে খাদ্য গ্রহণ করার পর দুনিয়ার যত বড় নেয়ামত সামনে আসুক না কেন তা খাওয়া উচিত নয়।

অধিকাংশ লোক খাদ্য গ্রহণের বেলায় সময়সূচির প্রতি লক্ষ্য রাখে না। তারা দুইবার খাদ্য গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে কিছু না কিছু খেতে থাকে। তবে খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, খাদ্যদ্রব্য যতই ভালো, বলবর্ধক ও শক্তিশালী হোক, যদি পরিমাণ ও সময়-সীমার প্রতি লক্ষ্য না করা যায়, তবে শরীরের উপকার তো দূরের কথা বরং উল্টো ক্ষতি হতে পারে। হজমশক্তি ক্লান্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে এবং বিভিন্ন প্রকার মারাত্মক রোগ-ব্যাধি পয়দা হয়ে দেহকে বরবাদ করে দিতে পারে এভাবে খাদ্য গ্রহণ স্বাস্থ্যের উন্নতির মাধ্যম হওয়ার পরিবর্তে তা বিষ স্বরূপ হতে পারে। অতএব স্বাস্থ্য টিকিয়ে রাখার জন্য খাদ্যের পরিমাণ ও সময়সূচির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

জনৈক আরবদেশীয় চিকিৎসক বলেছিলেন, "যখন ক্ষুধা লাগে তখন খাদ্য খাও"। অপর চিকিৎসক বলেছিলেন, "কোনো কোনো সময় অনিয়মিত খাদ্য গ্রহণ এমন ক্ষতিকারক হয় যেমন বিষ ক্ষতিকারক।" সুতরাং যতক্ষণ ক্ষুধা লাগবে না, ততক্ষণ বিন্দু মাত্র খাদ্য গ্রহণ করবে না। অল্প ক্ষুধা থাকলে খাদ্য গ্রহণ করা ত্যাগ করবে।

মানুষের উচিত অসময়ে, অনিয়মিত ও অনির্ধারিত খাদ্য গ্রহণের কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করা। এভাবে খাদ্য গ্রহণ করলে তা পুরোপুরি পরিপাক ও শরীর গঠনে সহায়ক হয় না। পক্ষান্তরে প্রকৃত ক্ষুধা থেকে এমন শক্তি আসে, যদ্বারা ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য সুন্দররূপে পরিপাক হয়ে যায়। ফলে শরীরের ক্ষয় পূরণ হয় এবং রক্ত ও গোস্তের বৃদ্ধি সাধন করে সুন্দর

স্বাস্থ্য গঠিত করে। তাই খাদ্য গ্রহণের সময়সূচি থাকা একান্ত প্রয়োজন। সময়-অসময় খাদ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

## শয়নের পূর্বে খাদ্য গ্রহণ

শয়ন করার পূর্ব মুহূর্তে খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিছানায় শয়ন করতে যাওয়ার পূর্বেই কিছু খাদ্য গ্রহণ করা অথবা রাতের খাদ্য বিলম্বে গ্রহণ করার ফলে, পাকস্থলী শয়ন অবস্থায়ও বিরামহীনভাবে কর্মরত থাকে। এ কারণে শয়নের সময় ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য পূর্ণরূপে পরিপাক হয় না। আরামে নিদ্রা আসে না। অনিচ্ছায় স্বপ্ন দেখতে থাকে। সকালে চোখ খুলতেই শরীর সতেজ-সবল হওয়ার পরিবর্তে দুর্বল ও ক্লান্ত অনুভূত হয়। শয়নের পূর্বে সামান্য দুধ পান করলেও অনুরূপ দেখা দেয়।

প্রকৃত নিয়ম হল, শয়নের পূর্বে পাকস্থলীর কাজ বন্ধ থাকা। আমরা যখন বিশ্রাম গ্রহণ করি, তখন আমাদের পাকস্থলীরও পূর্ণ বিশ্রাম থাকা উচিত। তা না হলে পাকস্থলীর (অতিরিক্ত) কর্ম ব্যস্ততা মন-মস্তিষ্ক ও সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম শক্তিতে বিঘ্ন ঘটাবে। ফলে ঘুমের স্বভাবগত চাহিদা ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। যেসব আরামপ্রিয় লোক বেশি পরিশ্রম করে না, তাদের রাতের খাদ্য বিলম্বে খাওয়া অথবা শয়নের পূর্বে খাওয়ার অভ্যাস করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এমন লোকেরা পরিপাকের ত্রুটি ও পাকস্থলীর দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। ফলে তাদের সুস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন হয়।

রাতে সমস্ত শরীরের সাথে পাকস্থলীর সমস্ত অঙ্গও বিশ্রাম গ্রহণ করতে চায়। এ আরামের সময় পুনরায় তাকে খাদ্যে বোঝাই করে দিলে এবং রাতে ৫/৬ ঘণ্টা পূর্ণ বিশ্রাম দিতে না পারলে তার ফলাফল খারাপই হবে। পাকস্থলী দুর্বল ও পরিপাকে বিঘ্ন ঘটা ছাড়া আর কিছুই হবে না। এজন্য প্রাচীন চিকিৎসাবিদগণ রাত্রে বিলম্বে খাদ্য গ্রহণ করা এবং আধুনিক যুগের প্রথায় ২/১ ঘণ্টা পর পর চা-নাশতা ইত্যাদি খাওয়া নিষেধ করেছেন। দৈহিক চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিকিৎসাবিদ ও পণ্ডিতগণের মতে সন্ধ্যার খাদ্য বিলম্বে গ্রহণ করা বা শয়নের পূর্বে খাওয়া বিষ পান করার ন্যায় এবং তা ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য ও জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।

## খাদ্য গ্রহণের মৌলিক নিয়মাবলী

অধিক খাদ্য ভক্ষণ করা ওই সকল লোকদের জন্য বিপদজনক, যারা স্বভাবগতভাবে কর্মবিমুখ এবং আরামপ্রিয়। এসব লোকদের দরকার কম খাওয়া এবং নিয়মিতভাবে কিছু ব্যায়াম করা। এমন অনেক লোক আছে, যারা আল্লাহর ইচ্ছায় যে স্বাস্থ্য ও যোগ্যতা নিয়ে আসে, সে হিসাবে যতটুকু পরিশ্রম করা দরকার, তার অর্ধেকও করে না।

এ প্রকৃতির লোকদের স্ব স্ব অবস্থা সমীক্ষা করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তারা ক্ষুধাকে দমন করার শক্তি রাখে না। ফলে খাদ্যদ্রব্যে উদর বোঝাই হয়ে যায়। এরপর কাজ-কর্ম করার প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়ে যায়। ভরা পেটে কোন ব্যক্তি তার দক্ষতা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে পারে না।

সুতরাং সারা দিনের মধ্যে তিনবারের অধিক খাদ্য গ্রহণ করবে না। লঘুপাক ব্যতীত হরেক রকম গুরুপাক খাদ্য ভক্ষণ করবে না। ক্ষুধা যতটুকু ততটুকু খাবে। এর অধিক বিন্দুমাত্র খাবে না। প্রত্যহ কিছুক্ষণ ব্যায়াম করবে। তাহলে দেখতে পাবে দেহের দুর্বলতা, মন্দাভাব, ক্ষয়, পরিপাক এবং শারীরিক ও মানসিক সব রকমের জড়তা বিলীন হয়ে শরীরের তেজ ও শক্তি বহুগুণ বেড়ে গেছে।

পক্ষান্তরে যেসব লোকেরা দৈনন্দিন কাজে রাত-দিন, সকাল-সন্ধ্যা কঠোর পরিশ্রম করে তাদের খাদ্যের ব্যাপারে ততটা সচেতন হওয় বেশি জরুরি নয় বরং কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলেই তারা সুস্থ ও সবল থাকতে পারবে। সুতরাং শারীরিক চাহিদার বেশি খাবে না। খাদ্য গ্রহণের সময় ও নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই যথেষ্ট। এসব বিধান পুরোপুরি অনুসরণ করলে স্বাস্থ্য, শক্তি, উদ্যম ও সাহস বৃদ্ধি পাবে।

## পাকস্থলীর দুর্বলতা থেকে বাঁচার উপায়

কঠোর পরিশ্রম অথবা ব্যায়াম করার পর তৎক্ষণাত খাদ্য গ্রহণ করলে দেহের ক্ষতি হবে। কেননা শরীরের উত্তাপ এবং ক্লান্তিময় অবস্থার মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পরিপাকযন্ত্র, মস্তিষ্ক ইত্যাদির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে যায়। এমনিভাবে কঠোর পরিশ্রম, উত্তেজনা ও কর্মব্যস্ততার পরপরই খাদ্য গ্রহণ করলে পরিপাকের দুর্বলতা অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ, ওই মুহূর্তে শরীরের আকর্ষণ থাকে ভিন্ন দিকে এবং অস্থি ও জোড়াসমূহ ভারসাম্য

বজায় রাখতে পারে না। তদ্রূপ ক্ষতি হয় খাদ্যগ্রহণের পরপরই শরীর চর্চা করলে কিংবা কঠিনকাজে লেগে গেলে। কেননা শরীরের কর্মতৎপরতা ও শক্তিসমূহ তখন দুদিকে ব্যস্ত থাকে। পাকস্থলী পরিপাকের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। অতএব খাদ্য গ্রহণ করার একটি স্বাস্থ্যসম্মত বিধান হল শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি ও স্থিরতা। বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী জালিউনুস বলেন, ধীরস্থিরভাবে ও প্রশান্তিতে খাদ্য গ্রহণ করলে তা পরিপাক ও দেহ গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে। পক্ষান্তরে ক্লান্তি-শ্রান্তি ও শোক তাপের মধ্যে খাদ্য ভক্ষণ করলে দেহের বৃদ্ধি সাধন হয় না।

ড. কিনান ইউরোপের একজন এক্সরে বিশেষজ্ঞ। এক্সরে মেশিনের সাহায্যে তিনি পাকস্থলী, যকৃৎ, নাড়িভুঁড়ি, ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন অবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেন যে, রোগ ও শোক-দুঃখের সময় পাকস্থলী ও অবশিষ্ট যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরে চাপ পড়ে। যার ফলে মানুষ অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং বাস্তব ও স্বাস্থ্যসম্মত একটি পাকস্থলীতে ক্লান্তির সময় খাদ্য গ্রহণ করলে, তা জীবন নাশক বিষের মতো ক্রিয়া করবে। তাই খাদ্য গ্রহণ করার সময় হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল থাকা উচিত।

তৈলবিহীন রুটি, পরটা, পুরি ইত্যাদি খাদ্য সহজে পরিপাক হয়। তরি-তরকারি ও শাক-সবজি সাদাসিধাভাবে রান্না না করে ঘি ও কড়া মসলা দ্বারা ভূনা করে কঠিন ও ভারী পাচ্য করে তোলা হয়। কড়া মিষ্টি, ময়দার তৈরি খাদ্যদ্রব্য, জর্দা, পোলাও, ঘিতে ভাজা যাবতীয় দ্রব্য, তৈল জাতীয় দ্রব্য সবই হজমশক্তিকে ক্ষীণ ও দুর্বল করে দেয়। তদ্রূপ কেক, পেষ্ট্রি, চকলেট ইত্যাদি ক্ষতিকারক।

খাদ্য গ্রহণ সমাপ্তির পরে অন্তত আধঘণ্টা কোনো চিন্তামূলক কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। কিন্তু অনেক লোকই খাদ্য গ্রহণের মধ্যে বা খাদ্য গ্রহণের পরপরই অধ্যয়ন শুরু করে দেয়। এতে তাদের মস্তিষ্ক ও হজম শক্তির উপর বিরাট প্রভাব পড়ে।

খাদ্য গ্রহণের মধ্যে পানি বা অন্য কোনো তরল দ্রব্য গ্রহণ করলে পরিপাকশক্তি ক্ষীণ হয় এবং পাকস্থলীতে অধিক সিক্ততার কারণে ভুক্ত খাদদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক হয় না। সুতরাং খাদ্য গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে পিপাসা না লাগলে এমন জিনিস ভক্ষণ না করা শ্রেয়। অধিক লবণ, মসলা,

আচার, চাটনি, মোরব্বা ইত্যাদি পরিপাক ক্রিয়াকে সহায়তা করে না; দুর্বল করে দেয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বসম্মত বিধান হল, আমরা যে জিনিসই খাই না কেন, তার তাপমাত্রা দেহের চাহিদা মোতাবেক হতে হবে। বেশি গরম বা বেশি ঠাণ্ডা হলে হবে না বরং মাঝামাঝি হতে হবে। বরফ, আইসক্রীম, মালাই, বরফের বোতল বা এ জাতীয় যে কোনো ঠাণ্ডা বস্তু দাঁত ও মাঁড়ীর জন্য ক্ষতিকারক। এছাড়া হিমায়িত পানি, বরফ এবং অধিক ঠাণ্ডা জাতীয় জিনিস পাকস্থলীর দুর্বলতার কারণ।

## পাকস্থলীর বিকৃতি ও মানসিক দুর্বলতার কারণ

পাকস্থলীর বিকৃতি যেমন জ্বালাপোড়া, দাস্ত, মোচড়ানো, আমাশয় ইত্যাদির চিকিৎসার সঠিক কারণগুলো ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সাধারণত এসব ব্যাধি খাদ্য স্বল্পতা, অতিভোজন ও সমতা না রেখে খাওয়ার কারণে হয়। তদ্রূপ নেশা ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহারে ক্লান্তি ও দুর্বলতা আসে। এসবের উপযুক্ত চিকিৎসা ও প্রতিকার হল, নিয়মিতভাবে শারীরিক পরিশ্রমের অভ্যাস তৈরি করা এবং সতর্কতা অবলম্বন করা। উল্লেখ্য যে, শুধু ওই সব বাহ্যিক কারণে পাকাশয় নষ্ট হওয়া সর্বদা জরুরি নয় বরং অনেক সময় কোনো লোক হয়তো খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও পাকস্থলীর দুর্বলতা ও বিকৃতির শিকার হতে দেখা যায়।

এমতাবস্থায় যৌক্তিকভাবে এ জাতীয় রোগ-ব্যাধি সতর্কতাজনিত রোগ ব্যাধি থেকে অধিক হবে না। কিন্তু নেহায়েত কমও হবে না। পাকস্থলী নষ্ট হওয়ার যদি মৌলিক কারণ না-ই থাকে, তবে চিকিৎসককে মনে করতে হবে, এর পিছনে কিছু না কিছু মানসিক কারণ কাজ করছে। এমতাবস্থায় চিকিৎসা ও সাবধানতা অবলম্বন করার পরিবর্তে মানসিক তৎপরতা ও মস্তিষ্কের উত্তেজনাকে সমান্তরাল পর্যায়ে আনার চেষ্টা চালাতে হবে। তা না হলে সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় তেমন উপকার হবে না। যেসব মানসিক কারণে পাকস্থলীর রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়, নিচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হল।

রবার্ট নামের একজন লোক ছিল, তার শরীর স্বাস্থ্য বেশ ভালো ছিল। একবার তার খুব ক্ষুধা পেল। সে পাঠ কক্ষ থেকে ঘরের ভিতরে চলে গেল। সেখানে ভালো ভালো খাদ্য রান্না করা ছিল। সেদিন তার দুজন সম্মানিত মেহমানও ছিল। এজন্য তাদের সাথে বসে একত্রে খাদ্য গ্রহণ করায় আরও আনন্দিত হল। সুতরাং ভালো স্বাস্থ্য, যথেষ্ট ক্ষুধা, উত্তম খাদ্য, অন্তরঙ্গ সহচর, মধুর আলাপ –এত কিছুর অপূর্ব সমন্বয়ের স্বাভাবিক চাহিদা ছিল তার পরিপাকের উপর ভালো প্রভাব ফেলা। কিন্তু তা হয় নি। কারণ, খাওয়া শেষ করতে না করতেই একটি শোকপত্র পেল। পত্র পাঠ করতেই তার উচ্ছ্বাস বিলীন হল। মন ভেঙে গেল। কথা বলার শক্তিই যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। চেহারায় দুঃখ ও শোকতাপ ছেয়ে গেল। এমতাবস্থায় রাতের খাওয়া হল না। তার ক্ষুধা লাগল না। আস্তে আস্তে তার পাকস্থলীর উত্তেজনা হ্রাস পেয়ে নিস্তেজ হয়ে গেল। সকালে নির্ধারিত সময়ে পায়খানা হল না। দুপুরের খাওয়া হল; কিন্তু অভ্যাসমত সহজ পন্থায় হল না বরং অতিকষ্টে কোনো রকম খাওয়া হল। অবশেষে তৃতীয় দিন আমাশয় হয়ে গেল।

উপরের ঘটনায় গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দুই শ্রেণীর লোক পাওয়া যায়। একশ্রেণীর লোক হবে কঠোর মনের অধিকারী। তারা ছোট ছোট বালা মসিবত ও দূর্ঘটনায় দুঃখিত ও শোকাভিভূত হবে না। স্বাচ্ছন্দ্যে প্রশান্তির মধ্যে জীবনযাপন করবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হচ্ছে, যারা স্বভাব ও প্রকৃতির সামান্য ব্যতিক্রম ঘটলে অস্থির ও পেরেশান হয়ে যায়। এভাবে অতি সামান্য ব্যাপারে তাদের দেহাভ্যন্তরে শিহরণ ও কম্পন সৃষ্টি হয়।

এখন বলুন! এমন শ্রেণীর লোক কি শূন্য কক্ষে বসে পড়াশোনা করবে? যদি সেখানে রক্ষিত চেরাগদানীর উপর কয়েকটি চড়ুই পাখি বসে কিচির মিচির করে বা চেয়ারে বসে, তা হলে বাস্তবিক সে এসব অবস্থা থেকে সঙ্কীর্ণতা অনুভব করবে। সুতরাং এমন স্বভাবপ্রবণ লোকেরা যদি ২/৪ দিন ওই অবস্থায় থাকে, তবে তাদের আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত আসবে এবং একসময় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে। তাহলে এ দাবি করা অত্যুক্তি হবে না যে, এত কিছুর চাপ তার পাকস্থলীর উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে। আর পাকস্থলী অসুস্থ হলে তো সমস্ত শরীরই অকেজো হয়ে যায়।

নিউইয়র্কের ডা. জি. বি. রাইস তার এক গ্রন্থে একজন রোগিনীর সমালোচনা করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, তার রোগ হল, তার পাকস্থলীতে সর্বদা একটা না একটা অসুবিধা থাকে। তাই তিনি অত্যাধুনিক এক্সরে এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি দ্বারা তাকে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু কোনো রোগ বা কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না। রোগিনী খাদ্য বন্ধ করে দিল। তাতেও কাজ হল না। সর্বদা বমি করতে লাগল এবং দুর্বল হতে থাকল। রোগের কোনো উপশম হল না। তবে সৌভাগ্যক্রমে ডা. সাহেব শুধু চিকিৎসকই ছিলেন না; তিনি একজন মনোবিজ্ঞানীও ছিলেন। সুতরাং রোগিনীর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কয়েক মিনিট প্রশ্ন করে তিনি রোগের প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করে ফেললেন।

তার স্বামী ছিল একজন পেশাদার জল্লাদ। সে মারাত্মক অপরাধীদের জবাই করে হত্যা করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এসব তার একটুও পছন্দ হত না। এভাবে লোকদের যবাই করার কারণে মহিলার মনের মধ্যে আঘাত লাগত। ইতোমধ্যে সে তার স্বামীকে কয়েকজন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করতে দেখে অন্তরে আরও বেশি আঘাত পেল। এতে তার মন আরও খারাপ হল। অবশেষে সমস্ত মানসিক চাপ তার পাকস্থলীর উপর পড়ল। ফলে সে পাকস্থলীর দুর্বলতা জনিত রোগে ভুগতে থাকল।

ডা. সাহেব লিখেন, দুনিয়ার কোনো ঔষধ তার উপকার আসছিল না। কারণ, সে ছিল মানসিক রোগে আক্রান্ত। ফলে তার স্বাস্থ্য দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে ডা. সাহেবের পরামর্শে যখন তার স্বামীকে জল্লাদির কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, তখন সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল।

এখন চিন্তা করে দেখা যাক, মানুষের মনের মধ্যে কেন এমন প্রভাব পড়ে। দেহ বিশেষজ্ঞ বলেন, খাদ্য পাকস্থলীতে জমা হওয়ার সাথে সাথে এর পরিপাক কর্মে সহায়তা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত সেখানে জমা হয়। রক্ত সেখানে একপ্রকার আর্দ্রতা সৃষ্টি করে। সে আর্দ্রতাই খাদ্য থেকে নির্যাস সংগ্রহ করে রক্ত তৈরি করার উপযোগী করে দেয় এবং অপ্রয়োজীয় দ্রব্য নাড়ীভুঁড়ির দিকে ঠেলে দেয়।

পাকস্থলীতে খাদ্য জমা হওয়ার পর যখন পর্যাপ্ত রক্ত জমা হওয়ার কথা তখন যদি কোনো মানুষ বিষণ্ন-ব্যথিত হয়, দুঃখ-কষ্ট ও আঘাত পায়, তখন রক্তের স্বাভাবিক গতি পাকস্থলীর দিকে ধাবিত হয় না বরং মস্তিষ্কের দিকে

ধাবিত হয়। কারণ, উক্ত অবস্থানগুলো মস্তিষ্কের কাজ এবং তা সংগঠিত হওয়ার জন্য মস্তিষ্কের মধ্যে রক্তের প্রয়োজন হয়। এমন দোটানা অবস্থার কুফলে পাকস্থলী পরিপাকের কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে না। কারণ, সেখানে পর্যাপ্ত রক্ত আসে না। সামান্য আসলেও আর্দ্রতা পয়দা হয় না। হলেও পর্যাপ্ত হয় না। ফলে খাদ্য হজম করতে সক্ষম হয় না।

আমরা জানি, চিকিৎসকগণ কখনও খাওয়ার পর গোসল করার অনুমতি দান করেন না। কারণ, গোসলের সময় রক্ত চামড়ার দিকে যায়। তদ্রূপ খাদ্যের পর অধ্যয়ন বা অন্য কোনো চিন্তামূলক কাজ করা থেকে নিষেধ করা হয়। কারণ, রক্ত তখন পাকস্থলীতে যাওয়ার পরিবর্তে মস্তিষ্কে যায়। অনুরূপ খাদ্যের পর ব্যায়াম করাকেও ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত করা হয়। কারণ, এ ক্ষেত্রেও রক্ত মূল কাজ বাদ দিয়ে অন্য দিকে ধাবিত হয়। সাধারণত খাদ্য খাওয়ার আগে পরে বা মধ্যে দৈহিক ও মানসিক স্থিরতা অতীব জরুরি মনে করা হয়। পাকস্থলী যেন উত্তম পন্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে তার কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারে। দৈহিক ও বাহ্যিক কারণে যেমন পাকস্থলী নষ্ট হয়, ঠিক তেমনি মানসিক বিড়ম্বনা এবং জটিলতাও এর উপর তীব্র প্রভাব বিস্তার থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, মানবজীবনে রোগ-ব্যাধি আসা স্বাভাবিক। তবে তা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আসতে পারে। কখনো ব্যবসা-বাণিজ্যে ধস নামার কারণে ধাক্কা আসে। কখনো বিবি-বাচ্চাদের রোগশোক মস্তিষ্ককে প্রশান্তি থেকে ক্লান্তিতে নিক্ষেপ করে। কখনো বেকার বা উপার্জন বিহীন জীবনের আতংক আমাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। আবার কখনো বা সাংসারিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশা মনের প্রশান্তিকে বিলীন করে দেয়। মোটকথা, কোনো না কোনো দুঃখ-নৈরাশ্য আমাদের মস্তিষ্কে ও মানসিক শান্তিতে আঘাত হানে। এমন নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের পাকস্থলী যদি স্বাভাবিকভাবে ভালো থাকে, তবে আশ্চর্যের কিছু নেই বরং তা হবে বিরাট এক হতাশাব্যঞ্জক জীবনের উপর আল্লাহ পাকের খাস রহমত। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা জটিল মানসিক অবস্থা সমূহকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম নই।

মনোবিজ্ঞানীরা এমন কিছু পন্থা বের করেছেন, যা মেনে চললে পাকস্থলীর সব সমস্যা থেকে অনেকটা নিরাপদ থাকা যায়। তন্মধ্যে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল, অহেতুক মনের মধ্যে ভয়-ভীতি চাপিয়ে না দেওয়া, যথাসম্ভব সমস্যাগুলোর ব্যাপারে পূর্বেই প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

অভিজ্ঞতা বলে রোগ আস্তে আস্তে বড় হয়। দ্বিতীয় পন্থা হল, দুঃখ বেদনা ও অস্থিরতা ভুলে যাওয়ার জন্য ভালো পরিবেশ খোঁজ করা। যেমন : ভ্রমণ, অনুষ্ঠান, বন্ধুদের সঙ্গ, অধ্যয়ন ইত্যাদি। অর্থাৎ দেহ ও মনকে সর্বদা উৎসাহব্যঞ্জক কাজে লিপ্ত রাখা। এসব পন্থা অবলম্বন করলেই মানসিক দুশ্চিন্তা দূর হবে। মোটকথা, যথাসম্ভব নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ হতে বিরত থেকে হাসি-খুশি থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

তাছাড়া পাকস্থলীকে মানসিক বিপর্যয়ের প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখার জন্য অতি জরুরি হল, খাদ্য গ্রহণের নিয়ম-কানুন পরিপূর্ণরূপে পালন করা এবং শোক-তাপ ও ক্রোধ অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ না করা। খাওয়ার সময় অনর্থক তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে না। কাউকে লজ্জা বা তিরস্কার করবে না। মর্মান্তিক ও বিব্রতকর ঘটনা থেকে বিরত থাকবে। খাওয়ার সময় প্রথমত কথা খুব কম বলবে। যদি বলতেই হয় তবে এভাবে বলবে, যেন তা সকলের সন্তুষ্টিমূলক হয়।

মনে রাখবেন, মানসিক রোগের চিকিৎসা মানসিকভাবে করতে হয়. যারা এসব রোগের চিকিৎসা ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে করে, তারা যেন কখনও উপকারের প্রত্যাশা না করে। এমনটি করলে অবস্থা আরও জটিল ও কঠিন আকার ধারণ করবে।

## খাদ্য কিভাবে গ্রহণ করা উচিৎ

খাদ্যদ্রব্য সর্বদা ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্বন করে খাওয়া উচিত। যেন প্রতিটি লোকমা মুখের লালা মিশ্রিত হয়ে পিচ্ছিল হয়ে যায়, তা হলে খাদ্য অতি সহজে পরিপাক হয়ে যাবে। মুখের লালা খাদ্য দ্রুত পরিপাক করতে সহায়তা করে। তদ্রুপ চিবিয়ে খেলে বদহজমও দূর হয়। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, Drink your meals and your water- এর মর্মার্থ হ খাদ্যদ্রব্য এমনভাবে চিবিয়ে খাবে, যেন সিক্ত হয়ে স্বেচ্ছায় গলার মধ্যে ঢুকে যায়। খাদ্য ধীরে ধীরে খাবে। এক ইউরোপীয় চিকিৎসক বলেছেন যদি কেউ আমাকে পরিপাকের ব্যাপারে কোনো বিষয়ে কিছু বলতে বলে

তবে আমি নিঃসন্দেহে বলে দিব, খাদ্যকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাও। যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য চর্বণ করে ভক্ষণ করলে উত্তমভাবে খাদ্য পরিপাক হয়ে দেহের অংশ গঠনে সহায়তা করবে। পরিপাকের মধ্যে কোনো প্রকার ব্যাঘাত ঘটবে না। এতদ্ব্যতীত খাদ্য চর্বণ করে খেলে পরিমাণে অল্প লাগে। আমাদের মধ্যে অনেক লোক আছে, যারা বড় বড় লোকমা দিয়ে তা তাড়াতাড়ি গিলে ফেলে। মূলত খাদ্যের আধিক্য উপকারের পরিবর্তে অপকারই বেশি করে। জীবনকে দীর্ঘ ও সুন্দর করার জন্য খাদ্য স্বল্প পরিমাণ খাওয়া জরুরি। খাওয়ার জিনিস বেশি গরম বা ঠাণ্ডা হওয়া ঠিক নয়। বেশি গরম জাতীয় কিছু গ্রহণ করলে পাকস্থলী ঢিলা হয়ে যায় এবং শক্তি হ্রাস পায়। আবার খাদ্য অধিক ঠাণ্ডা হলে তাকে পরিপাক করার জন্য পাকস্থলীকে অধিক শক্তি ও তাপ প্রয়োগ করতে হয়।

সেজন্য খাওয়ার সাথে সাথে অধিক ঠাণ্ডা পানি পান করাও বেশ ক্ষতিকারক। কেননা পানির শৈথিল্য ও তীব্রতা উভয়ই পাকস্থলীকে বিকৃত করে ও হজমে বিঘ্নতা ঘটায়।

## খাদ্য গ্রহণের পর খিলাল করা

প্রকাশ থাকে যে, হাদীস শরীফের বিভিন্ন কিতাবপত্রের মধ্যে খাদ্য গ্রহণের পর দাঁত খিলাল করার ব্যাপারে অধিক মাত্রায় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করা হয়েছে। আধুনিক সভ্য সমাজে হোটেলে বা ঘরে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাবারের সাথে খিলাল অতি যত্ন সহকারে সরবারাহ করা হয়। এটা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সর্বোত্তম তরীকা। খাদ্য ভক্ষণের পর খাদ্যকণা সাধারণত দাঁত ও মাড়ীর ফাঁকে আটকে যায়। সুতরাং তা খিলাল ব্যতীত রেখে দিলে প্রথমে পচন শুরু হয় ও পরে ক্ষত (প্লাজমা) দেখা দেয়। এভাবে মাড়ী ফুলে উঠে এবং মাড়ীর গোস্ত নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দাঁত মাড়ীর গোস্ত থেকে ধীরে ধীরে পৃথক হয়ে পড়ে। পরিশেষে অকালে দাঁত পড়ে যায়।

সুতরাং খাদ্যকণাগুলো খিলাল করে পরিষ্কার না করলে পাইওরিয়া বা মাসখেরিয়ার ন্যায় কঠিন রোগ দেখা দেয়। অসাবধানতা বশত মাড়ীর পুঁজ যখন লালার সাথে পাকস্থলীতে চলে যায় তখন সেখানে ধ্বংসকারী রোগ পয়দা হয়ে যায়। বিশেষ করে আলসার ও পাকস্থলীতে এসিড সৃষ্টি হওয়ায় মারাত্মক বিপদ দেখা দেয়।

## খিলালের মধ্যে সতর্কতা

ফিকাহ্ বিশেষজ্ঞগণ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন : যেসব খাদ্যকণা খিলাল ব্যতীত বের হয়, তা গিলে ফেলা শ্রেয়। আর যা খিলাল করে বের করা হয় তা ফেলে দেওয়া উচিত। পরিতাপের বিষয় হল, ইসলাম মানুষের জীবনকে সঠিক ধারায় পরিচালিত করার জন্যে যে শিক্ষা দিয়েছে, সেই শিক্ষা থেকে মানুষ যোজন যোজন দূরে সরে পড়েছে। ফলে আমাদের কাছে দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও হতাশা আর অশান্তি আমাদের জীবনকে গ্রাস করছে। তাই যখন কারও কাছে এ শিক্ষা এবং দীনী জীবন পেশ করা হয়, তখন সে বিস্ময়কর ভঙ্গিতে বলে, "দীন কি এতই বিস্তৃত এবং ইসলাম কি এটাও আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে?" ইত্যাদি।

খিলাল ব্যতীত যে খাদ্যকণা বের হয়, তা অন্যান্য খাদ্যবস্তুর মতো। সুতরাং তা খাওয়া প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিকারক নয়। তবে খিলাল দ্বারা যা বের করা হয়, তা গিলে ফেলা ঠিক নয়। কারণ, সতর্কের বিষয় হচ্ছে অনেক সময় দাঁত ও মাড়ীর ফাঁকে পুঁজ বা জীবাণু জন্মে।

সুতরাং এসব কণার সাথে ওই পুঁজ বা জীবাণু যদি মিশে যায় এবং পেটের ভিতরে চলে যায়, তবে সেখানেও ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং খিলাল দ্বারা নির্গত খাদ্যকণা উপকারী নয় বরং অপকারী ও মারাত্মক ক্ষতিকারক।

## খাওয়ার পর হাত ধোয়া ও পরিষ্কার করা

ইসলামী শরী'অতের বিধান হল খাওয়া-দাওয়ার পর হাত ধৌত করবে এবং কাপড়ে হাত মুছবে। হাদীস শরীফে আছে–

"কেউ রাতে খাদ্য গ্রহণের পর হাত না ধৌত করলে এবং কোনো পোকা মাকড় তাকে কামড়ালে (ক্ষতি করলে) আমাদের কোনো জিম্মাদারী নেই"।

অর্থাৎ হাতে তরকারি বা মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য লেগে থাকলে এবং ইঁদুর ছুঁছা ইত্যাদি কামড়ালে হাত জখম হয়ে যাবে। এর ফলে জ্বালা-যন্ত্রণা ও কষ্টের শিকার হতে হবে।

খাদ্য গ্রহণের পর হাতে খাদ্যের কিছু অংশ লেগে থাকে। তাই তা ধৌত না করলে যেখানে যেখানে লাগবে, সেখানে ওই খাদ্যবস্তু মিশে যাবে। ফলে ওই সব স্থানে পঁচা-গলা শুরু হবে এবং অসংখ্য রোগব্যাধি বিস্তার লাভ করবে।

কাপড় দিয়ে হাত মুছতে বলা হয়েছে এজন্য যে, হাতের মধ্যে অনেক সময় মসলা ও তৈল জাতীয় দ্রব্য লেগে থাকে। কাপড় দ্বারা মুছলে এসব পরিষ্কার হয়ে যায়। মোটকথা, দীন (ইসলাম) হল ধারাবাহিক সতর্কতা ও উপকার লাভের একটি মাধ্যম।

## খাদ্য গ্রহণের পরপরই পানি পান না করা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাওয়ার পরপরই পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। (মাদারিজুন্ নবুওয়াত)

## ডাক্তার কর্ণেল চোপড়া ও ইসলামী বিধান

ডা. কর্ণেল চোপড়া একজন হিন্দু বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি কয়েকটি বইও রচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, আমি দীর্ঘ গবেষণার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, খাওয়ার পর পানি পান করলে পাকস্থলীর রগগুলো ঢিলা হয়ে যায়। এর ভিতরের ঝিল্লী ফুলে যায় এবং হজমশক্তি হ্রাস পায়।

সুতরাং অধিকাংশ সময় পানি পাকস্থলীতে রোগ জন্ম দেয়। তা থেকে আবার হার্টের রোগ দেখা দেয়। এরই মধ্যে আমার একজন মুসলমান অধ্যাপকের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি বললেন, আপনার গবেষণা প্রশংসনীয় বটে; কিন্তু এ গবেষণা নতুন কোনো গবেষণা নয় বরং চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মহা সত্যটি প্রকাশ করে দিয়েছেন।

আমি তার এ দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ চাইলে তিনি হাদীসের গ্রন্থসমূহের মধ্যে এ কথা আমাকে দেখিয়েছেন।

## খাদ্য গ্রহণের পরপরই শয়ন করা

খাদ্য খেয়েই শয়ন করা মূলত রোগ-ব্যাধিকে ডেকে নিয়ে আসে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদ্য খাওয়ার পরপরই শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। (যাদুল মা'আদ)

খাওয়ার সাথে সাথে পাকাশয় তার পরিপাক ক্রিয়া শুরু করে দেয়। মানুষ শয়ন করলে পাকস্থলীও শয়ন করে। পূর্বের মতো কর্মতৎপর থাকে না। পাকস্থলীর কর্মতৎপরতা মানব দেহের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

জীব-বিজ্ঞান ও দেহ-বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের যাবতীয় বইপত্রে এ বিষয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তারা বলেন, খাওয়ার পর শরীরের কর্মতৎপরতা অত্যন্ত জরুরি। অন্যথায় পাকাশয়ে জমা হওয়া খাদ্য পঁচে যায় এবং বিভিন্ন প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়।

পেটের মধ্যে গ্যাস সৃষ্টি হওয়ার একমাত্র কারণ, খাওয়ার পরপরই শয়ন করা। মানুষ সাধারণত দুনিয়ার বিস্তৃত কর্মশালয় বিভিন্ন কাজে মগ্ন হওয়ার পর যখন ঘরে প্রত্যাবর্তন করে, তখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে যায়। সেজন্য খাবার খেয়েই শয়ন করে। অথচ খাদ্য যেমন গতিতে হজম হওয়া দরকার, তা সঠিকভাবে হয় না। সে অনিয়ম ও অসাবধানতার কারণে সুগার, হার্টেররোগ, পাকস্থলীর রোগ, প্যারালাইসিস ইত্যাদি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়।

## কায়লুলাহ নবীজীর সুন্নত

বহু গ্রন্থের লেখক ও বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ড. জিয়ালক আর্স্টন লিখেন: যদি রাষ্ট্র আমার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকত, তবে আমি সমস্ত কারখানা, ফ্যাক্টরী, বাজার ও দপ্তর বন্ধ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে কায়লুলা (দুপুরের খানার পর বিশ্রাম) করতে নির্দেশ দিতাম। কারণ, এর অভ্যাস করলে আমাদের রোগীদের সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পেত। সমস্ত প্রাণী মানসিক রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচতে পারত।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ অসংখ্য রোগ-ব্যাধিতে শঙ্কিত ও দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তাই দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মান উন্নত করার দিকে এখন বেশি গুরুত্বারোপ করেছে।

বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, মানুষ সারা দিনের দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি-শ্রান্তি নিয়ে রাতে যখন নিদ্রা যায়, তখন তাদের অনিদ্রা, পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা জাগ্রত হয়। যদি তাদের মধ্যে সুন্নত ভিত্তিক দৈনন্দিন কর্মসূচি নিয়মানুবার্তিতা ও কর্মতালিকা থাকত, তবে এমন পেরেশান হতে হত না। বিশেষজ্ঞগণ দৈনন্দিন কর্ম তালিকায় সর্বপ্রথম কায়লুলার সুন্নতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। তাদের মতে যে বা যারা কায়লুলা পালন করে সারা দিনের কাজকর্ম অব্যাহত রাখবে, তারা নিশ্চিন্তায় উদ্যমের সাথে সকল কাজ সচারুরূপে সম্পাদন করতে পারবে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার মানসিক রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে।

### সতর্কবাণী

মনে রাখতে হবে, কেবল দুপুরের পরবর্তী কায়লুলাই উপকারী। তবে তা এক ঘণ্টার অধিক হলে উপকারের পরিবর্তে এ কায়লুলাও অপকার ও রোগ-ব্যাধি জন্ম দিবে।

## পানি ও আধুনিক বিজ্ঞান

(WATER AND MODERN SCIENCE)

আমাদের জীবন ধারণের জন্য পানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত তরীকায় পানি পান করলে সাওয়াব লাভ হবে আবার প্রয়োজনও পূর্ণ হবে।

### চুষে পানি পান করা

✪ রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, চুষে চুষে পানি পান করো। ঘটঘট করে পান করো না।

জনৈক ব্যক্তি বলেন- একবার আমরা মরুভূমিতে গেলাম। সেখানে রৌদ্রের প্রখরতায় পিপাসার কষ্ট শুরু হল। কিন্তু সেখানে পানি পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি বাড়ী পাওয়া গেল। সেখানে আমরা উপস্থিত হয়ে কিছু পানি প্রার্থনা করলাম। ভিতর থেকে এক বৃদ্ধ লোক একটি মাটির পাত্রে করে পানি দিলেন বটে; কিন্তু তাতে মধ্যে ভূষি ছড়িয়ে দিলেন। এদিকে পানি পিপাসায় আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। পানি তো পান করতেই হবে। তাই প্রথমে ছোট ছোট ঢোক

পান করলাম। পরে বৃদ্ধকে পানিতে ভূষি দেওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তর দিলেন : আপনারা এত কঠিন পিপাসায় ছিলেন যে, যদি আমি পরিষ্কার পানি দিতাম আর আপনারা তৎক্ষণাত ঘটঘট করে পান করতেন, তবে কঠিন বিপদ ও কষ্টে পড়ে যেতেন। ইতোপূর্বে আমরা এভাবে পানি দিয়ে দেখেছি, কয়েকটি লোক কঠিন পিপাসায় ঘটঘট্ করে পানি পান করে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। আমরা যদি বড় বড় শ্বাসে ঘট্ঘট্ করে পানি পান করি, তবে খাদ্যনালী থেকে পানি শ্বাসনালীতে ঢুকে শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটিয়ে ভীষণ বিপদ ডেকে আনতে পারে।

সুতরাং পানি চুষে চুষে পান করলে মুখের মধ্যে যেসব খাদ্য বেঁধে থাকে, তা সহজে ছুটে যায় এবং দাঁতের গোড়া পরিষ্কার হয়ে যায়। তা না হলে ওই কণাসমূহ দাঁতে জড়িয়ে পঁচে গলে মারাত্মক বিপদ সৃষ্টি করতে পারে।

## পানি দেখে পান করা

✪ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সর্বদা দেখার পর পানি পান করবে।

জনৈক ব্যক্তি সেনাবাহিনীর একজন অডিট ইন্সপেক্টর ছিলেন। আমি তার সাথে কোনো এক সফরে ছিলাম। তিনি তার সাথে খুব হালকা সাদা একপ্রকার কাপড় রাখতেন। রাতে যখন পানি পান করতেন, তখন গ্লাসে পানি নিয়ে তার উপর ওই কাপড় রাখতেন। তারপর চুষে চুষে পানি পান করতেন। কারণ, জিজ্ঞাসা করলে বলতেন– পানিতে ময়লা বা পোকামাকড় থাকলে তাতে আটকে যাবে। ফলে পেটের ভিতর যেতে পারবে না।

সচরাচর পানিতে এমন ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ থাকতে পারে, যা পেটের অভ্যন্তরে ঢুকে যকৃত, পাকাশয়, প্লীহা ইত্যাদিকে অকার্যকর ও নষ্ট করে দিতে পারে। কিছু ক্ষুদে পোকা (প্যারা সাইটস)-এর পানি দেখে পান না করলে পানির সাথে পেটের ভিতর প্রবেশ করতে পারে। পানির মধ্যে বিচ্ছুর বাচ্চা থাকে এবং তা পেটের ভিতর চলে গেলে কি অবস্থা ঘটবে?

একবার মুলতান শহরের নিশতার হাসপাতালে এক নবীন যুবককে অপারেশন করা হয় এবং পাকস্থলী থেকে একটি কেঁচো বের করা হয়। ডাক্তার বলেন, পানির সাথে এটি ভিতরে চলে গিয়েছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহা মূল্যবান প্রতিটি সুন্নত সফলতা ও বিপদ মুক্তির এক একটি বিরাট হাতিয়ার।

## বসা অবস্থায় পানি পান করা

বসা অবস্থায় পানি পান করলে পানি দেহের চাহিদা মতো সর্বত্র পৌছে যায়। তবে বেশি পানি পান করলে এবং শরীরের চাহিদা থেকে অতিরিক্ত হলে অকিমা (Ockema) নামক মারাত্মক পানিরোগ হতে পারে। ফলে সমস্ত শরীর ফুলে যাবে।

## দণ্ডায়মান অবস্থায় পানি পান করা

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। দাঁড়িয়ে পানি পান করলে পাকস্থলী ও যকৃতে এমন মারাত্মক রোগ পয়দা হয়, যা চিকিৎসকগণ নিরাময় করতে অনেক সময় অপারগ হয়ে পড়েন। তদ্রুপ দাঁড়িয়ে পানি পান করলে পায়ে ফোলা রোগ হওয়ার ভয় থাকে। সুতরাং পা ফুলে গেলে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তা ছড়িয়ে যেতে পারে। অনুরূপ দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করলে ইস্‌তিসকা নামক পানিরোগ হতে পারে।

## তিন শ্বাসে পানি পান করা

বহু সংখ্যক হাদীসে তিন শ্বাস এবং কিছু হাদীসে দুই শ্বাসে পানি পান করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। [মামুলাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

তিন শ্বাসে পানি পান না করলে নিম্নোক্ত রোগ জন্ম নিতে পারে :

(১) শ্বাসনালীতে পানি ঢুকে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে।

(২) এমন বিঘ্নতা অধিক হলে মাথার খুলির ভিতর চাপ পড়ে। কারণ, পানির শিরাসমূহ মাথার পর্দার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। আবার মাথার ভিতর ফ্লয়েড আছে, যার সম্পর্ক থাকে পানির সাথে। যদি চুষে বা ধীরে ধীরে পানি পান করা হয়, তবে বিপদ ও ক্ষতিকর প্রভাব কখনও মাথার উপর পড়ে না।

(৩) পাকস্থলীতে পানি অতিরিক্ত জমা হলে বিভিন্ন প্রকার রোগ হয়। যথা, পানি যখন ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে তখন উপর থেকে চাপ পড়লে হার্ট ও লাঙ্গের ক্ষতি হয়। ডান দিক থেকে চাপ হলে যকৃত এবং বাম থেকে

চাপ পড়লে নাড়ীভুঁড়ি উলটপালট হয়ে যায়। এভাবে নানাবিধ ক্ষতি হয়।

## খোলা পাত্রে পানি পান করা

✪ হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা পেয়ালার পানি পান করতেন। সাধারণত ছোট ও সঙ্কীর্ণ পাত্রে পানি পান করলে আন্তরিক তৃপ্তি ও প্রশান্তি আসে না।

## পীসা গোর্স এর একটি বিশেষ আমল

তিনি একজন প্রখ্যাত গণিতবিদ ছিলেন। তিনি বলতেন : আমার যদি খোলা পাত্রে পানি, চামড়ার জুতা এবং যবের আটা-এ তিনটি জিনিস মিলে যেত, তবে আমি আকাশের হিসাব লাগাতাম।

(জবান মেরী হায় আওর বাত উনকি)

## পানির পাত্রের মধ্যে শ্বাস ত্যাগ করা

হাদীস শরীফে পানির পাত্রের মধ্যে শ্বাস ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতই না সূক্ষ্ম সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এর কারণ হল, পানির পাত্রের মধ্যে শ্বাস ত্যাগ করলে যে কোনো মুহূর্তে শ্বাসনালীর মধ্যে প্রবেশ করে আদান-প্রদানে বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

অনুরূপভাবে নাকের নালীর মধ্যে পানি প্রবেশ করতে পারে। ফলে নাক ও মাথার পর্দার মধ্যে ফুলা ধরতে পারে।

## মিঠা পানি পান করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় মিঠা ও ঠাণ্ডা পানি পান করতেন।

বর্তমানে পানি আন্তর্জাতিক বিষয় ও সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। অনেক দেশে পানির সংকট দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানের অনেক অঞ্চল আছে, যেখানে সীমাহীন কষ্টের পর একটু পানি পাওয়া সম্ভব হয়। বিশেষ করে মিঠা (খাবার) পানি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়োডিন ও সালফার যুক্ত মিঠা পানি (লবণাক্ত নয়) পান করতেন। সে পানিতে যথেষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত উপাদান থাকত। পক্ষান্তরে অধিক মাত্রায় লবণাক্ত পানি

স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। মিঠা পানির উৎস সম্বন্ধে গবেষণা করে জনৈক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রিপোর্ট পেশ করেছেন, যেখানে খেজুর গাছ ঘন ঘন ও বেশি পরিমাণে দেখা যায়, সেখানকার পানি মিঠা।

## বিশ্রাম ও আধুনিক বিজ্ঞান

(REST AND MODERN SCIENCE)

### গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সাহাবাগণের মধ্যে একজনও স্বপ্নদোষের শিকার হয় নি। কারণ, তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় তরীকা ও আদর্শ অনুযায়ী বিশ্রাম করতেন। তাই আসুন! আমরা আধুনিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসার আলোকে আলোচনা করি এবং খতিয়ে দেখি এসব বরকতময় পন্থা বর্তমান মানব জীবনের জন্য উপকারী ও প্রযোজ্য কি না ?

### ডান পার্শ্বে শয়ন করা

হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান পার্শ্বে কিবলা মুখী হয়ে বিশ্রাম করতেন। (উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

মানব দেহের মধ্যে হার্ট বাম দিকে থাকে। সুতরাং বাম পাশে কাত হয়ে শয়ন করলে নিম্নের ক্ষতি ও বিপদসমূহ দেখা দেয় ঃ

হার্টের মধ্যে রোগ-ব্যাধি পয়দা হয়। কারণ, বাম পাশে শয়ন করলে পাকস্থলী ও নাড়ীভুঁড়ির চাপ তার উপর পড়ে। ফলে রক্তের প্রবাহ ও হার্টের তৎপরতা হ্রাস পায়। ডা. কারশান লাল শর্মা নিদ্রার ব্যাপারে বোম্বে হাসপাতালের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যেসব রোগীকে সর্বদা ডান পাশে শয়ন করানো হয়, তাদের রোগ অতিদ্রুত আরোগ্য হয়। পক্ষান্তরে যেসব রোগীকে বাম পাশে শয়ন করানো হয়, তাদের রোগ নিরাময় হয় না।

অত্যাধুনিক গবেষণা দ্বারা একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ডান পাশে শয়ন করলে হার্ট ও পাকস্থলীর যাবতীয় রোগ-ব্যাধির আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। এমনকি অজ্ঞান ও বিরামহীন অজ্ঞান হওয়া থেকেও নিরাপদ থাকা সম্ভব। মাদারেজুন নবুওয়াহ কিতাবের লেখক এর হেকমত প্রসঙ্গে লিখেছেন : বাম দিকে যেহেতু হার্ট থাকে, সেহেতু

দিকে নিদ্রা গেলে গভীরভাবে ঘুম আসে। এমনকি কোনো অনুভূতি পর্যন্ত থাকে না। হালকা আঘাত করলেও জ্ঞান ফিরে না। চোখ খোলে না। সুতরাং এমন সীমাতিরিক্ত ঘুম প্রশংসনীয় নয়। পক্ষান্তরে ডান পাশে ঘুমালে হার্ট চাপ মুক্ত থাকে। গভীর ঘুম আসে না। সূক্ষ্ম আঘাতে নিদ্রা ভেঙ্গে যায়। চোখ খোলা সহজ হয়। সকালে সহজে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া যায়। এজন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফরে যেতেন, তখন হাত খাঁড়া করে তালুর উপর মাথা রেখে ঘুমাতেন, যেন গভীর নিদ্রা না আসে এবং ফজরের নামায কাযা না হয়। এভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্কতার সাথে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন করতেন।

রেলিং (বেড়া) বিহীন ছাদের উপর শয়ন করা নিষেধ। অনেক রাতে নিদ্রা ভাঙার পর (অথবা পেশাবের প্রয়জনে জাগার সময়) চোখে ঘুম ঘুম ভাব থাকার কারণে অন্ধকারে দিশা না পেয়ে বেড়া বিহীন ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমন সতর্কতা বর্তমান বিশ্বে সচরাচর করা হয় না। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে এ বিষয়ে সংকেত দিয়ে গেছেন। মানুষ সম্প্রতি সতর্কতার জন্য ছাদের চারিপাশে গ্রীলের বেড়া লাগিয়ে নিচ্ছে। অথচ বহুকাল পূর্ব থেকেই দীন ইসলাম এমন প্রতিরোধক দেওয়াল লাগানোর প্রবক্তা ছিল।

## উপুড় হয়ে শয়ন করা

✪ নবীজী বলেছেন, উপুড় হয়ে শয়ন করো না।

উপুর হয়ে শয়ন করলে হজম ও সংশ্লিষ্ট অংশ বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। এর প্রথম চাপ মাথার উপর পড়ে। তখন মাথার স্নায়ুগুলো নিজস্ব প্রবাহ ও গতি থেকে বিপরীতমুখী হয়ে যায়। ফলে মানুষ ভীতিকর স্বপ্ন দেখে। অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীদের মতে এমন মানুষের জীবনের মোড় বিপরীত দিকে যেতে পারে। ফলে সে উল্টা ও উদ্ভট চিন্তাশীল (পাগলপারার মতো) মানুষে পরিণত হয়ে যায়। এমনভাবে শয়ন করাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগল হয়ে যাওয়ার কারণ বলে সতর্ক করে দিয়েছেন।

ইমাম গাযালী রহ. উপুর হয়ে শয়ন করাকে আহমকের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাদীসে আছে, শয়তান এভাবে শয়ন করে। এমন উল্টাভাবে শয়নকারী ব্যক্তির সাথে শয়তান অপকর্ম (ব্যভিচার) করে।

## অধিক ঘুম নিষিদ্ধ

অধিক সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে। অতিমাত্রায় নিদ্রা গমন করলে শরীরে শক্তি থাকে না। অবসাদ, ক্লান্তি ও দুর্বলতা আসে। দৈনন্দিন কাজ-কর্মে ক্ষতি হয়। সাথে সাথে ধর্মীয় কাজেও দ্রুত ঘাটতি দেখা দেয়। অধিক শয়নে মৃগী রোগ, যৌন রোগ, হিস্টিরিয়াস, স্বপ্নদোষ ইত্যাদি দেখা দেয়। চোখের রোগ বিশেষ করে চোখের পাতা ফুলে যায়।

অধিক ঘুম স্বপ্নদোষে অভ্যস্ত ব্যক্তির জন্য ঘাতক বিষ থেকেও মারাত্মক। লক্ষ্যণীয় যে, জাপানের লোকেরা কম ঘুমায়। তাই তারা বিশ্বে উন্নতির শীর্ষে আরোহণকারী দেশ হিসেবে পরিচিত।

## চামড়া ও খেজুর ছালের বিছানা

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিছানা ছিল চামড়ার তৈরি। তার মধ্যে খেজুরের পাতার ছাল ছিল। (মাদারিজু নবুওয়াহ)

বিজ্ঞান মানুষের স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখে। বিজ্ঞানের এক গবেষণায় দেখা যায়, চামড়ার তৈরি বিছানা ও অন্যান্য জিনিসপত্র মানবদেহের জন্য উপযুক্ত ও উপকারী। এর দ্বারা কখনও ক্ষতি হয় না।

## আমেরিকান স্বাস্থ্য কাউন্সিল

সম্প্রতি আমেরিকার একটি স্বাস্থ্য কাউন্সিল চামড়ার উপকারিতা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছে। উক্ত রিপোর্টে লিখা হয়েছে, চামড়ার বিছানাপত্র কোমর ব্যথা, পাইলস, অস্থিনার্ভের দুর্বলতা, মাংসপেশীর দুর্বলতা ইত্যাদি রোগের একমাত্র মহৌষধ। (সিহহাত ও জিন্দেগী)

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও তার আবিষ্কৃত যাবতীয় যন্ত্রপাতি স্পষ্ট করে দিয়েছে, রোগের আরোগ্য কোথায়? রোগের আরোগ্য মূলত সুন্নতের মধ্যে।

## ইশার নামাযের পূর্বে শয়ন করা নিষিদ্ধ

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার পূর্বে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। (যাদুল মাআদ)

আসরের পরে জমিনের উপর তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার কা[illegible]

... হয়। মানুষের মন-মস্তিষ্কের উপর এর একটা চাপ বা প্রভাব পড়ে। সুতরাং আসরের পরে বা ইশার পূর্বে শয়ন করলে এর ক্ষতিকর প্রভাব মানুষ প্রতিহত করতে পারে না। ফলে বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়।

## ওযু করে শয়ন করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়নের পূর্বে ওজু করতেন। এশার নামাযের পর জীবনের কিছু কাজ করণীয় থাকে। যখন বিশ্রামের সময় হয়, তখন বিশ্রাম গ্রহণ করার পূর্বে অযু করা জরুরি। কারণ, এটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য খুবই উপকারী। অযু স্বপ্নদোষ ও পেরেশানী এবং দ্রুতগতিতে দুর্বলতা দূর করে। সুতরাং প্রশান্তি ও একান্ত তৃপ্তির সাথে নিদ্রা যাপনের জন্য সুন্নত তরীকা হল অযু করে শয়ন করা।

## শয়নের পূর্বে কাপড় পরিবর্তন

✪ শয়নের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লুঙ্গি (ঢিলা কাপড়) পরিধান করতেন এবং জামা খুলে ঝুলিয়ে রাখতেন।

স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান মতে মানুষ সারাদিন যে কাপড়চোপড় পরে থাকে, তা পরিহিত অবস্থায় কখনও নিদ্রা যাওয়া ঠিক নয় বরং হালকা ও ঢিলা কাপড় পরে শয়ন করবে। কারণ, সঙ্কুচিত ও শক্ত কাপড় পরলে উত্তমরূপে ঘুম আসে না। স্লিপিং ড্রেস (শয়নের পোশাক) ইউরোপীয়দের আবিষ্কৃত পরিভাষা বটে তারা একে স্বাস্থ্যসম্মত মনে করে এবং গর্ববোধ করে পরিধান করে। অথচ বহু পূর্বে ইসলাম মুসলমানদের রাতের পোশাক হিসেবে লুঙ্গি পরিধান করতে হুকুম দিয়েছে। আর এ পোশাকটি হালকা-পাতলা ও ঢিলা হয়।

## বিছানাপত্র ঝাড়ু দেওয়া

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়নে গমনের পূর্বে বিছানা ও আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র ঝাড়ু দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

(রাহবারে জিন্দেগী)

এমন সুন্দর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কোনো ধর্মে আছে বলে মনে হয় না।

## এক ব্যক্তির ঘটনা

শীতকালে কোনো এক ব্যক্তির বিছানার মধ্যে তাপ পাওয়ার জন্য একটি সাপ ঢুকে পড়ে। ঝাড়ু না দিয়ে সেও উক্ত বিছানায় শয়ন করে এর মধ্যে সাপ তাকে দংশন করে। ফলে সে মারা যায়। এভাবে জীবনে বহু বিপদজনক ঘটনা ঘটে যায়। তাই মহাদার্শনিক ও দূরদর্শী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সকল দিক থেকে শান্তি ও নিরাপদ থাকার জন্য বিছানাপত্র উত্তমরূপে ঝাড়ু দিতে হুকুম দিয়েছেন। এরূপ করলে পোকামাকড়, বিচ্ছু, কীট-পতঙ্গ, সাপ ইত্যাদি কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

## পেশাবদানী

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চৌকির নিচে একটি পেশাব করার পাত্র (হাজতী) রাখা হত। রাতে তিনি তার মধ্যে পেশাব করতেন। (রাহবারে জিন্দেগী)

এটাচ বাথ (ঘর সংলগ্ন শৌচাগার) রাখার পিছনে ইউরোপীয়রা কারণ দর্শিয়েছে যে, শীতকালে মানুষ পেশাব-পায়খানা করতে গৃহের গরম বিছানা ছেড়ে (যার ভিতর শয়ন করা হয়) বাইরে গেলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগে। ফলে পক্ষাঘাত রোগ, মুখের অর্ধাঙ্গ রোগ, জোড়াসমূহের ব্যথা ইত্যাদি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়। সে জন্য এমন ব্যবস্থা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জরুরি। 'হাজতী' অনুরূপ একটা বাথরুমের মতো। স্বাস্থ্য রক্ষামূলক এ ব্যবস্থাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বের মুসলমান জাতিকে দেখিয়েছেন।

প্রকাশ থাকে যে, তাফসীরকারকগণ উক্ত বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। কারও কারও মতে হতে পারে বিশেষ প্রয়োজনে তিনি এমন করেছেন অথবা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। (রাহবরে জিন্দেগী)

## পানির পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখা

মশক তথা বর্তমান কলস, ঘড়া, বালতি ইত্যাদির মুখ খুলে রাখলে ক্ষতিকর পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এমন ক্ষতির আশঙ্কায় পাত্রের মুখ বেঁধে রাখা দরকার।

... ... ১৫৭২ এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বনের পূর্বাভাষ দিয়েছে। এ ছাড়াও বদনার নালীর মুখে মুখ রেখে পানি পান করতেও নিষেধ করেছে, কেননা এতে ক্ষতিকর প্রাণী মুখের মধ্যে চলে যেতে পারে। এ সতর্কতাই আজকের আধুনিক জীবন যাত্রায় একটি নতুন সংযোজন ও সমাদৃত অধ্যায় হিসেবে আখ্যায়িত হচ্ছে।

## ঘুম থেকে ওঠার পর তৎক্ষণাত হাত ধৌত করা

ঘুম হতে ওঠার পর হাত ধৌত করার ব্যাপারে হাদীসে নির্দেশ রয়েছে। রাতে নিদ্রা অবস্থায় হাত কিসের সাথে লেগেছে, তা কারও জানা নেই। তাই হাতে থাকতে পারে নানা রোগজীবাণু। এখন যদি ওই রোগ জীবাণুসহ হাত পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেই পানিও বিষাক্ত হয়ে পড়বে।

এ মারাত্মক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ইসলাম নিদ্রা থেকে ওঠার সাথে সাথে হাত ধোয়ার পরামর্শ দিয়েছে। কৃমি রোগীর অনেকেরই নখের মধ্যে কৃমির ডিম লুকিয়ে থাকে। তাই হাত ধোয়া ছাড়া পানিতে ডুবিয়ে দিলে, সেই ডিম পানিতে মিশ্রিত হয়ে অন্যের জন্য অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

## শক্ত মাটিতে শয়ন করা

শক্ত মাটিতে শয়ন করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান অভ্যাস। কোমরে ব্যথা রোগীদের জন্য শক্ত মাটি বা কাঠের উপর শয়ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এমনকি আধুনিক গবেষণা (Modern Research) অনুযায়ী যে ব্যক্তি শক্ত মাটি বা কাঠের উপর শয়ন করবে, সে কখনো মেরুদণ্ডের ব্যথা (Sciatica) এবং (Inflammation Spinal Cord) কোমরের ব্যথায় আক্রান্ত হবে না। ইসলাম আমাদেরকে শত শত বছর পূর্বে এগুলির শিক্ষা দিয়েছে এবং খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে আমল করে তা দেখিয়ে গেছেন।

## বাতি নিভিয়ে রাখা

হাদীস শরীফে ঘুমানোর পূর্বে বাতি নিভিয়ে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা বাতি নিভিয়ে দাও। অন্যথায় ইঁদুর বাতি নিয়ে ছাদে উঠে পড়বে এবং ছাদে

আগুন লেগে যাবে। হাদীস বিশারদগণ অধিকাংশ হাদীসের উদ্বৃতি দিয়ে এমনই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উক্ত হাদীসের আলোকে উলামায়ে কিরাম বলেন : বর্তমান যুগে বৈদ্যুতিক বাল্ব নিভিয়ে রাখা জরুরি। এতে লাভ হল, শান্তির নিদ্রা আসবে এবং খারাপ প্রভাব থেকে চক্ষু নিরাপদ থাকবে।

বাল্ব নিভানো থাকলে বিদ্যুৎ বেশি (High Voltage) হলে তা ফেটে যাবে না। এমনকি বিদ্যুৎ বন্ধ করে ঘুমালে ঘর আগুন লাগা থেকে রক্ষা পাবে। আজকাল বিদ্যুত স্পার্কিং এর কারণে অনেক মার্কেট পুড়ে ছাই হতে দেখা যায়। ধোঁয়া হল এক পরিপূর্ণ কার্বন গ্যাস মিশ্রিত পদার্থ। এটা কামরায় ভর্তি হয়ে গেলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের আশঙ্কা রয়েছে।

## শোয়ার সুন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞান

(SLEEP AND MODERN SCIENCE)

### ডান কাতে শোয়া

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা ডান কাতে শয়ন করতেন। (উসওয়াহ্)

আজকের বিজ্ঞান বলে, বাম কাত হয়ে শয়ন করলে গভীর ঘুম আসে। তবে ডান কাতে শয়ন করলে গভীর নিদ্রাও আসে আবার তার ঘুম শীঘ্র পূর্ণও হয়ে যায়। ফলে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে জাগতে পারে।

### ভয়াবহ স্বপ্ন দেখা

অপর এক গবেষণা অনুযায়ী বাম দিকে কাত হয়ে শয়ন করলে ভয়াবহ স্বপ্ন বেশি হয়। কারণ, মানুষের হার্ট থাকে বাম দিকে। আর বাম দিকে শয়নকারী ব্যক্তির পাকস্থলী ও নাড়ীভুঁড়ির চাপ হার্টের উপর পড়ে এবং হার্টের উপর বৃদ্ধি পায় ফিজিক্যাল প্রেসার। আর হার্টের উপর প্রেসার বৃদ্ধি পেলে ভয়াবহ স্বপ্ন দেখতে পায়। যেন কেউ হৃদপিণ্ডকে ধরে রেখেছে।

(মাওয়ায়েযে নকশ্বন্দী)

# ইসলামী পোশাক ও আধুনিক বিজ্ঞান

(ISLAMI DRESS AND MODERN SCIENCE)

## সাদা পোশাক

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা পোশাক পছন্দ করতেন। (উসওয়ায়ে রাসূল ﷺ)

সাদা কাপড় সর্বপ্রকার আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করে থাকে। তীব্র গরম মওসুমে সাদা পোশাক গরম হয় না। কেননা তা গরমকে আকর্ষণ করে না। অপরদিকে তীব্র শীতের মওসুমে ঠাণ্ডার কারণে তা শীতলও হয়ে যায় না।

## ক্রোমোপ্যাথীর অভিমত

(LOWS OF CHROMPATHY)

রং ও আলো বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন– সাদা পোশাক হল ক্যান্সার থেকে প্রতিরক্ষার সর্বোত্তম ঔষধ। এমনকি বিশেষজ্ঞগণের মতে সাদা পোশাক পরিধানকারী ব্যক্তি (Sebaceous Glands) ঘামের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার ও ছোতো রোগ (Fungal Infection) এর মতো মারাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষা পেতে পারে। তারা চর্ম এলার্জি (Skin Allergy) এবং উচ্চ রক্তচাপে (High Blood Pressure) আক্রান্ত রোগীদেরকে সর্বদা সাদা পোশাক পরিধানের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ক্রোমোপেথী নীতি অনুযায়ী সাদা পোশাক মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড ও চর্মের সংরক্ষক। (উসূলে ক্রোমোপ্যাথী : ৪৩)

## ইবনে বতুতার অভিজ্ঞতা

বিখ্যাত এ পর্যটক ভারতবর্ষের জনসাধারণকে সাদা পোশাক পরিধান করতে দেখে খুবই প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তিনি বলেন, আমি ভারতবর্ষের লোকদের দেখেছি, তারা সাদা পোশাক পরিধান করে। এর উপকারিতা দেখে আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি। (সফরনামা –ইবনে বতুতা)

## খলিল জিবরান ও সাদা পোশাক

খলিল জিবরান ছিলেন একজন প্রখ্যাত দার্শনিক ও লেখক। তিনি সাদা পোশাককে সাদা ফুলের সমতুল্য জ্ঞান করতেন। তিনি বলেন, গোলাপের সাদা পাপড়ি ও আমার দেহের (সাদা) পোশাক দুটোই সমপর্যায়ের। আর

দুটোই আমার আনন্দের সামগ্রী। কবি বলেন, গোলাপের শুভ্র পাপড়ির সজ্জা ধারণ করব আর শুভ্র সামিয়ানার নিচে বসে মুক্ত অঙ্গনে খোলা মনে তোমার মুচকি হাসির শুভ্র ঝলক তোমার শুভ্র দন্তরাজির মধ্যে দেখব আর ভালবাসব তোমার শুভ্র পোশাক।

## ডা. লূহী কূনীর গবেষণা

তিনি ছিলেন জার্মানীর একজন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও চিকিৎসক। তিনি বলেন– সমস্ত বিশেষজ্ঞগণ সাদা পোশাককে গুরুত্ব দিয়েছেন।

## সুতী কাপড়
(COTTON DRESS)

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পোশাক ছিল সুতী কাপড়ের। সুন্নত অনুযায়ী সুতী পোশাকের কি কি উপকারিতা রয়েছে এবং অন্যান্য পোশাকে কি কি অপকারিতা রয়েছে, তা আমাদের জানা দরকার :

(১) খোদা না করুন! কারও শরীরে যদি আগুন লেগে যায়, তাহলে শরীরে সুতী পোশাক থাকলে তাতে ক্ষতি কম হয়।

(২) সুতী পোশাক গরম সহিষ্ণু হয় আর উষ্ণ দেশসমূহে এতদভিন্ন অন্য কোনো সুব্যবস্থাই নেই।

(৩) যে শরীরে সুতী পোশাক থাকবে, সে শরীর চর্মরোগে (Skin Diseases) আক্রান্ত হবে না। কেননা পলিয়েস্টার বা নায়লন সুতার পোশাক শরীরের ঘর্ষণে তীব্র গরম (Hottest) হয়ে যায়। আর এর তাপ শরীরের তাপের সাথে মিশে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে চর্মরোগ সৃষ্টি হয়।

সুতী পোশাক দেহের তাপমাত্রায় ভারসাম্যে রাখে। ফলে চর্মরোগ ও মানসিক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অথচ পলিয়েস্টার কাপড়ের পোশাক দুটি মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি করে। একটি হল মহিলাদের লিকুরিয়া আর অপরটি হল পুরুষদের যৌনরোগ (Sexual Diseases)।

## মোটা কাপড়

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোটা পোশাক পরিধান করতেন। (মা'মূলাতে নববী)

সকল সাহাবায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে কিরাম জীবনভর মোটা

পোশাকে অভ্যস্ত ছিলেন। বর্তমান কালের আধুনিক বিজ্ঞান দীর্ঘ গবেষণার পর এরূপ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছে।

### ডা. লূথর এম এর গবেষণা

ডা. লূথর ছিলেন জার্মানের প্রসিদ্ধ ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। (Carcer Specialist) তিনি বলেন, যখন থেকে মানুষ সুতী পোশাক পরিত্যাগ করেছে, তখন থেকে তারা নিম্নোক্ত রোগসমূহে আক্রান্ত হতে বাধ্য হয়েছে।

- চর্ম ক্যান্সার (Skin Cancer),
- চামড়ার মাংসগ্রন্থির ক্যান্সার (Skin Glands Cancer),
- মহিলাদের বক্ষ ক্যান্সার (Breast Cancer),
- টিসু ক্যান্সার (Tussues Cancer),
- হরমুন ক্যান্সার (Harmonies Cancer),
- চর্ম চুলকানী (Allergic Cancer),
- একজিমা (Eczema)

জনৈক ব্যক্তি বলেন– মুলতান কটন মিলে আমার এক বন্ধু ছিল। আমরা একত্রে উক্ত ফ্যাক্টরীতে কর্মরত ছিলাম। একবার জানতে পারলাম, তিনি চাকরি থেকে ইস্তেফা দিয়েছেন। অথচ তার বেতন ছিল খুবই আকর্ষণীয়। আমি তার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন :

"ফ্যাক্টরীর মালিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, জনসাধারণের আবেগ ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এখন থেকে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পাতলা কাপড় তৈরি করবেন। অথচ পাতলা কাপড় পরিধান করা সুন্নতের খেলাফ। তাই আমি এমন কাজে অংশ নিতে ইচ্ছুক নই।

একবার আমি করাচীর রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে একটি বড় প্রাইভেট কার আমার কাছে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল আমার সেই বন্ধুটি। কুশল বিনিময় হল আমাদের। জিজ্ঞেস করলাম, এখন দিন কেমন কাটছে? বলল, যেদিন আমি ওই ফ্যাক্টরীর চাকরি ছেড়েছি তার পরই আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ গাড়িটিও আল্লাহর বিরাট বড় অনুগ্রহ। ঘটনাটি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হল। পাঠকগণ এ হতে শিক্ষা গ্রহণ করবেন বলে আশা রাখি।

**রং পরিবর্তন**

মানুষের রক্তে ম্যালানিন নামক এক পদার্থ থাকে, যার দ্বারা তাদের শরীরের রং স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। কিন্তু কারো চর্মে যখন রৌদ্রের উষ্ণতা, ঠাণ্ডার তীব্রতা এবং ঋতুর পরিবর্তন প্রভাব বিস্তার করে, তখন চর্মের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। আর এরকম হওয়ার কারণ একমাত্র পাতলা কাপড় পরিধান করা।

## পাগড়ী ও আধুনিক বিজ্ঞান

**গুরুত্ব ও তাৎপর্য**

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন রং এর পাগড়ী ব্যবহার করতেন। যথা–

(১) সাদা (White) (২) সবুজ (Green), এবং (৩) কাল (Black)।

পাগড়ী হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। এর অনেক ফযীলত ও উপকারিতা রয়েছে। পাগড়ী পরিধানকারী ব্যক্তি লু-হাওয়া (Sun Stroke) থেকে রক্ষা পায়। নিয়মিত পাগড়ী পরিধান করলে স্থায়ী সর্দি রোগ হয় না। আর হলেও তা তেমন ক্ষতিকর হয় না। মাথাব্যথার জন্য পাগড়ী খুবই উপকারী। পাগড়ী ব্যবহারকারী ব্যক্তির মাথাব্যথার আশঙ্কা খুব কম হয়।

পাগড়ী মস্তিষ্ক শক্তিশালীকরণ ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে খুবই কার্যকর। পাগড়ীর ঝুলন্তপ্রান্ত মেরুদণ্ড ফোলা রোগ থেকে রক্ষা করে (Inflammation of Vertebral Column)। গাগড়ীর প্রান্ত দেহের নিম্নভাগের (Lower Half of the body) অর্ধাঙ্গ রোগ এবং শীত, গরম ও ঋতুর পরিবর্তনজনিত রোগ থেকে রক্ষা করে। গাগড়ী পরিধানকারীদের প্রলাপ ও উন্মত্ততা (Meningitis) রোগের আশঙ্কা কম থাকে। জনৈক বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধান ও গবেষণা অনুযায়ী যখন Spinal Cord সুরক্ষিত থাকবে, তখন শরীরের স্নায়ু প্রক্রিয়া (Nervous System) এবং মাংসপেশী প্রক্রিয়া (Muscles System) সঠিক ও সুশৃঙ্খল থাকে। আর এটা শুধু পাগড়ীর দ্বারাই সম্ভব।

সাদা পাগড়ী দ্বারা মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কের স্নায়ুতে (Brain Nerves) গরমের প্রখরতা (Sun Stroke) জনিত ব্রেইন স্ট্রোক ইত্যাদি খুব কম হয়।

ফয়সালাবাদের এক ব্যক্তি বলেন, আমার স্থায়ী সর্দি ও মাথাব্যথা রোগ ছিল। কেউ আমাকে পাগড়ী বাঁধার পরামর্শ দিল। আমি সার্বক্ষণিক পাগড়ী বাঁধা শুরু করলাম। এতে আমার যথেষ্ট উপকার হয়েছে।

## মনোস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে পাগড়ী

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা পাগড়ী ব্যবহার করো! কেননা এর দ্বারা ধৈর্য ও দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পাবে। ডা. আযীয আহমদ ছিলেন একজন মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন : আমি যখন উচ্চ ডিগ্রী অর্জনের জন্য বহির্বিশ্বে যাই, তখন সেখানে দেখলাম, লোকজন মানসিক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাগড়ীর মতো একপ্রকার কাপড় বাঁধে। আমি এ অবস্থা দেখে বললাম, এত পাগড়ী। আর তোমরা যেভাবে পাগড়ী বেঁধেছ, আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও ঠিক তদ্রুপই বাঁধতেন। বিশেষজ্ঞগণ পাগড়ীর মতো সে কাপড় এজন্যই বাঁধতে নির্দেশ দিয়েছেন, এর দ্বারা মানুষের মধ্যে বিপদাপদ বরদাশত করার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ মুক্তি পায় নানাবিধ মানসিক রোগ হতে। শত শত বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলে গেছেন, আজকের বিজ্ঞান সেগুলি নিয়ে গবেষণায় নেমেছে মাত্র।

## সবুজ পোশাক

সাদা পোশাক তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রিয় ছিলই আবার রঙ্গীন পোশাকের মধ্যে সবুজ পোশাকও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালবাসতেন। (যাদুল মা'আদ)

প্রত্যেক রং থেকে অদৃশ্য কিছু আলোক রশ্মি (Invisible Rays) বের হয়। সেগুলি শরীর ও শরীরের প্রতিটি অবস্থার উপর বিস্তার করে এক শক্তিশালী প্রভাব।

সবুজ বর্ণ, বাগ-বাগিচা, ফুল ইত্যাদি দর্শন করা আত্মা ও শারীরিক প্রশান্তির জন্য খুবই উপযোগী। তাই সবুজ পোশাকও দৈহিক প্রশান্তির জন্য ফলপ্রদ। ক্রোমোপ্যাথি বিশেষজ্ঞগণের মতে সবুজ পোশাক শরীরের অগণিত রোগ-ব্যাধির জন্য উপকারী। এ বিষয়ে তাদের রয়েছে এক পূর্ণাঙ্গ গবেষণা। সেই গবেষণা মতে সবুজ পোশাক নিম্নোক্ত রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করে :

আলসার, গ্যাষ্ট্রিক, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের খিঁচুনী, নৈরাশ্য, উচ্চ রক্তচাপ ও চর্মরোগ বিশেষ করে যন্ত্রণাদায়ক জ্বালা। চিন্তার বিষয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক একটি পছন্দনীয় বিষয় কতই না মূল্যবান!

(উসূলে ক্রোমোপ্যাথী)

## লাল পোশাক অপছন্দনীয়

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাল রংয়ের পোশাক অপছন্দ করতেন। উলামায়ে কিরাম এ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, লাল রং পুরুষের Harmony System-এর জন্য খুবই ক্ষতিকর। এর ফলে শরীরের হরমুনের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে। ফলে বিশেষ একধরনের আর্দ্রতা (Secretion) সেখান থেকে বের হয়ে রক্তের সাথে যুক্ত হয়। সেই আর্দ্রতা থেকে মনস্তাত্ত্বিক ও ক্রোমোপ্যাথী বিশেষজ্ঞগণের মতে নিম্ন লিখিত রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়। তাছাড়া লাল রং পুরুষের স্বভাব বিরুদ্ধ।

উচ্চ রক্তচাপ (High Blood Presser) কামোত্তেজনা (Increased Sewual Desire Sexual Exctation), চর্মরোগ (Skin Diseases) মাংসগ্রন্থি ফোলা (Inflammation of the Blands), (Infection of the Glands), কোমরে উপরের অংশে মাংস পেশিতে খিঁচুনী (Backache Pain in Back)।

## টাখনুর উপর পোশাক পরিধান করা

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লুঙ্গি পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত হওয়া উচিত। আর তার নিচে টাখনু পর্যন্ত হতে পারে। টাখনুর নিচে যে অংশে লুঙ্গি ঝুলন্ত থাকবে, সেই অংশটুকু অগ্নিতে জ্বলবে। আর যে ব্যক্তি অহংকার বশত লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরবে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না।

(আবু দাউদ)

তাহের মুনির সাহেব একজন ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত লোক ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একবার আমেরিকা (মিসিগান সিটি) ভ্রমণে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখতে পেলাম একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (Health Centre)। আমার বন্ধু বললেন- এখানে চল, তোমাকে একটি মজার জিনিস দেখাচ্ছি। আমরা গিয়ে পৌঁছলাম সেই কমপ্লেক্সে। তার মধ্যে রয়েছে অনেকগুলি বিভাগ। ঘুরতে ঘুরতে একসময় আমরা পোশাক বিভাগে পৌঁছলাম। সেখানে এক

২.৩ লেখা রয়েছে, স্যালোয়ার (পোশাক) টাখনুর উপরে পরিধান করুন, এতে টাখনু ফুলে যাওয়া, যকৃত ও উম্মাদনা রোগ থেকে রক্ষা পাবেন। তা দেখে তো আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম- এ সেন্টার কি মুসলমানদের? বলল, না। এটা খ্রিস্টানদের একটি গবেষণা কেন্দ্র।

এখানে তারা স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা চালায়, এর মধ্যে কিছু ইসলামি বিষয়ও গবেষণাধীন রয়েছে। স্যালোয়ার টাখনুর নিচে পরিধান করলে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ধমনী আবৃত থাকে বলে দেহে উপরিউক্ত পরিবর্তন সৃষ্টি হয়।

## আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রেশমী কাপড়

✪ হাদীস : রেশমী কাপড় ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য হারাম।

কিং এওয়ার্ড এর আলোচনা করতে গিয়ে ডা. ব্রাউন বলেন, তিনি কখনো রেশমী পোশাক পরিধান করতেন না। একবার তিনি নিজের শরীরে তীব্র তাপ ও অস্থিরতা অনুভব করলেন এবং ক্রোধ বুঝতে পারলেন। অথচ ইতোপূর্বে এ ধরনের অবস্থা তার কখনো সৃষ্টি হয় নি। এ ব্যাপারে তিনি ডাক্তারের পরামর্শ নিলেন। ডাক্তারগণ তাকে শরীরে প্রলেপ ও সেবনের জন্য কিছু ঔষধ দিলেন। কিন্তু কোনোই ফল হল না। তখন তিনি সর্বদা রেশমী পোশাক পরিধান করতেন। একবার তিনি রেশমী পোশাক খুলতেই কিছু শান্তি অনুভব করলেন। তারপর তিনি দুই দিন যাবত অন্য পোশাক পরলেন। দেখতে পেলেন, অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এবার তিনি কিছু দিনের জন্য রেশমী পোশাক ছেড়ে দিলেন। এতে তিনি পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন।

## মহিলাদের পায়ের পাতা পর্যন্ত কাপড় পরার বিধান

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদেরকে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানের নির্দেশ দিয়েছেন। (মাদারিজুন নুবুওয়াহ্) মহিলারা যদি পা খোলা পায়াজামা বা টাখনুর উপর কাপড় পরিধান করে, তাহলে তাদের নারী,জনিত Hormone এর হ্রাস বৃদ্ধির ফলে শরীরের ভিতর ফুলে যাওয়া (Vaginal Inflammation), কোমর ব্যথা, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, খিঁচুনী ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়।

## পোশাকের পরিচ্ছন্নতা ও আধুনিক বিজ্ঞান

✪ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুমিন ব্যক্তির সকল সৌন্দর্যের মধ্যে পোশাকের পরিচ্ছন্নতা ও অল্পেতুষ্ট থাকার গুণ অন্যতম।

✪ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় অপছন্দ করতেন। (উসওয়াহ্)

মনোবিজ্ঞানীগণ পোশাকের পরিচ্ছন্নতার উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে থাকেন। কেননা পোশাকের পরিচ্ছন্নতার সম্পর্ক থাকে মানুষের গোটা জিন্দেগীর সাথে। মা-বাবার পোশাক যদি পরিচ্ছন্ন না হয়, তা হলে তার সন্তানসন্তুতি এ অবস্থা দেখে নিজেদের জীবন তদানুরূপই গঠন করবে।

মানুষ যদি অপরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধযুক্ত পোশাক পরিধান করে অপর মানুষের সাথে মিলিত হয়, তখন সমাজে তার প্রতি সম্মানের দৃষ্টি পড়বে না বরং তাকে হীন দৃষ্টিতে দেখা হবে। আর এ দৃষ্টি উভয়ের মধ্যে মনোস্তাত্ত্বিক (Psychological) রোগে আক্রান্ত করে তোলে। অপরিচ্ছন্ন পোশাকের উপর দুর্গন্ধ, ময়লা-আবর্জনা ও বিভিন্ন জীবাণু (Germs) লেগে থাকে। আর অনেক জীবাণু থেকে নানা রোগ-ব্যাধি (Infections Germs) ছড়ায়। এতে গোটা সমাজে ব্যাধি বিস্তার হয়ে পরিবেশ-পরিস্থিতিকে কলুষিত করতে পারে। Sterilisation বা পরিচ্ছন্নতা ইসলামই ইউরোপকে উপহার দিয়েছে।

অথচ ইউরোপের ইতিহাসে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, এরা অনেকে কয়েক মাস পর্যন্ত গোসলবিহীন অবস্থায় কাটিয়ে দেয়। কেননা এরা হল বরফ প্রধান দেশের লোক। এজন্য এরা বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্বারোগ করে এবং দেহের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য শুধু বডি স্প্রে ব্যবহার করাকেই যথেষ্ট মনে করে। তাদেরকে বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা পদ্ধতি ইসলামই শিক্ষা দিয়েছে।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার সার্জন উইলিয়াম যিনি জর্জ আলেকজাণ্ডারের চিকিৎসা করেছিলেন। তিনি বলেন- ইউরোপিয়ানগণ পোশাকের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অসচেতন ছিলেন। পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাটা তাদের নিকট এমন কষ্টকর মনে হত, যেমন- হাতের নখ কাটাকে তারা বিরক্তিকর মনে

করত। তারপর তুর্কীদের কাছ থেকে তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে। আর একথা স্পষ্ট যে, তুর্কীরা সকলেই ছিল মুসলমান।

## রোযা ও আধুনিক বিজ্ঞান

### (FASTING AND MODERN SCIENCE)

### রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে কিছু বিধি-নিষেধ দিয়ে থাকে। তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়েও দিকনির্দেশনা দেয়। ইসলাম যেমনিভাবে আমাদের নামাযের নির্দেশ দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে এক সুন্দর সুখী জীবনের খোঁজ। যেখানে রয়েছে নতুনত্ব। অনুরূপভাবে রোযার মধ্যে যেমনি রয়েছে আল্লাহর নির্দেশ, তেমনি রয়েছে অসংখ্য অগণিত পার্থিব কল্যাণ।

✪ হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন– তোমরা রোযা রাখ, তা হলে সুস্থ থাকতে পারবে। হাদীসের বহু কিতাবে অসংখ্য বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, রোযার মধ্যে রয়েছে মানবজাতির রোগমুক্তি।

### রোযার পার্থিব উপকারিতা

ইসলাম রোযাকে মুমিনের জন্য রোগমুক্তি বলে ঘোষণা দিয়েছে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের বক্তব্য কি? নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হল।

### ফ্রান্সে ইহুদিদের রোযা রাখার ঘটনা

একবার আমি ফ্রান্স গিয়েছিলাম। সেখানে আমার এক বন্ধু বলল, রমাযান মাস এসেছে। আমাকে রোযা রাখতে হবে। তারাবীহ পড়তে হবে। আমি আমার প্রফেসরকে বললাম, আমাকে ছুটি দিন। তিনি বললেন– কেন? আমি বললাম, তারাবীহ নামায পড়ার জন্য। তিনি বললেন : তাতে তোমার আবার ছুটির কি প্রয়োজন? আমি বললাম, এসব ইবাদত পালনের জন্য আমাকে অনেক দূরে অমুক স্থানে যেতে হবে। তাই প্রত্যহ যাতায়াত করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এখানে এমন কিছু লোকের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিচ্ছি। যাদের মুখে দাড়ি, মাথায় পাগড়ী, পরনে জুব্বা, মিস্ওয়াক শেষে ওযু করে আযান দিচ্ছে, নামায আদায় করছে, একজন সকলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত

করছে। আর পিছনে সকলে তা শ্রবণ করছে। আরও মজার ব্যাপার হল, তারা পুরা মাস রোযাও পালন করছে। তাছাড়া তারা ইতিকাফেও বসেছে। সকাল-সন্ধ্যা, সাহরী-ইফতারীও দস্তুর মতো আদায় হচ্ছে।

তাঁর কথা শুনে আমি ঠিকানা নিয়ে তাদের সাথে মিলিত হয়ে পুরা রমাযান মাস কাটালাম ও সবশেষে আমি ঈদের নামায আদায় করে ফিরে এলাম। পরবর্তী সময়ে আমি প্রফেসর সাহেবকে বললাম– জনাব! আপনার বড় অনুগ্রহ। আপনি আমাকে এমন বুযুর্গ লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছেন। আমার রমাযান মাস অত্যন্ত আনন্দের সাথে কেটেছে।

একথা শুনে প্রফেসর সাহেব মুচকি হাসলেন। আমি বললাম, ব্যাপার কি স্যার? তিনি বললেন : তুমি কি জান, এরা কারা? এরা সবাই ছিল ইহুদি। আমি বললাম, বলেন কী! তা তো আমি জানতে পারি নি। তিনি বললেন, তারা সকলে এ প্রজেক্টের আওতায় কাজ করেছে যে, ইসলামের মুসলিম সম্প্রদায় একাধারে একমাস রোযা রাখে; আমরাও তদ্রূপ করে দেখব যে এর মধ্যে কল্যাণকর কি রয়েছে? যদি কল্যাণকর কিছু থাকে, তাহলে আমরা সম্মিলিতভাবে মুসলমান হয়ে যাব।

(উলামায়ে কিরামকী যিম্মাদারীয়া)

## এক আমেরিকান অমুসলিমের ঘটনা

জনৈক আমেরিকান ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে সে আমাকে বলল, আমি রোযা রাখি। আমি তাকে বললাম– তুমি তো অমুসলিম। তুমি কেন রোযা রাখ? সে বলল, আমার রোযা রাখার কারণ হল, বছরে কিছু সময় মানুষের জন্য এমনভাবে অতিবাহিত করা উচিত, যেন সে ডায়েটিং করে তার হজমপক্রিয়াকে (Digestive System) কিছু সময়ের জন্য অবসর রাখে। এভাবে তার মধ্যে বিদ্যমান আর্দ্রতা, যা সময় সাপেক্ষে বিষে (Poison) পরিণত হয়ে যায়, রোযা রাখার দ্বারা তা নিঃশেষ হয়ে যায়। আর এ মারাত্মক আর্দ্রতা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ফলে অনেক জটিল জটিল রোগ নিঃশেষ হয়ে যায়। এভাবেই হজমপ্রক্রিয়া পূর্ব অপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ কারণে আমরা স্বামী-স্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা প্রতি মাসে রোযা রেখে "ডায়েটিং" (Dieting) করব। আমি বললাম, আমাদের দীন ইসলাম আমাদেরকে এ পদ্ধতিতে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেছে, প্রতি মাসে

আইয়ামে বীযের তিনটি রোযা রাখবে। বিশেষ করে অবিবাহিত লোকজন। কেননা এতে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা (Discipline) সংযম ও ধৈর্যশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তা কুপ্রবৃত্তি দমনে সহায়ক হয়। (মাওয়ায়েযে নকশবন্দী)

## সিকান্দার আযম ও আরাসতু

সিকান্দার আযম ও আরাসতু একাধারে উপবাস থাকাকে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খুবই জরুরি বলে অভিহিত করেছেন। বাদশা সেকান্দার বলেন, আমার পুরা জীবনটা অতিবাহিত হয়েছে অভিজ্ঞতা ও ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, যে ব্যক্তি সকাল আর সন্ধ্যায় আহার করবে, সে রোগমুক্ত স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করতে পারবে। আমি হিন্দুস্থানে কোনো কোনো এলাকাতে এমন তীব্র গরম প্রত্যক্ষ করেছি, যেখানে সবুজ তরুলতা পর্যন্ত জ্বলে গিয়েছে। অথচ আমি সেই উষ্ণ এলাকাতেও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার না করেই কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তখনও আমি অনুভব করেছি নিজের মধ্যে এক প্রকার সজীবতা ও শক্তি। (সিকান্দার আযম, কৃত-মাহফুজুর রহমান)

## গান্ধিজীর বাসনা

গান্ধিজীর ক্ষুধার্ত থাকার ব্যাপারটা খুব প্রসিদ্ধ। জনাব ফিরোজ রাজ গান্ধিজীর জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি ছিলেন রোযা রাখার পক্ষপাতী। তিনি বলতেন, মানুষ খেয়ে খেয়ে নিজের শরীরকে অলস বানিয়ে ফেলে। এ অলস শরীর না জগৎবাসীর আর না মহারাজের। যদি তোমরা শরীরকে সতেজ ও সচল রাখতে চাও, তাহলে শরীরকে দাও তার ন্যূনতম আহার আর পূর্ণ দিবস রোযা রাখ। সন্ধ্যাবেলা বকরির দুগ্ধ দ্বারা রোযা খোল। (দাস্তানে গান্ধী বিশেষ সংখ্যা)

## অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিস্ময়

প্রফেসর মুর পাল্ড দিল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির পরিচিত নাম। তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেন, আমি বহু ইসলামি বইপত্র অধ্যয়ন করেছি। যখন রোযার অধ্যায়ে পৌঁছলাম, তখন আমি বিস্মিত হলাম যে, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে এক মহৎ ফর্মূলা শিক্ষা দিয়েছে। ইসলাম যদি শুধু রোযার ফর্মূলাই শিক্ষা দিত, তা হলেও এর চেয়ে উত্তম আর কোনো নেয়ামত তাদের জন্য হত না।

আমি একবার চিন্তা করলাম, ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। সুতরাং আমি মুসলমানদের পদ্ধতিতে রোযা রাখা শুরু করে দিলাম। আমি দীর্ঘদিন যাবত পেটের ফোলা (Stomach Inflammation) রোগে আক্রান্ত ছিলাম। অল্পদিন পরেই অনুভব করলাম, রোগ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। আমি রোযার অনুশীলন অব্যাহত রাখলাম। কিছুদিনের মধ্যে শরীরে আমূল পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করলাম। এভাবে চলতে থাকলে দেখতে পেলাম, আমার শরীর স্বাভাবিক হয়ে গেছে এবং দীর্ঘ একমাস পর শরীরে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

## পোপ এলফ গাল এর গবেষণা

(P.E.G.'S ANAIYSIS)

পোপ এলফ গাল ছিলেন হল্যাণ্ডের একজন নামকরা বড় পাদ্রী। রোযা সম্পর্কে তিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, আমি আমার অনুসারীদের প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছি। এ কর্মপদ্ধতিতে দৈহিক ও পরিমাপিক সমন্বয় অনুভব করেছি। আমার রোগীরা বারংবার আমাকে জোর দিয়ে বলেছে, আমাকে আরও কিছু পদ্ধতি বলে দিন, কিন্তু আমি নীতি বানিয়ে দিয়েছি যে, দূরারোগ্য রোগীদের প্রতিমাসে তিনদিন নয় বরং পূর্ণ একমাস রোযা রাখার নির্দেশ দিব। আমি ডায়াবেটিস (Diabetes), হৃদরোগ (Heart Diseases) ও পাকস্থলী রোগে (Stomach Diseases) আক্রান্ত রোগীদেরকে পূর্ণ একমাস রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছি।

এ পদ্ধতি অবলম্বনে ডায়াবেটিস রোগের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাদের সুগার কন্ট্রোল হয়ে গেছে। হৃদরোগীদের অস্থিরতা ও শ্বাস স্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। আর সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে পাকস্থলীর রোগীরা।

## ডা. লুথরজেম অব ক্যামব্রিজ

তিনি ছিলেন একজন ফারমাকোলোজী (Pharmacology) বিশেষজ্ঞ। প্রতিটি বস্তুকে গভীরভাবে দেখা ছিল তার স্বভাবগত ব্যাপার। একবার তিনি ক্ষুধার্ত মানুষ (রোযাদার)-এর পাকস্থলীর আর্দ্র পদার্থ (Stomach Secretion) নিয়ে তার ল্যাবরেটরীতে টেস্ট করেছিলেন। পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পেলেন, তাতে সেই খাদ্যের দুর্গন্ধময় উপাদান (Food Particles Septic) যার দ্বারা পাকস্থলী রোগ-ব্যাধি গ্রহণ করে, তা একেবারে নিঃশেষ

হয়ে যায়। মি. লুথর বলেন, রোযা শারীরিক রোগ-ব্যাধি বিশেষভাবে পাকস্থলীর রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তির গ্যারান্টি।

### সিগমন্ড নারায়াড (SIGMOND NARAYAD)

তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী। তার থিওরী (Theory) মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণের জন্য পথিকৃৎ। তিনি অভুক্ত থাকা ও রোযা রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বলেন, রোযা মনস্তাত্ত্বিক ও মস্তিষ্ক রোগ (Mental and Psychological) নির্মূল করে দেয়। মানব দেহে আবর্তন-বিবর্তন আছে। কিন্তু রোযাদার ব্যক্তির শরীর বারংবার বাহ্যিক চাপ (External Pressure) গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। রোযাদার ব্যক্তি দৈহিক খিচুনী (Body Congestion) এবং মানসিক অস্থিরতা (Mental Depression) এর মুখোমুখী হয় না।

### প্যারাসাইক্লোজী রিসার্চ (RESEARCH OF PARAPSYCHOLOGY)

জড় পদার্থের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর অস্থির ও আত্মহারা হয়ে আত্মহত্যাপ্রবণ জাতি পুনরায় প্রশান্তির পুষ্প অন্বেষণে একটি বাগিচা লাগাতে যাচ্ছে, যাকে বলা হয় প্যারাসাইক্লোজী।

পাশ্চাত্যের (European Scientists) চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medical Experts) এবং মনোবিজ্ঞান (Psychologist) সম্মিলিতভাবে ইসলামি জীবনের উপর গবেষণা রিসার্চের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কেননা পাশ্চাত্য জাতি বর্তমান জীবন-যাপন ও জন্মদান সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত। তারা সর্বাধিক আত্মহনন, হত্যার পদক্ষেপ, সম্ভ্রমহানী, সাম্প্রদায়িকতা, অপহরণ, প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ, বোমা বিস্ফোরণ, গণহত্যা, অবৈধ সন্তান, তালাক ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কাজের দিকে ধাবিত।

এখন তারা এ পাঁক-কাদা থেকে নিষ্কৃতি চায়। তারা বুঝতে পেরেছে মুক্তির একমাত্র পথ ইসলাম।

এক নও-মুসলিম মহিলা গুলবার্গ ডিফেন্স ও লিবার্টির গ্রন্থ দেখে পাশ্চাত্য মাসজকে বলে উঠল, আফসোস! আমি যে সমাজের প্রতি থুথু নিক্ষেপ করে চলে এসেছি, এরা আজ সেই কলুষিত সমাজকে চাটতে শুরু করেছে। এটি কত গুরুত্বপূর্ণ কথা! একটু চিন্তা করে দেখুন।

খ্রিস্টান মিশনারীরা এখন ইসলামি শিক্ষা গভীরভাবে অধ্যয়ন করে তার মধ্যে নিজেদের জন্য সংশোধনের পথ উন্নয়নের রাস্তা অন্বেষণে ব্যস্ত। রোযা সম্পর্কে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ অব্যাহত গতিতে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি তারা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, রোযা যেমন মানুষের দেহে নবজীবন ও উদ্যম সৃষ্টি করে, তেমনি এর দ্বারা জীবিকা (Economical) নির্বাহের দুশ্চিন্তাও দূরীভূত হয়। কেননা যখন রোগ-ব্যাধি কম হবে, তখন হাসপাতালও কম হবে। আর হাসপাতাল কম হওয়া শান্তির পরিবেশেরই আলামত।

ইউরোপীয় জাতি আজ ঘুরে ফিরে পুনরায় ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। আর আমরা তাদের অন্ধ অনুসরণ করে পশ্চাদদিকে ধাবিত হচ্ছি। একজন বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটার কত সুন্দর কথাই না বলেছেন, আজকের যুব সমাজ যে ইউরোপকে আদর্শ মনে করছে, আমি তা প্রত্যক্ষ করে এসেছি। শান্তি পেতে চাও তো ইসলামের দিকে চলে আস।

প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক চিত্রনায়ক আবেদন বাট এর জীবন দেখেও তাই বোঝা যায়। যখন সে ইসলামি জিন্দেগী গ্রহণ করে, তখন তার পোশাক হয়ে যায় সুন্নত অনুযায়ী, লাঠি সুন্নত অনুযায়ী। তার কালো পাগড়ী, বাবরি চুল ও দাড়ি দেখে মনে হত, যেন একজন প্রবীণ বুযুর্গ; অথচ তার পূর্বের ইতিহাস বিশ্বাবাসীর জানা।

এখনও সময় আছে, আমরা পুনরায় সুন্নতী জিন্দেগীর দিকে ফিরে আসি। আমরা যদি বিজ্ঞানকে মেনে নিয়ে সুন্নতে নববীর উপর আমল না করি, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে মুখ দেখাব কিভাবে? তাছাড়া বিজ্ঞানকে মেনে নেওয়ার পর যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা দেওয়া পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করি, তাহলে এর দ্বারা পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে লাভবান হওয়া যাবে ঠিকই, কিন্তু এর দ্বারা দ্বীনী উপকারিতা তথা পুণ্য অর্জনের আশা করা বোকামি বৈ কিছুই নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা প্রমাণের জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন পড়ে না।

## এমন দিনও আসবে যখন সকল মানুষ রোযা রাখবে

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পার। গণনার কয়েকটি দিনের জন্য। অধিকন্তু তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, সে অন্য সময়ে রোযা পূরণ করে নিতে পারবে। আর এটা যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। যে ব্যক্তি খুশির সাথে সৎকর্ম করে, তার জন্য তা কল্যাণকর হয়, আর যদি রোযা রাখ, তবে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণময়, যদি তোমরা বুঝতে পার।

আমরা সকলেই জানি, সূরা বাকারায় আয়াত ১৮৩ হতে ১৮৭ পর্যন্ত দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন রোযার ব্যাপারে সবিস্তারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে আমরা ১৮৪ নং আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত তাৎপর্যের উপর চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করব।

এ অংশে বর্ণনা করা হয়েছে, রোযা হল একটি উত্তম বস্তু, যার দ্বারা অনেক কল্যাণ অর্জিত হয়। সাথে সাথে আরও ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, আমরা সেই অর্জিত রহমত ও বরকতসমূহ অনুধাবন করতে সক্ষম হব। যদি আমরা সত্যকে জানতে পারি। মাত্র কিছুদিন পূর্বেও মনে করা হত, রোযা দ্বারা নিছক হজম প্রক্রিয়াতেই সামান্য কিছু প্রশান্তি পাওয়া যায়। দিন যত যাচ্ছে, চিকিৎসা বিজ্ঞানও দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে তারা এর আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য উদঘাটনে সক্ষম হয়েছে তাই রোযা হল এক স্বভাবগত মোজেযা। এ কারণেই পবিত্র আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, যদি তোমরা অনুধাবন করতে পার।

সুতরাং আসুন! যেভাবে আমরা প্রথম আয়াত সম্পর্কে বলেছি, এখন আমরা এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখব কিভাবে রোযা আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার সহায়ক হতে পারে।

### (ক) হজম প্রক্রিয়ার উপর রোযার প্রভাব

হজম প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা জানি, যে অঙ্গগুলি এ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়, সেগুলি একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ

অঙ্গ, যেমন- মুখ ও চোয়ালের মধ্যে লালার কোষ, জিহবা, গলা, খাদ্যনালী (Alimentary Canal) পাকস্থলী, বার আঙ্গুল বিশিষ্ট অন্ত্র, যকৃতের আঠাযুক্ত পদার্থ এবং অন্ত্রের বিভিন্ন অংশ। এ পেঁচানো অঙ্গগুলি স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে কার্যকর হয়। যেমন : আমরা যখন আহার শুরু করি অথবা আহারের ইচ্ছা পোষণ করি, তখনই এগুলো সচল হয়ে ওঠে এবং প্রতিটি অঙ্গই তার নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়ায় সমস্ত অঙ্গগুলি ২৪ ঘণ্টা ডিউটিরত থাকে। স্নায়ু চাপ এবং কুখাদ্য খাওয়ার ফলে তাতে একপ্রকার ক্ষয় সৃষ্টি হয়।

আর রোযা একদিকে এসব হজম প্রক্রিয়ার উপর এক মাসের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেয়। তবে এর আশ্চর্যজনক প্রভাব পড়ে যকৃতের ওপর। কেননা যকৃতের দায়িত্বে খাবার হজম করা ব্যতীত আরও পনের প্রকার কাজ রয়েছে। যেসব দায়িত্ব পালন করতে করতে যকৃত অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ফলে হজমের জন্য নির্গত পিত্তের আর্দ্র পদার্থে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং যকৃতের কাজের উপরও বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই যকৃতের বিশ্রাম দরকার।

রোযার উসিলায় যকৃত চার থেকে ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করে। যা রোযা ব্যতীত অন্য কোনোভাবেই এটা সম্ভব নয়। কেননা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর খাবার এমনকি ১ গ্রামের এক-দশমাংশও যদি পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, তখন হজম প্রক্রিয়ার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবি খুবই যুক্তিযুক্ত যে, যকৃতের এ অবসর গ্রহণের সময়কাল বছরে কমপক্ষে একমাস হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আধুনিক যুগের লোকজন যারা নিজেদের জীবনের অসাধারণ মূল্য নিরূপণ করে থাকে, তারা অনেকবার ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে চেষ্টা করে; কিন্তু যদি যকৃতের মধ্যে কথা বলার শক্তি অর্জিত হত, তাহলে সে নির্দ্বিধায় উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলত, রোযার দ্বারাই তোমরা আমার উপর বিরাট বড় করুণা করতে পার।

রোযার বরকতসমূহের মধ্যে একটি হল রক্তের রাসায়নিক ক্রিয়ার উপর প্রভাব সংক্রান্ত। যকৃতের কঠিনতর কাজের মধ্যে একটি হল হজম না হওয়া খাদ্যদ্রব্য ও হজম হওয়া খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।

তার কাজ হল প্রতি গ্রাস খাবারকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। বস্তুত রোযার কারণে সেই যকৃত বলবর্ধক খাবারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কাজ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। তেমনিভাবে যকৃত তার শক্তিকে রক্তের মধ্যে Globulin; (যা দেহকে হেফাযতকারী Immune সিস্টেমকে শক্তিশালী করে) সৃষ্টিতে ব্যয় করতে সক্ষম হয়। রোযা রাখার কারণে গলা ও খাদ্যনালী যে শক্তি পায়, তার মূল্য দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। মানুষের পাকস্থলী রোযার সাহায্যে যে প্রভাবগুলি অর্জন করে, তা খুবই উপকারী। এ পদ্ধতিতে পাকস্থলী থেকে নির্গত আর্দ্র পদার্থসমূহ উত্তমভাবে তার ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়। যার কারণে রোযা রাখাকালীন সময়ে গ্যাস জমা হতে পারে না। যদিও সাধারণ ক্ষুধা তা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু রোযার নিয়ত ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাস সৃষ্টি থেমে যায়। এর দ্বারা পাকস্থলী আঠাযুক্ত পদার্থ ও আর্দ্রতা তৈরিকারী কোষগুলি রমাযান মাসে বিশ্রাম গ্রহণ করে। যারা জীবনে কোনো দিন রোযা রাখে নি, তাদের দাবির বিপরীতে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, রোযা বিশ্রামক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে। রোযা অন্ত্রগুলিকেও প্রশান্তি দেয় এবং তাতে শক্তি সঞ্চার করে। রোযার দ্বারা সুস্থ আর্দ্র পদার্থ সৃষ্টি ও পাকস্থলীর আঠাযুক্ত পদার্থের নড়াচড়া হয়ে তাকে। এভাবে আমরা রোযা দ্বারা অসংখ্য রোগ-ব্যাধির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি।

## (খ) রক্তের উপর রোযার প্রভাব

দিনের বেলা রোযা রাখার দ্বারা রক্তের পরিমাণ হ্রাস পায়। এর প্রভাবে যকৃত পায় এক অনাবিল শান্তি। সবচেয়ে বড় কথা হল, Intercellular-এর মধ্যে প্রবহমান পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণে আঠাল পদার্থের উপর চাপ কম পড়ে। আঠাযুক্ত পদার্থের উপর চাপ হৃদয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোযার দ্বারা Diastolic প্রেসারের স্তর সর্বদা কম থাকে অর্থাৎ যকৃত তখন বিশ্রামে থাকে। তদুপরি আজকের যুগের মানুষ মডার্ন জিন্দেগীর বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বদা টেনশনে ভুগতে থাকে। রমাযানের এক মাসের রোযা বিশেষ Diastolic প্রেসারকে হ্রাস করে মানুষকে এক অনাকাঙ্ক্ষিত উপকার সাধন করে। রোযার সময়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রক্তপ্রবাহের উপর হয় অর্থাৎ এর দ্বারা রক্তের ধমনীসমূহের উপর প্রভাব পড়ে।

রক্ত প্রবাহের ধমনীর দুর্বলতার মূল কারণ হল রক্তের অবশিষ্ট পদার্থ Diastolic পূর্ণভাবে মিশ্রিত হতে না পারা। অথচ রোযার দ্বারা বিশেষভাবে ইফতারের নিকটবর্তী সময়ে রক্তে বিদ্যমান আহার্যের যাবতীয় ক্ষুদ্র অংশসমূহ মিশ্রিত হয়ে পড়ে। তন্মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি রক্ত প্রবাহিত ধমনীর গায়ে চর্বি বা অন্য কোনো কিছু জমতে পারে না। এভাবে ধমনীসমূহ কুঞ্চিত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক রোগ থেকে বাঁচার একমাত্র পথই হল রোযা। রোযাকালীন সময় কিডনী (Kidney), যাকে রক্ত প্রবাহের প্রধান অঙ্গ মনে করা হয়, তা তখন বিশ্রামে থাকে। সুতরাং মানব দেহের এহেন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গও রোযার দ্বারা উপকৃত হয়।

## রোযার দ্বারা রক্তের পরিচ্ছন্নতা

হাড়ের মজ্জার মধ্যে রক্ত তৈরি হয়। শরীরে যখন রক্তের প্রয়োজন পড়ে, তখন একপ্রকার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি হাড়ের মজ্জাকে আন্দোলিত করে তোলে আর দুর্বল লোকদের জন্য এটা বিশেষভাবে অলস অবস্থায় কাজ করে। যার কারণে বিষণ্ন ও ফ্যাকাশে চেহারার শোভা দিনে দিনে বর্ধিত হতে থাকে। রোযা রাখাকালীন সময়ে যখন রক্তের মধ্যে খাদ্যের পদার্থ সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে যায়, তখন হাড়ের মজ্জা আন্দোলিত হতে থাকে। এভাবে একজন দুর্বল লোক রোযা রাখার দ্বারা সহজেই নিজের দেহে রক্ত বৃদ্ধি করে নিতে পারে।

মোটকথা, যে ব্যক্তি রক্ত দূষণজনিত মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত রয়েছে, তার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হতেই হবে, তবে রোযা রাখাকালীন সময়ে যেহেতু কিডনী স্বস্তি ও শান্তিতে থাকতে পারে, তাই তা হাড়ের মজ্জার জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ সরবরাহ করতে পারে। যার দ্বারা অতি সহজেই আরও অধিক পরিমাণে রক্ত সৃষ্টি হতে পারে। এভাবে রোযার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক প্রকারের প্রাণসমৃদ্ধ পদার্থের উসিলায় একজন শীর্ণকায় মানুষ নিজের ওজন বৃদ্ধি এবং মোটা মানুষ তার দেহের স্থূলতা হ্রাস করে নিতে পারে।

সম্মানিত পাঠক! এবার আসুন আমরা কুরআনুল কারীমের সূরা বাকারা ১৮৪নং আয়াতের শেষাংশটি পুনরায় স্মরণ করি এবং তার মুজেযা দ্বারা

...বলা হয়েছে, তোমরা অনুধাবন করতে পারলে তোমাদের জন্য তোমরা রোযা রাখাই উত্তম।

## কোষের (CELL) উপর রোযার প্রভাব

রোযার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হল, শরীরে প্রবহমান পদার্থসমূহের মধ্যে ভারসাম্য ঠিক রাখা। যেহেতু রোযার দ্বারা বিভিন্ন প্রবহমান পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায়, তাই ওসবের কার্যক্রমে ব্যাপক প্রশান্তির সৃষ্টি হয়। মুখের লালাযুক্ত ঝিল্লির উপরের অংশ সম্পৃক্ত Cell সমূহ, যাকে প্রাপথেলীন সেল বলা হয় এবং যেগুলি দেহের আর্দ্রতাসমূহকে অনবরত বের করার দায়িত্বে নিয়োজিত, সেগুলিও রোযার দ্বারা অর্জন করে এক অনাবিল শান্তি এবং তাদের সুস্থতায় যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা সহজেই বলা যায়, লালা তৈরিকারী মাংসগ্রন্থি, গর্দানের মাংসগ্রন্থি এবং Pencereas-এর মাংসগ্রন্থিসমূহ অধীর আগ্রহের সাথে মাহে রমাযানের অপেক্ষায় থাকে। যাতে রমাযানের বরকতে কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ পায় এবং অধিক কাজ করার ক্ষেত্রে নিজের অপারগতাসমূহ পেশ করতে পারে।

## স্নায়ুবিক প্রক্রিয়ার উপর রোযার প্রভাব

রোযার কারণে কিছু লোকের মধ্যে চঞ্চলতা ও মনমরাভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু এর দ্বারা স্নায়ুবিক প্রক্রিয়ার উপর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। সে সমস্ত লোকদের মাঝে এ ধরনের পরিস্থিতি তাদের আত্মম্ভরিতা (Egotism) বা মেজাজের রুক্ষতার কারণেই হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে রোযার কারণে স্নায়ুবিক প্রক্রিয়ায় আসে পূর্ণ শান্তি। ইবাদত বন্দেগী পালনের দ্বারা অর্জিত প্রশান্তি আমাদের মনের যাবতীয় পঙ্কিলতা ও ক্রোধ দূরীভূত করে দেয়। ইবাদতে অধিক খুশু-খুযু, বিনয়-নম্রতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির সম্মুখে মস্তক অবনত হয়ে যায়। রোযার কারণে আমাদের যাবতীয় পেরেশানী চিন্তা-ভাবনা দুরীভূত হয়ে যায়। রোযার কারণে যেহেতু আমাদের যৌন চাহিদা হ্রাস পায়, তাই এ কারণেও আমাদের স্নায়ুবিক প্রক্রিয়ার উপর কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না।

রোযা ও ওযুর যৌথ প্রতিক্রিয়ার যে শক্তিশালী সমন্বয় সাধিত হয়, তার দ্বারা মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহের এক অতুলনীয় ভারসাম্য সৃষ্টি হয়, যা সুস্থ স্নায়ুবিক প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

আভ্যন্তরীণ মাংসগ্রন্থিতে যে আরাম ও শান্তি অর্জিত হয়, তা পূর্ণরূপে স্নায়ুবিক প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। মানবজাতির উপর এটা আরও একটি অনুগ্রহ। মানুষের যে আবেগপ্রবণতা রমাযানের কারণে, ইবাদতের অনুগ্রহের বদৌলতে পরিচ্ছন্ন ও শান্তিকামী হয়ে থাকে, তা স্নায়ুবিক প্রক্রিয়ার সর্বপ্রকার অশান্তি দূরীকরণে সহায়ক হয়।

## রোযার সামাজিক প্রভাব

ইসলাম আমাদের দুখীজনের লালন-পালনের পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করে। উদরপূর্তি থাকলে অন্যের ক্ষুধা সম্পর্কে অনুভব করা যায় না। আর পানি দ্বারা জিহবা তরতাজা থাকলে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির পিপাসার জ্বালা অনুভব করা যায় না। রোযা মুসলমানদেরকে দয়া, করুণা ও গরীব-দুঃখীর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন শিক্ষা দেয়। এ সবকিছুই ইসলামি সমাজ-সভ্যতার অন্যমত অংশ। ইউরোপে দুঃখীজনদের প্রতি সদয় হওয়ার জন্য অসংখ্য নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। কিন্তু সেখানে তারা সর্বাধিকভাবে বঞ্চিত।

মাওসেতুং ছিল চীনের মহান নেতা। চীনের সামাজিক পরিস্থিতি তাকে ভাবিয়ে তুলল। তিনি ভাষণ প্রদান কালে বলতেন– নিজের খাবারের মধ্যে প্রতিবেশী ও সামনে উপস্থিত ব্যক্তিকেও শামিল করে নাও। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে অন্যের ক্ষুধার জ্বালা অনুভব কর। এ শিক্ষাগুলি বস্তুত মাওসেতুং এর নয় বরং বহু পূর্বেই ইসলাম আমাদেরকে এগুলি শিক্ষা দিয়েছে। ইসলাম গরীব-দুঃখীদের ধর্ম। ইসলাম বিত্তবানদের নিরাপত্তা প্রদান করে। ইসলাম ধন- দৌলত অর্জনের বিরোধিতা করে না বরং তা উপার্জন ও ব্যয়ের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

## বিদেশী পর্যবেক্ষকদের পাকিস্তানে সার্ভে রিপোর্ট

জার্মান, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের একটি টিম এতৎসংক্রান্ত এক পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত পাকিস্তান এসেছিল যে, কিভাবে রমাযানুল মুবরাক মাসে (E.N.T) কান, নাক ও গলার রোগ-ব্যাধি হ্রাস পায়। উক্ত অনুসন্ধানের জন্য তারা পাকিস্তানের করাচি, লাহোর ও ফয়সালাবাদ এ তিনটি শহর নির্বাচন করেছিল। উক্ত সার্ভে রিপোর্টের সারসংক্ষেপ হল–

মুসলমানরা যেহেতু নামায আদায় করে, বিশেষত রমাযান মাসে অধিক পাবন্দীর সাথে নামায আদায় করে থাকে, এ কারণে ওযু করে। এ ওযু করার কারণে তাদের নাক, কান, গলার অসুখ কম হয়। খাদ্য কম খাওয়ার কারণে পাকস্থলী এবং লিভারের অসুখ কম হয়। রোযার মাধ্যমে এ ডায়েটিং করার কারণে তারা মস্তিষ্ক এবং হৃদরোগে কম আক্রান্ত হয়।

(দৈনিক জং, ১৯৮৮)

## অভিজ্ঞতার আলোকে মানবদেহে রোযার প্রভাব

মওসুম ভৌগোলিক অবস্থানের বিভিন্নতার কারণে রোযার সময়কাল ১২ থেকে ১৯ ঘণ্টা পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং রাত্রের দীর্ঘতা অনুপাতে সাধারণত এক থেকে দুইবার (ইফতারের পর সাহরীর পূর্বে) খাবার খাওয়া হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে একথা পূর্ণ আস্থার সাথে বলা সম্ভব নয় যে, দেহের উপর রোযার কি প্রভাব পড়ে এবং কিভাবে পড়ে ? কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা মতে রোযায় দৈহিক কর্মক্ষমতা হ্রাস ও শারীরিক দুর্বলতা সৃষ্টি করে না। কেননা রোযা রাখার দ্বারা কেবল দুই খাবারের মধ্যবর্তী সময়কাল সাধারণ সময়ের তুলনায় একটু বেশি হয়ে যায়। বস্তুত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমষ্টিগতভাবে এ পরিমাণ তাপ বা আহার্য এবং পানীয় শরীরে অর্জিত হয়, যা রমাযান ব্যতীত অন্য মাসে অর্জিত হয় না। তদুপরি সুস্পষ্টত, রমাযান মাসে মানুষেরা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য এবং উত্তেজক দ্রব্য সাধারণ দিনের তুলনায় বেশিই ব্যবহার করে থাকে। এ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, সমষ্টিগত আহার্য অন্য সময়ের তুলনায় রোযার মাসে দেহে অধিক পরিমাণে অর্জিত হয়।

স্বকীয়ভাবে এসব ভিন্ন মতাদর্শের সত্যতা ও অসত্যতা প্রমাণ করা বা তাদের সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে রোযাদারদের দেহের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এতৎসংক্রান্ত ১৩ জন সদস্যের একটি দল গঠন করা হয়েছিল। তন্মধ্যে একজন গর্ভবতী (৬ মাসের) মহিলাও অন্তভুক্ত ছিল। আবার ২৭ বছর বয়স্ক একজন বে-রোযাদার পুরুষও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে ১৪ জনের উপর সমীক্ষা চালানো হল। পর্যবেক্ষণকালীন সময়ে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিকে বিস্তারিতভাবে রেকর্ড করা

(১) ওজন বা পরিমাণ, (২) দৈহিক উচ্চতা (৩) শিরা ও ধমনী, (৪) রক্তচাপ, (৫) বি.এম.পি (৬) দৈহিক প্রবহমান তরল পদার্থ, (৭) রক্ত ও প্রস্রাবের রাসায়নিক বিশ্লেষণ।

## কর্মপদ্ধতি ও মাধ্যম

উক্ত গ্রুপে (একজন গর্ভবতী মহিলা ব্যতীত) তিনজন যথাক্রমে ১৭, ২৭ ও ৪০ বছর বয়স্কা মহিলাও ছিল। গ্রুপের পুরুষদের বয়সকাল ২২ থেকে ২৯ বছর পর্যন্ত ছিল (গড়ে ৩৩)। তাদের দৈনন্দিন সাধারণ খাবারের পরিমাণ আড়াই থেকে তিন হাজার ক্যালরী নির্ধারণ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে কোনো প্রকার দৈহিক অসুস্থতা বা সংক্রামক ব্যাধি ছিল না। রমাযানের এক সপ্তাহ পূর্বে সকলেরই ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছিল। যেন পরবর্তী অবস্থার মোকাবেলা করা যেতে পারে। তখন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রস্রাব ও রক্তের পর্যবেক্ষণের জন্য নাস্তার পূর্বে খালি পেটে কিছু পদার্থ গ্রহণ করা হয়েছিল। তেমনিভাবে রোযার সময়ও সেই পদার্থগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল ইফতারের সময় শুধু এক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করার পর।

## ফলাফল

ওযনের সংক্ষিপ্ত হিসাব ছিল নিম্নরূপ । তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোযা রাখে নি তার ওজনে তেমন কোনো পরিবর্তন আসে নি। কেননা সাধারণ অবস্থাতেও দেহের ওজন সাধারণত কমবেশি হয়েই থাকে। এখানে আমরা ওই ব্যক্তির পরিবর্তন "না" দ্বারা স্পষ্ট করে দিচ্ছি।

| ওজন পাউণ্ড | রমাযানের পূর্বে | ১লা রমাযানে | ১০ রামযানে | শেষ রমাযানে | ৪ সপ্তাহ পর |
|---|---|---|---|---|---|
| না | ১৪২ | ১৪০ | ১৪০ | ১৪২ | ১৪২ |
| রোযা পালনকারীদের গড় | ১২২ | ১২২ | ১২১ | ১১৯ | ১২১ |
| গর্ভবতী মহিলা | ১০৬ | ১০৬ | ১০৮ | ১১০ | ১১৭ |

(উল্লেখ্য যে, গর্ভাবস্থায় স্বভাবতই ওজন বৃদ্ধি পায়।)

উপরে রোযাদারের ওজনের গড় বর্ণনা করা হল। কিন্তু এখানে ২ জনের ওজন ৭ পাউণ্ড কম হয়ে যায়। একজনের ওজনে কোনো পরিবর্তন

হয় নি। আর গর্ভবতী মহিলার ওজন রমাযানের মধ্যে চার পাউণ্ড বৃদ্ধি পাওয়া যায়। ৭ ব্যক্তির ওজন ৪ সপ্তাহ পর পূর্বের মতোই থেকে যায়।

ধমনী এবং তাপমাত্রায় রোযার কোনো প্রভাব পড়ে নি। আর রক্তের মধ্যে হিমোগ্লোবিন এর পরিমাণ রমাযানের মধ্যে পূর্বের অবস্থায় বহাল থাকে। তেমনিভাবে সমষ্টিগতভাবে রক্তের চাপে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নি। রমাযানের মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি। গর্ভবতী মহিলার মধ্যে একটু বেশি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। তার কারণ ছিল গর্ভধারণ।

| ওজন পাউণ্ড | রমাযানের পূর্বে | ১লা রমাযান | ১০ই রমাযান | শেষ রমাযান | রমাযানে পর |
|---|---|---|---|---|---|
| না | ৯২ | ৮৭ | ৯০ | ৮৮ | ৯৩ |
| রোযাদার গ্রুপ | ৮৪ | ৮০ | ৮০ | ৭৪ | ৭৬ |
| গর্ভবতী মহিলা | ৮৮ | ৮৪ | ৭২ | ৬৯ | ৮১ |

খাদ্যের সুগার কোনো ব্যক্তির সর্বনিম্ন সাধারণ পরিমাণের (৭০ মি. গ্রা.) চেয়ে নিচে নামে নি।

তাছাড়া রক্তের রাসায়নিক উপাদান পূর্ণ রমাযানে স্বাভাবিকই ছিল। তন্মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নি।

## দেহের আর্দ্রতা ও প্রস্রাব নির্গত হওয়া

উক্ত গ্রুপের লোকেরা সাধারণত রোযা অবস্থায় ২৪ ঘণ্টায় পানি অন্য সময়ের মতোই ব্যবহার করেছে। আর প্রস্রাবের পরিমাণ কয়েকজনের মধ্যে কম ছিল এবং বাকীদের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে স্বাভাবিক ছিল। উল্লেখ্য যে, বে-রোযাদারদের মধ্যেও কখনো কখনো প্রস্রাব পরিমাণে কম হতে দেখা যায়। তাই হয়তো প্রস্রাবের পরিমাণ স্বাভাবিক কারণেই কমে গিয়েছে।

প্রস্রাবের ঘনত্বের (Specific Gravity) মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নি। এ অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝা যায়, রোযা রাখার কারণে শরীরে যদি কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তবে তা কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। রমাযানে মূত্রথলীর কার্যাবলী স্বাভাবিকই ছিল। যেমনটি পূর্বেও বলা হয়েছে। তবে এক সমীক্ষায় দেখা যায়, কয়েকটি রোযা রাখার পর

কিছু লোকের ওজন হ্রাস পেয়েছিল এবং ব্লাডে সুগারের পরিমাণও কমে গিয়েছিল। তবে এ পরিবর্তন স্বাভাবিক সীমানার চাইতে নিচে যায় নি। ব্লাডে সুগারের পরিমাণ বিশেষত তখনি হ্রাস পায়, যখন দিনের বড় অংশ অতিবাহিত হয়ে যায়।

প্রকাশ থাকে যে, এ সমীক্ষা চালানো হয়েছিল এমন লোকদের উপর, যারা শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন। কাজেই কিডনীসহ অন্যান্য ব্যাধিগ্রস্থ লোকদের ব্যাপারেও একই রিপোর্ট পাওয়া যাবে –এরূপ মনে করা ঠিক নয়।

দিনের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে গেলে কাজ-কর্মে তেমন একটা উৎসাহ অনুভূত হয় না। অনেকে মন্তব্য করেছেন, সম্ভবত এর কারণ ব্লাডে সুগারের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া। কেননা ইফতার করার পর এ অবস্থা অল্পক্ষণের মধ্যেই দূর হয়ে যায়।

## রোযা সুস্বাস্থ্যের
## এক নযিরবিহীন পদ্ধতি

আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি প্রাণীর শরীরের জন্য বিশেষ এক নিয়ম-নীতি দান করেছেন। সুতরাং যখন সে নিয়মিত খাদ্য ও পানীয় পরিমাণ মতো না পায়, তখন তার জীবিত থাকা মুশকিল হয়ে যায়। যে দিক থেকে তার খাদ্যে অনিয়ম দেখা দিবে, সে দিক থেকেই তার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়বে। অন্যান্য প্রাণী নিজের খাদ্য নিজেদের অনুভূতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মানবজাতি আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা ও জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য প্রাণীর বিপরীতে প্রায়ই সাধারণ নিয়মের সীমা অতিক্রম করে যায় এবং নিজের শারীরিক শৃঙ্খলা নষ্ট করে দিয়ে নিজেই বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির কারণ হয়। তাই অন্যান্য প্রাণীর রোগ-ব্যাধির সাথে মানুষের রোগ-ব্যাধির কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তার খোদা প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে অথবা ঔষধ সেবনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করে থাকে বরং বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের উপায় হিসেবে এ পর্যন্ত যা তারা নির্ধারণ করেছে, তা হল, কখনো কখনো কিছু সময়ের জন্য পানাহার বন্ধ রেখে পাকস্থলী খালি রাখতে হবে। আর পাকস্থলীর উপরই শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করে।

দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্ম ও শরী'অত তার অনুসারীদের জন্য এ পদ্ধতিই নির্ধারণ করছে। একে ধর্মীয় পরিভাষায় রোযা বলে। হিন্দুরাও ২৪ ঘণ্টার ব্রত বা রোযা পালন করে। তারা ব্রতকালে শস্য অথবা আগুনে রান্না করা কোনো জিনিস খায় না। অবশ্য কাঁচা দুগ্ধ, পানি, হুক্কা ইত্যাদি পান করায় তাদের রোযার কোনো ক্ষতি হয় না। বর্তমান যুগের খ্রিস্টানগণ তো শুধু মাছ-গোশত অথবা আরো দু'একটা জিনিস পরিহার করে বাকি সব জিনিস পানাহার করেও একে রোযা বলে সাব্যস্ত করে। এমনভাবে ইহুদিদের রোযায়ও কয়েকটি জিনিস আছে, যেগুলি রোযার মধ্যে খাওয়া নিষিদ্ধ নয়।

ইসলামি শরী'আতের বিধান অনুযায়ী একাধারে পূর্ণ এক চন্দ্রমাস রোযা রাখতে হয়। চন্দ্রমাস ও সৌরমাসে বছরে দশ দিনের পার্থক্য হয়। তাই ছত্রিশ বছরে শীত ও গরম উভয় মৌসুমেই রোযা এসে যায়। এমনিভাবে প্রায় পঞ্চাশ বা তদূর্ধ্ব বয়সী মুসলমান উভয় মৌসুমে রোযা রাখার অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

রমাযানের রোযা প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্ক সাবালক ব্যক্তির উপর ফরয। এছাড়া অন্যান্য রোযাও মনে চাইলে রাখতে পারে। এ রোযাকে নফল রোযা বলে। ইসলামি রোযার সময় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং এ সময়ে সর্বপ্রকার পানাহার, স্ত্রীসহবাস তথা সহবাসের ভূমিকা স্বরূপ কাজগুলোও নিষিদ্ধ। পান, বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা এবং নস্যি ইত্যাদি হতে বিরত থাকা জরুরি। এ জাতীয় কোনো জিনিস ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যায়।

রোযাই নিজেকে কন্ট্রোল করার এক নজির বিহীন দৃষ্টান্ত ও মাধ্যম। উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা যখন প্রথম গরমের মৌসুমে রোযা রাখে, তখন তাদের জন্য পিপাসা সহ্য করাও বিরাট সাহসিকতার পরিচয়। ওযু করার সময় যখন কুলি করে, তখন এক ফোটা পানিও গলা থেকে নিচে নামতে দেয় না। বিশেষত গোসল খানায় যখন তাকে কেউ দেখতে পায় না, তখনও পানি পান থেকে বিরত থাকা একটি আশ্চর্যজনক বিষয়।

আত্মিক ও চারিত্রিক উপকারিতা ছাড়াও ইসলামি রোযা ভাইরাস রোগ ও শরীরের দূষিত পর্দাথের জন্য সাবানের কাজ করে। নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করার শক্তি সঞ্চার করে। আর ইফতারের

সময় একজন রোযাদার যেরূপ খাওয়া দাওয়ার আনন্দ উপভোগ করে, তা বলে শেষ করা যাবে না।

বর্তমান যুগের ডাক্তার ও চিকিৎসকগণ ইসলামি পদ্ধতির রোযার মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য এবং এ রোযার উপকারিতার কথা স্বীকার করেছেন বরং কোনো কোনো রোগের জন্য ঔষধ হিসেবেও ইসলামি পদ্ধতির রোযা রাখার সুপরামর্শ দান করেছেন।

এ ব্যাপারে আরও স্মরণে রাখতে হবে, ইসলাম কারও উপর তার ক্ষমতার বেশি বোঝা চাপানোর পক্ষপাতি নয়। সুস্থ থাকা অবস্থায় কোনও গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী নারীর উপর রোযা ফরয নয়। কেননা এ অবস্থায় সুস্থতা বিনষ্ট হয়। অবশ্য এ থেকে সে সকল রোগ বাদ থাকবে, যেগুলির মধ্যে চিকিৎসক রোযাকেই ঔষধ হিসেবে নির্ধারণ করেন। এমনিভাবে একাধারে প্রতিদিন সারা বছর রোযা রাখাও নিষিদ্ধ। কারণ, এতে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়।

**একটি প্রশ্ন**

এক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতগণ একটি প্রশ্ন করে থাকেন। সেটি হল, উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু যেখানে দিন হয় ছয় মাসে এবং রাত হয় ছয় মাসে অর্থাৎ তাদের একদিন আমাদের এক বছরের সমান হয়। সেখানে তো কুরআনে বর্ণিত সময় অনুযায়ী অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা রাখা একজন মানুষের শক্তির বাইরে এবং অসম্ভব কাজ নয় কি? এ প্রশ্নের জবাব হল, আমরা প্রথমেই বলেছি, ইসলাম কারও উপর তার সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপানোর পক্ষপাতি নয়। দ্বিতীয়ত সেখানকার বাসিন্দাগণ যেভাবে কাজকর্ম, শোয়া, খাওয়ার জন্য সময় নির্ধারণ করে থাকে, তেমনিভাবে নামায পড়া ও রোযা রাখার সময়ও নির্ধারণ করতে পারে।

যেমন একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইয়াজুজ-মাজুজের সময় একদিন এক বছরের সমান হবে। তখন সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, তখন কি আমাদের একদিনের নামাযই যথেষ্ট হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– না, তোমরা নামাযের জন্য সময়ের অনুমান করে নিবে।

প্রফেসর বি.এন. নিকেটন দীর্ঘায়ু লাভ সম্বন্ধে নিজের আবিষ্কৃত একটি ঔষধের উপকারিতা প্রসঙ্গে ১৯৬০ সালের ২২ শে মার্চ লণ্ডনে একটি গবেষণা প্রতিবেদনে বলেন : যদি কেউ নিম্নের তিনটি নিয়ম পূর্ণাঙ্গভাবে সারাজীবন পালন করে, তা হলে তার শরীরের দূষিত পদার্থ বের হয়ে যাবে এবং বৃদ্ধাবস্থা প্রতিরোধ করবে।

প্রথমত মেহনত খুব বেশি করতে হবে। এমন একটি পেশা গ্রহণ করতে হবে, যা মানুষকে ব্যস্ত রাখে, তা হলে শরীরের রগ থাকবে সতেজ। তবে এ জন্য শর্ত হল এরূপ ব্যস্ততা মানসিক দিক থেকে শক্তিবর্ধক হতে হবে। যদি কাজটি ভালো না লাগে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিবেন।

দ্বিতীয়ত যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম করবেন। বিশেষভাবে চলাফেরা খুব বেশী করতে হবে।

তৃতীয়ত পছন্দ মাফিক খাদ্য খেতে হবে। কিন্তু প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার উপবাস থাকতে হবে।

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বছরে একমাসের রোযা ছাড়াও প্রতিমাসে তিনটি নফল রোযা রাখতেন এবং বলতেন, তোমরা রোযা রাখ। সুস্থ থাকবে।

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জীবনের শেষ সময় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন, তখন হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) কে যে ওসিয়ত করেছিলেন, তাতেও প্রতিমাসে তিনটি করে রোযা রাখার ব্যাপারে বেশ তাগিদ করেছেন।

## খেজুর দ্বারা ইফতার ও আধুনিক বিজ্ঞান

### গুরুত্ব ও তাৎপর্য

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, খেজুর দ্বারা ইফতার করা সম্ভব হলে তা দ্বারাই ইফতার করবে। আর যে ব্যক্তি খেজুর না পায় সে পানি দ্বারাই ইফতার করবে। কেননা তাও পবিত্র (নাসায়ী) সারাদিন রোযা রাখার পর শরীরের শক্তি কমে যায়। সুতরাং ইফতার এমন জিনিস দ্বারা করা উচিত, যা দ্রুত হজম হয়, ও শক্তি বর্ধক হয়।

## খেজুরের রাসায়নিক উপাদানের তালিকা

| | |
|---|---|
| প্রোটিন | ২.০০ |
| কার্বহাইড্রেট | ২৪.০০ |
| ক্যালরি | ২.০০ |
| সোডিয়াম | ৪.৭০ |
| পটাশিয়াম | ৭৫৪.০০ |
| ক্যালসিয়াম | ৬৭.৯০ |
| ম্যাগনেসিয়াম | ৫৮.৯০ |
| কপার | ০.২১ |
| আয়রণ | ১.৬১ |
| ফসফরাস | ৬৩৮.০০ |
| সালফার | ৫১.৬০ |
| ক্লোরিন | ২৯০.০০ |

এছাড়া খেজুরে আরও অন্যান্য পদার্থও পাওয়া যায়। সাহরীর পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো কিছু পানাহার করা হয় না এবং শরীরের ক্যালরী অথবা স্নায়ুবিক শক্তি একাধারে কমতে থাকে। এ জন্য খেজুর স্বাভাবিক প্রকৃতি ও উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য। এটা ভক্ষণ করলে স্নায়ুবিক শক্তি স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং শরীর বিভিন্ন প্রকারের রোগব্যাধি থেকে বেঁচে যায়। অন্যথায় শরীরের স্নায়ুবিক শক্তি ও তাপমাত্রা কন্ট্রোল করা না গেলে নিম্নোক্ত রোগগুলি সৃষ্টি হয়।

লো ব্লাড প্রেসার, প্যারালাইসিস, ফ্যাসিয়াল প্যারালাইসিস এবং মথাঘোরা ইত্যাদি। খাদ্যগুণ কম থাকার কারণে রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য ইফতারের সময় আয়রণ যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন। আর কুদরতীভাবেই খেজুরের মধ্যে তা রয়েছে। কিছু কিছু লোকের শরীর শুষ্ক হয়ে যায়। এ জাতীয় লোক যখন রোযা রাখে, তখন তাদের শুষ্কতা আরও বৃদ্ধি পায়। এজন্য খেজুর স্বাভাবিক প্রকৃতির হওয়ায় তা রোযাদারদের জন্য বিরাট

উপকারী। গ্রীষ্মকালে রোযাদারগণ বেশ পিপাসার্ত থাকেন। তারা যদি ইফতারের সময় প্রথমেই ঠাণ্ডা পানি পান করে নেন, তা হলে পাকস্থলীতে গ্যাস, তাপ ও লিভার ফুলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যদি রোযাদার খেজুর খাওয়ার পর পানি খায়, তা হলে নানা রকম বিপদ থেকে বেঁচে যায়।

## মানবীয় প্রয়োজন ও আধুনিক বিজ্ঞান

### গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মলত্যাগ মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি আমলে মানবজাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও আরামের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিন্দেগীর প্রতি লক্ষ্য করা হলে দেখা যাবে, ইসলাম মানুষের প্রতিটি কদমে কদমে রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চিয়তা প্রদান করে। বর্তমানে দুনিয়া পুনরায় সেই পদ্ধতির প্রতিই ধাবিত হচ্ছে, যে পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জীবন যাপনের আদেশ করেছেন এবং তিনি নিজেও জীবন যাপন করেছেন।

### মলত্যাগের জন্য দূরে গমন করা

হাদীসের কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মলত্যাগের জন্য অনেক দূর বেরিয়ে যেতেন। বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে অধিক চলাফেরা করার কথা বলে। আমেরিকার বড় বড় হাসপাতালগুলোতে এ বিষয়ে যথেষ্ট বির্তক হয়েছে যে, সর্বপ্রথম পা সৃষ্টি হয়েছে, নাকি চর্বি? গবেষণার পরে জানা গেছে, সর্বপ্রথম পা সৃষ্টি হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জাতিকে পায়ে হেঁটে চলাফেরা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। একজন বায়োকেমিষ্ট্রি বিশেষজ্ঞ খুবই সূক্ষ্ম একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেন, যখন থেকে শহরের পরিধি বাড়তে লাগল, জনপদ বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং ক্ষেত খামার বেশি হতে লাগল, তখন থেকেই রোগ-ব্যাধির প্রকোপ বাড়তে আরম্ভ করেছে। কেননা যখন থেকে মানুষ দূরে গিয়ে মলত্যাগের অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে, তখন থেকেই পেটে গ্যাস হওয়া, কষা, পাকস্থলীর তাপমাত্রা এবং হৃদরোগ বেড়ে গিয়েছে। চলাফেরা করলে অন্ত্রেও নড়াচড়া বৃদ্ধি পায়, যার ফলে মলত্যাগও হয় আরামপ্রদ

কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের মলত্যাগ আরামপ্রদ হয় না। তাই দীর্ঘ সময় ইস্তেঞ্জা খানায় বসে থাকতে হয়।

## কাঁচা মাটিতে মলত্যাগের উপকারিতা

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মলত্যাগের জন্য নরম মাটি বেছে নিতেন।

বিশিষ্ট স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী লেভেন পাওয়েল উসূলে ছিহহাত নামক গ্রন্থে লিখেন, মানবজাতির জীবন-মরণ উভয়ই মাটিতে নিহিত। যখন থেকে আমরা মাটিতে মলত্যাগ ছেড়ে দিয়েছি এবং শক্ত জমিন তথা ফ্লাশ ইত্যাদি ব্যবহার আরম্ভ করেছি, তখন থেকেই পুরুষদের যৌন দুর্বলতা এবং পাথরী রোগ অধিক হারে দেখা দিয়েছে এবং এর প্রভাব প্রোস্টেট গ্রন্থিতেও পড়ছে।

মূলত মানুষের শরীর থেকে যখন মল বের হয়, তখন মাটি তার জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া) ও বিষাক্ত প্রভাবকে চুষে নেয়। কিন্তু জমিন যদি শক্ত হয়, তা হলে ওই বিষাক্ত প্রভাব ও জীবাণু পুনরায় শরীরে ফিরে আসে এবং মানুষের শরীর তখন সুস্থতার পরিবর্তে অসুস্থতার দিকে ধাবিত হয়।

## বসার পদ্ধতি

মলত্যাগের জন্য বসার পদ্ধতি সম্বন্ধে হাদীসের কিতাবসমূহে যথেষ্ট বিশ্লেষণ রয়েছে।

সুন্নত অনুযায়ী মলত্যাগের জন্য বসলে বিভিন্ন উপকারিতা পাওয়া যায়। আমি এর উপকারিতা ও বিজ্ঞানের নিয়ম আলোচনা করতে গিয়ে ফিজিওলজীর একজন সিনিয়র প্রফেসরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি বলেন, আমি মরক্কো থাকাকালে জ্বরের ঔষধের জন্য একজন ইহুদি ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার ছিলেন খুবই বৃদ্ধ। তাই তার কাছে রোগীদের ভিড় কমই ছিল। যখন আমি নিজের নাম লেখালাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মুসলমান? আমি উত্তর দিলাম– হ্যাঁ, মুসলমান এবং পাকিস্তানী। তিনি বললেন, তোমাদের পাকিস্তানে যদি তোমাদেরই নবীর একটি তরীকা উজ্জীবিত হয়ে যায়, তাহলে পাকিস্তানীরা কয়েকটি রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। আমি আশ্চর্য হয়ে তার কাছে জিজ্ঞেস করলাম– সে তরীকাটি কি? উনি বললেন : মলত্যাগের জন্য যদি ইসলামি

পদ্ধতিতে বসা যায়, তা হলে এ্যাপেনডিসাইটিস, সর্বদা কষা, পাইলস এবং হৃদরোগ হবে না। এরপর তিনি বললেন– আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, সমস্ত মুসলমান যদি এ নিয়মেই মলত্যাগ করে, তা হলে উল্লিখিত রোগসমূহ থেকে বেঁচে যাবে।

পাকিস্তানী প্রফেসার বলেন, তখন আমার এ পদ্ধতিটি জানার আগ্রহ বাড়ল। আমি তার কাছে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে সেখানেই উপস্থিত একজন আলেমের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি যখন আমাকে উক্ত পদ্ধতিটির বিশ্লেষণ দিলেন, তখন আমি এর উপর আমল আরম্ভ করলাম। কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এর উপকারিতা আমার সম্পূর্ণরূপে বুঝে এসে গেল। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি ইস্তেঞ্জার জন্য উক্ত পদ্ধতিই ব্যবহার করি।

আধুনিক বিজ্ঞান হুযুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইস্তেঞ্জার এ পদ্ধতি নিয়ে রিসার্চ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, সুস্থতা ও সুন্দর জীবন যাপন এবং আর্থিক উন্নতির জন্য এ পদ্ধতির চেয়ে উপকারী আর কোনো পদ্ধতি নেই। এ পদ্ধতিতে গ্যাস, পাকস্থলীর তাপমাত্রা, বদহজম, কষা এবং মূত্রাশয় রোগ কমে যায় এবং একাধারে এ নিয়ম পালন করলে এ রোগ সম্পূর্ণরূপে ভালো হয়ে যায়।

## ইস্তেঞ্জার জন্য ঢিলার ব্যবহার

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তেঞ্জার জন্য বেজোড় সংখ্যায় ঢিলা ব্যবহার করতেন। (তিরমিযী)

বিজ্ঞানের সর্বশেষ রিসার্চ অনুযায়ী মাটিতে এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং উৎকৃষ্ট মানের রোগ প্রতিরোধক পদার্থ রয়েছে। যেহেতু পেশাব-পায়খানা পুরোটাই ময়লা, জীবাণু এবং রোগ-ব্যাধিপূর্ণ। তাই এ মলমূত্র মানুষের শরীরে লাগলে খুবই ক্ষতি হয়। আর যদি তার কিছু অংশ শরীরে আটকে থাকে অথবা হাতে লেগে থাকে, তাহলে অগণিত রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে।

ডাক্তার হুলুক লিখেন, ঢিলার ব্যবহার বিজ্ঞান এবং গবেষণা জগৎকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছে। কেননা মাটির যে কোনো অংশই জীবাণুনাশক। যখন ঢিলা ব্যবহার করা হয়, তখন গুপ্তাঙ্গে মাটি লাগার

কারণে বাইরের অংশে বিদ্যমান জীবাণু মৃত্যুবরণ করে বরং গবেষণা দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, ঢিলা ব্যবহার করলে পেনিস (পুরুষাঙ্গ) ক্যান্সার থেকে নিরাপদ থাকে। আবার যদি হাড় দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা হয়, তাহলে অন্যান্য রোগ-জীবাণুর সাথে তার বিশেষ জীবাণু দেহে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। তাছাড়া হাড় হল অসমতল ও অমসৃণ বস্তু। যার দ্বারা মানবদেহ ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যে সকল রোগীর পেনিসে যখম এবং ক্ষত হয়ে গিয়েছিল, আমি সে সকল রোগীকে ঢিলা ব্যবহার করিয়েছি এবং তাদেরকে মাটি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতে বলেছি। এতে রোগী আশ্চর্যজনকভাবে সুস্থতা লাভ করেছে।

মোটকথা, এ মাটির তৈরি মানুষ মাটি দ্বারাই মুক্তি লাভ করবে। দুনিয়ার যত ফরমুলাই সে ব্যবহার করুক।

## টয়লেট পেপার ও আধুনিক বিজ্ঞান

টয়লেট পেপার ফ্যাক্টরীর একজন কর্মচারীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমি তার কাছে প্রশ্ন করলাম, টয়লেট পেপারে মারাত্মক কোনো ক্যামিক্যাল ব্যবহার করা হয় কি না? আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন, তা পাঠকগণের খেদমতে উপস্থাপন করা হল।

"টয়লেট পেপার তৈরি করতে অগণিত ক্যামিক্যাল ব্যবহার করতে হয়। তন্মধ্যে কোনো কোনো ক্যামিক্যাল এত বিপদজ্জনক যে, তা দ্বারা চর্মরোগ, একজিমা ও স্কীনের কালার পরিবর্তনকারী যে কোনো ভয়াবহ রোগ জন্ম নিতে পারে।"

বর্তমান যুগে পুরো ইউরোপের লোকজন টয়লেট পেপার ব্যবহার করে। কিছুদিন পূর্বে খবরের কাগজে দেখা গেছে, বর্তমানে সারা ইউরোপের মানুষের পেনিসে ভয়াবহ রোগ বিশেষত ক্যান্সার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তখন এর কারণ উদঘাটনের জন্য গবেষণা বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। ওই বোর্ডের রিপোর্ট শুধু দুটি জিনিসকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। একটি হল ইস্তেঞ্জার সময় টয়লেট পেপার ব্যবহার করা আর দ্বিতীয়টি হল পানি ব্যবহার না করা।

## গোবর ও হাড় দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গোবর ও হাড় দ্বারা ইস্তেঞ্জা করো না। (যাদুল মা'আদ) গোবরের মধ্যে থাকে অসংখ্য রোগ জীবাণু। কেননা গোবর হল বিষ্টা আর প্রতিটি বিষ্টাই রোগ জীবাণু দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। গোবরের মধ্যে পেশী সংকোচন টিটেনাস (Titenus) এবং টাইফয়েড (Typhoid) রোগের জীবাণু থাকে। এর দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা হলে এসব রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

হাড় ফেলে দেওয়ার পর তা জীব-জন্তুরা খায়। কতক জন্তুর মুখের লালায় থাকে মারাত্মক রোগ-জীবাণু। যেমন : কুকুরের মুখের লালায় থাকে একধরনের বিশেষ রোগ-জীবাণু। যা তার খাওয়া হাড়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। তদুপরি হাড়ের উপর থাকে ধুলাবালু, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি। সেই ময়লা আবর্জনার মধ্যেও থাকে নানান ধরনের রোগ-জীবাণু।

## দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার নিষেধাজ্ঞা

✪ নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে তার ভিতরগত ও বাহ্যিক ক্ষতিসমূহ বৃদ্ধি পায়। প্রস্রাব হল রোগ-জীবাণু দ্বারা পরিপূর্ণ একটি পদার্থ। কখনো তার মধ্যে রোগের কারণে মূত্রদ্বারে জ্বালা-পোড়া, পুঁজ, রক্ত নির্গত হওয়া ও কিডনীতে ইনফেকশন ইত্যাদি বিদ্যমান থাকার কারণে তা প্রস্রাবের সাথে বিদ্যমান থাকে। অতএব দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে তার ছিঁটা শরীর ও কাপড়-চোপড়ে লেগে যায়।

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে কিডনীতে এর খারাপ প্রতিক্রিয়া পড়ে এবং ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি পায়। যার কারণে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া, ফোঁটায় ফোঁটায় প্রস্রাব আসা, প্রস্রাবে কষ্ট হওয়া, বীর্য পাতলা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

## গোসল খানায় প্রস্রাব করা নিষেধ

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসংখ্য হাদীসের মধ্যে গোসল খানায় প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এতে মনের ভিতর বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হয় এ ব্যাপারে আমি অনুসন্ধান শুরু করলে অনেকেই আমাকে বলেছেন তারা না কি একটি ম্যাগাজিনে লিখ

দেখেছেন, গোসলখানায় পেশাব করলে কামভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। অনুরূপভাবে গোসলখানায় পেশাব করলে মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

## কাঁচা ও পাকামাটির পার্থক্য

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানার জন্য নরম স্থান/মাটি তালাশ করতেন। কেননা কোমল ও উর্বর মাটি সব কিছুকে শোষণ করে ফেলে। যেহেতু প্রস্রাব-পায়খানা হল রোগ-জীবাণুপূর্ণ একটি পদার্থ, তাই এর জন্য এমন মাটি চাই যা তাকে শোষণ করতে পারে এবং পেশাবের ছিঁটে এসে শরীর ও কাপড়ে লাগতে না পারে। আর তা পাকা জায়গায় সম্ভব নয়। সেখানে ছিঁটা লাগার পূর্ণ সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাছাড়া সেগুলি শোষণ করার ক্ষমতা তার নেই। প্রস্রাব-পায়খানার দ্বারা সৃষ্ট গ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

## পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা

আমার এক বন্ধু বলছিল, আমার এক নিকট আত্মীয় ইংল্যাণ্ডে বসবাস করত। সে একবার আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসল। কিছু দিন থাকল আমার বাড়ীতে। একদিন আমার ছোট মেয়ে বলল, আম্মু! আংকেল রং বেরঙের পায়খানা করেন। আমরা মনে করলাম, ও তো ছোট মানুষ। হয়ত এমনিই কথাটা বলছে। কিন্তু কথাটি সে বারবার বলতে থাকলে আমরা টয়লেটে গিয়ে দেখি যে, ভদ্রলোক পানি ব্যবহার করেন না বরং শুধু রং বেরঙের টিসু বা টয়লেট পেপারই ব্যবহার করেন।

কলুষিত ও দুর্গন্ধময় ইউরোপীয় জীবন। সেখানে তারা পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করে না। যার কারণে সেই দুর্গন্ধময় ময়লা-আবর্জনা শরীরে আটকে থাকে এবং বিভিন্ন রোগের কারণে পরিণত হয়।

লণ্ডনের হার্ড স্টেটের বিশিষ্ট ডাক্তার "কেনন ডেভিস" সমগ্র ইউরোপীয় জাতিকে কড়া সতর্ক করে বলেছেন : তোমরা যদি এভাবেই জীবন যাপন করতে থাক, তা হলে নিম্নোক্ত রোগ-ব্যাধির জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। লিঙ্গ ক্যান্সার, ভগন্দর, চর্ম ইনফেকশন (Skin Infections) ও ফুসফুসের রোগ।

পানি হল এ জগতের সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত। এটা যাবতীয় কলুষতাকে পবিত্রতায় রূপান্তরিত করে দেয়। ইসলাম পরিচ্ছন্নতা পদ্ধতিকে এত সুস্পষ্ট করে দিয়েছে, যেন পানি আমাদেরকে আমলের দিকে আহবান করছে।

জ্যান্ট মিলন নামের জনৈক খ্রিস্টান বলেন, ইসলাম হল পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার ধর্ম। সকল ধর্মাবলম্বীগণ ইসলাম ধর্ম থেকে তার পরিচ্ছন্নতার অধ্যায়কে পূর্ণ করে থাকে। দেহের কোনো অংশ অপবিত্র হলে পানি ব্যবহার ছাড়া ওই অংশকে পরিষ্কার করলে দেখা যাবে, তা ভালোভাবে পরিষ্কার হয় নি। (সাইন্স আওর সিহহাত)

তাছাড়া পানি ব্যবহার করলে শরীরের ওই অংশের তাপমাত্রা নর্মাল হয়ে যায়। আর ইস্তেঞ্জার সময় পানি ব্যবহার করা না হলে পূর্ণ শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং দেহ অসংখ্য রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

## প্রস্রাব থেকে সতর্ক থাকুন, রোগ থেকে রক্ষা পাবেন

✪ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা প্রস্রাব থেকে সতর্ক থাক। কেননা কবরের অধিকাংশ আযাব প্রস্রাবের কারণেই হয়ে থাকে।

জ্যান্ট মিলন বলেন, আমার নিকট খোস-পাঁচড়া, ফোঁড়া, চর্ম খসে যাওয়া, নিতম্বের আশপাশে এলার্জি, গোপন অঙ্গের ক্ষত ইত্যাদির রোগী আসলে তার কাছে আমার সর্বপ্রথম প্রশ্ন থাকে, তুমি কি প্রস্রাব থেকে সতর্ক থাক? তন্মধ্যে দেখা যায়, অধিকাংশ লোকই প্রস্রাব থেকে সতর্ক থাকে না; যার কারণে এরূপ দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আমার নিকট আসে। (সাইন্স আওর সিহহাত)

প্যান্টের চেইন খুলে প্রস্রাব করে পানি দ্বারা পবিত্র না হয়েই আবার চেইন এটে দিলে প্রস্রাবের ফোঁটা শরীরে লাগতে থাকে। যদ্বারা চর্মরোগসহ অসংখ্য রোগ সৃষ্টি হয়। সুবহানাল্লাহ্! ইসলাম কত সুন্দর ও পবিত্র ধর্ম! সে তার অনুসারীদেরকে কত রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। আজ ইউরোপীয়গণও পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করার প্রতি পুনরায় ঝুঁকে পড়েছে।

## বাতাসের দিকে মুখ করে প্রস্রাব করা

বাতাসের দিকে মুখ করে প্রস্রাব করলে বাতাসের চাপে প্রস্রাবের ছিঁটা উড়ে এসে শরীর ও চেহারায় পড়ে। এভাবে দেহ ও পোশাক অপবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এ অপবিত্রতা হল রোগ-ব্যাধির উৎস। তাই প্রস্রাবের জন্য এমন দিক নির্বাচন করা উচিত যেদিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হয় না।

## গর্তে প্রস্রাব করার নিষেধাজ্ঞা

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইঁদুর, সাপ ইত্যাদির গর্তে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। কেননা কোনো বিষাক্ত প্রাণীর গর্তে প্রস্রাব করলে সেই প্রাণী এসে তার ক্ষতি সাধন করতে পারে। তাছাড়া অনেক জায়গা থাকে লবণাক্ত আর সেই স্থানের গর্তের মধ্যে এসিড ও নাইট্রোজেন থাকে। সুতরাং সেখানে যদি প্রস্রাব করা হয়, যা খোদ এক প্রকার এসিড, এ উভয় প্রকার এসিড মিলে বিষাক্ত বাষ্প সৃষ্টি হয়ে মানব দেহে ক্ষতি সাধন করতে পারে।

## প্রস্রাবপায়খানার কতিপয় নিষিদ্ধ স্থান

কিছু কিছু স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করতে হাদীস বিশারদগণ নিষেধ করেছেন। যেমন :

### আবদ্ধ পানি

কূপ, পুকুর, ঝিল ইত্যাদি আবদ্ধ ও স্থির পানিতে প্রস্রাব-পায়খানা করলে সেই পানিতে ক্ষতিকর জীবাণু পতিত হয়ে সমস্ত পানি মরাত্মক ব্যাধির কারণ হয়ে যায়। এরপর কোনো প্রাণী সেখান থেকে পানি পান করলে টাইফয়েড, ভাইরাস জণ্ডিস, প্যারাসাইট (Parrasites) ইত্যাদি ব্যাধি তার দেহে প্রবেশ করতে পারে।

### প্রবহমান পানি

প্রবহমান পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ। কেননা এ পানি গ্রাম-গঞ্জ ঘুরে ঘুরে প্রবাহিত হয়। মানুষ ও প্রাণী সেই পানি দ্বারা উপকৃত হয়। কিন্তু যদি পেশাব পায়খানার সাথে সেই পানি মিশ্রিত হয়ে যায়, তা হলে তা রোগ-ব্যাধি ছড়াতে থাকে। তাই ভারত সরকার গঙ্গা নদীতে পেশাব-পায়খানা বা ময়লা পানি ফেলতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। গঙ্গাস্নানকরীদেরকেও তথায় পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছে।

### ছায়াদার ও ফলদার বৃক্ষের নিচে ও রাস্তায়

ছায়াদার বৃক্ষ হল মানুষের অবস্থান ও আরামের স্থান। এখানে প্রস্রাব-পায়খানা করা জঘন্য অপরাধ। আর ফলবান বৃক্ষের নিচে মানুষ বিশ্রাম করে এবং তার ফল নিচে পড়ে। এ ফল যদি ওই ময়লার উপর পড়ে, তা হলে তা মানুষের ভক্ষণের উপযোগী থাকবে না। আর চলন্ত রাস্তায় সকল

প্রকার মানুষের আনাগোনা থাকে। সেখানে যদি ময়লা-আবর্জনা থাকে, তা হলে সকল মানুষের জন্য তা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ সমস্ত কারণে এসব স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করতে ইসলাম নিষেধ করেছে।

## নামাযের পূর্বে ইস্তেঞ্জা করা

বস্তুত এ বিশেষ সূক্ষ্ম বিষয়টি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ওই মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে প্রস্রাব-পায়খানাকে আটকে রাখার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কেননা প্রস্রাব-পায়খানা আটকে রাখায় নানা ধরনের রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হতে পারে। এতে সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষতি হয় মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, স্নায়ু ও কিডনীতে। কখনো তো প্রস্রাব-পায়খানা আটকে গেলে বমী এবং মাথা ঘোরা শুরু হয়ে যায়।

## পায়খানার পর মাটি দ্বারা হাত পরিষ্কার করা

প্রস্রাব-পায়খানার পর মাটি দ্বারা হাত পরিষ্কার করলেও হাতে জীবাণু লেগে থাকে আর সেই জীবাণুগুলি কতক এমনও রয়েছে, যা সাধারণ পানি দ্বারা ধোয়া হলেও ধ্বংস হয় না। এ কারণে হাত মাটি দ্বারা পরিষ্কার করতে হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, মাটি হল একপ্রকার উন্নতমানের এন্টিসেপটিক। এমনকি তা কুকুরের রোগ-জীবাণুও ধ্বংস করে দেয়। আর সাধারণ রোগ-জীবাণুকে তো সাথে সাথেই ধ্বংস করে ফেলে।

## ডব্লিউ. সি. এবং কমোড-এর মধ্যে পার্থক্য

ইউরোপীয়ান ডব্লিউ. সি. (W. C.) হল এক ধরনের কমোড যাতে চেয়ারের মতো বসে পায়খানা করার ব্যবস্থা রয়েছে। এটা সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই অনুপযোগী। এ পদ্ধতি আবলম্বনে নিম্ন বর্ণিত রোগগুলি সৃষ্টি হয়

- স্নায়ুবিক খিঁচুনি।
- স্বস্থির সাথে পায়খানা না হওয়া।
- বড় নাড়ীতে পায়খানা আটকে থাকা।
- পায়খানা করার পর প্রস্রাবের ফোঁটা পড়ার সম্ভাবনা থাকা।

- এভাবে বসে বসে পায়খানা করার দ্বারা নাড়ী ও পাকস্থলীতে চাপ পড়ে না। তাই পাকস্থলী ও নাড়ীর অসংখ্য রোগ-ব্যাধি সৃষ্টিসহ সাথে সাথে এটা শরীরের প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী।

## কমোড

(COMODE)

এটা মানব প্রকৃতির অনেকটা নিকটবর্তী। তাই এর ক্ষতিকর দিক অনেক কম। কিন্তু কাঁচা ও নরম মাটিতে প্রস্রাব-পায়খানার উপকারিতাসমূহ এখানে পাওয়া যায় না। অবশ্য মাটি সব জায়গায় পাওয়া দুষ্কর বিধায় অন্তত এতটুকু যথেষ্ট।

## পবিত্রতা অর্জনের জন্য বাম হাত নির্ধারণ

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পবিত্রতা অর্জনের জন্য বাম হাত ব্যবহার করবে। (যাদুল মা'আদ)

উপরে বর্ণিত হয়েছে, শরীরের ডান হাত থেকে পজিটিভ আলোকরশ্মি বের হয়; বাম হাত থেকে নির্গত হয় নেগেটিভ আলোকরশ্মি। ইস্তেঞ্জা করার জন্য ডান হাত ব্যবহার করা হলে দেহের আলৌকিক সিস্টেম পরিবর্তন হয়ে যাবে, যার অশুভ প্রভাব পড়বে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের ওপর।

তদুপরি ডান হাত ব্যবহৃত হয় খাবারের জন্য আর সেই হাতই যদি আবার ইস্তেঞ্জার জন্য ব্যবহার করা হয়, তা হলে রোগ-জীবাণু খাবারের সাথে মিশ্রিত হয়ে শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে যেতে পারে।

## কিবলার দিকে মুখ না করা

কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে বসে প্রস্রাব-পায়খানা করতে হাদীসে নিষেধ রয়েছে। কাবাগৃহের চতুর্দিকে পজিটিভ বা ইতিবাচক আলোকরশ্মি (Postive Rays) সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে। আর প্রস্রাব, পায়খানা ও থুথু হল নেতিবাচক বিচ্ছুরণের অংশ। কাবার দিকে নিক্ষেপ করা ওই ব্যক্তির জন্য সার্বক্ষণিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

বিখ্যাত প্যারাসাইক্লোজিস্ট ডা. কমন বীমন তার সারা জীবনের গবেষণার আলোকে বলেছেন, কাবা শরীফ থেকে সর্বদা অনবরত এক ইতিবাচক আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই সেদিকে নেতিবাচক আলোকরশ্মির গতি অবশ্যই ক্ষতির কারণ হবে।

# ইসলামী পবিত্রতা পদ্ধতি ও ইউরোপীয় সমাজ

## ফারানির উপদেশ

সাধারণ পরিচ্ছন্নতার প্রতি দিকনির্দেশনা রয়েছে সব ধর্মেই। কিন্তু ইসলাম এসব বিষয়ের প্রতি এত ব্যাপক ও সুষ্ঠু দিকনির্দেশনা দিয়েছে এবং এর জন্য এমন নিয়মনীতি প্রণয়ন করেছে, যার দৃষ্টান্ত অন্য কোনও ধর্মেই দৃষ্টিগোচর হয় না। আর আমাদের পূর্বপুরুষগণ সাধারণ মাসআলার উপর এত ব্যাপক আলোচনা করেছেন, যা পড়ে মানুষ রীতিমত বিস্মিত হয়ে পড়ে। কিছু লোক এর হেকমত ও দার্শনিক তাৎপর্যের জ্ঞানের অভাবে একে ঢিলা ও ইস্তেঞ্জার মাসায়েল বলে হাসি-তামাশা করে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু বিষয়টির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে এর উপকারিতা ও গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মনীতি হিসেবে একে সাধারণ ব্যাপার বলে মনে হলেও এতে রয়েছে ভিত্তিমূলক তাৎপর্য।

বর্তমান কালের সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে প্রস্রাব-পায়খানার পর টয়লেট পেপার, কাপড় ইত্যাদি দ্বারা পরিচ্ছন্ন হতে দেখা যায়। আর অনুন্নত জাতিকে ঢিলা, পাথর বা পানি ব্যবহার করতে দেখা যায়। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে ইসলাম পানির ব্যবহারকে অত্যাবশ্যকীয় করে এমন গুরুত্বপূর্ণ নিদের্শিকা দিয়েছে, যার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো সংস্কৃতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামীর উর্ধ্বে থেকে দেখলে এ কথা কোনো মতেই অস্বীকার করতে পারবে না যে, যদি কোনো মহাজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব এর পথ প্রদর্শন না করত, তাহলে কোনো মানুষের পক্ষে এ ধরনের প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং মানবজাতির জন্য এত কল্যাণকর কথা বলা অসম্ভব ছিল।

প্রস্রাব-পায়খানা থেকে ফারেগ হওয়ার পর পবিত্রতা অর্জনের সর্বোত্তম পদ্ধতি হল একমাত্র বাম হাত ব্যবহার করা আর ডান হাত দ্বারা পানি ঢালা। এ বাধ্য-বাধকতায় যথেষ্ট হেকমত রয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই হাতসমূহের কার্যাবলী বণ্টন করে দিয়েছেন। দু' একজন ব্যতীত সকল মানুষেরই ডান হাত বাম হাতের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। জীবও প্রথমে তার ডান পা উত্তোলন করে থাকে। যেমন, ঘোড়া, হাতি, ছাগল, বিড়াল ইত্যাদি।

## এক অমুসলিমের ঘটনা

একজন মুসলিম ডাক্তার আমাকে একটি ঘটনা শোনালেন। এক অমুসলিম একবার তার পায়ের গোছায় প্রচণ্ড আঘাত পান। ক্ষতস্থান থেকে তখনো টপটপ রক্ত ঝরছে। চিকিৎসার জন্য সে আমার নিকট আসল। আমি তার ক্ষতস্থান ধৌত করার জন্য একটি পাত্রে করে কিছু পানি দিলাম। সে ব্যক্তি ডান হাত দ্বারা পানি নিয়ে ওই হাত দিয়েই ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে লাগল এবং বারবার ওই রক্তমাখা হাত পানিতে দেওয়ার কারণে পানিও নষ্ট হয়ে গেল। সেই পানি ফেলে দিয়ে আমি তাকে পরিষ্কার পানি দিয়ে বললাম, ডান হাত দিয়ে ক্ষতস্থানে পানি ঢালুন আর বাম হাত দিয়ে তা পরিষ্কার করুন। এতে করে ক্ষতস্থানও পরিষ্কার হয়ে যাবে আর পানিও নষ্ট হবে না। আমি তাকে আরও বললাম, ইসলামে ডান ও বাম হাতের কর্ম বণ্টনের মধ্যে এ হিকমতই লুকিয়ে রেখেছে।

✪ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা গোসল কর বা কাপড় পরিধান কর বা ওযু কর, তখন ডান দিক থেকেই শুরু করবে। ইস্তেঞ্জার পবিত্রতা ইত্যাদি ব্যতীত প্রতিটি উত্তম কাজের জন্য ডান হাতকে কাজে লাগানোর নির্দেশ রয়েছে।

পায়খানা করার পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের পূর্বে যদি কোনো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়, কাগজ, ঢিলা পাথর ইত্যাদি দ্বারা সংশ্লিষ্ট অঙ্গটাকে মুছে ফেলা হয়, তাহলে খুবই উত্তম। শুধু পানি ব্যবহার করলেও কোনো ক্ষতি নেই। তবে উভয়টাই ব্যবহার করলে শরীর আরও উত্তমরূপে পবিত্র হবে। আর এটাই সর্বোত্তম পন্থা, যা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব পছন্দ করেছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে তিন টুকরা কাগজ, কাপড় বা বেজোড় ঢিলা বা পাথর ব্যবহার করলে যথেষ্ট হবে। তিন সংখ্যাটি অধিক পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপর পানি দ্বারা শরীরের সংশ্লিষ্ট অঙ্গটা আবার ধুয়ে ফেললে খুবই উত্তমরূপে শরীর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। ইসলামের পরিভাষায় একেই ইস্তেঞ্জা বলা হয়। এটাই হল ইস্তেঞ্জা ও ঢিলার মাসআলা, যাকে নিয়ে কিছু অমুসলিম, এমনকি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু মুসলমানও হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে থাকে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কোনো দোষ বা সমালোচনার বিষয় নয়। এভাবে ইস্তেঞ্জা করার পর

পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহৃত বাম হাতটি পরিষ্কার মাটিতে ঘষে বা অসুবিধার ক্ষেত্রে সাবান দ্বারা ধুয়ে ফেলতে হবে।

এক্ষেত্রে কিছু বাধ্য-বাধকতাও আছে। যা একেবারে সাধারণ ও নগণ্য বিষয় বলে মনে হলেও বস্তুত এটা প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তোমরা প্রস্রাব-পায়খানার পরিচ্ছন্নতা হাড় বা গোবর দ্বারা করো না। কেননা এগুলি জীনের খাবার।

### অবজ্ঞা ও তার পরিণাম

আমার নিকট জনৈক ব্যক্তি একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, স্বাধীনচেতা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক মুসলমান যুবক "হাড্ডি দ্বারা ইস্তেঞ্জা নিষেধ" শুনে খুবই অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করল। ঘটনাক্রমে সেই ব্যক্তি একদিন পায়খানা করার পর পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য হাড্ডি ব্যবহার করে বসল। এরপর তার সে স্থানে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল এবং সাথে সাথে সে স্থান ফুলে গেল।

আসলে কথা হল, সেই হাড্ডিতে ছিল ছোট ছোট বিষাক্ত পিঁপড়া, যা সে দেখতে পায় নি। আর সেগুলিই তাকে কামড়ে বসেছে। যখন জ্বালা-যন্ত্রণা বেড়ে গেল, তখন সে আমার নিকট দৌড়ে এসে কুকর্মের জন্য ভুল স্বীকার করল ও লজ্জিত হল এবং সাথে সাথে চিকিৎসার প্রার্থনা করল। আমি বললাম, যেই মহান দয়ালু নবীর সাথে তুমি পরিহাস করেছ, তার উপর দরূদ শরীফ পাঠ কর এবং তওবা কর। আমার কথা মতো আমল করার পর অবশেষে তার জ্বালা-যন্ত্রণা দূরীভূত হল।

হাড় ও গোবরের মধ্যে কয়েক প্রকার পোকামাকড় ও রোগজীবাণু থাকে। তাছাড়া যে নিজেই অপবিত্র, সে কিভাবে অন্যকে পবিত্র করবে। উন্নত দেশসমূহের গ্রামে-গঞ্জেও পবিত্রতা অর্জনের জন্য কাগজ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়; মাটির ঢিলা ব্যবহার করা তাদের নিকট অবমাননাকর বিষয় মনে হয়। কিন্তু ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। তার হুকুম আহকাম ধনী-দরিদ্র, কালো-ফর্সা, শহুরে-গ্রাম্য, শুষ্ক-আর্দ্র, শীত-গরম, সকল ব্যক্তি ও অঞ্চলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের পল্লী এলাকাই অনুন্নত ও দারিদ্র্য পীড়িত। যে সকল গরিব লোকদের দু'বেলা পেট ভরে আহার করার মতো খাদ্য জোটে না, তারা ইস্তেঞ্জার জন্য

টয়লেট পেপার কিভাবে খরিদ করবে? তাদের তো বাহ্যকর্ম সম্পাদনের জন্য উন্মুক্ত জঙ্গল আর পরিচ্ছন্নতার জন্য আল্লাহর সৃষ্ট সাধারণ ও সহজ প্রাপ্য ফ্রি জিনিস মাটি ও পানিই যথেষ্ট।

বর্তমানে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে কোথাও কোথাও পানি ব্যহারের প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতদিন তো শধু কাপড় আর কাগজের দ্বারাই তাদের কাজ চলত। কিন্তু পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা না করলে তা একজন মুসলমানের অন্তরে কঠিন সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি করে।

তাছাড়া এ ধরনের অসম্পূর্ণ পবিত্রতার পর গোসল করার জন্য চলে যাওয়া তার মেজাজের জন্য আরও বেশি কষ্টদায়ক হয়। এ ধরনের গোসল তার দৃষ্টিতে প্রকৃত গোসলই নয়। আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, ইসলামও একজন মুসলমানের পবিত্রতার মানদণ্ড কত উন্নত। এ বিষয়টি অন্য একটি ব্যাপার দ্বারাও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ প্রস্রাব করার পরও পবিত্রতা অর্জন করা অত্যাবশ্যক। প্রস্রাব করার পর প্রস্রাবের নালীতে পেশাবের ফোঁটা আটকে থাকে। যা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অদৃশ্যভাবে বের হয়ে পোশাক ও উরুতে লেগে তাকে দুর্গন্ধময় করে তোলে। এ কলুষতা থেকে পরিত্রাণের জন্য দু'ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথমত কোনো শোষণকারী জিনিস। যেমন, মাটির শুষ্ক ঢিলা, শোষণকারী কাগজ বা কাপড়ের টুকরা ইত্যাদি দ্বারা প্রস্রাবের ফোঁটাসমূহকে শুকিয়ে ফেলা। তারপর পানি দ্বারা আবার ধোয়া। পানির শীতলতা দ্বারা প্রস্রাবের নালী সঙ্কোচিত হয়ে ফোঁটাগুলি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসে এবং সাথে সাথে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয়ে যায়।

অন্যান্য জাতি প্রস্রাবের ফোঁটা থেকে মোটেই সতর্কতা অবলম্বন করে না। প্রস্রাব করে সাথে সাথেই দাঁড়িয়ে প্যান্টের বোতাম বন্ধ করে দেয়, লুঙ্গি ছেড়ে দেয় বা পায়জামা পরে নেয় বা ধুতির সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা শরীর ঢেকে নেয়। আর প্রস্রাবের ফোঁটা শরীর ও পোশাকে লেগে দুর্গন্ধময় ও কলুষিত করে তোলে। ফলে তা উরুতে চর্মরোগ সৃষ্টির কারণ হয়।

আমি স্বচক্ষে দেখেছি, হিন্দু সম্প্রদায় পায়খানায় পানির পাত্র তাকের উপর না রেখে নিচেই রেখে দেয়। ফলে ওই পানিতে প্রস্রাবের ছিঁটা পড়তে থাকে। সেই নাপাক পানিই তারা আবার ব্যবহার করে।

একজন নামাযী ব্যক্তির শরীর ময়লা-আবর্জনা ও যাবতীয় কলুষতা মুক্ত হয়। আবার কেউ তো এমন সতর্কতা অবলম্বন করে যে, যদি এক ফোঁটা প্রস্রাবও তার কাপড় বা শরীরে লেগে যায়, তবে তা পরিষ্কার না করা পর্যন্ত স্বস্তি বোধ করে না। এক কথায় এ ঘৃণ্য কাজ থেকে বেঁচে থাকা যেন একজন মুসলমানের স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

এক হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় কাশফের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, তার কবরে আযাব হচ্ছে। কেননা সে তার জীবদ্দশায় পেশাবের ছিঁটা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করত না। মানুষের শরীর থেকে নির্গত পেশাব পায়খানা কঠিন নাপাক। এটা কাপড়চোপড় খারাপ করা ছাড়াও স্বয়ং মানুষকেই বিবিধ রোগে আক্রান্ত করে দেয়। আখেরাতের শাস্তি ছাড়া দুনিয়াতেই এ নাপাক থেকে অসাবধানতার ফলে চুলকানি, এলার্জি ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে দুনিয়াতেই দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হয়।

অনেকেই পেশাব-পায়খানা করার পর মানুষ চলাফেরা করে এমন জায়গায় ঢিলা-কুলুখ নিয়ে নির্লজ্জভাবে ঘোরাফেরা করে। আধুনিক শিক্ষিত লোকজন এ অবস্থা দেখে অনেক অশালীন উক্তি করে থাকে। আসলে সুন্দর নিয়ম হল, ইস্তেঞ্জার পর এমন জায়গায় এমনভাবে হাঁটাহাঁটি করা, যেখানে সাধারণভাবে মানুষের নজর না পড়ে। এটাই হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও আমল।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরয। আর পূর্ণ পবিত্রতা ছাড়া নামায পড়া যায় না। তাই বলা যায়, প্রতিটি মুসলমানের জন্য শরীর ও কাপড়চোপড় পবিত্র রাখা ফরয। পূর্বে বলা হয়েছে, পেশাব-পায়খানা সর্বাপেক্ষা নাপাক। প্রতিটি মুসলমানের শরীর ও কাপড়চোপড় এ নাপাক থেকে যত পবিত্র রাখা যাবে ততই ভালো। ইসলাম এ শিক্ষার উপরই বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছে।

শরীরের সুস্থতা ও পরিবেশের সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পেশাব-পায়খানার নিয়ম-পদ্ধতি ও ইস্তিঞ্জাখানা নির্মাণের গুরুত্বও অপরিসীম। পেশাব-পায়খানা করার সহজ পদ্ধতি তা-ই, যা আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বিদ্যমান। তথাকথিত উন্নত দেশের লোকজন এ নিয়মের বিপরীত করে থাকে। আবার মুসলমানদের তাহজীব-তামাদ্দুন দে

ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, ডাক্তারী মতেও ইসলামী নিয়মই স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য উপকারী। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ বাড়িতে যখন পেশাব-পায়খানা করতে বসতেন, তখন তিনি দুটি ইটের উপর বসতেন।

এভাবে বসলে শরীরের উপরের অংশের পূর্ণচাপ নাড়ীভূঁড়ির উপর পড়ে। ফলে পেশাব-পায়খানা শরীর থেকে পূর্ণরূপে বের হয়ে যায়। সেই সাথে পাকস্থলীতে উভয় দিক থেকে উরুর চাপ পড়ে। পা অনাবৃত থাকায় পাকস্থলী ও দেহের প্রাকৃতিক চাপের কারণে পাকস্থলীর অন্ত্রের মুখ পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং দ্রুতি বৃদ্ধি পায়। যার কারণে পায়খানা দ্রুত ও সহজে বের হয়ে আসে।

অনুন্নত ও সাধারণ শিক্ষিত জাতির মধ্যে প্রয়োজনানুপাতে এবং নিজেদের পরিবেশ অনুযায়ী সেই প্রাকৃতিক পদ্ধতির উপরই আমল করা হয়। গ্রাম্য সাধারণ লোকজন পায়খানা করার জন্য জঙ্গলে চলে যায় এবং পায়খানা করার স্থানটি থেকে সরে গিয়ে অন্যত্র বসে পবিত্রতা অর্জন করে। আর শহরের লোকজন নিজেদের ঘরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বাথরুম বানিয়ে নেয়, যার মধ্যে দু'একটি বাথরুম থাকে পায়খানা করার জন্য আর একটি থাকে পানি ব্যবহার করার জন্য। সেগুলো এত উঁচু থাকে যে, প্রস্রাব-পায়খানা বা পবিত্রতা অর্জনের সময় শরীর বা পোশাকে তার ছিটা পড়তে পারে না। আবার কখনো শহরে বাথরুম একটিই এমন পদ্ধতিতে বানানো হয়, যার ছিদ্র উত্তম ও পরিপূর্ণভাবে ঢালু থাকে। ফলে পায়খানা নিজে নিজেই প্রবাহিত হয়ে নিচের দুর্গন্ধ নালীতে গিয়ে পড়ে। তারপর যখন সেখানে বসে পানি ব্যবহার করা হয়, তখন এর ছিদ্র আরও অধিক পরিমাণে পরিষ্কার হয়ে যায়।

এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে যদি সামান্যতম সতর্কতাও অবলম্বন করা হয়, তাহলে শরীরের সংশ্লিষ্ট অঙ্গও পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যায়। পেশাব পায়খানা দ্বারা মানুষ প্রশান্তি পায় আর পবিত্রতা দ্বারা নিজেকে হালকা অনুভব করে।

এক্ষেত্রে ইসলাম অবশ্যই একটি বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা হল, প্রস্রাব-পায়খানার সময় লজ্জা-শরমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রস্রাব-পায়খানার সময় যেন সে ব্যক্তি অন্যের সম্মুখে উলঙ্গ না হয়,

তাই মাঠে-ঘাটে বা জঙ্গলে গিয়ে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে বসবে। আর বাথরুম হলে পর্দায় বসতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।

ইসলামি পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণের কারণে বোধসম্পন্ন মানুষের প্রকৃতিগত অভ্যাসই এটা। পায়খানা করার সময় যদি জানতে পারে যে, আমাকে কেউ দেখে ফেলছে, তাহলে আর পূর্ণরূপে বাহ্যকর্ম সম্পন্ন হয় না। যা কখনো শরীরের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে পড়ে। অনেক মুসলমানকে জিজ্ঞেস করে জানা গেছে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে তাদেরও এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়।

একবার পাটনার এক কনফারেন্সে আমার অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। প্রতিনিধিগণের মধ্যে মাদ্রাজের কিছু হিন্দু ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিল। সেখানে দেয়ালের পার্শ্বে অনেকগুলো বাথরুম বানানো ছিল। মাদ্রাজিরা পায়খানারত অবস্থায় কনফারেন্সে আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোচনার ঝড় বইয়ে দিচ্ছে দেখে আমি হতবাক হলাম। অথচ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বাথরুমে উলঙ্গ অবস্থায় আলাপকারীদের উপর আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন।

প্রাচীন পদ্ধতির বাথরুমের পরিবর্তে অধুনা পাট, কমোড, ও ফ্লাশের প্রচলন শুরু হয়ে গেছে। আফ্রিকা ও এশিয়াবাসীগণ নতুন পদ্ধতির প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। এগুলো গোসলখানার মধ্যে রাখা থাকে বা বানানো থাকে, যা দৃশ্যত খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনে হয়। গোসল খানা ও টয়লেট একত্র হওয়ার কুফল সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। এখানে শুধু আধুনিক পদ্ধতির বাথরুম সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করব।

কমোডের উপর মানুষ শরীরের নিম্ন অংশ বিছিয়ে এভাবে বসে, যেমনি বসে চেয়ারে। একজন রোগীর জন্য এ পদ্ধতি আরামদায়ক ও ফলপ্রদ হতে পারে। কিন্তু সুস্থ মানুষের শরীরে এ পন্থা নানা ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি করে। এভাবে বসার দ্বারা শরীর পূর্ণ শান্তি অনুভব করে, যার সাথে সাথে অন্ত্রগুলোতেও বিরাম সৃষ্টি হয়, পাগুলো পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হয় না। উরুদ্বয়, বাহু যুগল ও দেহের উপরি অংশের চাপ নাড়ীর উপর পড়ে না। বিধায় নাড়ীর মুখ পূর্ণরূপে খোলে না। পায়খানাও বের হয় না।

পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে এ পদ্ধতি মোটেই পছন্দনীয় নয়। যারা নিজেদের দেহে বা পোশাকে বিন্দুমাত্র প্রস্রাব-পায়খানা লেগে থাকা পছন্দ করে না, তারা লাকড়ী বা ধাতুর একটি কাঠামোর উপর যার মধ্যে সর্বদা পায়খানা পড়তে থাকে এবং ওই উদ্দেশ্যেই তা বানানো হয়ে থাকে, তার উপর শরীর লাগিয়ে বসা কিভাবে সহ্য করতে পারে? চাই সেটা যতই ধোয়া-মোছা ও পরিচ্ছন্ন হোক না কেন।

কমোড কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠিত ও অপ্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠিত কমোড সেখানেই কাজে লাগানো হয়, যেখানে নগরবাসী ময়লা নিষ্কাশনের বিশেষ ধরনের পাইপ স্থাপন করে থাকে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সরবরাহ করতে পারে।

অপ্রতিষ্ঠিত কমোড ধাতুর পাইপ দ্বারা দেয়ালের উপরি অংশে লাগানো পানির হাউজের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, যার মধ্যে একটি শিকল কমোডের উপর উপবেশনকারীর উপর ঝুলন্ত থাকে। কার্যশেষে যখন সে শিকল টান দেয়, তখন সেই হাউজ থেকে তীব্র বেগে পানি সেই পাইপ হয়ে কমোডের মধ্যে এসে পড়ে এবং সমস্ত আবর্জনা বয়ে নিয়ে যায় এবং নিচের ময়লার পাইপে নিয়ে ফেলে। হাউজটাও এমনভাবে বানানো হয় যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজে নিজেই ভরে যায়। তার মধ্যে আনুমানিক ১০/১২ সের পানি সার্বক্ষণিক থাকে। সেটা ভরে যাওয়ার পরই আবার সেখান থেকে পানি সরানো সম্ভব।

এ ধরনের কমোড ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন-প্রিয় মানুষের ক্ষেত্রে কয়েক মণ পানির প্রয়োজন পড়ে। শুষ্ক এলাকায় যেখানে মানুষের খাবারের পানি সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার, সেখানে এ ধরনের ব্যবস্থা কিভাবে করা সম্ভব? আর যদি কোনো বিত্তবান ব্যক্তি নিজের অর্থের বলে এ ব্যবস্থা করেও নেয়, তবুও তো মানব জীবনের এক অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় জিনিসকে এভাবে অপচয় করা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার.

এ ধরনের কমোডে বসে পবিত্রতা অর্জন করা সকলের জন্য সম্ভব নয়। কেননা এর জন্য অধিক পরিমাণ পানির প্রয়োজন। শরীরের সংশ্লিষ্ট অঙ্গের পরিচ্ছন্নতার জন্য শুধু টয়লেট পেপারই ব্যবহার করতে হয়। কাপড়, তুলা ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় না। কেননা তা কমোডের ভিতরে পড়লে তার নিচের পাইপ বন্ধ হয়ে যায়।

এ ধরনের কমোডে কয়েক প্রকারের অসুবিধা রয়েছে। এটা নির্মাণ করতে প্রয়োজন পড়ে হাজার হাজার টাকা। নিম্ন আয়ের লোকদের পক্ষে তা আদৌ সম্ভব নয়। তাছাড়া টয়লেট পেপারেরও ব্যবস্থা করতে হয়। সে জন্যও কিছু না কিছু ব্যয় হয়। তদুপরি কমোডের নিচের পাইপ বন্ধ হয়ে গেলে বিশেষ যন্ত্রপাতি ও কমোড পরিচ্ছন্ন বিশেষজ্ঞ এনে পরিষ্কার না করলে তা অকেজো হয়ে পড়ে। হাউজে কোনো প্রকার ত্রুটি দেখা দিলে বা পানি সরবরাহ কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে কমোড দুর্গন্ধে ভরে যায়। ছড়িয়ে পড়ে বাড়ি-ঘরেও।

দ্বিতীয় প্রকারের কমোড স্থানান্তরযোগ্য এবং তার পার্ট খুলে খুলে পরিষ্কার করা যায়। তা-ও তেমন উপকারী এবং স্বাস্থ্যসম্মত নয়। একবার ব্যবহারের পর পরিষ্কার না করে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যায় না। তাই হয়তো ঘরে উপযুক্ত ও যথেষ্ট পরিমাণ কমোড থাকা প্রয়োজন, নতুবা একবার ব্যবহারের পর সাথে সাথে তা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা রাখা উচিত। এমন কমোডের সাথে প্রস্রাবের জন্য পৃথক পাত্রেরও ব্যবস্থা করতে হয়। যার জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন।

আফ্রিকা ও এশিয়ার কোনো কোনো দেশে এমন কমোডের প্রচলন শুরু হয়ে গেছে, যার উপর প্রাচীন পদ্ধতিতে পায়ের উপর ভর দিয়েই বসতে হয়। তার উপর ফ্লাশ করার হাউজ থাকে এবং তার উপর বসেই পানি ব্যবহার করার ব্যবস্থা রাখা হয়। তাই এটা প্রথম প্রকারের তুলনায় পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে কিছুটা উন্নত। কিন্তু এর ব্যবস্থা করতে যথেষ্ট খরচ পড়ে এবং পানির অপচয় হয়। আর হাউজ, নালা, নর্দমা এবং পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত অসুবিধাগুলোই সৃষ্টি হয়।

আমরা বলছি না যে, ইসলামে কমোড, ফ্লাশ বা পট ব্যবহার নিষিদ্ধ বরং এত ব্যাপক আলোচনার উদ্দেশ্য শুধু ইসলামি নিয়ম-নীতি সম্পর্কে সচেতন করা। ইসলাম চায় এ কাজে এমন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা হোক, যার দ্বারা সর্বোৎকৃষ্টভাবে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা যায় এবং যা কারও জন্য কষ্টসাধ্য না হয়। পশ্চিম আফ্রিকার প্রসিদ্ধ ইংরেজি পত্রিকা "গিনী টাইমস" পত্রিকার বিশেষ প্রবন্ধকার পিন ফোর্ডের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সে প্রবন্ধে লেখক বলেন, ইসলামের সৌন্দর্য

তার নিজ স্থানে স্বীকৃত ও প্রশংসনীয়, কিন্তু সেখানে এ কেমন পরিচ্ছন্ন ও ঘৃণিত পন্থা রাখা হয়েছে যে, টয়লেট পেপারের পরিবর্তে পানি দ্বারা শৌচকার্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মি. পিনফোর্ড নিজের পক্ষ থেকে ইসলামের উপর নগ্ন সমালোচনায় মেতে উঠে ওই সমস্ত এলাকায় তাদের সাংস্কৃতির প্রাধান্য প্রকাশের চেষ্টা করেছেন।

আমাদের উপরিউক্ত প্রামাণ্য আলোচনার ভিত্তিতে এ সমালোচনার কোনোই গুরুত্ব নেই। তাছাড়া ইউরোপীয় সাংস্কৃতির ও সভ্যতার অধঃপতনের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রকাশিত হওয়ার পরে ইসলামের উপর নির্লজ্জ আক্রমণ নিমজ্জিত ব্যক্তির তৃণলতার সাহায্য গ্রহণ বৈ কিছু নয়।

কিন্তু ওই এলাকারই লেগ্‌স শহরের সি, এ, এস, গ্রামার স্কুলের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল মি. কে, ই, আইওয়ানজ, বি এস, সি, (লণ্ডন) স্বরচিত "ট্রপিক্যাল হাইজিন" গ্রন্থে লিখেছেন, "শৌচকার্যের সময় পেপারের পরিবর্তে পানি ব্যবহার অতি উত্তম। যে সমস্ত ইউরোপীয়ান প্রাচ্য দেশসমূহে গিয়ে বসবাস শুরু করছে, তারা ব্যাপক হারে পানি ব্যবহারের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। যারা এ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাদের এটা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। শৌচকার্যের সময় কাগজ ব্যবহার করুক বা পানি ব্যবহার করুক, উভয় পদ্ধতিতেই শৌচকার্যের পর সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধৌত করে নেওয়া অত্যাবশ্যক।"

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি, পেপার ব্যবহার করার পর পানি দ্বারা শৌচকার্য করা ব্যতীতই গোসলের জন্য চলে যাওয়া একজন নামাযী মুসলমানের জন্য খুবই অপছন্দনীয়। কেননা প্রস্রাব করার পরও পানি দ্বারা সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে ধৌত করে তা পবিত্র করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আর একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পরিচ্ছন্নতা কাপড় দ্বারা করুক বা পেপার দ্বারা করুক, শরীরের ওই অঙ্গে কিছু না কিছু নাপাকীর অংশ অবশিষ্ট থেকেই যায়, যা একমাত্র পানি দ্বারাই পরিষ্কার হতে পারে। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, দুনিয়ার কোনো জিনিসই পানির চেয়ে বেশি সহজলভ্য ও দ্রুত কার্যকরী নয়।

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রস্রাব সংক্রান্ত আরও আকর্ষণীয় নীতিমালা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্য হতে

যদি কেউ প্রস্রাব করতে চায়, তা হলে সে যেন উপযুক্ত স্থান তালাশ করে নেয়। অর্থাৎ এমন জায়গা বেছে নেয়, যেখানে প্রস্রাবের ছিঁটা এসে কাপড় ও গায়ে না লাগে। জায়গাটা যেন পূর্ব থেকেই কলুষিত না হয়, যা হতে রোগ-জীবাণু এসে আক্রান্ত করতে পারে কিংবা যেখান থেকে প্রস্রাব প্রবাহিত হয়ে নিজের দিকেই চলে আসে। তিনি আরও বলেছেন, তোমরা কেউ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার অনেকগুলো অসুবিধা রয়েছে।

প্রথমত এটা ছেলেমী কাজ। দ্বিতীয়ত কাপড় ও শরীরে ছিঁটা এসে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তৃতীয়ত পবিত্রতা অর্জনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অথচ পবিত্রতা ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু প্রয়োজনবশত এমন স্থানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা যেতে পারে, যেখান থেকে ছিঁটা এসে শরীরে লাগার সম্ভাবনা না থাকে।

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো গর্তের মধ্যে প্রস্রাব করা উচিত নয়। এর কারণ স্পষ্ট। কখনো গর্তের মধ্যে কোনো বিষাক্ত প্রাণী থাকতে পারে। গর্তের ভিতরে পানি প্রবেশ করলে সেটি বাইরে বেরিয়ে এসে প্রস্রাবকারী ব্যক্তিকে দংশন করার সম্ভাবনা আছে। প্রস্রাব-পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জনের প্রভাব স্বাস্থ্যের উপর পড়ে। অবিবাহিত যুবকরা সাধারণত স্বপদোষের শিকার হয়ে থাকে। কেউ তো স্বপ্নদোষের আধিক্যের কারণে স্বাস্থ্য বিনষ্ট করে বসে। একবার জনৈক যুবক হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট স্বপ্নদোষের অভিযোগ করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "শোয়ার পূর্বে নিজের গুপ্তাঙ্গ ধৌত করে নিবে"।

গুপ্তাঙ্গ ধৌত করতে গেলে প্রস্রাবও এসে পড়বে। সুতরাং প্রস্রাব করা ও গুপ্তাঙ্গ ধোয়া এ দুটি কাজ স্বপ্নদোষ বন্ধের জন্য খুবই উপকারী। কেননা প্রস্রাব করা দ্বারা মূত্রথলী খালি হয়ে যায় আর ধমনীসমূহ পানি দ্বারা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। প্রস্রাব-পায়খানারত অবস্থায় কাউকে উক্ত কাজ থেকে বাধা প্রদান করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তি মদীনায় এসে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেই প্রস্রাব করতে বসে গেল। সাহাবীগণ এ দৃশ্য অবলোকন করে চিৎকার শুরু করে দিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিষেধ করে বললেন, আপাতত তাকে ফারেগ হতে দাও। পরে এক বালতি পানি এনে তার উপর ঢেলে দিলেন।

উদ্ধৃতিসমূহ মেশকাত শরীফ : ১, হাদীস নং-৪০৭, ৪৪৪, ৩১০, ২১৯, ৩২১, ৩২৫, ৩০৯। তাজরীদে বুখারী, হাদীস নং- ১৫৮, ১১৫, ১৫৯, ১২২, ১১৯, ১২০, ১২৯, ১২১, ১৫৫। তিরমিযী শরীফ, পবিত্রতা অধ্যায় : ১/৩। সহীহ বোখারী ওযু অধ্যায় হাদীস নং-১৩৬, ১৩২, ১৪৬। (ইসলামী উসূলে সিহহাত)।

## মহানবীর সতর্কতা ও আধুনিক বিজ্ঞান

হাদীসের কিতাবসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন কতকগুলো সতর্কতামূলক ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়, যেগুলোকে আধুনিক বিজ্ঞান একবাক্যে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়। বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান এমন অনেক জিনিসের উপর নতুনভাবে গবেষণা শুরু করেছে, যা ইসলাম ধর্ম হাজার বৎসর পূর্বে মুসলমানদেরকে বলে দিয়েছে।

### ডা. কোস্ট এর স্বীকারোক্তি

ডা. কোস্ট বলেন, ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়নের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায়, ইসলাম বিভিন্ন বিধি-নিষেধ দ্বারা তার অনুসারীদেরকে প্রতি পদক্ষেপে সতর্ক ও উপদেশাবলী দ্বারা তাদের চরিত্রের উন্নতি সাধন করেছে। ইসলামের প্রতিটি নির্দেশ মান্যকারী ব্যক্তি কখনো বিপদগ্রস্ত হয় না। হয় না কখনো অকৃতকার্য। সামাজিক জীবন হোক বা পারিবারিক জীবন হোক, ইসলামে রয়েছে তার সুষ্ঠু সমাধান। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের ভাত, কাপড়, জীবিকা নির্বাহ। মোটকথা, জীবনের প্রতিটি স্তরের সমাধান বাতলে দিয়েছেন। যেন জীবনের কোনো অংশেই কোনো প্রকার ত্রুটি ও দুর্বলতা সৃষ্টি না হয়।

## নবীজীর পেয়ালা ও আধুনিক বিজ্ঞান

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতকগুলো পেয়ালা ছিল। হযরত আনাস রাযি. (একটি পেয়ালার প্রতি ইশারা করে) বলেন, আমি এ পেয়ালা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু

পানীয় (অর্থাৎ মধু, পানি ও দুধ) পান করিয়েছি। কোনো কোনো কিতাবে আছে, সেই পেয়ালা ছিল ঝাউ কাঠের তৈরি। এর রং ছিল হলুদ। সেই পেয়ালাটা প্রশস্ত ও উত্তম কাঠের তৈরি ছিল। তার উপর লোহার আবরণ ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উন্মুক্ত পেয়ালার পানি পান করতেন। যা ছিল অন্তরের জন্য শান্তি ও আনন্দদায়ক। আর সেই পাত্রটি ছিল ঝাউ কাঠের তৈরি। ঝাউগাছকে আরবীতে তুরখা, ফারসীতে গজ এবং ইংজেরীতে টামারিসক বৃক্ষ (Tamarisk Tree) বলা হয়।

(রাহবরে জিন্দেগী, উসওয়া)

ডা. কর্ণেল চোপড়া (টামারিস্ক) ঝাউ বৃক্ষের পেয়ালার নিম্নলিখিত গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। উক্ত পেয়ালার পানি পান করা দ্বারা লিভারের রোগ (Liver Diseases) বিশেষ করে লিভার ফুলে যাওয়া (Liver Inflammation), ইস্‌তিস্‌কা (Oedema), কিডনী ফুলে (Iflammation of Kedneys), যাওয়া এবং কিডনীর ইনফেকশন নির্মূল হয়ে যায়।

আরামের সাথে প্রস্রাব হয়। এমনকি উক্ত পেয়ালার পানি পান করলে রক্তের পিত্তবর্ণ হ্রাস পেয়ে রক্তের চর্বিযুক্ত পদার্থ কোলেস্টেরোল (Cholesterol) হ্রাস পায় এবং পিত্তে পাথরী সৃষ্টিকারী পদার্থ প্রস্রাবের সাথে বের হয়ে যায়।

## খাবারের সতর্কতা ও আধুনিক বিজ্ঞান

### গুরুত্ব ও তাৎপর্য

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং অপরকেও এর নির্দেশ দিতেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ ও মাছ, দুধ ও যে কোন টক জাতীয় জিনিস এবং দুই গরম জাতীয় খাবার কখনো একত্রে ভক্ষণ করতেন না।

তাছাড়া দুই রকম ঔষধ, দুই তৈলাক্ত খাবার কখনো একত্রে খেতেন না এবং দুই বিপরীত জিনিস যেমন কাঠিন্য ও নরমকারী, একটি দ্রুত হজমশীল ও অপরটি বিলম্বে হজমশীল। একটি ভূনা ও অপরটি (পানি দ্বারা) রান্না করা খাবার একত্রে ভক্ষণ করতেন না। আবার একটি তাজা খাবার ও অপরটি বাসি খাবার একত্রে খেতেন না। তেমনিভাবে বেশি গরম

খাবারও তিনি ভক্ষণ করতেন না। তাছাড়া রাত্রে পাকানো খাবার পরের দিন বাসি করে খেতেন না। দুর্গন্ধযুক্ত খানা ও চাটনী ইত্যাদিও কখনো ভক্ষণ করতেন না। (যাদুল মা'আদ)

এ সমস্ত সতর্কতা অবলম্বনের কারণসমূহ বিস্তারিত নিম্নে বর্ণিত হল।

## তীব্র গরম খাবারের নিষেধাজ্ঞা

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীব্র গরম খাবারে বরকতহীনতার কথা বলেছেন। তীব্র গরম খাবারে মুখের ভিতরে ঘা, পেট ফোলা ও জ্বালা-পোড়া সৃষ্টি হয়। তাছাড়া তীব্র গরম খাবার কখনো গলা নষ্ট করে ফেলে। আর গরম খাবারের সাথে ঠাণ্ডা পানি পান করলে দন্ত ও পাকস্থলীতে অসুবিধা সৃষ্টি করে। খাওয়ার আবেগ ও উদ্যমকে প্রশমিত করার পর খাবার ঠাণ্ডা করে খেলে এসব রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তীব্র গরম খাবারে বরকতহীনতার প্রমাণ হল, চুলা বা তন্দুর থেকে নামিয়ে গরম গরম রুটি খেলে তা অধিক পরিমাণে খাওয়া যায়। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা করে খেলে অনেক কম খাওয়া যায়। আর হুযুর সা.-এর কথা অনুযায়ী বরকত এসে যায়। এখানে এমন ধারণা করা ঠিক নয় যে, একেবারে জমাট বাঁধা খাবার খেতে হবে বরং একটু ঠাণ্ডা করে খেলেই চলবে।

ডা. আলবার্ট "ফীড এণ্ড কেয়ার" নামক একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, যাতে যাবতীয় খাদ্য ব্যবহারের পদ্ধতি, উপকারিতা ও তার সতর্কতাসমূহ উত্তমরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তদানুযায়ী একজন সুস্থ মস্তিষ্কবান ব্যক্তির জন্য যাবতীয় খাদ্যের জ্ঞান অর্জন করা একান্ত কর্তব্য। অথচ আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক পূর্বেই এ সম্বন্ধে ধারণা দিয়ে গেছেন।

## দুধ ও মাছ একত্র না করা

একবার এমন কিছু জেলের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, যাদের শরীরের চামড়া সাদা হয়ে গিয়েছিল। আমি বললাম– তোমাদের এ অবস্থা কিভাবে হল? তারা বলল– আমরা হলাম মৎস্য শিকারী। একবার মাছ খাওয়ার পর দুধ পান করেছিলাম। তারপর থেকেই আমাদের চামড়ার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। অভিজ্ঞতায় জানা গেছে, সর্বপ্রকার দুধ আর মাছেই কুষ্ঠ রোগ হয় না বরং শুধু মাছ খেয়ে বকরির দুধ পান করলেই এ ধরনের রোগ হয়।

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ ও মাছ একত্রে খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা এর দ্বারা ক্ষতি হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। (যাদুল মা'আদ)

উপরিউক্ত ফরমান হল এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের, যার সত্যতায় লেশমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই বরং এখন তো গবেষণা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, দুধ বকরির হলে তার দ্বারা সত্যিই চামড়ার রং পরিবর্তন হয়ে যায়।

## দুই গরম খাবার একত্রিত না করা

এক গরম খাবারের সাথে যদি আরেক গরম খাবার মিলিত হয়, তা হলে তা অতি গরমে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এক খাবারের যদি ক্যালোরী (Calories) বেশি হয়, তার সাথে যদি এমন আরেকটি খাবার যুক্ত করা হয় যার মধ্যেও বেশি ক্যালোরী (Calories) থাকে, তাহলে রক্ত ও চর্বিতে এর ক্ষতির প্রভাব পড়বে। এমনকি কখনো ব্লাড প্রেসার আরও বৃদ্ধি পাবে। তাই বিভিন্ন গরম খাবার একাধারে এবং একই সময় না খাওয়া উচিত।

## দুই ঠাণ্ডা জাতীয় খাবার একত্র না করা

এমন ধরনের খাবার যা ঠাণ্ডা প্রকৃতির এবং যাতে ক্যালোরীর পরিমাণ কম থাকে, তা অনবরত ও অধিক পরিমাণে খাওয়াও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। দুই ঠাণ্ডা জাতীয় খাবার একত্রে ভক্ষণ করলে ক্ষতির আশঙ্কা অনস্বীকার্য। এ ধরনের খাবার লো ব্লাড প্রেসার (Low Blood Pressure) বা নিম্ন রক্তচাপ, অর্ধাঙ্গ রোগ (Hami Plegia), মুখের উপর সংঘটিত অর্ধাঙ্গ রোগ, হাত পা অবশ হয়ে যাওয়া এবং স্নায়ুবিক খিঁচুনি ইত্যাদি সৃষ্টি করে।

## দুই আঠাযুক্ত খাবার একত্র না করা

এমন খাবার যার মধ্যে আঠা জাতীয় পদার্থ থাকে, তা পাকস্থলীর দেয়াল ও ঝিল্লির (Epithilium) সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। ফলে ওই সমস্ত ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়, যা থেকে পাকস্থলীর গ্রাস ও হজমকারী আর্দ্র পদার্থ বের হয়ে খাদ্যের সাথে সংযুক্ত হয় এবং খাদ্য হজম হয়। যেমন : কচুরমুখী ও ঢেড়শ ইত্যাদি।

## দুই কঠিন খাদ্য একত্র না করা

পায়খানা কষাকারী খাবার অন্ত্র ও ধমনীসমূহের মধ্যে রক্ত চলাচলে বাঁধার সৃষ্টি করে। একই সাথে যদি দুই কাঠিন্যকারী খাবার খাওয়ানো হয়, তা হলে উভয়ের কাঠিন্য ক্ষমতা একত্র হয়ে অন্ত্র ও ধমনীর কার্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে যায়। আর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্তির দরুন শরীরে জ্বালা-যন্ত্রণা ও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যেমন, কাঁচা পেয়ারা ও ঢেড়শ।

## দুই জোলাপ সৃষ্টিকারী খাবার একত্র না করা

অন্ত্র ও নাড়ীর গতি যদি সর্বদা দ্রুত থাকে, তাহলে অন্ত্রে ক্ষত, আলসার ও জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে যায়। পায়খানা তারল্যকরণ খাবার অন্ত্রের সেই গতি দ্রুত করে, যদ্বারা অন্ত্র ও পাকস্থলীর আভ্যন্তরীণ স্তর দুর্বল হয়ে জ্বালা সৃষ্টি করে। যেমন : পালং ও করলা (উষ্ণ প্রকৃতির লোকদের জন্য)।

## দুই স্থুল জাতীয় খাবার একত্র না করা

পাকস্থলীতে স্থুলতার কারণে হজম প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, যার কারণে পাকস্থলীর গ্রাস নিঃশেষ হয়ে তার এ্যালকারী (Alakali) বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ স্থায়ী গ্যাস্ট্রিক ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যেমন- পালং , কচুরমুখী, ঢেরশ, মাশকলাই, ছোলা ইত্যাদি।

## দুই তরল খাবার একত্রে না খাওয়া

যেসব খাবার দ্বারা পাকস্থলীতে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, তা অতিসার, বমি, বমি বমি ভাব, অবসণ্নতা, বিষণ্নতা ইত্যাদি সৃষ্টি করে।

## পায়খানা কঠিন ও তরলকারী খাবার একত্রে না খাওয়া

যে খাদ্য দ্বারা কাঠিন্য সৃষ্টি হয়, তা ভক্ষণ করার পরপরই যদি আবার জোলাব জাতীয় খাবার খাওয়া হয়, তা হলে দুই বিপরীত স্বভাবের খাবার ব্যবহারের ফলে পাকস্থলীর আভ্যন্তরীণ ঝিল্লীসমূহের মধ্যে ফোলা সৃষ্টি হয়। তাই এ ধরনের বিপরীত স্বভাবের খাবার একত্রে না খাওয়া উচিত।

## দ্রুত হজমশীল ও বিলম্বে হজমশীল খাবার একত্রে না খাওয়া

সহজ-পাচ্য খাবার দ্রুত হজম হয়ে যায়। আর বিলম্বে হজমশীল খাবার দীর্ঘক্ষণ যাবৎ পাকাশয়ে পড়ে থাকার কারণে পাকস্থলীর কার্যক্রমে বিঘ্ন

ঘটে। যেমন : দেখুন, উট ও বকরির গোশত একত্রে রান্না করা হলে উভয়টা একত্রে সিদ্ধ হয় না, উটের গোশতের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। এমনিভাবে খাদ্যশস্যের বেলায়ও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যেমন– আপেল ও মূলা।

## ভূনা করা ও পানি দিয়ে রান্না করা খাবার একত্রে না খাওয়া

ভুনা করা গোশত খাওয়ার পর যদি পানিতে পাকানো খাবার খাওয়া হয়, তা হলে পানি পাকস্থালীতে আর্দ্রতা বৃদ্ধি করবে। আর ভূনা গোশত শুষ্ক বিধায় শুষ্কতা সৃষ্টি করবে।

## তাজা ও বাসী খাদ্য একত্র করা অনুচিত

কানাডার এক খাদ্য বিশেষজ্ঞ 'বাজিষ্ট বোর্ণ' বলেন, তাজা খাদ্যই ভক্ষণ করা উচিত, যদিও তা বিলের ঘাস হয়। বাসী গোশত অপেক্ষা বিলের তাজা ঘাস পাকিয়ে খাওয়া শ্রেয়। আমি বাসী খাদ্য ভক্ষণের কারণে অনেককেই রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি। আমার জীবন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়াদি, ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে আমি একজন বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞের মর্যাদায় উপনীত হয়েছি। সুতরাং আমার পরামর্শ হল, আপনি যদি খাদ্য গ্রহণ করতে চান, প্রথমে দেখুন খাদ্যটি তাজা না বাসী? কেননা সজীবতার মাঝেই প্রকৃত স্বাদ; মসলার মাঝে নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাজা খাদ্য পছন্দ করতেন এবং অন্যদেরকেও তাজা খাদ্য ভক্ষণের নির্দেশ দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য আদৌ পছন্দ করতেন না।

## অধিক মসলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য খাওয়া ক্ষতিকর

বাজিস্ট বোর্ণ আরও বলেন, সাদাসিধা বিশুদ্ধ খাদ্যই সুস্থতা ও সজীবতার নিয়ামক। কেননা তা মানুষের শারীরিক শৃঙ্খলা বিধানের (Physical System) জন্য উপকারী। আর যে খাদ্য মরিচ ও বিভিন্ন প্রকার মসলাযোগে পাকিয়ে সুস্বাদু করা হয়, তা নিশ্চিতরূপে শারীরিক সুস্থতার জন্য ক্ষতিকর। আধুনিককালে ইউরোপীয় জগতের উপহার যেমন, রোষ্ট,

চিকেন ফ্রাই ইত্যাদি নিশ্চিতরূপে শারীরিক সুস্থতার পরিপন্থী। এসব খাদ্যের কারণে আলসার (Ulcer), পাকস্থলীতে গ্যাস (Acidity of Stomach) এবং বদহজমী ইত্যাদি জটিল রোগের সৃষ্টি হচ্ছে।

পক্ষান্তরে ইসলাম আমাদেরকে সাদাসিধে খাদ্য ভক্ষণের পরামর্শ দিয়েছে। এতে রয়েছে স্বাদ ও সুস্থতার অপূর্ব সমন্বয়।

## মাটি ভক্ষণের নিষিদ্ধতা

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : "যে ব্যক্তি মাটি ভক্ষণ করল, সে নিজেকেই ধ্বংস করল।" (তাবারানী)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাটি খেও না। কেননা এর মধ্যে তিনটি বড় বড় ক্ষতি রয়েছে। (ক) সর্বদাই রোগ লেগে থাকা। (খ) পেট খারাপ হয়ে যাওয়া। (গ) রং হলুদ হয়ে যাওয়া। (জামে কাবীর)

## বিখ্যাত ফিজিওলজিষ্ট ড. কিউর-এর অভিজ্ঞতা

ড. কিউর বহু সংখ্যক এমন রোগী দেখেছেন, যারা সর্বদা মাটি খাওয়ায় অভ্যস্থ ছিল। তাদের মধ্যে শিশু, মহিলা ও পুরুষ সব ধরনের রোগীই ছিল। তার সুনিপুণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতারপূর্ণ রিপোর্ট নিম্নরূপ:

উপরিউক্ত রিপোর্ট থেকে বুঝা যায়, মাটি খাওয়া বড় মারাত্মক অভ্যাস। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মাটি ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন।

| পুরুষ | শিশু | মহিলা |
|---|---|---|
| * পাকস্থলী, যকৃৎ ও মস্তিষ্কের নানাবিধ জটিল সমস্যা | * পেট বাড়তে থাকা<br>* থাইরাইড<br>* গ্লাণ্ডের দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কেরক্ষতি,মায়ের দুধের প্রতি অনীহা, শারীরিক বৃদ্ধিহ্রাস | * গর্ভবতীর রুগ্ন বাচ্চা প্রসব।<br>* যকৃতের অবিরত বৃদ্ধি জনিত কষ্ট।<br>* পাকস্থলীর দুর্বলতা এবং বদহজম।<br>* জরায়ুর দুর্বলতা।<br>* গর্ভপাত ঘটা, দুধ শুকিয়ে যাওয়া।<br>* আরও বহুবিধ জটিল রোগ। |

কোনো কোনো রোগী এমন আছে, যারা সর্বদা যকৃৎ ও পেটের পাথরীরোগে ভুগছে। একবার যদি পাথর বের হয়ে যায় আবার নতুন করে পাথর সৃষ্টি হয়। এরূপ রোগীদের রোগের কারণ সম্পর্কে জরিপ চালিয়ে জানা গেছে, তাদের শতকরা ৩০ জনই মাটি খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিল।

এদের মধ্যে মহিলা ও শিশুদের সংখ্যাই বেশি। মাটি খাওয়ার কারণে কিডনী আক্রান্ত হয়। আর যখন কিডনী দুর্বল হয়ে যায়, তখন নানাবিধ জটিল ও স্থায়ী ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

## চারটি উপকারী বিষয় ও আধুনিক বিজ্ঞান

❈ হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, চারটি বস্তুকে চারটি কারণে ক্ষতিকর মনে করবে না।

(১) চোখ ওঠাকে ক্ষতিকর মনে করো না। কেননা তা অন্ধত্ব থেকে রক্ষা করে।

(২) কফ-সর্দিকে খারাপ মনে করবে না। কেননা এটা কুষ্ঠরোগের মূলোৎপাটন করে।

(৩) কাশিকে অকল্যাণকর ভেবো না। কেননা তা সর্ববিকলাঙ্গতার শিকড় কেটে দেয়।

(৪) দম্বল (একধরনের ফোঁড়া)-কে খারাপ মনে করো না। কেননা তা শ্বেত ও কুষ্ঠরোগের উৎপত্তিতে বাঁধা দেয়। (নুযহাতুল মাজালিস)

## বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারী যৌক্তিকতা

(SCIENTIFIC AND MEDICAL JUSTIFICATION)

(১) চোখ ওঠার কারণে চোখ রক্ত বর্ণ ধারণ করে। চোখ থেকে অনবরত কেতর ও পানি ঝরতে থাকে। ফলে খুবই কষ্ট ও যন্ত্রণাবোধ হয়। ফলে চোখ থেকে এমন সব ক্ষতিকর দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায়, যা চোখের মনি বা পুতলির সিক্ততা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিকারক। চোখ ওঠার কারণে চোখের দূষিত পদার্থ নির্গত হওয়ায় চোখ স্থায়ীভাবে বিভিন্ন প্রকার মারাত্মক রোগ থেকে মুক্ত থাকে। (তিব্বে নববী)

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছমত নামক এক প্রকার বিশেষ সুরমা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। তা ব্যবহার করলে চক্ষু দিয়ে পানি ঝরতে থাকে এবং চোখ ওঠার কারণেও চোখ দিয়ে পানি ঝরে।

ফলে চক্ষু বিভিন্ন প্রকার কঠিন ব্যাধি, বিশেষ করে অন্ধত্ব থেকে মুক্ত থাকে।

(২) মানুষের চোখে এবং নাকে কুষ্ঠ রোগ হয়ে থাকে। ড. কিউরের অভিজ্ঞতা ও গবেষণা মতে কুষ্ঠরোগের জীবাণু (Germs) নাসিকা পথে শরীরে প্রবেশ করে এবং নাসিকাই এ মারাত্মক জীবাণুর নিরাপদসড়ক। সর্দি হলে নাক দিয়ে পানি ঝরতে থাকে। ফলে নাসিকার ভিতর থেকে সর্বপ্রকার ধুলা-বালি ও জীবাণু বের হয়ে যায়। কেননা সর্দির কারণে নাক দিয়ে অধিক পরিমাণ সিকনী ঝরতে থাকে। ফলে বিভিন্ন প্রকার ধ্বংসাত্মক জীবাণু ও ময়লা যা স্বাভাবিকভাবে নির্গত হয় না, তা নাক ঝাড়ার কারণে বের হয়ে যায়। এ কারণেই সর্দিকে কুষ্ঠরোগের রক্ষাকবজ মনে করা হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে কুষ্ঠ ব্যাধিকে একপ্রকার কফ্ বা শ্লেষ্মাজনিত রোগ মনে করা হয়। শ্লেষ্মা এবং সর্দি একত্রে মিলিতভাবে কুষ্ঠরোগের সৃষ্টি করে। সর্দির কারণে কফ্ বের হয়ে যায়। সুতরাং সর্দি মানুষের জন্য খবুই উপকারী। কাশিকে খারাপ ভেবো না। কেননা তা বিকলাঙ্গতা থেকে রক্ষা করে। বিকলাঙ্গতা মূলত মস্তিষ্কপ্রসূত স্নায়ুবিক রোগ। বর্তমান যুগে এ রোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানসিক চাপের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে। উচ্চ রক্তচাপ তথা হাইব্লাড প্রেসার এ রোগের বিশেষ কারণ। কাশির কারণে ফুসফুসে অধিক পরিমাণ অক্সিজেন প্রবেশ করে। ফলে পালমনারী ভেইনের (Pulmonary Vein) মাধ্যমে ফুসফুসে আগত রক্ত ভালোভাবে পরিস্কার হয়ে যায়। ওই রক্তেরই একটা বিশেষ অংশ বা উপাদান (যা কিছুকাল পরে রক্তকে গাঢ় করে বিভিন্ন রোগের উদ্ভব ঘটায় সেটা) পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে মানুষ অঙ্গহীনতা বা বিকলাঙ্গতা থেকে পরিত্রাণ পায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে এ রোগের বিভিন্ন কারণ ও বিভিন্ন প্রকার আছে। তন্মধ্যে একটি সামগ্রিক কারণ হল কফ। যখন মস্তিষ্কপ্রসূত শ্লেষ্মা অতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন এমন বস্তুর প্রয়োজন দেখা দেয়, যদ্বারা কফ বের হতে পারে। কফ বের হওয়ার প্রধান মাধ্যম কাশি। এ কাশির ফলে কফ জনিত অতিরিক্ত আর্দ্রতা হ্রাস পায়।

দম্বল মূলত কফ জনিত ফোঁড়া। এ ফোঁড়ার মাধ্যমে পুঁজ ও পানি নির্গত হয়। ফলে মস্তিষ্কের কফ জনিত আর্দ্রতা স্বাভাবিক হয়ে যায়। আর এই কফ জনিত অস্বাভাবিক আর্দ্রতাই শ্বেত-কুষ্ঠের প্রধান কারণ।

এ ব্যাপারে আমি (লেখক) একজন ফিজিওলজিষ্টকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রক্তে মেলানিন এর ঘাটতিই শ্বেত-কুষ্ঠের প্রধান কারণ। আর মিলানিন ঘাটতির কারণ হল, রক্তে W.B.C এর আধিক্য এবং W.B.C মূলত কফ। আলোচ্য ফোঁড়ার কারণে রক্তপুঁজ হিসেবে প্রচুর পরিমাণে তরল পদার্থ নির্গত হয়। ফলে দম্বল তথা কফ জনিত ফোঁড়ার রোগী শ্বেত-কুষ্ঠ থেকে মুক্ত থাকে।

### নাসিকা ও কর্ণের চুলের গুরুত্বঃ

✪ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নাসিকা এবং কর্ণে উন্নত চুল কুষ্ঠ ব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "কর্ণ এবং নাসিকা রন্ধ্রের পশম উপড়ে ফেলবে না। কেননা এতে নাকের মধ্যে ক্ষত সৃষ্টি হয়। তবে খুব বেশি বেড়ে গেলে কেটে ফেলবে।" (নুজহাতুল মাজালিস : ২য় খণ্ড)

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, ড. কিউবের অভিজ্ঞতা ও গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত হল, "শ্বেত রোগের জীবাণু নাকের ছিদ্র দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে এবং নাসিকাই এ জীবাণুর সর্বোত্তম বাসস্থান।"

✪ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্ণ ও নাসিকার পশম কাটতে নিষেধ করেছেন। কারণ, নাসিকা রন্ধ্রের চুলের কারণে রোগ জীবাণু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ওজুর সময় ও সর্দি ঝাড়ার সময় অনেক জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়। চুল উপড়ে ফেলতে নিষেধ করার আরও একটা কারণ হল, এর ফলে জখম ও ক্ষত সৃষ্টি হয়। নাসিকা রন্ধ্রে ক্ষত সৃষ্টি হলে উক্ত ক্ষতের মাধ্যমে জীবাণু অতি দ্রুত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

## দৃষ্টির হেফাজত ও আধুনিক বিজ্ঞান

### গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আল্লাহ্ তা'আলা দেখার জন্য চক্ষুদান করেছেন এবং একে উন্মোখিত ও অবনমিত করার ক্ষমতাও মানুষকে দান করেছেন। এ স্বাধীনতা প্রদানের কারণ হল, মানুষ যেন তার প্রতিপালকের হুকুম মোতাবেক চক্ষুকে ব্যবহার করতে পারে অর্থাৎ খুলতে ও বন্ধ করতে পারে। আল্লাহ্ পাক যা দেখতে নিষেধ করেছেন, তা দেখা থেকে নিজেকে বিরত রাখে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি দৃষ্টির হেফাযত করবে, আল্লাহ পাক তাকে এমন ঈমান দান করবেন, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করবে।" আধুনিক পাশ্চাত্য মস্তিষ্কের চিন্তাধারা হল, 'দেখলে আর কি হবে? এটা তো শুধু দেখা, কোনো ভুল বা অন্যায় কাজ তো নয়।'

## চিন্তার বিষয়

আমরা কখনও চিন্তা করেছি কি, কেউ যদি তার সামনে হঠাৎ একটি বাঘ দেখতে পায়, তাহলে তার দেহ ও প্রাণের মধ্যে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়? একটু ভেবে দেখুন, শিশু তার মাকে দেখা মাত্রই মায়ের প্রতি তার আকর্ষণ কেমন হয়ে থাকে? সবুজ বস্তু ও ফুল তো শুধু দেখাই হয়। তবু তাতে দুখাই অন্তর কেন আনন্দে আপ্লুত হয়? প্রশান্তি লাভ করে? বিপদ-আপদ বা ভয়ানক কোনো কিছু দেখা মাত্রই অন্তর অস্থির হয়ে যায় কেন?

কোন গুরুতর আহত ব্যক্তিকে দেখে চিন্তিত ও অস্থির হয়ে যাই এবং কেউ কেউ বেহুঁশ হয়ে পড়ে কেন? এ তো দেখা ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

কারও বড় দোকান-পাট, অট্টালিকা, বাগান-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া দেখার সাথে সাথে অন্তরের মধ্যে আফসোস, আশা, অস্থিরতা, হতাশা, লোভ ইত্যাদি অবস্থার সৃষ্টি হয় কেন? এতো শুধু দেখাই। কোনো সুন্দরী রমণী দেখা মাত্র হৃদয় আন্দোলিত হয়? এ-ও তো শুধু দেখাই। একটু ভেবে দেখুন, কেন এমন হয়?

## একটি মজার ঘটনা

শাহজাদা জাহাঙ্গীর নবাব জঙ্গন খানের অপরূপা কন্যাকে দেখেই তো আত্মহারা হয়ে তাকে হৃদয় দান করেছিলেন। তিনি একবার মিনা বাজারে আঙ্গুরী পার্কের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় সম্মুখ থেকে আসা নবাব জঙ্গন খানের সুন্দরী কন্যার প্রতি তাকাতেই শাহ্জাদার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তখন তার প্রেয়সী তার দিকে এগিয়ে আসছিল। এ সময় শাহজাদার হাতে ছিল একজোড়া কবুতর।

শাহজাদা তাকে দেখে বললেন, তুমি এ কবুতর জোড়া হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। আমি শীঘ্রই ফিরে আসব। ফিরে এসে দেখল, রূপসীর হাতে মাত্র একটি কবুতর আছে। প্রশ্ন করল, অপর কবুতরটি

কোথায়? উত্তর হল, উড়ে গেছে। প্রশ্ন করা হল, কিভাবে উড়ে গেল? মেয়েটি তার হাতের অপর কবুতরটিকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "এভাবে।" বলার সাথে সাথেই শাহজাদা পূর্বের চেয়েও অধিক আসক্ত হয়ে পড়লেন এবং পরিশেষে তাকেই বিয়ে করলেন। এ ছিল শুধু দেখার পরিণতি, অন্য কিছুই নয়। সুতরাং একটু চোখ খুলুন, বার বার চিন্তা করুন। হয়ত সত্য গ্রহণ করা সহজ হয়ে যাবে!

মোটকথা, মূলত চোখ চুরি করে, হাত অগ্রসর হয়। ফলে গুনাহ ও পাপাচার সংঘঠিত হয়। আর এজন্যই ইসলাম চেহারা আবৃত করা ও পর্দা করার বিধান দিয়েছে। সহাবস্থান ও সহশিক্ষা হারাম ঘোষণা করেছে। সহশিক্ষা প্রসঙ্গে জনৈক ব্যক্তি বলেছিল, "ক্ষুধার্ত পেটে উন্মুক্ত গোশত দেখলে চক্ষু কি অন্য দিকে ফিরতে চায়?"

অভিজ্ঞ ডাক্তার ও মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত মতে দৃষ্টির প্রভাব বিভিন্ন মাধ্যমে মস্তিষ্ক ও হরমোনারী সিস্টেমের উপর পতিত হয়। মানুষের হরমোনারী সিস্টেম মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার কারণে শরীরের অন্যান্য ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আসে। ফলে মানুষ অসংখ্য রোগ ও দুর্বলতায় জর্জরিত হয়ে পড়ে।

## পিতা-মাতার আনুগত্য ও আধুনিক বিজ্ঞান

### গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আত্মিক ও মানসিক রোগের অভিজ্ঞ ডাক্তার ও গবেষক নিকলসন ও মনোবিজ্ঞানের প্রধান শিক্ষক প্রফেসর মিলন কিস্‌ম এর রিপোর্ট এবং গবেষণার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাদের উভয়ের বক্তব্যই অভিন্ন। তারা বলেন, বার্ধ্যক্যে সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ-ভালবাসা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন সন্তানদের প্রতি পিতামাতার মহব্বতপূর্ণ দৃষ্টি অত্যন্ত কার্যক্ষম হয় এবং তাদের সুস্থতা ও প্রশান্তির বিরাট কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পিতা-মাতা সহস্র মাইল দূরে থেকেও শুভকামনার ভিত্তিতে এক অদৃশ্য রশ্মি সন্তানদের প্রতি নিক্ষেপ করেন। পিতা-মাতা রোগাক্রান্ত হলেও তাদের এ অদৃশ্য রশ্মির শক্তি দুর্বল হয় না বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পিতা-মাতা নিকটে থাকলে তাদের স্নেহময় পুণ্যদৃষ্টির কারণে আগত অদৃশ্য রশ্মি সন্তানদের দেহের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। ফলে তাদের দেহ ও মন সতেজ ও শক্তিশালী হয়। পিতা-মাতার সংস্পর্শে সন্তানদের মানসিক সমস্যা দূর হয়। তাদের এ মানসিক চাপ দূর হওয়ার ফলে শরীর ভালো থাকে।

আমি যখন আমার মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দৃষ্টি বিনিময় করি, তখন শান্তি ও স্থিরতা ফিরে পাই। সমস্ত পশ্চিমা অভিজ্ঞমহল ধারাবাহিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কোনো ব্যক্তি যখন মাতা-পিতার কথা মেনে চলে, তখন তাদের গোপন হৃদয় কিরণের ইউনিটে কম্পন সৃষ্টি হয়। তারপর তা থেকে উপকারী হৃদয়কিরণ বের হয়ে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে, যা তার সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের কারণ হয়। এ হৃদয়কিরণই তার আশপাশে দুর্ভেদ্য প্রাচীর রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাকে সর্বপ্রকার বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে হেফাজত করে।

এরপর যখন এ ব্যক্তিই মাতা-পিতার অবাধ্য হয় তখনও মাতা-পিতার গোপন হৃদয় কিরণের ইউনিটে কম্পন সৃষ্টি হয়। কিন্তু তৎসঙ্গে তখন মাতা-পিতার ক্রোধ, মনের ব্যথা ও ফরিয়াদ যুক্ত থাকে। তাই তা থেকে ক্ষতিকর কিরণ বের হয়ে তার ক্ষতি সাধন করে।

## মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তার ফলাফল

একজন ডাক্তার হিসেবে আমি বিভিন্ন প্রকারের লোকের মৃত্যুকালের অবস্থা দেখেছি। জনৈক মৃতব্যক্তি আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রেখে গিয়েছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, যারা মাতা-পিতার কথা মেনে চলেও সদ্ব্যবহার করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দুনিয়ার সকল মুশকিল আসান করে দেন। এমনকি তাদেরকে এমন কষ্টদায়ক ব্যাধি থেকেও মুক্তি দান করেন, যার ঔষুধ আমাদের কাছে নেই। তাদের ভালো মৃত্যুও নসীব হয়। আর যারা আপন মাতা-পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তারা দুনিয়াতেই শাস্তি পেয়ে যায়। তাদের মৃত্যু হয় অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে মাতা-পিতার সঠিক মূল্যায়ণের তাওফীক দান করুন। এখানে কয়েকটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করছি।

# মায়ের দু'আ

## ঘটনা–১

আমি যখন এম.বি.বি.এস ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছিলাম, তখন আমার জ্বর হয়েছিল। জ্বরের ভিতরেই এ্যানাটমির প্রশ্ন পত্র দেওয়া হল, যার ছয়টি প্রশ্নের মধ্যে একটির উত্তর ভুল হয়ে গেল। বাড়িতে ফেরার পর আম্মাজান প্রশ্নপত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম, জ্বরের কারণে একটি উত্তর ভুল হয়েছে। আম্মাজান আমাকে দৃঢ়চিত্তে বললেন, আমি দু'আ করব, তোমার ভুল প্রশ্নটিও সঠিক হয়ে যাবে। ফলাফল প্রকাশের পরে দেখা গেল, ক্লাশে আমিই প্রথম স্থান অধিকার করেছি। এজন্য স্বর্ণের মেডেলও পুরস্কার পেয়েছি। মায়ের দু'আর ফলে উক্ত ভুল প্রশ্নেও পূর্ণ নম্বর পেয়েছি এবং ক্লাশেও প্রথম স্থান অধিকার করেছি।

## ঘটনা- ২

এক প্রফেসর সাহেবের হার্টে ব্যথা আরম্ভ হল। তার এ ব্যথা এত মারাত্মক ছিল যে, তাঁর জীবননাবসানের সম্ভাবনাই ছিল প্রকট। তাঁর আম্মা শিয়রে বসে বারবার দু'আ করছিল। আমরাও শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন, আয় আল্লাহ! আমি আমার এ সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট আছি। তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমরা তো তার চিকিৎসায় ব্যস্ত ছিলাম আর উক্ত মহিলা লিপ্ত ছিলেন দু'আয়। প্রফেসর সাহেব জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কালিমা পাঠ করলেন। এরপর মুচকি হেসে পরজগতে পারি জমালেন।

## ঘটনা– ৩

১৯৬৭ সন এর ঘটনা। আমাকে মেডিসিনের এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনে উপস্থিত করা হল। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী ও মাতা-পিতার দু'আয় আমি পাকিস্তানে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। কিন্তু কয়েকটি কারণে আমাকে উক্ত পদে নিয়োগ করা হয় নি। তাই আমাকে সৌদি আরব যেতে হল। যার ফলে আমার মাতা-পিতাও মনে খুব আঘাত পেলেন। তাঁরা দিবারাত্র আমার ফিরে আসা এবং আমার উক্ত পদে নিয়োগের জন্য দু'আ করলেন। তখন আমার ফিরে আসা এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভবই ছিল। কিন্তু তাদের নিরন্তর দু'আর বরকতে হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি এবং এক বছরের ভিতরেই আমি সেই পদ লাভ করেছি। যার জন্য আমি নিজেকে হকদারও মনে করতাম।

**ঘটনা- ৪**

করাচীতে আমার এক বন্ধু ব্যাংক অফিসার ছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে তিনি একটি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন। তিনি পাণ্ডুরোগে এত দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, একেবারে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তদুপরি পেটে পানি এসে গিয়েছিল এবং মূত্রাশয়ের কার্যক্ষমতাও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ওই ব্যাংক অফিসারের কয়েকজন যুবতী কন্যাও ছিল এবং তিনি ছিলেন মাতা-পিতার একমাত্র সম্বল।

চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ার কারণে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত মনে করে আমাকে করাচী আসার অনুরোধ জানালেন। আমি করাচী গেলাম। বন্ধুকে জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত দেখে এবং তাঁর দায়-দায়িত্বগুলি দেখে মনে খুবই ব্যথা পেলাম।

আমার যাওয়ার পূর্বে ১৮ জন ডাক্তার তাঁকে দেখে গিয়েছেন এবং সকলেই একমত ছিলেন যে, এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। আমি ছিলাম উনিশতম ফিজিশিয়ান। আমিও তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে একমত পোষণ করলাম। তবে আমি একটি জিনিসের অভাব পেয়েছি। সেটা হল, চিকিৎসায় অনিয়ম।

আমি তার মাতা-পিতাকে কাছে বসিয়ে বুঝালাম, যদি সদকা করে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে দু'আ করে চিকিৎসা আরম্ভ করা হয়, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ণ সুস্থতা দান করবেন।

আমি তাঁর মাতা-পিতাকে আরও বুঝালাম, সন্তানের জন্য মাতা-পিতার দু'আ যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ ফেরৎ দেন না। ডাক্তারগণ সেই পূর্বের চিকিৎসাই পুনরায় আরম্ভ করলেন।

এ দিকে তার পিতা-মাতা একাধারে তিনদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার দরবারে রোগ মুক্তির দু'আ করতে থাকলেন। সেখানকার লোকেরা বলল, তৃতীয়দিন আল্লাহ তা'আলার রহমতের সাগরে ঢেউ উঠল। তার মূত্রাশয় কাজ আরম্ভ করল। পাণ্ডু এবং পেটের পানি ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করল। এভাবে এক সপ্তাহের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা তাকে পূর্ণ সুস্থতা দান করলেন। আমি করাচী থেকে ফিরে আসার চতুর্দশ দিনেই বন্ধুর স্বহস্তে লেখা চিঠি পেলাম। তিনি স্বীকার করলেন যে, একমাত্র পিতা-মাতার দু'আয়ই তিনি এ কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। মেডিকেল সাইন্সের

# মায়ের দু'আ

**ঘটনা–১**

আমি যখন এম.বি.বি.এস ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছিলাম, তখন আমার জ্বর হয়েছিল। জ্বরের ভিতরেই এ্যানাটমির প্রশ্ন পত্র দেওয়া হল, যার ছয়টি প্রশ্নের মধ্যে একটির উত্তর ভুল হয়ে গেল। বাড়িতে ফেরার পর আম্মাজান প্রশ্নপত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম, জ্বরের কারণে একটি উত্তর ভুল হয়েছে। আম্মাজান আমাকে দৃঢ়চিত্তে বললেন, আমি দু'আ করব, তোমার ভুল প্রশ্নটিও সঠিক হয়ে যাবে। ফলাফল প্রকাশের পরে দেখা গেল, ক্লাশে আমিই প্রথম স্থান অধিকার করেছি। এজন্য স্বর্ণের মেডেলও পুরস্কার পেয়েছি। মায়ের দু'আর ফলে উক্ত ভুল প্রশ্নেও পূর্ণ নম্বর পেয়েছি এবং ক্লাশেও প্রথম স্থান অধিকার করেছি।

**ঘটনা- ২**

এক প্রফেসর সাহেবের হার্টে ব্যথা আরম্ভ হল। তার এ ব্যথা এত মারাত্মক ছিল যে, তাঁর জীবননাবসানের সম্ভাবনাই ছিল প্রকট। তাঁর আম্মা শিয়রে বসে বারবার দু'আ করছিল। আমরাও শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন, আয় আল্লাহ! আমি আমার এ সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট আছি। তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমরা তো তার চিকিৎসায় ব্যস্ত ছিলাম আর উক্ত মহিলা লিপ্ত ছিলেন দু'আয়। প্রফেসর সাহেব জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কালিমা পাঠ করলেন। এরপর মুচকি হেসে পরজগতে পারি জমালেন।

**ঘটনা– ৩**

১৯৬৭ সন এর ঘটনা। আমাকে মেডিসিনের এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনে উপস্থিত করা হল। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী ও মাতা-পিতার দু'আয় আমি পাকিস্তানে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। কিন্তু কয়েকটি কারণে আমাকে উক্ত পদে নিয়োগ করা হয় নি। তাই আমাকে সৌদি আরব যেতে হল। যার ফলে আমার মাতা-পিতাও মনে খুব আঘাত পেলেন। তাঁরা দিবারাত্র আমার ফিরে আসা এবং আমার উক্ত পদে নিয়োগের জন্য দু'আ করলেন। তখন আমার ফিরে আসা এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভবই ছিল। কিন্তু তাদের নিরন্তর দু'আর বরকতে হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি এবং এক বছরের ভিতরেই আমি সেই পদ লাভ করেছি। যার জন্য আমি নিজেকে হকদারও মনে করতাম।

**ঘটনা- ৪**

করাচীতে আমার এক বন্ধু ব্যাংক অফিসার ছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে তিনি একটি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন। তিনি পাণ্ডুরোগে এত দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, একেবারে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তদুপরি পেটে পানি এসে গিয়েছিল এবং মূত্রাশয়ের কার্যক্ষমতাও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ওই ব্যাংক অফিসারের কয়েকজন যুবতী কন্যাও ছিল এবং তিনি ছিলেন মাতা-পিতার একমাত্র সম্বল।

চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ার কারণে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত মনে করে আমাকে করাচী আসার অনুরোধ জানালেন। আমি করাচী গেলাম। বন্ধুকে জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত দেখে এবং তাঁর দায়-দায়িত্বগুলি দেখে মনে খুবই ব্যথা পেলাম।

আমার যাওয়ার পূর্বে ১৮ জন ডাক্তার তাঁকে দেখে গিয়েছেন এবং সকলেই একমত ছিলেন যে, এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। আমি ছিলাম উনিশতম ফিজিশিয়ান। আমিও তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে একমত পোষণ করলাম। তবে আমি একটি জিনিসের অভাব পেয়েছি। সেটা হল, চিকিৎসায় অনিয়ম।

আমি তার মাতা-পিতাকে কাছে বসিয়ে বুঝালাম, যদি সদকা করে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে দু'আ করে চিকিৎসা আরম্ভ করা হয়, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ণ সুস্থতা দান করবেন।

আমি তাঁর মাতা-পিতাকে আরও বুঝালাম, সন্তানের জন্য মাতা-পিতার দু'আ যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ ফেরৎ দেন না। ডাক্তারগণ সেই পূর্বের চিকিৎসাই পুনরায় আরম্ভ করলেন।

এ দিকে তার পিতা-মাতা একাধারে তিনদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার দরবারে রোগ মুক্তির দু'আ করতে থাকলেন। সেখানকার লোকেরা বলল, তৃতীয়দিন আল্লাহ তা'আলার রহমতের সাগরে ঢেউ উঠল। তার মূত্রাশয় কাজ আরম্ভ করল। পাণ্ডু এবং পেটের পানি ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করল। এভাবে এক সপ্তাহের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা তাকে পূর্ণ সুস্থতা দান করলেন। আমি করাচী থেকে ফিরে আসার চতুর্দশ দিনেই বন্ধুর স্বহস্তে লেখা চিঠি পেলাম। তিনি স্বীকার করলেন যে, একমাত্র পিতা-মাতার দু'আয়ই তিনি এ কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। মেডিকেল সাইন্সের

ভাষ্যমতে এরূপ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট তো সব কাজেই সম্ভব।

## মাতাপিতার বদ-দু'আর পরিণতি

### প্রথম ঘটনা

আমার পিতার এক বন্ধু সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিল, সে মায়ের মৃত্যুকালে মায়ের সাথে বেয়াদবী করেছিল। তার মা বেচারী একাকিনী পড়ে থেকে অবশেষে মারা গিয়েছেন। আর আমিও অনুসন্ধানে ছিলাম, যে ব্যক্তি মা-বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করে তার মৃত্যু কিভাবে হয়? ধীরে ধীরে সময় গড়িয়ে যেতে লাগল। এ ঘটনার ত্রিশ বছর পর যে ব্যক্তি মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল, সে অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং ডায়রিয়ার কারণে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ল।

আমার পিতা আমাকে তার চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলেন। আমি দেখলাম, সে ব্যক্তি একেবারে দুর্বল হয়ে বিছানায় পড়ে আছে এবং কান্নাকাটি করছে। আমি তাকে তার খাদ্যের ব্যাপারে পরামর্শ দিলে সে আরও জোরে কাঁদতে লাগল এবং বলল, আমার তিনটি ছেলে। কিন্তু কেউ আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, কয়েকদিন যাবৎ অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছি। একটিবারও কেউ দেখতে আসল না। এভাবেই তার মৃত্যু এসে গেল। রাত্রিবেলায় সে একাকী মরে পড়ে ছিল। সকালে মহল্লাবাসী যখন সংবাদ পেল, তখন তার শরীর পিপঁড়ায় খাচ্ছিল। বাস্তবিকই মায়ের সাথে দুর্ব্যবহারকারীরা এ দুনিয়ায়ই শাস্তি পেয়ে যায়।

### দ্বিতীয় ঘটনা

আমার ওয়ার্ডে এক যুবকের মূত্রথলির কার্য বন্ধ হয়ে তিন দিন পর্যন্ত আধমরা হয়ে পড়েছিল। বিগত চল্লিশ বছরেও এমন নির্মম মৃত্যু আমার নজরে পড়ে নি। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার মুখ নীলবর্ণ ধারণ করত। চক্ষু বের হয়ে আসতে চাইত এবং মুখ থেকে ভয়াবহ আওয়াজ বের হত। মনে হত যেন কেউ তার গলা টিপে ধরেছে। মৃত্যুর একদিন পূর্বে তার এ অবস্থা খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করল। চিৎকার আরও বেড়ে গেল। ওয়ার্ড হতে অন্যান্য রোগীরা পালাতে আরম্ভ করল। তাই তাকে ওয়ার্ড হতে অনেক দূরে একটি আলাদা কামরায় স্থানান্তর করা হল। কিন্তু তারপরও তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হল না। অবশেষে তার বাবা এসে আমাকে বললেন, তাকে একটি বিষাক্ত টিকা দিয়ে দিন। যেন সে মরে যায়। এ

অবস্থা আর সহ্য হয় না। আমি তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে এমনকি মারাত্মক অন্যায় করেছে, যার কারণে তার এ করুণ অবস্থা। তার পিতা সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললেন- এ ব্যক্তি তার স্ত্রীকে খুশী করার জন্য মাকে মারধর করত। আমি তাকে বাঁধা দিতাম। সে শুনত না। এ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত।

## তৃতীয় ঘটনা

আমার এক বন্ধু গ্রামের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সেখানকার একটি ঘটনা। এক কৃষকের ঘরে সর্বদা তার মা ও স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হত। কয়েকবার তার স্ত্রী অসন্তুষ্ট হয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। তার স্ত্রী শেষবার এ শর্ত প্রদান করল যে, তুমি যদি তোমার মাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দাও, তা হলে আমি তোমার ঘরে আসব।

কৃষক প্রতিদিনের ঝগড়ায় বিরক্ত হয়ে অবশেষে তার মাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়ার ফন্দি আটল। সে প্রতিদিন ক্ষেত হতে আখ্ কেটে নিয়ে বাজারে বিক্রি করত। একদিন সে তার মাকে ছল করে ক্ষেতে নিয়ে গেল। যেন তিনি তার মাথায় আখের বোঝা তুলে দেন। সুতরাং সে তার মাকে পাশে দাঁড় করিয়ে আখ্ কাটতে আরম্ভ করল এবং হঠাৎ সে কাস্তে দ্বারা তার মাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে বসল। তখন জমিন তার পা আটকে ফেলল। দূরে ছিটকে পড়ল কাস্তে। এমতাবস্থায় তার মা চিৎকার করতে করতে গ্রামের দিকে দৌড়ে পালাল।

এরই মধ্যে জমিন ধীরে ধীরে কৃষককে গিলতে আরম্ভ করল। তখন কৃষক চিৎকার করতে লাগল। উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে শুরু করল মাকে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। কিন্তু ক্ষেত থেকে গ্রাম দূরে হওয়ার কারণে মানুষ তার আওয়াজ শুনল অনেক দেরীতে। মানুষ সেখানে পৌছার আগেই জমিন তাকে বুক পর্যন্ত গিলে ফেলল তার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

লোকেরা তাকে উদ্ধারের জন্য অনেক চেষ্টাই করল। কিন্তু জমিন তাকে ছাড়ল না। এভাবেই সে ধীরে ধীরে মাটির অধরে ধ্বসে গেল।

## ইউরোপের শিক্ষণীয় একটি ঘটনা

ইংল্যাণ্ডের একটি চিকিৎসা সাময়িকীতে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ছেপেছিল। মেরী নামের একটি মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হলে তার মা তাকে খুব ভালো পাত্রের কাছে বিবাহ দিল। স্বামী অত্যন্ত প্রতাপশালী ও

সামাজিক ছিল। তার ঘরে একটি কন্যা সন্তানও জন্ম নিল। মায়ের আর কোনো সন্তান না থাকায় সে মেয়ের সাথেই থাকত এবং নাতনিকে লালন-পালনে সহযোগিতা করত। নাতনী যখন একটু বড় হয়ে গেল এবং নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ নিজেই পালটাতে সক্ষম হল, তখন মেরী ভাবল, মায়ের জন্য ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। এজন্য বৃদ্ধাকে এখান থেকে সরাতে হবে। মা বৃদ্ধা-ভাতা পেতেন। সুতরাং মেরী তার মাকে একটি বৃদ্ধাশ্রমে 'ওল্ড হাউজে' (Old house) দিয়ে এল।

মা মেয়েকে বুঝানোর অনেক চেষ্টা-তদবীর করল। ঘরে তার প্রয়োজনীয়তার কথাও স্মরণ করিয়ে দিল। কিন্তু মেরী মাকে বলল, আমার চার কামরার ফ্লাট এখন আমাদের জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এখন আপনি এখান থেকে তুমি চলে গেলেই ভালো হয়। মেরীর কন্যা এলিজাবেথের তার নানীর সঙ্গে খুব ভাব জমে গিয়েছিল। তার আবেদনও নাকচ হয়ে গেল। অবশ্য মায়ের সাথে ওয়াদা হল, প্রতি রবিবার তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তাকে বাসায় আনবে।

মাকে ওল্ড হাউজে পৌছানোর পর ধীরে ধীরে সাক্ষাতে দেরী হতে লাগল। সপ্তাহে রবিবার ছুটির দিন হওয়ার কারণে ঘরে মেহমান আসা-যাওয়া করে। তাদের উপস্থিতিতে ঘরে একজন দুর্বল বৃদ্ধার আগমন ভালো দেখায় না। বিধায় ওল্ড হাউজেই মায়ের বসবাস সুনির্ধারিত হয়ে গেল। এদিকে মা কিন্তু অক্ষম ও দুর্বল বৃদ্ধাদের মাঝে থেকেও তাদেরকে স্মরণ করত। ভালবাসা ও মমতাপূর্ণ বড় বড় চিঠি প্রেরণ করত। নাতনী এলিজাবেথের কাছে স্নেহ-মায়া ও ভালবাসা পাঠাত। কিন্তু সে চিঠির উত্তরের অপেক্ষাতেই থাকত। কন্যা তার মাকে চিঠিতে লিখল, বড়দিনের উৎসবে অবশ্যই মাকে ঘরে আনতে যাবে।

মা বেচারী পকেট খরচ থেকে এক পয়সা করে বাঁচিয়ে উল ক্রয় করল এবং দিবারাত্র খেটে-খুটে প্রিয় নাতনীর জন্য টুপি, মাফলার এবং সোয়েটার তৈরি করতে লাগল। বড়দিন আসতে আর মাত্র অল্প ক'দিন বাকি। এদিকে বুনন কাজ কিছু বাকি রয়ে গেছে। তাই ২৪ শে ডিসেম্বর কঠিন বরফপাত হওয়া সত্ত্বেও বিল্ডিংয়ের বেলকনিতে চেয়ার পেতে বসে কলিজার টুকরা প্রিয় নাতনীর উপহারে কাজ সম্পন্ন করতে লাগল। কঠিন শীতে বেলকনিতে বসার আরেক কারণ ছিল, যখন তাকে নেওয়ার জন্য টেক্সী আসবে, তখন তাদেরকে যেন অপেক্ষা করতে না হয়।

ওল্ড হাউজের ন্যান্সী নামের এক সেবিকা তার সেবায় অত্যন্ত যত্নবান ছিল। সে বৃদ্ধাকে হিটার রুমে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করল। কিন্তু মা পরিবারের লোকজনদের দেখার জন্য অধীর হয়ে ছিল। তাই কোনো ক্রমেই সেখান থেকে অন্যত্র যেতে রাজী হলেন না। ন্যান্সী একটি কম্বল এনে তার গায়ে জড়িয়ে দিল। বারবার ঘরে যাওয়ার অনুরোধ জানানোর সাথে সাথে চাও দিতে লাগল। এভাবে সকাল হয়ে গেল, কিন্তু তাকে নেওয়ার জন্য কেউই আসল না। দুর্বলতা, রাত্রি জাগরণ এবং প্রচণ্ড হিমেল হাওয়ায় সারারাত বসে থাকার কারণে তার নিউমোনিয়া দেখা দিল।

মেয়ে নিজে আসার সুযোগ পেল না। এমনকি সে একবার ফোন করেও মায়ের খবর নিতে পারল না। ইতোমধ্যে মা মারা গেল। মেরী সংবাদ পেয়ে মায়ের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করল। কিছুদিন পর মেরী মায়ের সামানপত্র আনার জন্য ওল্ড হাউজে গেল, তখন সে সেখানকার সেবিকা ন্যান্সীর কৃতজ্ঞতা আদায় করল। কারণ, সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মায়ের সেবা করেছে। এরপর মনে মনে ভাবল, ন্যান্সী বাস্তবিকই একজন সেবিকা মেয়ে। তাকে বাসায় কাজের জন্য নিয়ে গেলে মন্দ হয় না।

তাই সে ভালো বেতনের লোভ দেখিয়ে ন্যান্সীকে তার সাথে বাড়িতে যাওয়ার জন্য প্রস্তাব করল। ন্যান্সী হেসে হেসে বলল, আমি আপনার বাড়িতে অবশ্যই যাব। তবে তার আগে আল্লাহ তা'আলার ইনসাফ দেখে নিব। যেদিন আপনার মেয়ে এলিজাবেথ আপনাকে ওল্ড হাউজে রেখে যাবে, সেদিন আমি তার সাথে সেবার জন্য চলে যাব। এটি নিছক একটি ঘটনাই নয় বরং এটা বাস্তব সত্য। বর্তমানে মডার্ণ পরিবারগুলোতে মাতা-পিতা একটি ফালতু বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তাদের সেবা তো দূরের কথা বরং নতুন প্রজন্ম তাদের চেহারা দেখতেও রাজী নয়।

হযরত ওয়ায়েস করনী রহ. ইসলামের পয়গাম শুনে ইসলাম পছন্দ করলেন এবং মক্কায় গিয়ে বাই'আত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর মা তখনো জীবিত ছিলেন। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উপস্থিতি ছাড়াই তাঁর ইসলাম গ্রহণ কবুল করলেন। তাঁকে নসীহত করলেন, তিনি যেন মায়ের খেদমত করতে থাকেন। কেননা জান্নাত মায়ের পদতলে। এরপর তিনি সংবাদ পেলেন, উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাঁত মুবারক শহীদ হয়ে গেছে। নবী-প্রেমে পাগলপারা এবার পাথর দ্বারা নিজের দাতগুলিও ভেঙে ফেললেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হওয়ার

ভাগ্য হয় নি। তাঁর মা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পরও জীবিত ছিলেন। তাই তিনি তার যিয়ারত থেকে মাহরূম ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীর মর্যাদা লাভের জন্য জরুরি হল বালেগ অবস্থায় তার দর্শন লাভ করা এবং মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর অটল থাকা। হযরত ওয়ায়েস করণী রহ.-এর হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতও হয় নি এবং তিনি তাঁর পবিত্র হাতে ইসলামও গ্রহণ করেন নি। তাঁকে মায়ের খেদমতের প্রয়োজনীয়তার কারণে এগুলি থেকে বাদ রাখা হয়েছে। সরাসরি উপস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সাহাবিয়াতের মর্যাদা দান করা হয়েছে (অবশ্য এতে কারও কারও মতভেদও আছে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মজলিসে ওয়ায়েস করণী রহ.-এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিবারই তাঁকে আপন বন্ধুর মর্যাদা দান করেছেন।

## ইসলাম ও মাতা-পিতার খেদমত

সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমাদের পালনকর্তা আদেশ করেছেন তোমরা তিনি ব্যতীত আর কারও ইবাদত করো না এবং আপন মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।"

হযরত আবু উমামা বাহেলী রহ. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সন্তানের উপর মাতা-পিতার হক কতটুকু? ইরশাদ হল, "মাতা-পিতাই তোমার জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নাম।"

অর্থাৎ পিতা-মাতার দেখমত করলে জান্নাত পাওয়া যাবে। যেমন : হযরত ওয়ায়েস করনী রহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না দেখা সত্ত্বেও ঘরে বসেই সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেছেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল লাভ করেছেন। কিন্তু কেউ যদি এর বিপরীত করে অর্থাৎ তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তা হলে সে জাহান্নামের উপযোগী হবে। যে ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে মাতা-পিতার খেদমত করল না, সে নিজে বৃদ্ধ বয়সে আপন সন্তানদের কাছ থেকে কিভাবে খেদমতের আশা করতে পারে?

## একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

লাহোরে বড় একজন রং ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তার ব্যবসা লাখের কোঠা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সম্পদ বেড়ে যাওয়ায় তার অহঙ্কার বেড়ে

গিয়েছিল। মানুষকে মানুষ মনে করত না। একদিন তার মা তাকে কাছে বসিয়ে কিছু উপদেশ দিতে চাইলেন। যেন মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং অন্যদেরকেও মানুষ মনে করে। মায়ের উপদেশগুলো তার কাছে ভীষণ খারাপ লাগল। তাই মাকেই সে গালিগালাজ আরম্ভ করল। তাঁকে একটি থাপ্পড়ও মারল। এ ঘটনার এক বছরের ভিতরই তার ব্যবসায় ধ্বস নামল। শেষ পর্যন্ত দোকানও বিক্রি করতে হল। অবশেষে তাকে দু'বেলা খাবারের জন্য মাজারের বাইরে বসে থাকতে হত।

এ ধরনের লোকেরা দীর্ঘদিন জীবিত থাকে। এদেরকে অন্যদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দীর্ঘদিন জীবিত রাখা হয়। কুরআনে মাজিদে মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে বিভিন্ন স্থানে বেশ জোর দিয়েছে এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের উপায় ও পন্থা বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতি জোর দিয়ে বলেছেন– আমি মানবজাতিকে আদেশ করেছি, তারা যেন আপন পালনকর্তা ও মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা আদায় করে।" আমাদের জন্য যেরূপ আপন পালনকর্তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন জরুরি, তেমনিভাবে মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা আদায়ও অত্যাবশ্যক।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে মায়ের দুর্ব্যবহারের নালিশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার মায়ের অনুগ্রহের প্রতিদান পূর্ণ করেছ? সে জবাব দিল, আমি তাকে কাঁধে করে হজ্ব করিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি তার খেদমেতর সবকিছুই ফেরৎ দিতে পেরেছ? যখন তাকে বার বার মায়ের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, তখন তার টনক নড়ল যে, আম্মা-আব্বা যদি বাড়াবাড়িও করেন, তবু তা সহ্য করা আমার কর্তব্য। কুরআন মজীদের একটি আয়াত থেকে তা-ই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। "যদি তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমাদের জীবদ্দশায় বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে কখনো 'উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে কখনো ভৎর্সনা করো না।" উহ্ বলার পরিস্থিতি তখনই সৃষ্টি হয়, যখন কেউ কোনো কষ্ট পায়। অর্থাৎ তারা যদি তোমাকে কোনো প্রকার কষ্ট দেন, তখন তোমার করণীয় হল, তুমি তার প্রতিটি কাজকে হাসিমুখে এবং সৎগুণে বরণ করে নিবে। তাদের দুর্ব্যবহারের জবাবে ভর্ৎসনা করা কুরাআনে মাজিদে নিষেধ করা হয়েছে।

আর কুরআন মাজীদ যে কাজ থেকে বারণ করে, সেটি করা হারাম হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : ওই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হোক, লাঞ্ছিত হোক, লাঞ্ছিত হোক! লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যে ব্যক্তি আপন মাতা-পিতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েছে। অথচ তাদের খেদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে নি।" মাতা-পিতার খেদমত ওই অনুগ্রহের প্রতিদান, যা মাতা-পিতা তার লালন-পালনের সময় করেছিলেন। ইহসানকে ইহসান মনে করা এবং ইহসানকারীর প্রতিদান দেওয়ার অভ্যাস ঘর থেকেই শুরু করতে হয়।

যখন কেউ এ কথা অনুভব করতে পারে, তখন সে অন্যের প্রতিও কৃতজ্ঞ হতে শিখে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহ তা'আলারও শুকরিয়া আদায় করে না। অন্যের ইহসানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার সুযোগ প্রতিটি মুসলমানের জীবনে বার বার আসে।

আম্মা-আব্বার গোনাহ মাফের জন্য দু'আ করাও একজন মুসলমানের জন্য একটি বিশেষ সওয়াবের কাজ। আর আল্লাহ তা'আলা নিজেই দু'আ করার পদ্ধতি এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, "হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমার আব্বা-আম্মার প্রতি রহম করুন! যেমনি তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।"

হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা হকদার কে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার আম্মা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার আম্মা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার আম্মা। তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার আব্বা। সুতরাং আম্মা-আব্বার সম্মান করা, তাদের সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা, তাদের ইহসানের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এমন একটি শিক্ষা, যা একজন মানুষের উত্তম চরিত্রের শামিল। তাই সর্বদা আম্মা-আব্বার খেদমত করা এবং তাদের জন্য সর্বদা দু'আ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য একান্ত জরুরি।

**প্রথম খণ্ড সমাপ্ত**

# সুন্নতে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ও

# আধুনিক বিজ্ঞান

## দ্বিতীয় খণ্ড

# শরাব বা মদ এবং আধুনিক বিজ্ঞান

(ALCOHOL AND MODERN SCIENCE)

## হাদীসে রাসূল

○ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আল্লাহ তা'আলা শরাবের উপর, শরাব পানকারীর উপর, শরাব নিংড়িয়ে বেরকারীর উপর, বিক্রেতার উপর, ক্রেতার উপর, পরিবেশনকারীর উপর, পরিমাপকারীর উপর এবং ঐ ব্যক্তির উপর লা'নত করেন, যার জন্য মেপে দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

## শরাব সভ্যতা বা মানবতার দুশমন

(ALCOHAL IS THE ENEMY OF CIVILIZATION)

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"আপনার কাছে মানুষ শরাব এবং জুয়ার হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। আপনি বলে দিন। ঐ দুটি জিনিসের মধ্যে খুবই খারাবী রয়েছে। যদিও এর মধ্যে মানুষের জন্য কিছু কিছু উপকারও রয়েছে। তবে এর লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই অনেক বেশি।" (সূরা বাকারাহ : ২১৯)

সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক পৃথিবীর প্রসিদ্ধ প্রফেসার হির্স (HIRSCH) এ বিষয়ে তার লিখিত গ্রন্থে লিখেছেন, শরাবের অভ্যাস যা সভ্য আমেরিকা মাত্র ১৫ বছরের জন্য বর্জন করতে পারে নি, ১৪০০ বছর পূর্বে সফলতার সঙ্গে ইসলাম তা বর্জন করেছে এবং শরাবের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মানবতাকে রক্ষা করে আসছে।

পবিত্র কুরআনের তিনটি নির্দিষ্ট সূরার মধ্যে শরাব বা মদ্যপানের বদঅভ্যাস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমটি হল উপরিউক্ত সূরার আলোচ্য আয়াত। দ্বিতীয়টি সূরা নিসার ৪৩নং আয়াত আর তৃতীয়টি হল সূরা মায়েদার ৯০ ও ৯১ নং আয়াত।

উক্ত সূরা তিনটিতে নিজ নিজ ধারণানুযায়ী শরাবে অভ্যস্ত হওয়া তো দূরের কথা বরং শরাব থেকে সৃষ্ট ক্ষতিসমূহ সম্পর্কে পৃথক পৃথক পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে শরাবের প্রাকৃতিক ক্ষতিগুলো বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমরা যেহেতু কুরআনের আয়াতকে

বিজ্ঞান ভিত্তিক ইলমের দৃষ্টিতে নিরীক্ষা করতে চাচ্ছি, তাই আমি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা বিশেষভাবে সে দৃষ্টিকোণ থেকেই করব।

সুতরাং সর্বপ্রথম মানসিক সুস্থতার উপর শরাবের বিষাক্ত প্রভাব পরিপূর্ণভাবে অনুসন্ধান করব। এর আগে শরাবের রাসায়নিক উপাদন সম্পর্কে আমাদের কমবেশি কিছু জেনে নেওয়া উচিত।

ইলমে কিমিয়া বা রসায়ন (CHEMISTRY)-এর দৃষ্টিতে আমি জানি, এ্যালকোহল (শরাব) দ্রবণ ক্রিয়ার জন্য বিশেষ করে চর্বি গলানোর কাজে একটি শক্তিশালী দ্রাবক। খাদ্যের পরিভাষায় এটা অবশ্য দ্রবণকারী জিনিস নয় বরং চূর্ণ-বিচূর্ণ করার কাজে ফলপ্রসূ। অন্য কথায় চিনিকে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে হজম করার ব্যাপারে শরাব একটি রাসায়নিক বিকল্প খাদ্য (By Product)। উল্লিখিত কারণের ভিত্তিতে শরাবকে মানবদেহের জন্য একটি ক্ষতিকর ক্যামিকেল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মানবাত্মা শরাবের ক্রিয়াকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করে দেয় অর্থাৎ এর বিষাক্ত ক্রিয়াকে নষ্ট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ ক্রিয়াকে Detoxified বলে। অতএব আহার্য ক্ষেত্রে শরাব বা এ্যালকোহলের উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা নেই। এটা যখন মানবদেহে প্রবেশ করে, তখন অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে খাদ্য দ্রব্যকে দ্রুত হজম করে দেয়। এটাই শরাবের বাহ্যিক উপকারিতা, যা পবিত্র আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

## মানবদেহের উপর মদের প্রভাব

১। পরিপাক ক্রিয়ায় শরাবের প্রভাব : এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সর্বপ্রথম মুখ থেকেই প্রকাশ পায়। সাধারণত মানুষের মুখে লালা সাদৃশ একধরনের ধাতু (Flora) থাকে। এ্যালকোহল পান করার কারণে মুখের লালা উৎপাদনের শক্তি ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। যদ্দরুন মাড়ীতে ক্ষত এবং ফোলা বা স্ফীতি দেখা দেয়। সুতরাং শরাবে অভ্যস্থ ব্যক্তিদের দাঁতগুলি খুবই দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তারপর কণ্ঠ এবং খাদ্যনালিতে (Esophagus) তার প্রভাব দেখা দেয়। উভয় অঙ্গ পরস্পর একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত এবং উক্ত অঙ্গদ্বয় নেহায়েত কঠিন কাজ সম্পাদন করে।

উক্ত অঙ্গ দুটির উপর অনুভূতিশীল বিশেষ একধরনের (M) আবরণ থাকে। এ্যালকোহল পান করার কারণে উক্ত আবরণটির উপর বিরূপ

প্রভাব পড়ে। ফলে অঙ্গদ্বয় ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে। অঙ্গদ্বয়ের মধ্যে ক্যান্সার সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে মদ বা এ্যালকোহল ব্যবহারকেই ধরে নেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে সকল সংস্থা ক্যান্সারের মতো মারাত্মক ব্যাধিকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট, তারা ১৯৮০ সালের পর থেকে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা ও দূরদর্শিতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে।

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, এ্যালকোহল পান করার কারণে পাকস্থলিতে ধ্বংসাত্মক (Gastrits) ব্যাধির সৃষ্টি হয়। কারণ, রক্তে Lipid নামক এক বিশেষ ধরনের চর্বি থাকে, যা প্রতিরক্ষামূলক কাজ করে। এ্যালকোহল ব্যবহারের কারণে তা বিগলিত হয়ে যায়। অর্থাৎ Lipid একধরনের প্রতিরক্ষামুলক আবরণ সৃষ্টি করে, যার উপর হাইড্রোক্লোরিক এসিডের ক্ষতিকারক প্রভাব কার্যকরী হয় না।

সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মদ বা এ্যালকোহল যেমনিভাবে কণ্ঠনালী এবং খাদ্যনালিতে ক্যান্সার সৃষ্টির মূল উৎস হিসেবে কাজ করে, তেমনিভাবে পাকস্থলিতে ক্যান্সার সৃষ্টির ব্যাপারেও এ্যালকোহল উল্লিখিত ভূমিকা পালন করে থাকে।

মদের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে ডিওডেনাম এর ওপর। উক্ত স্থানটি খুবই স্পর্শকাতর এবং রাসায়নিক প্রভাবজনিত হয়ে থাকে। শরাব ডিওডেনিয়ামের উক্ত বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে থাকে, যা বিশেষ ধরনের হজমকারী লালা উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে।

শরাব হজমশক্তিকে ধ্বংস করার পর কলিজা থেকে সৃষ্ট লালা নির্গত করার ব্যাপারেও বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মধ্যপায়ীদের ডিওডেনিয়াম এবং পিত্তাবরণ সর্বদাই রোগাক্রান্ত থাকে অর্থাৎ উক্ত অঙ্গদ্বয়ের কার্যক্রম প্রায়ই যথাযথভাবে হয় না। পাকস্থলির উক্ত সমস্যা পরিপাক যন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলে। সুতরাং যে পরিপাক প্রক্রিয়া কম্পিউটারের মতো কর্ম সম্পাদন করে থাকে, তার কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

একজন সুস্থ ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় সব কিছু হজম করে থাকে। এটা তার পরিপাক ক্রিয়া বিশেষ কার্যক্রম চালু রাখার কারণেই সম্ভব হয়ে থাকে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত শরাবপায়ীদের এ নিয়ন্ত্রণ শেষ হয়ে যায়। তাদের পরিপাকক্রিয়াটি [illegible]

(মেদ) বেড়ে যায়। কারণ, তাদের অপ্রত্যাশিত হজমক্রিয়ায় পরিপাকযন্ত্রের ফাঁকা স্থানে চর্বি জমতে শুরু করে। মূলত চর্বির আধিক্য হৃদযন্ত্রের উপর (Myocardic Tissue) ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে হৃদযন্ত্রের রোগসমূহ বিস্তার লাভ করে। মদের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর প্রভাব কিডনীর উপর পতিত হয়। মানুষের কিডনী ওই অনুভূতির গবেষণা কেন্দ্র, যা শরাবের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুকেও বিষের মতো অনুভূতিপ্রবণ করে তোলে। এ অবস্থা প্রত্যেক মদ্যপকেই গ্রাস করে। কিডনীর উপর দুইভাবে মদের প্রভাব পতিত হয়।

(১) মদ্যপানের অবস্থায় কিডনীর এ্যালকোহল সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে মদ্যপায়ীর স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়।

(২) কিডনীর সকল কার্যক্রম হল, একটি বিষয় থেকে অন্য বিষয়ের অনুভূতি লাভ। আর উক্ত অনুভূতি মদের সার্বক্ষণিক প্রভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়। অবশেষে কিডনীকে সর্বক্ষণ একই বিষয়ের অনুভূতির চর্চা করতে হয়। এভাবে সর্বক্ষণ অপ্রয়োজনে শ্রম ও কষ্টের ফলে কিডনীর দুর্বলতা দেখা দেয়।

শরাবের এ প্রভাব কিডনীর জন্য বিপদজনক পরিণাম ডেকে আনে। বিশেষত কিডনী সঙ্কুচিত হয়ে যায়। জীবদ্দশায়ই শরাব পানকারীর কিডনী সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যেতে দেখা যায়। আরও বড় আশঙ্কা হল, শরাবের ব্যবহার পর্যায়ক্রমে কিডনীর সকল কার্যক্রম ধ্বংস করে দেয়।

ধ্বংসশীল কার্যাবলীর প্রথম হল মদ্যপানের দ্বারা কলিজা এমন কতগুলি রক্তকণা সৃষ্টি করে, যা কলিজা নিজে নিজে সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে কলিজার রক্ত তৈরির ক্ষমতাটি দুর্বল হয়ে যায়। সমস্ত মদ্যপায়ীরা আভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল (Anaemic) হয়ে পড়ে। যদিও তাদের বাহ্যিক চেহারা টলটলে রক্তিম বর্ণ দেখা যায় এবং তাদেরকে হৃষ্টপুষ্ট মনে হয়। কলিজার রক্ত উৎপাদন ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের হাড্ডির মজ্জাও (Bone Morrow) নষ্ট হয়ে যায়।

তাছাড়া কলিজার ওই শক্তি যার দ্বারা দেহ-রক্ষাকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন প্রকার গ্লোবিন তৈরি হয়, বিশেষ করে Immuno Globulin তৈরি হয়, উহা মদ্যপায়ীদের দেহে ভয়াবহভাবে হ্রাস পায়। ফলে মদ্যপায়ীদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খর্ব হয়ে পড়ে। কখনও শরাব হৃদক্রিয়াকে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মদ্যপায়ী অচেতন অবস্থায়

মৃত্যুবরণ করে। একে কলিজার দেউলিয়াপনা (Bankruptcy) বলা হয়। শরাব পানে কলিজা ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই, এমন কোনো দৃষ্টান্ত কলিজার ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এ বিষয়টিকে ব্যক্ত করার জন্য এর চেয়ে জোরালো আমার কোন বক্তব্য নেই।

## রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার উপর শরাবের বিরূপ প্রভাব

রক্ত সঞ্চালনের উপর শরাবের প্রভাব দু'ভাবে পতিত হয়। প্রথমত হৃদযন্ত্রের উপর শরাবের প্রভাব কোনো মাধ্যম দ্বারা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত মাধ্যম ব্যতিরেকেই হৃদযন্ত্রে পেশীর (Myeoardic Tissue) উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে থাকে। যে পেশী রসালো চর্বি জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে, তার মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি করে। ফলে রক্তবাহী শিরাগুলি শক্ত হয়ে যায়, যাকে (Arteriosclerosis) বলা হয়। এর কারণে ব্লাড প্রেসার (Hiper tension) দেখা দেয়। অন্যদিকে এ্যালকোহলের (মদের) তীব্রতায় হৃদযন্ত্র জ্বলে যাওয়ায় নিয়মতান্ত্রিক রক্তপ্রবাহের বিঘ্ন ঘটে। ফলে অন্তরের মধ্যে অবসন্নতা আসে। চর্বিকণিকা জমা হয়ে যায় আর শিরাতন্ত্রের বিরূপ প্রভাবের দ্বারা মানসিক ভারসাম্যতা নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুত শরাবে অভ্যস্ত ব্যক্তি হয়তো হৃদক্রিয়া বন্ধ (Cyrosis) হয়ে নতুবা হার্টফেল করে নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য এক ফোটা শরাব গ্রহণ যেন ওই উন্মাদ ব্যক্তির মতো কর্ম, যে নিজের প্রাণনাশের বা অঙ্গহানীর কোনো পরোয়া করে না।

কতিপয় মদ্যপায়ীদের ধারণা হল, স্বল্পমাত্রায় এবং সহনীয় পরিমাণ মদ পান করায় মনেপ্রাণে এবং শিরা-উপশিরায় একপ্রকার সতেজতা আসে। আর এটা শরাব পানেরই একটি উপকারিতা। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ ধারণার কোনো মূল্য নেই। ডাক্তারী শাস্ত্রে এ ধরনের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় না। তথাপি হতচ্ছড়া কিছু লোক পাওয়া যায়, যারা বিজ্ঞানেরও বিপরীত ধারণা রাখে।

মানুষের হৃদপিণ্ডকে রক্ত সঞ্চালনের শেষ কেন্দ্রবিন্দু ধরা হয়। মদ্যপানের ফলে উক্ত হৃদপিণ্ডের সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতি হয়। কেননা হৃদপিণ্ড অনুভূতি-

যন্ত্রের মিলিত (Valance) হওয়ার স্থানে ছাকনির কাজ দেয়। কিন্তু শরাব বা এ্যালকোহল এ জটিল কাজটিকেও ব্যাহত করে।

নিঃসন্দেহে যে-সকল শরাবে এ্যালকোহলের পরিমাণ কম থাকে, তা হৃদপিণ্ডের জন্য অধিক ক্ষতিকর। যেমন : অধিক মাত্রায় তিতো মদ (Beer) পান করায় হৃদপিণ্ড সিংহভাগ ধ্বংস হয়ে থাকে। রসবাহী নল (Lymphatic) মানবীয় শরীর রক্ষায় অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রণালীর রক্তবাহী শিরাগুলি শরাবের দ্বারা চিকিৎসার অযোগ্য হয়ে পড়ে। কেননা লাইপিড (Lipid) প্রণালীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে, যা শরাব পানের ফলে সেটি বরবাদ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা যদি নিজ অনুগ্রহে মানবীয় জিন্দেগীর হেদায়েত বিভিন্ন পন্থায় না করতেন, তা হলে শরাব আমাদের জন্য কত অধিক ক্ষতিকর তা আমাদের জন্যে পরিষ্কার হয়ে যেত।

## সমাজ জীবনের উপর মদের প্রভাব

এ সত্যটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে, মদ সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধনের উপর কতটা বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নে বিশেষ কয়েকটি প্রভাবের কথা উল্লেখ করছি :

১. মদ্যপায়ীরা দ্রুত চিন্তিত অথবা দ্রুত ক্রোধান্বিত হওয়ার ফলে তারা সমাজে অসংখ্য ঝগড়া-ফাসাদে জড়িয়ে পড়ে।

২. অসংখ্য মদ্যপায়ীদের দ্বারা তালাকের দুর্ঘটনা সমাজের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। এভাবে অপরাধ প্রবণ লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকায় পুরো সমাজব্যবস্থা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

৩. বিভিন্ন স্তরের শ্রমজীবী তথা কৃষক ও কারিগরদের উপর মদের কারণে উদাসীনতা ও অলসতা দেখা দেয়। ফলে তাদের কর্মজীবন এবং অভিজ্ঞতার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। যার থেকে সমাজও রেহাই পায় না।

৪. মদ্যপানের ফলে মানুষের মাঝে সহানুভূতি লোপ পায়। ফলে একতা এবং নীতি বিবর্জিত সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদী মনোভাব নিয়ে রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা পরিপূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়।

উপরিউক্ত চার প্রকার সমস্যা পশ্চিমা বিজ্ঞানীদেরকে এ পরিমাণ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ করে রেখেছে যে, তারা বারবার তাদের সরকারের দৃষ্টি

এদিকে আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট হয়েছে। যদি মদের ব্যবহার এরূপ বাড়তেই থাকে, তাহলে এ দেশগুলোতে জাতীয় চিন্তা-চেতনা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

পবিত্র কুরআন এ সমস্যার মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। কোনো দার্শনিকেরও হিম্মত হয় নি এ সমস্যা সহজে সমাধান করে যাওয়ার। এ মদ সেবন সমস্যা পশ্চিমাগোষ্ঠীর সামাজিক ভিত্তিকে ঘুণপোকার মতো ধীরে ধীরে খেয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের সমাজকে শত শত বছর ধরে এ বিপদ থেকে হেফাযত করে আসছেন।

(ড. হলুক বাকীর গবেষণা থেকে)

# নেশা স্বাস্থ্য ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান

## হালাল-হারামের তাৎপর্য

আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত ধর্মসমূহের মধ্যে একমাত্র ইসলামই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ধর্ম। ইসলামই মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার প্রতি লক্ষ্য করে খাওয়া-দাওয়ার জিনিসকে হালাল-হারাম অথবা জায়েয-নাজায়েযে বিভক্ত করে বিশ্বমানবতার প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহ করেছে। মূসা আ.-এর শরী'আতেও এ জাতীয় প্রকারভেদ পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে, অমুক জিনিস খাওয়া জায়েয নেই; অমুক জিনিস খাওয়া জায়েয আছে। কিন্তু এ বিষয়ের কোনো প্রমাণ অথবা তা খাওয়ানো খাওয়ার লাভ বা ক্ষতি বর্ণনা করা হয় নি। তাওরাতে নেশাযুক্ত দ্রব্যাদি সেবন করার ব্যাপারে বিশেষ কোনো বিধি-বিধান পাওয়া যায় না। উক্ত কিতাবে মদের যথেষ্ট গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

## নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার

হিন্দু ধর্মে আফিম, ভাং, চরস ইত্যাদি সেবন ধর্মীয় ক্রিয়া কলাপের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। বেদ গ্রন্থে মাদক বিশেষত ভাং এর প্রশংসা করা হয়েছে। খ্রিষ্ট দেশসমূহে তো ধর্মীয় যে-কোনো অনুষ্ঠানে মদ অধিক হারেই পরিবেশন করা হয়। মনে হয় যেন মদের ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। "আশায়ে রব্বানী" [হযরত ঈসা আ. হাওয়ারীদের সাথে শেষ যে খানা খেয়েছিলেন] এর পবিত্র আচার-অনুষ্ঠানে মদে ভিজানো রুটি ইবাদতকারী নারী-পুরুষ ও

বাচ্চা-বৃদ্ধদের মাঝে বণ্টন করা হয়। খ্রিস্টধর্মে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কেননা এ রুটির মসীহের গোস্তের সাথে এবং রুটিতে মিশানো মদের মসীহের রক্তের সাথে সামঞ্জস্য আছে বলে মনে করা হয়।

বর্তমান যুগে অমুসলিম সম্প্রদায় উন্নত হোক আর অনুন্নত হোক তারা নেশাযুক্ত দ্রব্যাদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মনে করে। এমনকি অনেক যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রও তাদের সৈনিকদের জন্য মদের বিশেষ ব্যবস্থা রাখে। ইসলামে সকল মাদক যথা আফিম, ভাং, চরস, মদ ইত্যাদিকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এগুলোর পরিমাণ বেশি হোক আর কমই হোক, হুকুমের দিক থেকে সবই সমান। এ বিষয়ে কুরআন পাকে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। সূরায়ে বাকারার ২৭নং রুকুতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মদ্যপান ও জুয়াবাজি খুবই ক্ষতিকর। যদিও এর কিছু উপকারিতা আছে। কিন্তু উপকারিতার চেয়ে অপকারিতা অনেক বেশি।"

সূরায়ে মাইদার ১২নং রুকুতে ইরশাদ করেন, "এ সকল নোংরা কাজ শয়তানের। সুতরাং তোমরা এসব পরিহার কর। সম্ভবত তোমাদের জীবন সুন্দরভাবে কাটবে।" শয়তানের অর্থ পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ হল– বরবাদ হওয়া, ধ্বংস হওয়া। সুতরাং এ কাজগুলি ধ্বংস ও বরবাদ হওয়ারই নামান্তর। তারপর আল্লাহ্ বলেন, "মদ ও জুয়া দ্বারা শয়তান তোমাদের মাঝে মুনাফেকী (কপটতা) ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায়।"

✪ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যা বেশি খেলে মাতলামী আসে, তা কম খাওয়াও হারাম।

যেমন : পূর্বেও বলা হয়েছে, মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার প্রতি লক্ষ্য করেই ইসলামে হালাল-হারামের প্রকারভেদ করা হয়েছে। মদ এবং অন্যান্য নেশাযুক্ত দ্রব্যাদি শরীরের উপর যে কি পরিমাণ কু-প্রভাব ফেলে, তা মদ্যপানে অভ্যস্থ এবং নেশাখোরদের অবস্থা দেখেই অনুমান করা যায়। কিছু লোক বর্তমানে মদের সাধারণ প্রচলন দেখে বলে, শক্তি লাভের জন্য এবং অতি ঠাণ্ডায় যদি অল্প অল্প মদ্যপান করে, যাতে মাতলামি না আসে এবং হুঁশ-জ্ঞান ঠিক থাকে, তাতে অসুবিধার কি আছে! অতিরিক্ত পরিমাণে পান করে বেহুঁশ ও মাতাল না হলেই তো হল। কিন্তু এরা মোটেও লক্ষ্য করে না যে, এটা এমন একটি জলাভূমি, যাতে একবার ফেঁসে গেলে বের

হওয়া অসম্ভব। কেউ এতে ফেঁসে গেলে দিন দিন অবনতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। যদি কোনো ক্ষতিকর জিনিসের স্বল্প পরিমাণ থেকে মানুষ বিরত থাকতে না পারে, তবে অধিক পরিমাণ থেকেও বিরত থাকতে পারে না। কোনো ছোট অপরাধ করলে সেখান থেকে বড় অপরাধ করার সাহস সৃষ্টি হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম জিনিসসমূহকে একটি সরকারি চারণভূমির সাথে তুলনা করেছেন। যার সীমানার কাছাকাছিও প্রাণী চরানো বিপদমুক্ত নয়। তিনি বলেছেন, এ সকল চারণভূমির কাছেও যেও না।

এ উদাহরণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের নফসে আম্মারাকে প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। যা মানুষকে অপকর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। সরকারী চারণভূমির বাহির সামীনায় দাঁড়িয়েই তাতে মুখ দেওয়ার চেষ্টা করে। কিছু খেয়েও নেয়। এরপর এক পা ভিতরে রেখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। এভাবে চারণভূমির মধ্যখানে পৌঁছার পর আর ফিরে আসতে চায় না যতক্ষণ না কেউ তাকে তাড়িয়ে বের করে।

কিন্তু মানুষ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও যদি তার নফসকে বাধা না দেয়, তবে অন্য কেউ তার উপর জোর খাটাতে পারে না। কিন্তু ধর্মহীনতার কারণে তার এ স্বাধীনতা প্রাণীর চেয়েও অধিক বিপদ ডেকে আনে।

হিন্দুস্তানের মধ্য প্রদেশের রেটোল জেলায় কয়েকজন গ্রাম্য ব্যক্তি একটি মদ্যশালায় গিয়ে বাজি ধরে যে, সবচেয়ে কম সময়ে কে দশ বোতল মদ খেয়ে শেষ করতে পারবে। একজন বাজি জিতে নিল। কিন্তু তার মাথা চক্কর দিল এবং সে ওখানেই পড়ে মারা গেল। (এ.পি.পি. দিল্লী ১৯৬০ইং)

মানুষের অভিজ্ঞতাই সাক্ষী যে, খুব কম লোকই এমন আছে, যে একবার নেশা পান করে পরে তা থেকে বিরত রয়েছে কিংবা স্বল্প সেবন করে কখনো সীমাতিরিক্ত সেবন করে নি। বস্তুত তারা নিজেদের সুস্থতাকে স্বেচ্ছায় তিলে তিলে শেষ করে দিয়েছে।

মুসলমানগণ মদের কু-প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করে মদকে উম্মুল খাবায়েছ বা সকল অপকর্মের মূল বলে আখ্যা দিয়েছে। এ নামটি যথোপযুক্ত ঠিকই। তবে মদকে উম্মুল মুসকিরাত বা সকল নেশার মা বললেও অত্যুক্তি হবে

না। কারণ, যে কোনো নেশা জাতীয় দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য এর ভিতর বিদ্যমান রয়েছে। আফিম, ভাং ইত্যাদি যে অবনতি আনে, অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং রক্তের ভিতর যে তীব্রতা সৃষ্টি করে, তা পরিপূর্ণ রূপে মদেও বিদ্যমান রয়েছে। মদে মাতাল ব্যক্তি অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে গালি-গালাজ করে এবং মারামারিতে লিপ্ত হয়ে যায়। কখনো আবেগপ্রবণ হয়ে কাঁদতে থাকে। আবার কখনো ভয়ে কাঁপতে থাকে।

মাতাল ব্যক্তি এরূপ অসমীচিন ও মানবতা বিরোধী অশালীন কাজও করে, যা একজন জ্ঞানী ব্যক্তি দেখতেও পছন্দ করে না। কিছুদিন ধরে জাপানী পুলিশ মদ্যপায়ীদের সঙ্গে একটি হাস্যকর ও নতুন ধরনের আচরণ শুরু করেছে। তা হল, মদ্যপায়ী যখন মাতাল হয়ে গালিগালাজ করতে আরম্ভ করে, তখন তারা এগুলো টেপে রেকর্ড করে নেয়। যখন হুঁশ ফিরে আসে, তখন ওই টেপ রেকর্ড ছেড়ে দিয়ে তার সকল কথাবার্তা তাকে শোনায়। এতে মদ্যপায়ী বেচারা খুবই লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে যায়।

মদ্যপানের আরও একটি মজার ব্যাপার রয়েছে, তবে এটা অন্যদের জন্য খুবই মারাত্মক। তা হল একজন মাতাল তার সঙ্গীকেও মদ্যপানে বাধ্য করে যদিও সে মদ্যপায়ী না হয়। মদ পান করানোর ক্ষেত্রে সে নিজেকে বড়ই মঙ্গলকামী, উদারমনা, দানশীল এবং শাহী মেজাজের বলে প্রকাশ করে এবং অন্যদেরকেও এ কাজে শরীক করার জন্য নিজের সামর্থ্যের চেয়েও অধিক খরচ করার জন্য তৈরি থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, ঘটনাচক্রে যদি কোনো অমদ্যপায়ী মদ্যপায়ীদের সাথে যায়, তখন তারা নেশাগ্রস্ত হয়ে সেই অমদ্যপায়ীর মুখেও জবরদস্তি করে মদ ঢেলে দেয়। আমি বোম্বাইতে স্বচক্ষে দেখেছি, মিলশ্রমিক নারী-পুরুষরা কারখানা থেকে বেতন উঠিয়েই ছেলেমেয়ে নিয়ে সোজা তাড়ির দোকানে চলে যায়। নিজে তো তাড়ি পান করেই, ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও মেরে মেরে পান করায়। এ কারণেই ইসলাম এ জাতীয় আসরের ধারে কাছে যেতেও নিষেধ করেছে।

এক্ষেত্রে আমরা পাশ্চাত্যবাসীদের বুদ্ধিমত্তার উপর আশ্চর্য বোধ না করে পারি না। কারণ, তারা একদিকে কুইনিন, ভাং, চরস, আফিম এবং ঘুমের জন্য নেশা জাতীয় দ্রব্য বিভিন্ন রাজ্যে ব্যবহার ও তার আমদানী-রফতানীর উপর কড়া নজর রাখে এবং এ সকল অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক

শাস্তির বিধান, যেমন– যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়, অপরদিকে উম্মুল খাবায়েস বা সকল অপরাধের মূল মদকে তারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস মনে করে। যা তাদের ভাষ্য মতেও ধ্বংসাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করছে। এ ব্যাপারে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। এর বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন বা এর বিরুদ্ধে কোনো বাক্য উচ্চারণ করতেও সাহস পায় না।

ইউ, এন, ও, (জাতি সংঘ) এর কমিশন ১৯৫৮ সালে নেশা সম্পর্কীয় এক অধিবেশনে এ বিষয়ে সকলে একমত হয়েছেন যে, আফিম এবং এ জাতীয় নেশাযুক্ত ঘুমের ঔষধ ব্যবসায়ীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলে যথেষ্ট ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। আর এ বিষয়ে সে-সব দেশের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা অপরাধীদেরকে কঠোরতর শাস্তি প্রদান করে। যেমন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি। তুর্কী এবং ইরানে এরূপ ব্যবসায়ীদেরকে ফাঁসীতে ঝুলানো হয়। ১৯৫৮ সালে আমেরিকায় এরূপ দুজন ব্যবসায়ীকে বিশ বৎসর করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

এ সংস্থার অর্থনীতি ও সমাজ বিভাগের কমিশন নেশা জাতীয় দ্রব্যাদির সেবন বন্ধ করার জন্য ১৯৬১ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে স্বীকার করেছে যে, তাদের এ শাস্তির বিধান বিভিন্ন দেশে এ সকল জিনিসের ব্যবসা এবং স্মাগলিং রোধে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় নি। তাই এর চেয়েও কঠোরতর শাস্তি প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর নিকট আবেদন জানিয়েছে। (জেনেভা থেকে পি.পি.পি.এ ৫ জুন ১৯৬১ইং)

কিন্তু যে জাতিসংঘ এত মানব সেবার দাবি করে, তারা মদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নারাজ। কারণ, ইউ.এন.ও এর বাগডোর যাদের হাতে রয়েছে, তারাই তো এরূপ পদক্ষেপ নিতে চায় না। তাদের মুখপাত্ররা জনসাধারণের চাহিদার বিপরীত কোনো কিছু করতে সাহস পায় না। অথচ উন্নত দেশ বিশেষত চরম উন্নত দেশ বৃটেন, আমেরিকা রাশিয়ার ধর্মীয় গুরুদের বক্তৃতা, পুলিশ, আদালত এবং শিশু অপরাধ দমন বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীদের মাঝে মদের ব্যবহার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে তাদের মধ্যে অপরাধ-অপকর্ম, অবৈধ জন্ম, দূরারোগ্য ব্যাধি এবং মাতাল ড্রাইভারদের হাতে নিহতের সংখ্যা এত মারাত্মক হারে বেড়ে চলেছে যে, সর্বসাধারণের সকল দমনকৌশল এ ভয়াবহ অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে

অকৃতকার্য প্রমাণিত হয়েছে।

মস্কো থেকে এ.এফ.পি-র ৫ জুলাই ১৯৬৮ সালের এক সংবাদসূত্রে জানা যায়, রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী খোরোশেফ লেনিন গ্রাদের ক্রোফ কারখানায় শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দানকালে বলেন : মদ আমাদের সার্বিক জীবনে এক ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলছে। মদ শ্রমিকদের সুস্থতার মূলে কুঠারাঘাত হানছে। পারিবারিক জীবনকে বিনাশ করে দিয়েছে। অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে অর্থনীতির অবকাঠামোকে চুরমার করে দিয়েছে। আমরা এখন থেকেই এর বিরুদ্ধে অক্লান্ত যুদ্ধে নেমে পড়তে চাই।

কিন্তু ১৫ই অক্টোবর ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মস্কো রেডিওর সংবাদে জানা যায়, এ অক্লান্ত যুদ্ধের ঘোষণাকারী মাত্র তিন মাস পরে তার পূর্বপুরুষদের গ্রাম ক্যালনোফকায় এক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে বলেন, আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নে মদের নিষেধাজ্ঞার আইন জারি করতে চাই না। কারণ, মদপান আমাদের সামাজিক রীতিনীতির একটি অংশ। আমাদের সমাজে মদ্যপানে কেউ বাঁধা প্রদান করে না। তবুও মানুষকে নিজের মান-সম্মানের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। নূতন আইন অনুযায়ী প্রত্যেক মদ্যপানকারী ব্যক্তি মদ্যশালা থেকে এক পেয়ালার বেশি পাবে না। এর পাশাপাশি মিষ্টার খোরোশেফ সকলকে সাবধান করে বলেন,

"যদি কোনো মদ্যপানকারীর আরেক পেয়ালা পান করার প্রয়োজন হয়, তখন সে আরেক মদের দোকানে চলে যাবে; কিন্তু এক মদ্যশালা থেকে আরেক মদ্যশালায় গেলেই জেলখানার ভাত খেতে হবে।"

এ যুদ্ধ ঘোষণার এক বছর পরই ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে দৈনিক প্রোজা প্রত্রিকা একাধিক সন্তানের মায়েদের কয়েকটি চিঠি প্রকাশ করেছে। তাতে মহিলারা দাবি জানিয়েছে, মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিদেরকে যেন জোরপূর্বক চিকিৎসালয়ে পাঠানো হয় এবং আংশিক ব্যয়ভার বহন করার ব্যাপারেও তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তারা আরও বলেছেন, ভদকা (রাশিয়ান মদ) এর দাম বাড়ানো, মাতাল হলে চালান দেওয়া এবং মস্কো থেকে বের করে দেওয়া ইত্যাদি সরকারি পদক্ষেপ তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় নি। কারণ, কোনো মা অথবা স্ত্রী আপন ছেলে বা স্বামী চালান হয়ে যাওয়া অথবা শহর থেকে বহিষ্কৃত হওয়া পছন্দ করেন না। সে সকল মহিলারা দাবি জানিয়েছে, এরূপ মদখোরদের বেতন যেন সরাসরি তাদের (স্ত্রীদের) কাছে

প্রেরণ করা হয়। কেননা তাদের অধিকাংশই নিজের সম্পূর্ণ উপার্জন দিয়ে এবং অনেক সময় ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বিক্রি করে মদ্যপানে উড়িয়ে দেয়।

রাশিয়ান পত্রিকা আয়োসিয়ার বরাত দিয়ে রয়টার সংবাদ প্রচার করেছে, মিষ্টার খোরশেফ 'ভোনিস' এর কৃষকদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমেরিকার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রতিটি প্রদেশেই কঠোর আইন প্রণয়ন করা দরকার। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মদ্যপায়ী, সুদখোর এবং জনগণের রক্তচোষণকারীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

অন্যান্য গণপ্রজাতন্ত্র দেশগুলোতেও মদ্যপানের পরিস্থিতি এত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গও সকল নৈতিকতা এবং আইনের সীমানা পেরিয়ে নিজেদের জন্য অবৈধভাবে সর্বাধিক পরিমাণে মদ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে থাকে।

পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস থেকে সংবাদ সংস্থা পি. পি. পি. এ, এবং ডি. পি. এ. ১৫ই জুলাই ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে প্রচার করেছে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় মদ তৈরীর কারখানার এক মহাপরিচালকের বাড়িতে একবার প্রধামন্ত্রীর দাওয়াত ছিল। তিনি সেখানে শরীক হলেন। তার পিপাসা লাগায় ঠাণ্ডা পানি পান করার আগ্রহ হল। তিনি মহাপরিচালকের রান্নাঘরে গেলেন। সেখানে তিনি পানির পাত্রের মুখ খুলতেই সাদা পানির পরিবর্তে ভদকা মদ বেরিয়ে আসল। মহাপরিচালক অতি গোপনে কারখানা থেকে পাইপের সাহায্যে মদ নিয়ে আসতেন। অবশেষে তার উপর সরকারি সম্পদ চুরির অভিযোগে মামলা করা হয়।

ফ্রান্সে মদের বিরুদ্ধে আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠার পরিস্থিতি দেখে মদের কারখানার মালিক সমিতির সভাপতি এবং মদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে দাবি জানালেন, পুনরায় যেন সরকারিভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়, মদ আমাদের জাতীয় পাণীয়। মদ্যপানে স্বাস্থ্যহানির হাজারো ঘটনা সকল দেশেই ঘটে থাকে। কিন্তু যে সব দেশ মদের কেন্দ্র, সে সব দেশের ঘটনাবলী আতঙ্কজনক।

ফ্রান্সের হোটেলগুলোতে খুবই সস্তা দামে মদ সরবরাহ হয়ে থাকে।

সেখানে পান করার পানি অনেক মূল্যের বিনিময়েও পাওয়া মুশকিল। ১৯৫৬ সালের এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, সে দেশে প্রতি বছর শুধু মদপানে দূরারোগ্য ব্যাধির শিকার হয়ে ১৫ হাজার মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি লোক মদ থেকে সৃষ্টি মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি বিড়ম্বিত জীবন যাপন করছে। অর্থাৎ সেখানে প্রতি পয়ত্রিশ মিনিট অন্তর মূল্যবান জীবন রক্তভোগ বেদীর উপর উৎসর্গিত হয়।

শাহ্ সাঈদ আল হেজাযকে দেশে মদ প্রতিরোধ এবং অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য নিষিদ্ধ করার অভিনন্দন জ্ঞাপনের পূর্বে আমেরিকার ইউ. এস. এর মদ প্রতিরোধ সংস্থার প্রধান বলেন, প্রতি বছর আমাদের দেশে মদপানের কারণে ৮৬ হাজার লোক মারা যায়।

এ পরিসংখ্যান থেকেই সারা পৃথিবীতে মদের কারণে মৃত্যুহার অনুমান করা যেতে পারে। ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে এবং সেগুলোর অধীন দেশগুলোত খ্রিস্টমাস (বড়দিন) এবং 'নিউ ইয়ার ডে' নববর্ষের দিন জনসাধারণ ছাড়াও তাদের বড় বড় ধর্মীয় গুরুরাও অবাধে মদ পান করেন এবং প্রবৃত্তি দমনের সকল সীমানা পেরিয়ে তারা নিজেদের যে অবস্থা সৃষ্টি করেন, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আর এ সকল অনুষ্ঠানে উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীরা যে সকল অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ করে থাকে, তার মোটামুটি চিত্র সব দেশের পত্র-পত্রিকাই তুলে ধরে।

গোষ্ঠীগত জীবনে মদপানের প্রভাব সম্পর্কে আমেরিকার এ্যারিগান প্রদেশের এ্যালকোহল এডুকেশন কমিটি এবং মদপান সংশোধন সমিতির ডাক্তার আইওয়ার্ড এম স্কট এর গবেষণাটি গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয়। তার মতামতের সাথে সমমনা অন্যান্য গবেষক ডাক্তারও একমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, এ প্রদেশের মদখোর পুরুষদের ৫৬ শতাংশই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নিজেদের পারিবারিক জীবন ধ্বংস করে দেয়। আর মদখোর নারীদের হারও অনুরূপ।

খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে বড় সম্প্রদায় রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র এবং ইউরোপের প্রসিদ্ধ শহর ভেটিকান সিটির বহুল পঠিত পত্রিকা 'আওয়া রোয়েটো রোমানো' ২০শে নভেম্বর ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ সংখ্যায় প্রকাশ করেছে, বিভিন্ন প্রকারের পাণীয় ও মশলা দ্বারা তৈরি ককটেল

(মদের নাম) ও মদের বিরুদ্ধে জোরদার আওয়াজ উঠেছে। এসব মাঝে মাঝে পান করলে তেমন অসুবিধা নেই। কিন্তু প্রতিদিন সেবন করলে শারীরিক এবং চারিত্রিক অবনতির কারণ হয়ে যাবে। মদ সেবনকারী মূত্রথলি, হার্ট, ধমনী, চর্মরোগ, মস্তিষ্কে রক্তচাপ, স্নায়বিক দুর্বলতা, অনিদ্রা ও কাঁপুনি রোগের শিকার হয়ে যায়। সেইসাথে দেখা দেয় শারীরিক ও চারিত্রিক অবনতি। পত্রিকা ককটেল সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, "ককটেল" এর শাব্দিক অর্থ, "মোরগের লেজ", যাকে বিচ্ছুর লেজ বললেও অত্যুক্তি হবে না। চারিত্রিক ক্ষতির চিকিৎসা করা কি সম্ভব?

খ্রিস্টধর্মে আশায়ে রব্বানী অনুষ্ঠানের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আর এ অনুষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল মদ। সুতরাং তারা মদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার অর্থ কি?

মস্কোর টারউড পত্রিকা ১৯ শে জুলাই ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সংবাদ দিয়েছে, একজন মাতাল ড্রাইভার তিনটি শিশুকে স্কুল থেকে বের হওয়া মাত্রই কারের চাকায় পিষ্ট করে দিয়েছে। নিম্ন আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। উচ্চ আদালতও এ দণ্ডাদেশ বহাল রেখেছেন। হায়! যদি এ সমস্ত দেশের মানুষ মদের বিষাক্ত ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন হত এবং তা বন্ধ করার কোনো জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করত!

✪ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, তোমরা মদ পান করো না। কারণ, এটা সকল পাপের মূল। অধিকন্তু তিনি এমন পাত্রসমূহও ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, যেগুলো মদ পানের কাজে ব্যবহৃত হয়।

উপরিউক্ত নেশাযুক্ত দ্রব্য ছাড়াও আরও একটি জিনিস আছে, যাকে বর্তমান বিশ্ব নেশাজাতীয় মনে করে না; যদিও নেশার সকল খারাপ গুণাবলীই তার মধ্যে বিদ্যমান আছে। আর তা কালো, সুন্দর, লাল, সাদা, সকল মানুষই সমানভাবে সেবন করছে। সকল দেশের নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক এবং বৃদ্ধ সকলেই এর শিকার হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানগণও একে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় জিনিস মনে করে থাকেন। নির্দ্বিধায় বলা যায়, যাকে বর্তমান বিশ্ব জীবনের অতি জরুরি দ্রব্য বলে মনে করে, তা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পাঁচটি জিনিসের মধ্যে প্রথম। সেটা হল ধূমপান। উক্ত পাঁচটি জিনিস হল– তামাক, চা, আইসক্রীম, মদ এবং

অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্য।

## বিবাহ ও আধুনিক বিজ্ঞান

### সুন্নাতে রাসূল

✪ প্রাপ্ত বয়স হয়ে যাওয়ার পরপরই বিবাহ করা সুন্নত।

(উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম ﷺ)

শরী'অতের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ যখন প্রাপ্ত বয়স লাভ করে, তখন তাকে বিবাহ দেওয়া উচিত।

### ডাক্তার ওয়াচার লোহাক এর তথ্য

ডাক্তার ওয়াচার লোহাক সিডনীর একজন বিখ্যাত ডাক্তার। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন : যদি পরিণত বয়স হয়ে যাওয়ার পরও বিয়ে করতে দেরী করে, তবে সেক্স হরমোন (Sex Hormones) কমতে কমতে একসময় তা নিঃশেষ হয়ে যায়। বৃক্কস্থিত গ্রন্থির (Adrenal Glonds) রস কমে গিয়ে প্রথমে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং পরে ধীরে ধীরে কমতে থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে বিবাহ না হলে সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধির আশঙ্কা হয়। তারপর যদি বিবাহ্ করেও ফেলে, তবুও সে তার অপকর্মের অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারে না। এভাবেই দিন দিন সমাজ অবনতির পথে অগ্রসর হতে থাকে।

বর্তমান যুগে সামাজিক অপরাধের মূল হোতা হল যুব সমাজ। তাদের মধ্যে যৌন উত্তেজনা বেশি। আর এ উত্তেজনা 'ব্যভিচারকে' সহজ বানিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে পুরো ইউরোপ তথা প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সমাজের সর্বনিম্ন পর্যায়ের মানুষ পর্যন্ত ব্যভিচারে লিপ্ত। সুতরাং ইসলাম কি তাদের মনগড়া সকল ধর্ম থেকে উত্তম নয়। ইসলামের প্রতিটি দিক এবং প্রতিটি অংশ কি সহজ সরল নয়?

### খাত্না
(CIRCUMCISION)

খাতনা একটি খাঁটি মুসলমানী নিয়ম ও নিদর্শন। কোনো কোনো ধর্মে খাতনার প্রচলন এবং নিয়ম নেই। যে সকল ধর্মে খাতনা নেই, তাদের এমন এমন রোগ হয়, যা খাতনাকারীদের মধ্যে নেই।

ডাক্তার ওয়াচার খাতনা সম্পর্কে গবেষণায় উল্লেখ করেছেন,

- যাদের খাতনা করা হয়, তারা লজ্জাস্থানের ক্যান্সার থেকে নিরাপদ থাকেন।
- যদি খাতনা না করা হয়, তাহলে প্রস্রাবে বাধা, মূত্রথলিতে পাথরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেকে খাতনা না করার কারণে বৃক্কে পাথরী (Kedny Stones) রোগে আক্রান্ত হয়।
- খাতনার ফলে পুরুষরা অতিরিক্ত উত্তেজনা ও আজেবাজে চিন্তা থেকে রেহাই পায়।
- কোনো কোনো মারাত্মক রোগের জীবাণু লিঙ্গের বাড়তি চামড়ার ভিতরে বাড়তে থাকে। যার ফলে লিঙ্গে একজিমা, ঘা ও এলার্জি হয়ে যায়।
- সিফিলিস (Syphilis), গনোরিয়া (Gonorhia) এবং মারাত্মক এ্যালার্জির চিকিৎসা সে সকল পুরুষদের ক্ষেত্রেই জটিলতা সৃষ্টি করে, যারা খাতনা করে না। (সায়েন্স আওর দুনিয়া)

আরও দেখা গেছে, খাতনা না হওয়ার ফলে অনেকেই সন্তানহীন থাকে। অনেকের যৌনশক্তিতে দুর্বলতা দেখা যায়। আবার দু'শ্রেণীই পরমানন্দ মানবীয় অধিকার লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে ।

## খাত্না ও বিশ্বের অন্যান্য জাতি

বাচ্চাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য প্রতিটি দেশ ও গোষ্ঠী তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি অবলম্বন করে; বহু পূর্ব থেকেই এরূপ হয়ে আসছে। নাভি কাটার পর বাচ্চাকে গোসল দেওয়া, তারপর তাকে খুটি (একপ্রকার ঔষধ যা বাচ্চার পেট পরিষ্কার করে) পান করানো ইত্যাদি এমন একটি নিয়ম, যা সারা দুনিয়ায় পালিত হয়ে থাকে। কিন্তু খাত্নার রেওয়াজ একমাত্র ইবরাহীমী অনুসারীদের মাঝে পাওয়া যায়। তারা একে একটি ধর্মীয় নিদর্শন মনে করে। অবশ্য খ্রিস্টানরা এ কাজটি ছেড়ে দিয়েছে। মুসলমান এবং ইহুদিরা এটা কঠোরভাবে এখনো পালন করে থাকে।

কোনো কোনো পশ্চিমা খ্রিস্টানদের মতে হযরত ইবরাহীম আ.-এর পূর্বেও এ নিয়ম ছিল। এরূপ হতেও পারে। তবে তাওরাতের ভাষ্যমতে সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম আ. ৮০ বৎসর বয়সে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পেয়ে নিজেও আমল করেছেন এবং পরিবারের সবাইকে আমল

করিয়েছেন। এমনকি গোলামদেরকেও। আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে তাঁর শর্তও ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যেও এ সুন্নত চালু রাখবেন। এ অঙ্গীকার অনুসারে হযরত ঈসা আ.-কে জন্মের অষ্টম দিনে তাঁর খাত্না করানো হয়েছিল।

পশ্চিমা চিকিৎসকগণ খাতনার উপকারিতা ভালভাবেই বুঝেন। কিন্তু খ্রিস্টান বিশ্বের ঘৃণার ফলে এর প্রচলন করতে তারা ভয় পান। অবশ্য কোনো কোনো রোগের চিকিৎসা করা এটা ছাড়া সম্ভব হয় না। তখন তারা খাতনা করতে বাধ্য হন।

## কুদৃষ্টি ও আধুনিক বিজ্ঞান

### হাদীসে রাসূল

✪ হযরত উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরের মধ্যে একটি মেয়েকে দেখলেন, যার চেহারা হলুদ ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে দম করাও। কারণ, তার কুদৃষ্টি বা বদ-নজর লেগেছে।
(বুখারী ও মুসলীম)

✪ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস শরীফে ইরশাদ করেন, বদনজর সত্য।

✪ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মস্তিষ্ক বিকৃতির দোষ এবং মানুষের বদ নজর লাগা থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এমনকি সূরা নাছ ও সূরা ফালাক নাযিল হওয়ার পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত সূরা দুটিকে গ্রহণ করে এ জাতীয় বাকি কাজগুলি ছেড়ে দিলেন। (তিরমিযী)

বদনজর এবং এর কার্যকারিতা নিষিদ্ধ কাজের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা কোনো কোনো ব্যক্তির চক্ষুর মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি রেখেছেন, যখন তারা পূর্ণ দৃষ্টিতে কোনো কিছুর দিকে তাকায়, তখন উক্ত জিনিসের ক্ষতি হয়।

✪ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন : যদি

কোনো কিছু তাকদীর বা আল্লাহর ফায়সালাকে ছাড়িয়ে যেত, তবে তা হত বদনজর। এমন কিছু লোক দেখা যায়, যাদের শুধু একটি দৃষ্টি মানুষ, জীব-জন্তু এমনকি জড় বস্তুকে পর্যন্ত ধ্বংস করে দেয়।

## স্টিফেন গোলনের তেজদীপ্ত চোখ

স্টিফেন নামক একুশ বৎসর বয়সের এক যুবক আশ্চর্য ধরনের ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তার চোখে এক বিশেষ গোপন রহস্য পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা এর তত্ত্ব উদঘাটনে লিপ্ত হয়েছিল। স্টিফেনের চোখ থেকে অদৃশ্য রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে যার উপর পতিত হত, তা খতম হয়ে যেত। স্টিফেন একটা বন্ধ দরজার উপর মাত্র কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। এতেই দরজা টুকরা টুকরা হয়ে গেল। অনুরূপভাবে সে কোনো একটি খুঁটির দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকায় তাতে ফাটল ধরল। সে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে উক্ত খুঁটি ভেঙে পড়ল।

এটা ছিল এক যুবকের কৃতিত্ব। যার চক্ষুদ্বয় বিশ্ব জগতের সমস্ত মানুষের চোখের কারিগরী থেকে একেবারেই আলাদা ছিল। কেন তার চক্ষুদ্বয় এত তেজদীপ্ত এবং গরম ছিল? এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্যে প্যারাসাইক্রোজী দ্রষ্টব্য।

## প্যারাসাইক্রোজী এর গবেষণা
(RESEARCH OF PARAPSYCHOLOGY)

চোখে দেখা যায় না এমন গুপ্ত জ্ঞান অনুসন্ধানের নাম প্যারাসাইক্রোজী। বিশেষজ্ঞদের মতে মূলত প্রত্যেক ব্যক্তির চক্ষু হতেই অদৃশ্য আলোকরশ্মি বের হয়ে থাকে, যার মধ্যে আবেগময় শক্তির বিদ্যুৎ (Emotronal Energy) থাকে। এ সকল বিদ্যুৎ দ্রুত লোমকূপের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ায় শরীরের স্বাভাবিক গঠনের অবনতি ঘটে।

যদি আবেগময় শক্তির বিদ্যুৎ প্রবাহ বা আলোকরশ্মি পজেটিভ (+) হয়, তা হলে মানুষের উপকার হয় আর যদি এ রশ্মি নেগেটিভ (-) হয়, তবে অব্যাহত ক্ষতি হতে থাকে। কুদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের চক্ষু থেকে নির্গত রশ্মি মূলত নেগেটিভ হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে এত শক্তি নিহিত থাকে যে, শরীরের স্বাভাবিক নিয়ম শৃঙ্খলাকে ওলট-পালট করে দেয়।

কোনো এক কুদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি কোনো সুন্দর একটি মাকড়শা দেখে

এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় অন্য এক ব্যক্তির চেহারা কালো হয়ে গিয়েছে। তার রক্তে মিলানিন (Melanin) বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রুত রং কালো হয়ে যায়। মোটকথা, (বদ-নযর সম্পর্কিত) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী সঠিক। আর বদনজরের প্রতিরোধ হয় পবিত্র কুরআন এর মাধ্যমে। কুরআনের সূরা নাস ও সূরা ফালাক এবং সূরা ইখলাস বা সূরা কাফিরূন ওই নেগেটিভ বা নেতিবাচক রশ্মিকে দূর করে দেয়।

## লাঠির সুন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞান

### সুন্নাতে রাসূল

✪ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতে লাঠি ব্যবহার করতেন। (উসওয়ায়ে রাসূল ﷺ)

তাহের সাহেব বর্ণনা করেন– আমি যখন ওয়াশিংটন ডিসিতে ছিলাম, তখন এক ব্যক্তিকে পাগড়ী বেঁধে, হাতে লাঠি নিয়ে ও সুন্নাতি পোশাক পরে ঠক ঠক করে চলতে দেখলাম। আমি আমার মেজবানকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ফকীর বাবা কে? দেখতে তো মুসলমানদের মতো মনে হচ্ছে। তিনি বললেন, তিনি একজন পরমাণু বিজ্ঞানী (Atomic scientist)। তিনি পরমাণু গবেষণাগারে ডিউটি করতে যাচ্ছেন। আমি এগিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার অবস্থা জানতে চাইলাম– আপনি যে সেন্টারে চলছেন, সেখানে তো সকলেই ইহুদি এবং খ্রিস্টান। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদও সম্পূর্ণ আলাদা। কাজেই এ পোশাকে সেখানে গেলে আপনার অবস্থা কি হবে? এ কথা শুনে বিজ্ঞানী অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে জবাব দিলেন, "সে সকল লোক তো ইহুদি ধর্মমত এবং তাদের ধর্মীয় পোশাকের উপর গঠিত। আর আমি মুহাম্মদী ধর্মবিশ্বাস এবং মুহাম্মদী লেবাসের উপর গঠিত।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হাতে লাঠি রাখার উদ্দেশ্য কি? বিজ্ঞানী জবাব দিলেন, "লাঠি ডান হাতে থাকে। সুতরাং যে হাতে লাঠি থাকে, সে হাত শক্তিশালী হয়। এতে অস্বাভাবিক শক্তি ও সামর্থ্য বেড়ে যায়। জীবন ধারণের ক্ষেত্রে ডান হাত যেহেতু অধিক প্রয়োজন। তাই ডান হাত মজবুত হওয়া আবশ্যক। আর এর শক্তি ও মজবুতী লাঠির মধ্যে নিহিত।

অধিকন্তু লাঠি শরীরের ভারসাম্যতা রক্ষা করে এবং শক্তি ও সামর্থ্য যোগায়। লাঠির কারণে ডান হাত মুষ্ঠিবদ্ধতায় নিয়োজিত থাকে। আর এ মুষ্ঠিবদ্ধতার প্রতিক্রিয়া শরীরবিদ্যা (Physiology) অনুযায়ী দিল এবং দিলের

গ্রন্থির উপর পতিত হয়। ফলে অন্তর মজবুত হয় ও ভীরুতা দূর হয়। লাঠির কারণে বিষাক্ত বা ক্ষতিকর জীব-জন্তুর ভয় দূর হয়।

লিপন গিরলিপন এর THE CHIEFS OF PUNJAB

এ প্রকাশিত অভিমত

স্যার লিপন গিরলিপন "সিয়াসাতে কেরাউন ইয়াদি চিপ অব পাঞ্জাব" নামক প্রসিদ্ধ কিতাবে আর একটি কথা বাড়িয়ে বলেছেন, লাঠি হল শরীরের অবলম্বন এবং সঙ্গী। শরীরের শিরা-উপশিরার উপর লাঠির একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে। যার হাতে সর্বদা লাঠি থাকে ওই লাঠির অদৃশ্য প্রভাব তার শরীর ও রূহের উপর পতিত হতে থাকে। এরূপ ব্যক্তি কখনও ভীরু বা ভয়কাতুর হয় না। আমি পাঞ্জাবের আমীর এবং সর্দার লোকদের হাতে লাঠি রাখতে দেখেছি। যাদের হাতে আমি লাঠি দেখেছি, তাদেরকে আমি সাহসী ও দূরদর্শী পেয়েছি। নিঃসন্দেহে লাঠি সকল নবী-রাসূলের সুন্নাত। হযরত মূসা আ.-এর লাঠি প্রসিদ্ধ।

## মাঝে মধ্যে খালি পায়ে চলার উপদেশ

✪ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কখনও খালি পায়ে চলার উপদেশ দিয়েছেন।

(মামূলাতে নবনী ﷺ)

জুতা পায়ের সঙ্গে আটকা অবস্থায় থাকে। আর সর্বক্ষণ এরূপ পায়ের সঙ্গে লেগে থাকা জুতা অসংখ্য রোগ সৃষ্টির কারণ হয়। বিশেষ করে ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগের জীবাণু (Contagious Germs) জুতার সঙ্কীর্ণতার কারণে জুতার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। যদি উক্ত পা জমিনে রাখা হত, তা হলে পায়ে বাতাস লাগার কারণে পায়ে লেগে থাকা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাসগুলি (Virus) খতম হয়ে যেত। পায়ে মাটি লাগার কারণে মাটিস্থ এন্টি সেপটিক (Anti-Septic) অর্থাৎ পচন নিরোধক পদার্থের দরুন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়।

জুতা যদি রবার অথবা প্লাস্টিকের হয়, তবে উক্ত হাদীসের ভাষা একেবারেই যথাযথ। কেননা সে সকল জুতার উত্তাপে পায়ে আগুন লেগে যায় (এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে, আমরা ওই অসহ্য গরম সকলেই সহ্য করে নিতে সকলেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি)। সুতরাং আমাদের জুতা থেকে

মাঝে মধ্যে পা বের করে জমিনের উপর খালি পায়ে হাঁটা উচিত। অধিকাংশ দক্ষ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী (Hygienic) প্রতি দিন খুব সকালে মাটি এবং ঘাসের উপর খালি পায়ে চলার উপর বিশেষ জোর দেন। এতে মস্তিষ্কের দুর্বলতা, শুষ্কতা এবং শিরাতন্ত্রীর ক্ষয় থেকে রেহাই পাওয়া পরীক্ষিত।

## রোগীকে অধিক খাওয়ার উপর পীড়াপীড়ি না করা

○ হাদীস গ্রন্থে রোগীকে অধিক খাওয়ার উপর তাগিদ না করার অসংখ্য নির্দেশ পাওয়া যায়। (যাদুল মা'আদ)

রোগীর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল থাকে। এ দুর্বল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অধিক শক্তির কাজ করতে পারে না। শক্তিশালী খাদ্য সহ্য করতে পারে না। তখন পরিপাকতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তা সকল প্রকার খাদ্য হজম করার সামর্থ্য রাখে না। তাই রোগীকে হালকা ও দ্রুত হজমযোগ্য খাবার খাওয়ানো হয়। রোগীকে যদি অধিক খাবার খাওয়ানো হয় অথবা অধিক খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়, তা হলে রোগীর রোগ বেড়ে যাবে। এমনকি মৃত্যুর আশঙ্কা পর্যন্ত রয়েছে।

## অভিজ্ঞতালব্ধ একটি ঘটনা

কোনো এক ব্যক্তি অল্প কয়েকদিন অসুস্থ ছিলেন। এতে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। একদিন ঘরে মাছ রান্না হচ্ছিল। তার এমন ঘ্রাণ ছুটছিল যে, তিনি মাছ খাওয়ার লোভ সামলাতে পারছিলেন না। বাড়ির লোকেরাও পিড়াপীড়ি করে বলতে লাগল– কিছু খেয়ে নাও, শক্তি বাড়বে। ওই ব্যক্তিও যথেষ্ট পরিমাণ রুটি এবং মাছ খেয়ে নিলেন। কিন্তু মাছ হজম হল না তার। সন্ধ্যাবেলায় বমি শুরু হয়ে গেল। রোগ আরও বেড়ে গেল। পরের দিন উক্ত রোগী এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করল।

বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি হল, রোগীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং তাকে কোনো কিছু খাওয়ার ক্ষেত্রে পিড়াপীড়ি করবে না বরং তার পরিপাকতন্ত্রকে এমন শক্তিশালী করার চেষ্টা করবে, যেন নিজ থেকেই খাদ্যের চাহিদা হয়। এটাই আসল চিকিৎসা।

# গালি এবং আধুনিক বিজ্ঞান

## সুন্নাতে রাসূল

ইসলাম অনেক জায়গায় গালি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। আমি এ সম্পর্কিত হাদীসগুলি এখানে উল্লেখ করছি না। কেননা হাদীসের কিতাব থেকে সেগুলো অতি সহজে আপনারা দেখে নিতে পারবেন। নিম্নে গালির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছি।

## প্যারাসাইক্রোজী এর গবেষণা
(RESEARCH OF PARAPSYCHOLOGY)

ইউরোপের এক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী লিড বিড় দি মাষ্টার এণ্ড দি পাথ "The masters and the path" গ্রন্থে লিখেন :

Each word as it is uttered makes little form in etheric matter. The word "hate" for instance. produces a horrible form so much so that having seen its shape. I never use the word when I saw the form discomfort.

অর্থাৎ প্রতিটি শব্দ এর (ঊর্ধ্ব জগতে) একটা নির্দিষ্ট আকৃতি ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ 'ঘৃণা' শব্দটি খুবই ভয়ংকর আকৃতিতে বদলে যায়। আমি একবার এর আকৃতি দেখেছিলাম। তারপর থেকে ওই শব্দটি আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করার সাহস হয় নি। উক্ত দৃশ্যটি আমাকে চরম আঘাত দিয়েছিল। প্রতিটি শব্দ এক একটি এটম। যা থেকে আভ্যন্তরীণ শক্তির বিদ্যুৎ সঞ্চালন হয় এবং এর প্রতিক্রিয়ায় এ মর্ত জগত ও সূক্ষ্ম জগতে প্রকাশিত হয়।

একটি সাধারণ উদাহরণ হল, গালি। এ গালি কোনো তরবারি অথবা আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষের নাম নয় বরং তা কতকগুলি শব্দের সমষ্টি মাত্র। তবে মুখ থেকে বের হতেই সম্বোধিত ব্যক্তির শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ আগুন কোথেকে আসে? শব্দ থেকে? নাকি শব্দ সমষ্টি থেকে? না, এটা বরং ওই ব্যক্তির অন্তরের আগুন, যার থেকে গালী বের হয়। আর এ আগুন গালির মাধ্যমে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করে। লিড বেড় বলেন : আমি আপনারদের বলব, কখনও গালি দিবেন না। কারণ, তা চমৎকার আকৃতিও বিকৃত করে দেয়।

ইসলাম যে সকল বিষয় স্বভাবত নিষেধ করেছে, আধুনিক বিজ্ঞান (Modern Science) সেগুলি গবেষণার পর নিষেধ করেছে। সুতরাং বলা যায়, গালী একটি নেগেটিভ (নেতিবাচক) শক্তিশালী রশ্মি। আর এটা নিঃসন্দেহে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে।

## মুচকি হাসি এবং আধুনিক বিজ্ঞান

### সুন্নাতে রাসূল

✪ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কারও সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও সদকাহ। এটা মূলত মহব্বত ও প্রেম-ভালবাসা বৃদ্ধির বিশেষ উপায়।

গালি যেরূপ একটি শব্দ এবং এর মধ্যস্থিত ঋণাত্মক বা নেগেটিভ শক্তি অন্যের বুকে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ওই আগুন মূলত বুকের মধ্যেই সৃষ্টি হয়, অনুরূপভাবে পবিত্রতা এবং মহব্বতও একটি রশ্মি, যা অন্তরে অবস্থান করে। মুচকি হাসি উক্ত রশ্মি এবং তরঙ্গের একটি অংশ। মুচকি হাসি থেকে পজেটিভ রশ্মির চমক সৃষ্টি হয়। উক্ত রশ্মি বক্ষ-প্রাণের শীতলতার কারণ হয় এবং মানুষ খুশি ও আনন্দিত হয়।

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী বলেন, আচারব্যবহারের মূল ভিত্তি হিসেবে স্মীত হাসি বা মুচকি হাসির কথা উল্লেখ করা যায়। যেখানে মুচকি হাসি আছে, সেখানে সৌজন্যমূলক আচার-ব্যবহার বিদ্যমান। আর যখন এ হাসি খতম হয়ে গেল, তখন মহব্বত, সম্প্রীতি, সৌহার্দ, মানবতা, সহমর্মিতার প্রভাব আপনাআপনি শেষ হয়ে যায়। মুচকি হাসির তরঙ্গ বা ঢেউ অন্যের অন্তরে মহব্বত এবং সহমর্মিতার ভাব সষ্টি করে।

### সকাল সকাল দ্রুত কাজ শুরু করা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে সকাল সকাল দ্রুত কাজ শুরু করার নির্দেশ পাওয়া যায়। (উসওয়ায়ে রাসূল)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নসিহত কতই না মূল্যবান। এটা জাতির উন্নতির গোপন তত্ত্ব। যে জাতি এ গোপন তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছে, সে জাতি সফল হাকিম হতে পেরেছে।

## ইউলিয়াম থেরাপ নামক অর্থনীতিবিদের অভিজ্ঞতা

ইউলিয়াম ছিলেন একজন অত্যন্ত বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ। তিনি নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, জাপান এবং জার্মানির উন্নতির চাবি-কাঠি হল পরিশ্রম, আন্তরিকতা এবং খুব সকাল সকাল দ্রুত কাজ শুরু করা এবং রাত্র পর্যন্ত একটানা কাজ করে যাওয়া।

আমি মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, যে সব লোক সকাল হতেই কাজ শুরু করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সকাল সকাল পা বাড়ায়, তারা সারাদিন তরু-তাজা ও আনন্দিত থাকে। আর এ সকল লোক সময়ের দ্রুত গতিতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হয়। যে সকল লোক এভাবে না চলে বিপরীতভাবে জীবন যাপন করে, তারা নিজে তো সফল হয়ই না, অন্যকেও সফলতার দ্বারে পৌঁছাতে দেয় না। এখন যদি আমরাও সফলতার উক্ত পন্থা অবলম্বন করি, তা হলে অন্যান্য জাতির পশ্চাতে কখনও পড়ে থাকব না।

রাত্রে আগে-ভাগে শয়ন করা এবং সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠার গুরুত্ব এবং ফায়েদা অস্বীকার করা যায় না। সকল চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। প্রসিদ্ধ একটি প্রবাদ আছে : Early to bed and early to rise make a man healthy wealthy, and wise, অর্থাৎ রাত্রে দ্রুত ঘুমিয়ে যাওয়া এবং প্রত্যুষে জেগে উঠা মানুষকে স্বাস্থ্যবান, সম্পদশালী ও জ্ঞানী করে।

ইসলাম ধর্মে সকল মুসলমানের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মতো আদায় করা ফরয। তন্মধ্যে ৩টি ওয়াক্ত তো দিবসের কাজের ব্যস্ততার মধ্যে এসে থাকে, একটি ঘুমানোর পূর্বে ও এক ওয়াক্ত সকাল হতেই আসে। রাত্রি এবং সকালের নামাযকে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তৎসঙ্গে প্রত্যেক ওয়াক্তের শুরুতে নামায আদায় করারও আদেশ এসেছে। ইশা অথবা ঘুমানোর পূর্বের নামায সম্পর্কে নির্দেশ এসেছে, নামায আদায় করার পর পরই ঘুমিয়ে যাবে এবং অযথা সময় নষ্ট করবে না। আর সকাল হওয়া মাত্র ঘুমের বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়া উচিত। এ দুই নামাযের কত গুরুত্ব, নবীজীর কথা থেকেই অনুমান করা যায়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের মধ্যে দয়াশীল হওয়া সত্ত্বেও তিনি ফজর ও ইশার নামাযের ব্যাপারে বলতেন, হে লোকসকল! আমার মন চায়, তোমরা তো নামায পড় আর আমি জঙ্গলে গিয়ে শুকনা লাকড়ী এনে ওই সকল লোকদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিই, যারা রাতে ইশার নামাযের জামাতে আসে না। আর সকালের (ফজরের) নামাযের সময় বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে।

মুনাফিকদের নিকট এশা ও ফজরের নামায অত্যন্ত ভারি মনে হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এ নামাযের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে মসজিদে আসতে হলেও আসো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরও সুস্পষ্ট ভাষ্য হল, সকাল সকাল (বিছানা হতে) উঠার অভ্যাস করো। কেননা এর বিরাট প্রতিদান রয়েছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যু শয্যায় নিজের বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরাইরাহ রাযি.-কে যে তিনটি বিশেষ নসিহত করেছিলেন, তার মধ্যে একটা ছিল, সারা রাত ইবাদাত-বন্দেগীর মধ্যে অতিবাহিত করলেও ঘুম থেকে জেগে সকালের নামায (ফজরের নামায) পড়ে নিও। আরও বলেছেন, ফজরের নামায এমন সময় পড়ে নিবে, যখন তারকারাজিতে তখনও আলো বাকি থাকে (অর্থাৎ একটু অন্ধকার থাকতে)।

উল্লেখ্য যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মহিলাগণ ফজরের নামায আদায়ান্তে বাড়ি ফিরে আসত, তবুও চেনা যেত না। কারণ, তখনও যথেষ্ট অন্ধকার বাকি থাকত। ইসলামের ভিত্তি স্থাপনকারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামায নির্দিষ্ট সময়ের প্রারম্ভে আদায় করতে বলেছেন। তিনি ফজর ও এশার নামাযকে এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সমগ্র মানবজাতির জন্যে এটা এক বিরাট উপকার। আমরা সকাল-সকাল বিছানা থেকে জাগ্রত হয়ে স্বাস্থ্যগত দিক থেকে অনেক লাভবান হয়েছি।

**জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে কিছু উপদেশাবলী**

মহান সত্তা নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য নাক সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় মানুষ অনেক সময় মুখ দ্বারাও নিঃশ্বাস নিয়ে থাকে। রাতে শয়ন কালে মুখবন্ধ থাকার কারণে নাক দ্বারা নিঃশ্বাস গ্রহণ করে এবং ভিতর

থেকে বেরিয়ে আসা অনেক গাঢ় পদার্থ থেকে কিছু হাতে (জমে) থেকে যায়। নিঃশ্বাস সঠিকভাবে বের হওয়া তথা স্বাস্থ্যগত সুস্থতার জন্য বিছানা হতে উঠার সাথে সাথে উক্ত জমাট পদার্থকে বের করা অপরিহার্য হয়ে যায়। এজন্যই ইসলাম ঘুম হতে উঠেই সর্বপ্রথম নাক পরিষ্কার করার শিক্ষা দিয়েছে। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, ঘুম হতে উঠেই সর্বপ্রথম নাক পরিষ্কার কর। কেননা রাত ভর শয়তান তা দিয়ে আসা যাওয়া করেছে।

আরবি শব্দগত দিক দিয়ে 'শয়তান' শুধু মানুষকে পথভ্রষ্টকারীকেই বলা হয় না বরং প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু বা জন্তুকেও 'শয়তান' বলা হয়। যেমন : যাক্কুম বৃক্ষটি দূর থেকে ফনাধরা সর্পের মতো মনে হয়। কুরআনে কারীমে সেটাকে (রুউসুস শায়াত্বীন) তথা শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

সুতরাং হাদীসের মূল উদ্দেশ্য, শয়নকালে নাকের মধ্যে জমাট পদার্থ জমে গিয়ে থাকে। আর দিনের বেলায় মানুষ সাবধান থাকে। এজন্য নাক পরিষ্কার [illegible] জন্য সদা সচেষ্ট থাকে। আর রাতে ঘুমিয়ে থাকার কারণে কিছুই করার থাকে না; ভিতরে অনেক কিছু জমে যায়।

অতএব জেগে উঠার সাথে সাথে তা পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। তার সাথে হাতের তালু দ্বারা চক্ষুদয় মলে নেওয়াও একান্ত প্রয়োজন। যার ফলে চক্ষুদ্বয় পুরোপুরি খুলে যায়। কাজ দুটির সুবাধে মানুষের ঘুমের কারণে যে অলসতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা খুব দ্রুত কেটে যায়। তারপর জুতা ঝেড়ে পরবে। কারণ, হতে পারে জুতার মধ্যে কোনো বিষাক্ত পোকা ঢুকে আছে। বিশেষ করে গরম প্রধান দেশে এমনটি ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

অনুরূপভাবে ঘুমানোর পোশাক এবং কাজের পোশাক পৃথক হলে তা ভালো করে ঝেড়ে পরিধান করা আবশ্যক। হতে পারে রাত্রে কোনো বিষাক্ত প্রাণী এর মধ্যে ঢুকে রয়েছে। ঘুম থেকে উঠে হাত ধৌত করা ব্যতীত কোনো পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করাবে না। কেননা কে জানে রাত্রে তার হাত কোথায় লেগেছে? (বুখারি : ১ম, মেশকাত, তিরমিযী)

# বংশগত বা ছোঁয়াচে রোগ ও আধুনিক বিজ্ঞান

## বিজ্ঞানের অভিমত

ফ্রান্সের বিখ্যাত ফিজিওলোজিস্ট (Phygologist) তার রচিত Thirty years psychical Research গ্রন্থে লিখেন,

গোনাহের কারণে মানুষের রূহ অপবিত্র হয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও অপবিত্র করে দেয়। এ গোনাহের শাস্তিকেই মূলত মানুষ বংশগত ব্যাধি বলে মনে করে। মূলত সৎকাজের প্রতিদান হয় স্থায়ী ও অবিনশ্বর। অনুরূপভাবে অসৎকর্মেরও স্থায়ী কুপ্রভাব আছে। তারই কুপ্রভাব বংশানুক্রমিকভাবে চলতে থাকে। আমরা একেই বংশগত রোগ বলে ধারণা করি।

এক ব্যক্তি ব্যভিচারের দরুন অগ্নিকুণ্ডে পতিত হয়। ফিজিওলোজিস্ট, প্যাথোলজিস্ট ও বিজ্ঞগণ এ কথার উপর একমত যে, জেনাকারীর শুক্রকীট স্ত্রীর রেহেমে প্রবেশ করার কারণে এ ধরনের বংশগত রোগের ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হয়। গোনাহ শুধু গোনাহকারীর জন্যই ক্ষতিকারক নয় বরং তার কুফল ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যেও প্রভাব ফেলে।

## হাইকে হাত দ্বারা প্রতিরোধ করা

## হাদীসে রাসূল

✪ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ, তোমরা হাত দ্বারা হাইকে প্রতিরোধ কর। (যাদুল মা'আদ)

কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায়, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাই তোলা অপছন্দ করতেন। হাদীস শরীফে হাই প্রতিরোধের জন্য বাম হাত ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

হাই উঠলে চোয়ালের সমস্ত জোড়া খুলে যায়; হাত দ্বারা প্রতিরোধ করলে মাত্রাতিরিক্ত খোলে না। কারণ, চোয়ালের জোড়া অধিক খুলে গেলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। হাই তোলার সময় মানুষকে যেহেতু দীর্ঘশ্বাস নিতে হয়, তাই বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত ধুলাবালি মুখ গহবরে প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এ সময় মুখে হাত রাখলে সেগুলি প্রবেশ করতে পারে না। এ সকল ধুলাবালি ভিতরে প্রবেশ করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

হাই প্রতিরোধে বাম হাত ব্যবহারের কারণ হল, বাম হাত ব্যবহার না করে যদি ডান হাত ব্যবহার করা হয়, তাহলে ডান হাতে হাই এর সঙ্গে নির্গত জীবাণু লেগে যাবে। আর ডান হাত যেহেতু খানা খাওয়ার জন্যে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং হাতে লেগে যাওয়া জীবাণুগুলি খানার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে তা নানাবিধ রোগ-ব্যাধির কারণ হতে পারে।

হাই তোলার কারণে অলসতা সৃষ্টি হয় আর অলস ব্যক্তি দীন ও দুনিয়ার কোনো কল্যাণে আসে না। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা অপছন্দ করতেন।

## কুকুরের ঝুটা মাটি দ্বারা পবিত্র করা ও আধুনিক বিজ্ঞান

### নবীজীর উপর এক চিকিৎসাবিদের আস্থা

জার্মানির প্রসিদ্ধ ডাক্তার ক্রখ এর অভিমত আমি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত করছি। তাতে প্রমাণিত হয়, ইসলামের শিক্ষা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ, যে কোনো ধর্মের প্রত্যেক বিবেকবান লোক তা নির্দ্বিধায় মেনে নিবে।

উক্ত ডাক্তার লিখেন, আমাকে কুকুরে কামড়ানোর চিকিৎসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতিমালার অনুসরণ করি। সুতরাং আমি তাঁর সেই বাণীটুকু পাঠ করি, যার ভাবার্থ হল,

যে পাত্রে কুকুর মুখ লাগায় সেটি সাত বার ধুয়ে ফেলো। ছয়বার পানি দ্বারা এবং শেষ বার মাটি দ্বারা। এ হাদীস পাঠান্তে আমার ধারণা হল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো সম্মানিত নবীর শানে অনর্থক কথা বলা সমীচীন নয়। নিশ্চয়ই তার মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ রহস্য রয়েছে। তারপর আমি মাটির সকল প্রকার উপাদানকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতঃ কুকুর-কাটা রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করতে শুরু করলাম।

অবশেষে আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কুকুরের ঝুটার বিষাক্ত প্রভাব দূরীকরণের জন্য মাটিই একমাত্র উপাদান। তাছাড়া মাটি সর্বদা

হাতের কাছে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে আছে : "জ্বর হল জাহান্নামের অগ্নি উত্তাপ। সুতরাং তোমরা একে পানি দ্বারা নির্বাপিত কর।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথাকে নিয়ে চিকিৎসকগণ উপহাস করত। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্ত বাণীর মর্ম ছিল, জ্বরের উত্তাপকে তোমরা ঠাণ্ডা পানি দ্বারা শীতল করো। সে মতে আজ গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, জ্বরের চিকিৎসা শুধু ঠাণ্ডা পানিই নয় বরং দ্রুত পানি প্রবাহের মাধ্যমে করো।

মোটকথা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য হাদীস চিকিৎসা-বিদ্যার মূল। আর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে। আমি পয়গম্বর আ.-কে সম্মান করি। আমি বলি, সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি তাঁর সমকক্ষ কোনো চিকিৎসকের জন্ম হয় নি। (আহকামে ইসলাম আকল কি নজর মে)

আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিশেষ মর্যাদা দান করি। এ গবেষণার ক্ষেত্রে আমাকে তাঁর মুখনিসৃত পবিত্র বাণী আলোর পথ দেখিয়েছে। আমি তাঁর সেই হাদীসটি পড়লাম। যার ভাবার্থ, যে পাত্রে কুকুর মুখ দেয়, তাকে সাতবার ধুয়ে ফেল। ছয়বার পানি দিয়ে; একবার মাটি দিয়ে। এ হাদীসটি দেখেই আমার স্মরণ হল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো ব্যক্তি কোনো ফালতু কথা বলতে পারেন না। নিশ্চয় এর ভিতরে কোনো গোপন রহস্য আছে। তাই আমি মাটির উপাদানগুলো নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলাম। প্রতিটি উপাদানকে কুকুরের কাটা রোগে পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহার শুরু করলাম। অবশেষে নওশাদর ব্যবহার করতেই সকল জট খুলে গেল বুঝলাম, এ রোগের ঔষধ এটাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটি দিয়ে পাত্র ধৌত করার প্রতি কেন উদ্বুদ্ধ করেছেন? তার কারণ হল, মাটিতে সব সময় নওশাদর থাকেই। যদি তিনি নওশাদর দিয়ে পাত্র ধোয়ার নির্দেশ দিতেন, তবে অনেক সময় তা পাওয়া অসম্ভব হয়ে যেত। এ জন্য যে মাটি সর্বদা সর্বস্থানে পাওয়া যায়, তা দিয়ে পাত্র ধোয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস (ভাবার্থ) "জ্বর জাহান্নামের অগ্নির অংশ, একে পানি দ্বারা নিভাও।" এ

নিয়ে চিকিৎসকগণ হাসাহাসি করত। অথচ এ ইরশাদ দ্বারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল, পিত্ত জ্বরের চিকিৎসা ঠাণ্ডা পানি দ্বারা করো। সুতরাং এখন গবেষণায় পাওয়া গিয়েছে যে, জ্বরের ঔষধ শুধু ঠাণ্ডা পানিই নয় বরং বরফের পানি। মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক হাদীসই চিকিৎসার প্রাণ এবং মৌলিক উপাদান। গবেষণা, অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা এ সত্যই ফুটে উঠে। আমি এ পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান করি এবং বলি, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তার সমতুল্য দ্বিতীয় কোনো ডাক্তার বা কবিরাজ সৃষ্টি হয় নি। (আহকামে ইসলাম আকল কি নযর মেঁ)

## মাছি ডুবিয়ে দেওয়ার রহস্য

✪ সুনানে ইবনে মাজাহ এর মধ্যে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) থেকে, বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : মাছির এক ডানায় রোগ থাকে এবং অপর ডানায় থাকে ঔষধ। তাই এটি যখন (তরল) খাদ্যে পতিত হয়, তখন একে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে নাও। কেননা সে রোগবিশিষ্ট ডানাটি আগে ডুবায়।

মূলত বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও মাছির এক ডানায় মারাত্মক ভাইরাস থাকে এবং এটা তাৎক্ষণিক কার্যকরী ক্ষমতা রাখে। মাছি যখন কোনো খাদ্যে বসে তখন যে ডানায় জীবাণু থাকে সে ডানাটি খাদ্যে ডুবিয়ে দেয়। অথচ তার অপর ডানায় থাকে প্রতিরোধক ভাইরাস (Anti Virus)। যদি মাছিকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, তখন প্রতিরোধক ভাইরাস খাদ্যের সঙ্গে মিশে মারাত্মক জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এতে খাদ্যটি স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য অনুকূল হয়। নতুবা এ খাদ্যটিই জীবাণুযুক্ত হয়ে মানব ধ্বংসের কারণ হয়ে যেতে পারে।

## বিজ্ঞানের আলোকে শেভ করার ক্ষতি

দাঁড়ি রাখা সুন্নত। এমন সুন্নতের প্রতি অনীহা প্রদর্শন সুন্নাতের প্রতি অনীহা প্রদর্শনেরই শামিল। দাঁড়ির ফায়দা ও উপকারিতা শরীঅতের দৃষ্টিতে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এর বৈজ্ঞানিক ও মেডিক্যাল উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শেভের ক্ষতিসমূহ লিখা হচ্ছে।

## ডাক্তার মোর এর গবেষণা

বার্লিন ইউনিভার্সিটির ডাক্তার মোর শেভ, ব্লেড এবং সাবানের উপর দীর্ঘদিন গবেষণার পর যে ফলাফল পেয়েছেন, তা দিল্লীর মাসিক পত্রিকা 'স্বাস্থ্য' তুলে ধরেছে নিম্নরূপ :

## চর্মরোগ

(SKEENDISEASES)

শেভের কারণে চামড়ার যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, শরীরের অন্যান্য অংশে সম্ভবত এ পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয় না। মূলত শেভের সময় রেজার বা ক্ষুর চামড়াতে দলতে থাকে। আর প্রত্যেক শেভকারীই চায়, তার চেহারায় যেন একটি দাড়িও না থাকে এবং চেহারার সৌন্দর্য ফুটে উঠে। তাই বারবার একটি চামড়াকে ব্লেড অথবা ক্ষুর দিয়ে মুণ্ডানো হয়। ফলে চামড়া খুবই স্পর্শকাতর (Sensitive) হয়ে যায় আর বিভিন্ন রোগ সহজেই সৃষ্টি হয়।

ভোঁতা ক্ষুর অথবা ব্লেড দিয়ে শেভ করতে হলে যথেষ্ট বল প্রয়োগ করতে হয়। ফলে চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। যা আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কিন্তু এর প্রদাহ অনুভূত হয়। যখন চামড়ায় কোনো ক্ষত সৃষ্টি হয়, তখন জীবাণু প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এভাবেই শেভকারী বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির শিকার হয়ে যায়। প্রথমে চেহারায় একপ্রকারের গুটি দেখা দেয়। পরে অন্য একপ্রকার চর্ম প্রদাহ দেখা দেয়, যাকে Sycosis Borleac বলা হয়।

এ ছাড়া আরো অনেক ছোঁয়াচে রোগ চেহারায় দেখা দেয়। পরে তা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। যার কিছু নমুনা নিম্নে প্রদান করা হল :

- চেহারার ব্রণ (Acne Vulgaris)
- চেহারার খুশকী : (Dandruf Seleorrhoese)
- মেছতা (চেহারার কালো দাগ) (Acne Rosaced)
- একজিমা (Eczema)
- নাকের গুটি ও মেছতা (Rhimophijma)
- এ্যালার্জি (Allergy)

## অ্যালট্রাভায়োলেট রশ্মির ক্ষতি

● অ্যালট্রাভায়োলেট (Ultraviolet Ray) রশ্মি চামড়ার অনুভূতি শক্তিকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত করে। কারণ, এ রশ্মিগুলি রৌদ্রে থাকে আর রৌদ্র থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই এটা চামড়ার উপর তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলে। ফলে চামড়ার রং কালো হয়ে যায়। চামড়ার চর্বিগ্রন্থি প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়।

## শেভের একটি বিশেষ প্রভাব

একাধারে শেভ করলে মস্তিষ্কের মূলে স্থিত গ্রন্থি (যার নিঃসৃত রস শরীর বৃদ্ধির সহায়ক) Pituatary gland এর উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। ফলে স্নায়ুবিক ব্যবস্থাপনা (Nervous System) এবং যৌন উত্তেজনায় দুর্বলতা দেখা দেয়। এরূপ অনেক রোগী আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে। এরা শেভ করা বন্ধ করার পর উক্ত রোগ থেকে মুক্তি লাভ করেছে।

# শরঈ পর্দা ও আধুনিক বিজ্ঞান

## সুন্নাতে রাসূল

যে কোনো আত্মীয় স্বজন অনুমতি ছাড়াই কি ঘরে প্রবেশ করতে পারে? নিকটাত্মীয়দের সাথে ইসলাম পর্দার নির্দেশ কেন দিয়েছে? পর্দা আল্লাহর প্রদত্ত নির্দেশ এবং গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী নির্দেশসমূহরে মধ্যে অন্যতম। ইসলাম মুসলমানদেরকে পর্দার নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্দা থাকবে, ততক্ষণ ঘর নিরাপত্তা, স্থিরতা ও লজ্জার আদর্শ প্রতীক হয়ে থাকে। যে ঘর ও গোষ্ঠী থেকে পর্দা উঠে গিয়েছে, সে ঘর নির্লজ্জতা ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ থাকে। অধমের জানামতে এরূপ হাজারো ঘটনা রয়েছে, যার কারণ হল, পর্দা কম করা বা পর্দা ছেড়ে দেওয়া। পর্দা না করলে যে সকল চারিত্রিক অপকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে, তার বর্ণনা দেওয়া মুশকিল। এক্ষেত্রে আমরা একজন ইউরোপীয়ান যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করি।

## ডাক্তার স্টিফেন ক্লার্ক

তিনি সিসিলির একজন যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, নারী-পুরষের অবাদ মেলামেশা, আত্মীয়-স্বজনদের

নির্বিঘ্নে ঘরে যাতায়াত করা, সাধারণ আত্মীয়-স্বজন বিনা অনুমতিতে ঘরে অবস্থান করা এবং চা পান করা, আমার দৃষ্টিতে এ সব ক্ষতিকর। আর এর প্রভাব কয়েক পুরুষ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। আমি এরূপ মেলামেশায় নারীদেরকে অন্যান্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখেছি। এ মেলামেশার দরুন তালাকের আধিক্য দেখতে পেয়েছি। যেনা এবং অপকর্ম বৃদ্ধি পেতে দেখেছি। ঘর উজাড় হয়ে যেতে দেখেছি। আত্মহত্যা করতে দেখেছি। নারী-পুরুষের জেলে যেতে দেখেছি। এসব কিছুর মূলে রয়েছে ঘরে যে কোনো নারী-পুরুষের অবাধে যাতায়াত করা। এছাড়া আর কিছু নয়। শরঈ পর্দা ছেড়ে দেওয়ার ফলে একজন কাফের এতগুলি ক্ষতির বর্ণনা দিয়েছে। অথচ আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরঈ পর্দার আদেশ দিয়ে আমাদেরকে সকল ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

## অবাধ মিলন, ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান

### ইহ্সানে রাসূল

ইসলাম নারীদেরকে সম্মান ও শান্তি দিয়েছে। অন্য কোনো ধর্ম এরূপ সম্মান ও মর্যাদা দান করে নি। কাজেই আমার প্রশ্ন–

- ইসলাম কি নারীদেরকে উলঙ্গ করেছে, নাকি সম্মানজনক পোশাক প্রদান করেছে?
- ইসলাম কি নারীদেরকে বাজারের সদাই বানিয়েছে, নাকি ঘরের প্রদীপ বানিয়েছে?
- ইসলাম কি নারীদেরকে রঙ্গশালার সৌন্দর্য-উপকরণ বানিয়েছে, না কি ঘরের চাঁদ বানিয়েছে?
- নারী কি শুধু রাজা-বাদশাদের মনোরঞ্জনের উপকরণ?
- নারী কি শুধু দাসী হওয়ার জন্যই জন্মেছে?
- ইউরোপ নারীদেরকে সম্মান দিয়েছে না কি ইসলাম দিয়েছে?
- ইউরোপিয়ান নারীরা কি হাজার মাইল ট্রাক ড্রাইভিং করেও নিজেদের ইজ্জতের হেফাযত করতে পারে? আমি একদিকে মুসলমান নারীর ইজ্জত, পবিত্রতা ও ক্রিয়াকলাপ দেখি, অপরদিকে ইউরোপিয়ান নারীদের মর্যাদা ও সম্মান দেখি। তখন আমার কাছে পরিষ্কার মনে হয়, ইসলাম নারীদেরকে ঘর-সংসারে সম্মান দান করেছে। আর যখনই এ নারী ঘর

সংসার ছেড়ে খোদাদ্রোহীতাকে বেছে নেয়, তখনই অপমান ও লাঞ্ছনা তার ভাগ্যে জুটে। তার মানসম্মান পদদলিত ও মথিত হয়। তারপর নারী শিশুদের খেলনা হয়ে যায়। বলুন! ইউরোপিয়ান নারীরা কী মর্যাদা পেয়েছে? তাদের জীবন কি আদৌ শান্তিপূর্ণ? তাহলে তালাক দিতে এবং আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় কেন? এর কিছু নমুনা পাঠক দেখুন!

## একটি প্রশ্ন সাতটি উত্তর

**প্রশ্ন :** কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, নারী-পুরুষের আবাধ-স্বাধীন মেলামেশায় ক্ষতি কি?

**উত্তর :** এ প্রশ্নের অনেক গুলি উত্তর আছে।

**প্রথমত** এতে আত্মসম্ভ্রমবোধ লোপ পায়। রাষ্ট্রীয় আইন-শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষা শক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

**দ্বিতীয়ত** ঘরের প্রশান্তি বিদূরিত হয়ে যায়। পুরুষ যতই নির্লজ্জ ও বেহায়া হোক, সে কখনো বরদাশত করে না যে, তার স্ত্রী কয়েক রাত ঘরের বাইরে যাপন করুক। তার স্ত্রী আজ একজনের বাহু বন্ধনে থাকুক আর কাল আরেক জনের বাহু বন্ধনে। খাবে একজনের আর সুখ দিবে অন্য জনকে? এতটুকু সম্ভ্রমবোধ তো প্রাণীদেরও থাকে, সে কাউকে তার বাসস্থানের কাছেও আসতে দেয় না। স্ত্রী যদি ফূর্তিবাজ হয়ে যায়, তাহলে ঘর সামলাবে কে? আর স্বামী প্রশান্তির খোঁজে কোথায় যাবে? স্বামী-স্ত্রীর একজন করে ফূর্তিবাজ হোক, তা না হলে একজন আরেক জনের স্বাদ থেকে মাহরূম হয়ে অস্থিরতার শিকার হয়ে যাবে।

**তৃতীয়ত** নারীদের শিক্ষা বিঘ্নিত হয়। ধরুন, কলেজে পড়ুয়া একটি মেয়ে যদি গর্ভবতী হয়ে যায়, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সে খেলাধুলায় শামিল হতে পারবে না। কলেজের উপর তলায় উঠতে সক্ষম হবে না। ছয় সাত মাস পর যখন বোঝা বেড়ে যাবে, তখন বাধ্য হয়েই কলেজ ত্যাগ করতে হবে। এ জাতীয় ঘটনা আমেরিকায় এত বেশি ঘটছে যে, যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের শুরুতে ছাত্রী সংখ্যা থাকে একশ, তবে বছরের শেষে থাকবে মাত্র বিশজন। (দেখুন মাসিক "লক")

**চতুর্থত** তালাকের মোকদ্দমা বৃদ্ধি পায়। পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি, আমেরিকায় মাত্র এক বছরে বিশ লক্ষ দম্পত্তি তালাকের শিকার হয়েছে। তালাকের পর সন্তানের অবস্থা যে কি হয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

পঞ্চমত মেয়েদের বিরাট একটি সংখ্যা বিবাহ থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজে অপরাধ ছড়ায়। সুতরাং এরূপ দ্বিচারিণী নারীকে বিবাহ করার শখ কার হবে?

ষষ্ঠত অবৈধ সন্তানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আমেরিকায় ১৯৬৩ সালে ২০ লাখ জারজ সন্তান জন্ম নিয়েছে। ("টাইম" ২৪ শে জানুয়ারি ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ) এর পূর্ববর্তী বৎসরে এ সংখ্যা ছিল সাড়ে তেইশ লাখ। এ সকল শিশুদের পিতৃপরিচয় নেই। এদের লালন-পালন কে করবে? সরকার? ভালো কথা! এদেরকে চরিত্র ও ভদ্রতা শিখাবে কে? স্বভাবতই এই সকল কু-সন্তান বড় হয়ে সমাজের জন্য একটি অভিশাপ হয়ে যাবে। এটা মা-বাবারই ভয়, তারা পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য সন্তানদেরকে ভবঘুরে হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। কিন্তু যেখানে বাপও নেই, পরিবারও নেই, সেখানে আশ্রয় কোথায়?

সপ্তমত এক রোগ থেকে আরেক রোগের সৃষ্টি হয়। ধরুন! একজন যুবক যখন স্বহস্তেই নিজের যৌবনের মূলোৎপাটন করছে, তখন প্রথমে তার কমা রোগের সৃষ্টি হবে। এরপর মাথাব্যথা, তারপর অনিদ্রা এবং রক্ত স্বল্পতা দেখা দিবে। একজন নওজোয়ান যখন চরিত্রহীন এবং উগ্র-উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়, তখন সর্বপ্রথম সে নারী শিকারে মত্ত হয়। এর জন্য তার টাকা পয়সার প্রয়োজন পড়ে। যখন ঘরে টাকা না পায়, তখন শুরু করে জুয়া, চুরি, পকেটমার ও ডাকাতি। আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে সৌখিন দেশ। সেখানে মাথাপিছু বার্ষিক আয় হাজার হাজার ডলার। বৃটেনেও জনপ্রতি আয় হাজার হাজার পাউণ্ড এবং পাকিস্তানে অনুরূপ মাথাপিছু আয় হাজার হাজার টাকা। কিন্তু আমেরিকায় অপকর্মের হার এত বেশি যে, প্রতি এক মিনিটে একটি হত্যাকাণ্ড, আটটি চুরির ঘটনা এবং মাসে পচিশ হাজার কার চুরি হয়। এসব অপকর্মের জন্য শুধু একটি অপরাধই দায়ী। সেটি হল নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। একটি নারীর সঙ্গে এক সন্ধ্যা কাটানোর জন্য মদ, নাচ, সিনেমা এবং ডিনারে হাজার টাকা ব্যয় করা হয়। এত টাকা আসে কোত্থেকে? আজ কোনোভাবে যোগাড় হয়ে গেলেও আগামী কাল কি হবে! ফলে হয় চুরি ডাকাতি এবং ব্যাংক লুট। এ ধরনের ঘটনা আমেরিকায় মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। পাকিস্তানের কোনো কোনো শহরেও এরূপ শুরু হয়ে গিয়েছে। যদি ইংলিশ ফিল্ম আমদানি বন্ধ না হয়, মদ

ও নাচ-গানের অনুষ্ঠান বন্ধ করা না হয় এবং আমাদের শিক্ষা সিলেবাসে উত্তম চরিত্র গঠনের বইপত্র অন্তর্ভুক্ত করা না হয়, তা হলে এখানেও খুব দ্রুত কেয়ামত কায়েম হয়ে যাবে।

## আমেরিকার কয়েকটি ঘটনা

(১) আজ থেকে তিন মাস পূর্বে এক শহরের একটি বরযাত্রী দল সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বাজার অতিক্রম করেছে।

(২) ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ক্লাবে মেয়েরা কোমর পর্যন্ত ছয় ইঞ্চির একটি কাপড় পরিধান করে। কিন্তু উপরের অংশ একবারে খোলা থাকে। এরূপ মেয়ে পাকিস্তানেও রয়েছে, যারা নাচের সময় শরীরের উপরি অংশের কাপড় খুলে ফেলে। আর এসব নর্তকী নামী-দামী ঘরেরই আদুরে মেয়ে।

(৩) এক ব্যক্তি নিউইয়র্কের একটি দোকানে প্রবেশ করল। সেখানে ১৮ বছরের একটি মেয়ে বিক্রেতার দায়িত্ব পালন করছিল। সে ব্যক্তি মেয়েটিকে ধরে তার কাপড় খুলে ফেলল এবং তার ইজ্জত লুটতে লাগল। মেয়েটি চিৎকার দিতে লাগল; কিন্তু কেউ ভ্রূক্ষেপও করল না। মেয়েটি কোনো কৌশল অবলম্বন করে তার হাত থেকে ছুটে বাজারের উপর দিয়েই দৌড়ে পালাল। এ লোকটিও পিছু পিছু দৌড়াতে লাগল। কিছু দূর গিয়ে মেয়েটিকে ধরে ফেলল। প্রথমে তাকে প্রহার করল। এরপর তাকে টেনে হিঁচড়ে দোকানের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। সেখানে তামাশা দেখার জন্য অনেকেই ভিড় জমাল। কিন্তু কেউ মেয়েটির সাহায্য করল না। তারপর সেখানে পুলিশ আসল এবং মেয়েটিকে দানবের হাত থেকে উদ্ধার করল।

এ ঘটনার কিছু দিন পর এ জাতীয় এক নরপশু একটি মেয়ের ফ্লাটে গিয়ে প্রবেশ করল। প্রথমে তার সঙ্গে অপকর্ম করল। তারপর তাকে ছুরি মেরে হত্যা করে ফেলল। পড়শিরা সকলে এ তামাশা দেখতে থাকল। কিন্তু কেউ তার উদ্ধারে এগিয়ে আসল না। (পাকিস্তান টাইমস)

(৪) নিউইয়র্কের উচ্চ আদালত ২৯ বছর বয়স্ক ওয়ানষ্টন মোসলেকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। কারণ, সে উঠতি বয়সের যুবতীদের সঙ্গে অপকর্ম করে তাদের হত্যা করত। একবার সে একটি মেয়েকে উলঙ্গ করল এবং তার শরীরের কাপড় দিয়ে বল তৈরি করে তার গায়ে জড়াল এবং তাতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল। এ নরপশু [illegible] চাকু দিয়ে হত্যা করত।

গ্রেফতারের এক সন্ধ্যা পূর্বে সে নিয়ম মাফিক তার সাদা কার নিয়ে ঘর থেকে বেরুল। রাস্তায় সে একটি কারে একটি মেয়েকে একা যেতে দেখল। মেয়েটি যখন বাড়ির পাশে এসে গাড়ি থামাল, তখন মোসলেও তার গাড়ি থেকে নেমে আসল। মেয়েটি তার মনোভাব বুঝতে পেরে দ্রুত ঘরে ঢুকে পড়ল। মোসলেও তার পিছু পিছু ঘরে ঢুকে পড়ল। মেয়েটি ছিল একা। সে চিৎকার দিতে লাগল। তবু নরপশু সামনে অগ্রসর হয়ে মেয়েটিকে আক্রমণ করল এবং ছোরা দিয়ে চালনি করে দিল। তাকে সেখানে ফেলেই কারে করে ফিরে আসল এবং নতুন শিকারের উদ্দেশ্যে রাস্তায় চক্কর দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসল। মেয়েটি তখনো ছটফট করছিল। তাকে আরও কয়েকবার ছুরিকাঘাত করল। মেয়েটি যখন ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তখন সে তার অপকর্ম সেরে ঘরে ফিরে গেল। ছোরা ধুয়ে আলমারীতে রাখল এবং কাপড় পাল্টে শুয়ে পড়ল। দ্বিতীয় দিন আরেকটি ঘরে হামলা চালানোর সময় সে গ্রেফতার হয়ে গেল। পুলিশের নিকট জবানবন্দীতে সে এসব তথ্য বর্ণনা করেছে। (সাপ্তাহিক তা'মীর)

(৫) ফ্রান্সের পুলিশ একবার এক হাসপাতালের একজন নওজোয়ান কর্মচারীকে পাকড়াও করল। সে হাসপাতালের ডিউটির অবসরে কার চুরি করত এবং শিশুদেরকে হত্যা করত। নয় নম্বর শিশু হত্যার সময় সে ধরা পড়ল।

(৬) বর্তমানে আত্মহত্যা আমেরিকায় একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের শেষ ছয় মাসে আমেরিকার প্রসিদ্ধ শহর লস এঞ্জেলসে পঁচাত্তর হাজার নারী-পুরুষ আত্মহত্যা করেছে।(পাকিস্তান টাইমস)

(৬) ৯ই মে ৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। এক ব্যক্তি প্যাসিফিক এয়ার লাইন্সের একটি বিমানে করে আরও ৪৪ জন যাত্রীর সঙ্গে সফর করছিল। সে নিজ জীবনের প্রতি তিক্ত হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ পিস্তল বের করে সে পাইলটকে ছয়টি গুলি করল। বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে সকল যাত্রীই প্রাণ হারাল। পরে জানা গেল, সে সফরের পূর্বে পঞ্চাশ হাজার ডলারে একটি বীমা তার স্ত্রীর নামে করিয়ে রেখেছে। (পাকিস্তান টাইমস ১০ই মে ১৯৬৪ই)

### একই ধ্যান একই মন

বিশ্বাস এক অর্থাৎ আল্লাহ এক, রাসূল এক, কুরআন এক, কাবা এক এবং জীবন যাপনের নিয়মও এক হওয়ার কারণে ইন্দোনেশিয়া থেকে

মরক্কো পর্যন্ত পুরো ইসলামি বিশ্বের ধ্যান-ধারণা ও মন-মানসিকতা এক। এটা একই মন-মানসিকতার ফলে কোটি কোটি মানুষ অন্ন-বস্ত্রহীন হওয়া সত্ত্বেও রীতি-নীতি, ধর্ম ও নিয়মের ক্ষেত্রে তারা সরল পথের উপরই চলে। যদি কোনো সময় ধর্মের বন্ধন ঢিলে হয়ে যায় আর পাকিস্তানে মাত্র দশ হাজার ডাকাত, চোর, খুনী ও বিদ্রোহীর জন্ম হয়ে যায়, তবে রাষ্ট্রীয় পুলিশ ও সেনাবাহিনী বেকার হয়ে যাবে। নিরাপত্তা ও শান্তি দূর হয়ে যাবে। সকল নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

ধর্ম এমন একটি একক শক্তি যা দর্পকারী, গর্বকারী অহংকারী এবং হস্তীশক্তির অধিকারীকেও দুর্বলদের পায়ে মস্তক অবনত করতে বাধ্য করে এবং সিংহের গর্দানে বকরির গোলামীর জিঞ্জির পরিয়ে দিতে পারে। এ জন্যই ক্ষুধার্তরা বাজার লুট করে না। কারণ, এটা গুনাহের কাজ। সবলেরা দুর্বলদেরকে এ জন্যই কষ্ট দেয় না যে, আল্লাহ্ তা'আলা এটা পছন্দ করেন না। সম্পদশালীরা ইয়াতিম মিসকীনদেরকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই লালন পালন করে। যখন কোনো বিপদ এসে পড়ে, তখন লক্ষ লক্ষ নওজোয়ান আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। যে সকল লোক নির্লজ্জতা ও অপকর্ম দ্বারা এ পবিত্র পরিবেশকে কলুষিত করে, জাতি কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবে না। বিশেষত যারা জনগণের তহবিল থেকে বড় অঙ্কের বেতন ভোগ করে জনগণের সম্মুখেই তাদের দীন-ধর্ম ও আকীদা বিশ্বাসকে হেয় প্রতিপন্ন করে এবং তাদের ইসলামের হৃদয়ে আঘাতের পর আঘাত হানে।

এ বাস্তব সত্যটি সকলেরই জানা আছে যে, উঁচু শ্রেণীর লোকেরা প্রতি সন্ধ্যায় হোটেল এবং ক্লাবে পরনারীর সঙ্গে নাচগান ও মদ পানে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং নামায ও কুরআন থেকে হাজারো মাইল দূরে সরে যায়। যদি তাদেরকে দেখে আমাদের লক্ষ লক্ষ নওজোয়ান এবং কোটি কোটি জনসাধারণ ধর্মের সীমানা পেরিয়ে বাইরে চলে যায়, তা হলে অবস্থা কি দাঁড়াবে?

পবিত্র কুরআনের ফয়সালা মতে এ আরামপ্রিয় শ্রেণী খুবই বিপদজনক। এরাই প্রত্যেকে রাসূলের প্রতিপক্ষে শামিল হয়েছে এবং এদের কারণেই প্রতিটি জাতি ধ্বংসের কোলে ঢলে পড়েছে।

"যখন কোনো লোকালয়ে সম্পদশালী শ্রেণী অন্যায় ও অপকর্মে ডুবে যায়, তখন সে আমার গযবকে আহ্বান করে এবং আমি সে লোকালয়কে ধ্বংস করে দেই।" (সূরা সাবা : ৩৪-৩৫)

"যখন আমি সম্পদশালী শ্রেণীকে পাকড়াও করলাম, তখন তারা চিৎকার দিতে লাগল। এ চিৎকার আজ আমার পাকড়াও থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। আমার আহ্বান তোমাদেরকে শোনানো হয়েছিল। কিন্তু তোমরা অহংকার প্রকাশ করতে, অযথা বকাবকি করতে এবং অপবাদ দিয়ে পিছনে সরে যেতে। (সূরা মুমিনুন : ৬৪-৬৭)

আজ ইসলামের বিরুদ্ধে পক্ষ মাত্র একটি। সেটি হল, ইউরোপ ও তার নগ্ন সংস্কৃতি। ইউরোপের চরম উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি বুলিয়ে দেখুন। সে কিভাবে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার প্রচার-প্রসারে কোটি-কোটি টাকা ব্যয় করছে। কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইসলামি সালতানাতের নেতৃবর্গ জ্যোতির্ময় এবং মজবুত মূল্যবোধ সৃষ্টি করার কল্পনাকেও ভয় করে। যখন সততা ময়দান থেকে পালিয়ে যায়, তখন বাতিল ছেয়ে যায় এবং মানবতার চিৎকার ধ্বনিত হয়। (ইসলাম আওর আছরে রওয়া)

## মারাজাল বাহ্‌রাইনের রহস্য

কোস্টো একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী। খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। সে সমুদ্রের পানি নিয়ে গবেষণা করছিল, কী কারণে দুই সমুদ্রের পানি মিশে একাকার হয় না। এক সমুদ্রের পানি এক রংয়ের ও এক স্বাদের আর অপর সমুদ্রের পানি আরেক রংয়ের ও আরেক স্বাদের। কিন্তু এক পানি আরেক পানির সঙ্গে মিশে না কেন?

সে সমুদ্রে গিয়ে প্রত্যক্ষ করল। তারপর সে পানি সম্পর্কে গবেষণায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিল এবং কোস্টো-থিওরী নামে একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করল। কিছু দিন পর তার সঙ্গে একজন মুসলমান বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎ হল। তাঁর সম্মুখে কোস্টো যখন তার থিওরী উত্থাপন করল, তখন তিনি কোস্টোকে বললেন, আপনি তো এখন রিসার্চ করছেন। আমি আপনাকে শতশত বছর আগের রিসার্চ দেখাতে পারব। যখন মুসলমান বিজ্ঞানী তাকে কুরআন দেখাল। তখন কোস্টো স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হল।

# কুরআনই সঠিক পথ দেখিয়েছে

(THE VERSE THAT SHOWED CORSLEAU THE RIGHT WAY)

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ

"দুটি সমুদ্রকে আল্লাহ তা'আলা পাশাপাশি প্রবাহিত করেছেন। তাদের মাঝে একটি অন্তরাল সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।"

(সূরা আর-রহমান)

"He has let two Seas that should meet together there is a barrier between them which they do not overpass"

(১) আয়াতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) দুটি সমুদ্রের বিরাট জলরাশি একটি সূক্ষ্ম জলস্রোতে (Strait) মিলিত হওয়া একটি সাধারণ ব্যাপার।

(৩) দুটি সমুদ্রের মাঝে একটি বিশেষ বাধা থাকায় পরস্পরে পুরোপুরি মিলিত হয় না।

আসুন! এ বিষয়ে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করি। ফ্রান্সের বিজ্ঞানী জ্যাক ভি কোস্টো, যিনি সমুদ্রের ভিতর পানি রিসার্চ বিষয়ে প্রসিদ্ধ। তিনি বুঝতে পারলেন, রোম সাগর Medeterranian এবং আটলান্টিক Atlantic মহাসাগর রাসায়নিক দিক থেকে একটি অন্যটির চেয়ে ভিন্ন রকমের। তিনি এ বাস্তব সত্যটি অনুধাবন করার জন্য জিব্রাল্টরের দুই সমুদ্রের মোহনার কাছাকাছি সমুদ্রের তলদেশে গবেষণা চালান। সেখান থেকে তথ্য পেলেন যে, জিব্রাল্টরে উত্তর তীর (মরক্কো) এবং দক্ষিণ তীর (স্পেন) থেকে আশাতীতভাবে একটি মিষ্টি পানির ঝর্ণা উথলে উঠে এবং এ বড় ঝর্ণাটি উভয় সমুদ্রের মধ্য দিয়ে ৪৫ ডিগ্রি সূক্ষ্ম কোণে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে চিরুনীর দাঁতের আকৃতি ধারণ করে বাঁধের মতো কাজ করে। ফলে রোম সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর একটি আরেকটির সঙ্গে মিশতে পারে না।

কোস্টোকে এ গবেষণার পরই কুরআনের আয়াত দেখানো হয়েছিল। তিনি তখন খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং কুরআনের প্রশংসা ও বড়ত্ব প্রকাশ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। এ আশ্চর্যজনক আয়াতটিতে জাবালুত তারেক (জিব্রালটর) এর সীমানা ও বাঁধটিকে সঠিকভাবে বর্ণনা করা

হয়েছে। আসুন, আমরা আয়াতটিকে সূরায়ে আর-রাহমানের সাধারণ আলোচনার নিরিখে পরখ করে দেখি। নিঃসন্দেহে এ সূরার আলোচনায় আল্লাহ্ তা'আলার অপূর্ব সৃষ্টি এবং তাঁর অপার নেয়ামতের মধ্যে মানুষের জন্য সীমাহীন জ্ঞান-প্রজ্ঞার কথা রয়েছে।

সমুদ্রের এ মোহনায় যে বাঁধা রয়েছে, তার মূল রহস্য কি? সমুদ্রের প্রাণীর সংখ্যা স্থলের প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি। তাতে রয়েছে অসীম শরীরী Organism। আরও রয়েছে অসংখ্য অদ্ভুত ধরনের উদ্ভিদ। মোটকথা, তাতে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের এক বিরাট কীর্তি রয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী বিভিন্ন পরিবেশে বাস করতে অভ্যস্ত। তাই আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত সমুদ্রগুলোকে একটি অপরটির মাঝে একাকার হতে দেয় না। এ বক্তব্যটি আমাদের দৃষ্টিকে ২২ নম্বর আয়াতে নিবদ্ধ করে দেয়। বিশেষভাবে সমুদ্র তৈরির ধাঁচের দিকে এবং সামুদ্রিক উদ্ভিদ এবং মাছের বিভিন্ন প্রকারের দিকে। এ আয়াত উভয় সমুদ্রে মুক্তা এবং সামুদ্রিক মূল্যবান পাথরের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করে। সমুদ্রের পানি পরস্পর একাকার না হওয়ার কারণে সমুদ্রে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ রয়েছে যেগুলিকে তাদের কুদরতী পরিবেশে দেখে সীমাহীন আনন্দ অনুভূত হয়।

সমুদ্রে এক বিশেষ ধরনের ফুল রয়েছে, যেগুলো কয়েক প্রকার উদ্ভিদে ঢাকা থাকে। যাদের উপমা স্থলভাগে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ জাতীয় বিভিন্ন রকমের ফুল স্থলে থেকে কল্পনাও করা যায় না। সমুদ্রের তলদেশে লালা (Lepasfaris) ফুল হয়। যেগুলো স্থলভাগের লালা ফুল থেকে অনেক সুন্দর। সমুদ্রের তলদেশে এরূপ অনেক সুন্দর পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ আছে, যেগুলি দেখার মতো। এরা (Radar) রাডারের মতো কৌশল দ্বারা হাজার হাজার মিটার নিচে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে।

Acan Thurus Triostegus নামক একটি মাছ আছে। যার লাল শরীরে ক্লোরাইডের লাল লাল দাগ থাকে। যাদের থেকে খুবই সুন্দর আলো বের হয় এবং নিজেদের আশপাশের পরিবেশকে উজ্জ্বল করে দেয়। সমুদ্রের অতল গভীরে অন্ধকারে ত্রিশ প্রকারের বিভিন্ন আলোক মাছ পাওয়া গেছে। এসব জীব আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির বিশেষ নমুনা এবং সমুদ্রগুলো পরস্পর সংমিশ্রণ না হওয়ার গোপন রহস্য প্রকাশ করে। যেমন : আয়াতে কারীমা থেকেও এরূপ বুঝে আসে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারাও প্রকাশ পায় যে,

জিব্রাল্টরে সমুদ্রের মিলনস্থলের উভয় পাশের তলদেশে এবং সেখানে বিদ্যমান পাহাড়ের চূড়ায় বিভিন্ন প্রকারের সুন্দর সুন্দর উদ্ভিদ ও কীট-প্রতঙ্গ রয়েছে, যার পরিসংখ্যান এত উন্নত যুগেও সম্ভব হয় নি।

এ জাতীয় বিভিন্ন প্রজাতির ফুল উভয় সমুদ্রেই রয়েছে। যেমন : নাগফনী, (একটি ফুলগাছ যার পাতা সাপের ফণার মতো এবং ফুল খুব সুন্দর হয়) থোহর (রং বেরংয়ের ফুল বিশেষ নীলাভ, বেগুনি, লাল ইত্যাদি রংয়ের নানাফুল।) কিন্তু উভয় সমুদ্রের ফুলের প্রকার আলাদা আলাদা। এমনিভাবে সমুদ্রের অথৈ পানির নিচে নীলাভ রং বিচ্ছুরণকারী একপ্রকারের কীট (Spiders) রয়েছে, যেগুলো এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে।

## হাঁচির জবাবে আল-হামদুলিল্লাহ্ বলা ও আধুনিক বিজ্ঞান

### হাদীসে রাসূল

✪ হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হাঁচিকে পছন্দ এবং হাই অপছন্দ করেন। যখন কোনো ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আল-হামদুলিল্লাহ্ বলে, তখন যে ব্যক্তি তা শুনে তার জন্য ওই হাঁচিদাতা মুসলমানকে ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলে দু'আ করা উচিত। এ হাই শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। যদি কোনো ব্যক্তির হাই আসে, তবে যথাসম্ভব রোধ করার চেষ্টা করবে। কারণ, যখন মানুষ হাই তুললে শয়তান হাসে; আনন্দিত হয়। কেননা এটা অলসতা ও কর্ম বিমুখতার প্রমাণ। আর অলসতা এবং কর্মবিমুখিতাকে শয়তান পছন্দ করে। (বুখারী শরীফ)

### গবেষণার ফসল

লাহোরের ইসলামি কলেজের ইসলামি শিক্ষা বিভাগের প্রফেসর নাসরুল্লাহ্ খান বলেন– এক ইংরেজ ডাক্তার যখন এ হাদীসটি পড়ল যে, মুসলমানদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুসলমান হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ্' পড়বে আর যে মুসলমান তার আশ-পাশে থাকবে, সে জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলবে। এরপর হাঁচিদাতা বলবে– 'ইয়াহদীকুমুল্লাহ্'। তখন সে ভাবল, এ সামান্য কাজে এতগুলি দু'আ পড়ার কারণ কি? তারপর সে গবেষণা করল এবং জানতে পারল,

এতগুলি দু'আ পড়া অযথা নয় বরং আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়। কেননা গবেষণা দ্বারা জানা গেছে, মস্তিষ্কের রগসমূহে বায়ু আটকে যায় এবং কুদরত এ হাওয়া বের করার জন্য একটি প্রেসারের ব্যবস্থা করেছে এবং এভাবে হাঁচি প্রেসারের মাধ্যমে সে বায়ু নাসিকা পথে বেরিয়ে যায়। যদি মস্তিষ্কে এ বাতাস আটকে থাকে, তবে প্যারালাইসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ জন্য হাঁচি দেওয়ার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়া মানে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

সারাদিনের ব্যস্ততায় মানুষ বিভিন্ন ধরনের কাজ-কর্ম করে। অনেকে পেশাগত কারণে, তাদেরকে ধূলোবালিতে কাজ করতে হয়। এভাবে এ ধুলোবালি নাকের ভিতর প্রবেশ করে। কুদরত নাকের পশমগুলোকে ওই বালিকণা এবং তাতে বিদ্যমান জীবাণু প্রতিরোধ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। হাঁচি দিলে জমে থাকা ধূলোবালি এবং জীবাণুগুলো (Germ) বের হয়ে যায়। আর হাঁচির হাওয়া এত প্রেসারপূর্ণ হয় যে, সেখানে কোনো জীবাণু আটকে থাকার সুযোগ পায় না। যদি এই জীবাণুগুলো ও ধূলোবালি ভিতরে প্রবেশ করে, তা হলে অগণিত রোগের কারণ হয়ে যেতে পারে। এরূপ বহু রোগ রয়েছে, সেগুলো নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ছড়ায় এবং পরে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আল্লাহ তা'আলা এ সকল রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক হিসেবে হাঁচির ব্যবস্থা করেছেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাঁচিকে পছন্দ করেছেন।

## ভাল নাম ও আধুনিক বিজ্ঞান

(BEST NAME AND MODERN SCIENCE)

### হাদীসে রাসূল

• নবীজী বলেছেন– "হে লোকসকল! তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন নিজেদের এবং নিজেদের পিতার নামে ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা নিজেদের নাম ভালো দেখে রাখ।" (আবু দাউদ)

• যে নামে আল্লাহর দাসত্ব এবং আল্লাহর প্রশংসা প্রকাশ পায়, ওই নাম আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই প্রিয়। (বুখারী)

• হযরত আবু ওহাই (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা নবীদের নামে নাম রাখো। আল্লাহ

তা'আলার নিকট সব চেয়ে প্রিয় নাম আব্দুল্লাহ্ এবং আব্দুর রহমান এবং সবচেয়ে সত্যবাদী নাম হারেস ও হাম্মাম। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

## নাম এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য

(NAME AND SCIENTIFIC DISCLOUSURE)

আধুনিক বিজ্ঞান ভালো নামকে পছন্দ করে। তাদের এ পছন্দ মূলত নামের শব্দ এবং তার প্রভাবসমূহের কারণেই।

প্যারাসাইকোলোজির অভিজ্ঞ প্রফেসর প্যারিন গাস্টার তার সম্প্রতি এক গবেষণায় প্রকাশ করেছেন, নাম মানব জীবনের উপর প্রভাব ফেলে। এমনকি নামের শব্দসমূহের অর্থও নামের উপকারিতা ও প্রভাব পরিবর্তন করে দেয়। প্রফেসর বলেন, আমি রহীম এবং পারভেজ উভয় নামের তুলনা করেছি। রহীম থেকে সবুজ এবং সাদা আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি এবং পারভেজ থেকে কালো এবং ধুম্র বর্ণের আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি।

তাবিজের উপকারিতা এবং তার শব্দসমূহেও আমরা একই অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি। মূলত শক্তি শব্দের ভিতর। চাই তা নামের আকারে হোক অথবা ওই নামই তাবিজে ব্যবহার করা হোক। আর এ নামই মানুষের আমলনামাকে বরকতময় বা খারাপ বানায়। ফেরাউন অথবা নমরুদ কয়েকটি শব্দের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু তার তরঙ্গ শ্রবণকারীর অন্তরে ঘৃণা এবং অন্ধকার সৃষ্টি করে।

## শব্দেরও শক্তি আছে

আমার নিকট এক ব্যক্তি চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আসলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি নিজের ঘটনা শোনালেন। তিনি বলেন, আমার গাধার পেটের পাশে একটি গভীর জখম হয়েছিল। বহু চিকিৎসা করালাম। কিন্তু কোনো লাভ হল না। সে স্থানে পোকা হয়ে গেল। এক ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার কথা বলল, তুমি যদি চাও তোমার গাধা সুস্থ হয়ে যাক, পোকা শেষ হয়ে যাক এবং জখম ঠিক হয়ে যাক, তাহলে তুমি তিনজন পাকা সুদখোরের নাম কাগজে লিখে তাবিজের মতো বানিয়ে গাধার গলায় ঝুলিয়ে দাও। প্রথমে তো আমি খুবই আশ্চর্যবোধ করলাম যে, এতে আর এমনকি উপকার হবে? কিন্তু কথাটা বারবার বলার কারণে আমি আমার এলাকার তিনজন সুদ খোরের নাম কাগজে লিখে গাধার গলায় বেঁধে দিলাম। আপনি শুনে আশ্চর্য

হবেন! মাত্র তিন দিনের মাথায় আমার গাধা পূর্ণ সুস্থতা লাভ করল। পোকা মরে গেল এবং জখমও ভালো হয়ে গেল।

## বদ-আমল কি মানুষকে বিষাক্ত বানিয়ে দেয়?

কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী বদ-আমলের কারণে কি মানুষ জানোয়ার থেকেও অধম হয়ে যায়? সুদখোরী কি তাকে এত নিকৃষ্ট বানিয়ে দিয়েছে যে, তার নামও বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে?

বলুন! এ উদাহরণটি কি এরূপ নয় যে, বিষই বিষকে খতম করতে পারে? আপনি কি জানেন, ক্যান্সার, ক্ষতরোগ এবং গলগণ্ড রোগের জখমের জন্য বিষাক্ত ঔষধ বা মলম ব্যবহার করলে এ সমস্ত রোগ খতম হয়ে যায়? সুতরাং আপনি এ তাবীজ থেকে সুফল কিভাবে পেলেন?

শব্দের শক্তির ব্যাপারে তিনজন পশ্চিমা বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন। নিম্নে তাদের গবেষণাটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

## পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের গবেষণা

পশ্চিমা ধর্মগুরু মনে করেন, মানুষের শরীর থেকে বিভিন্ন রংয়ের কিরণ বিচ্ছুরিত হয়। যা শরীরের আশপাশে একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। এ কিরণ প্রতিটি মানুষই বিচ্ছুরণ করে। চাই সে ভালো লোক হোক অথবা খারাপ লোকই হোক। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, কিরণের রং কর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে এ বিচ্ছুরণ নীল বর্ণ থেকে কালো বর্ণ ধারণ করে।

আরেকটি মতবাদ আছে, প্রতিটি মানুষ তার চারপাশে নিজের আমল অনুযায়ী একটি পরিবেশ (Atmosphere) তৈরি করে নেয়। বদআমলকারীর পরিবেশ দেয়ালের মতো শক্ত হয়। যার ফলে কোনো ফরিয়াদ অথবা দু'আ বাইরে যেতে পারে না এবং কসমিক ওয়ার্ল্ডের উত্তম প্রভাব ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। এরূপ লোকেরা অদৃশ্য শক্তির সাহায্য থেকে মাহরূম থাকে। আর মনে হয় কুরআনুল কারীমের শব্দ পর্দা, দেয়াল এবং 'গেলাফ' দ্বারা উদ্দেশ্য এ পরিবেশই।

ডাক্তার ক্রিংটন মনে করেন, Aura is an invisitble magnatic radiation from the human body which either attracts or ripels.

অর্থাৎ 'ওরা' এমন একটি অদৃশ্য ম্যাগনেটিক আলো, যা মানুষের শরীর

থেকে বিচ্ছুরিত হয়। এটা হয়তো অন্যকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে অথবা দূরে ঠেলে দেয়।

এ জাতীয় রশ্মিকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ, কাউকে আকর্ষণ করা আর কারও কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া আমাদের দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতা। এ আলোক রশ্মি মাটির শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীর উভয় থেকেই বের হয়। ভালো লোকেরা সূক্ষ্ম শরীরের কিরণ দ্বারা দুনিয়াকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং দুনিয়া সুধারণা, ঈমান এবং শৃঙ্খলার হাদিয়া নিয়ে তার নিকট আগমন করে। অপরদিকে খারাপ লোকের রশ্মি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধঃপতনের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। এর বেশি কিছু নয়।

## দু'আ ও ইবাদতের দর্শন

দু'আ ও ইবাদতের হাকীকত বুঝতে হলে প্রথমে দুটি জিনিসের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন।

(১) আত্মা বিশেষজ্ঞগণের মতে প্রতিটি অক্ষরের একটি বিশেষ রং এবং শক্তি থাকে। অদৃশ্য দর্শনকারীগণ (Clairvoyants) অক্ষরগুলি লিখে তৃতীয় চক্ষু দ্বারা দেখেছেন, তখন তারা 'আলিফ' এর রং লাল 'বা' এর রং নীল, 'ওয়াও' এর রং সবুজ এবং সীন এর রং হলুদ দেখতে পেয়েছেন। এরপর যখন এগুলির প্রভাব সম্পর্কে জরিপ করলেন, তখন দেখলেন, কোন্ শব্দ পড়লে রোগ ভালো হয়। কোনটি দ্বারা বৃশ্চিকদংশনের ব্যথা দূর হয় এবং কোন্‌টি দিয়ে সাপও ধরে আনা যায়। আম্বিয়া-আওলিয়াদের রুহানী শক্তি খুব বেশি হয়। তাদের শব্দসমূহে আশ্চর্যজনক শক্তি পাওয়া যায় এবং এরূপ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি পাওয়া যায়, যার দ্বারা একজন হৃদয়বান ব্যক্তি মারাত্মক ব্যাধিও দূর করে দিতে পারে। আকাশে আল্লাহ তা'আলার পর সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হযরত জিব্রাইল আ.। আর তাঁরই মাধ্যমে কালামে এলাহী দুনিয়াতে আগমন করে। একারণেই অহী প্রেরিত কিতাবসমূহের প্রতিটি শব্দে শক্তির একটি ভাণ্ডার নিহিত থাকে। অন্য কথায় এলহামী শব্দসমূহ সর্বোচ্চ শক্তির আধার বা Highly Energised.

## তাবীজের শক্তির রহস্য

A talismar or an amult strongly Charged with magnatism for a particular purpose by some one who possesses strong magnetic power may be of invaluable h elp.

অর্থাৎ কোন তাবীজ বা টোটকায় কোনো ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাগনেট ব্যক্তিত্ব কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ম্যাগনেট শক্তি ভরে দিলে, তা যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

পাদ্রী লেডবিটর ইউরোপের একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সম্ভবত ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছে। তিনি সূক্ষ্ম শরীরে অনেক দূর-দূরান্তে চলে যেতে এবং গোপন জিনিসসমূহ দেখতে পারতেন। তিনি স্বরচিত The masters and the path গ্রন্থে লিখেন :

Each word as it is uttered makes a little form in etheric matter. The word 'hate' for instance, produces a horrible form so much as that having seen its shape, I never use the word when I saw the form it gave me a feeling of acute discomfort (P-136)

অর্থাৎ প্রতিটি শব্দ ইথারে একটি বিশেষ আকৃতি ধারণ করে। যেমন, 'ঘৃণা' শব্দটি এত মারাত্মক আকৃতি ধারণ করে, একবার আমি ওই আকৃতি দেখেছিলাম। তারপর থেকে এ শব্দটি ব্যবহার করার সাহস আমার হয় নি। এ দৃশ্য দেখে আমার খুবই মানসিক কষ্ট হয়েছিল।

## এ জাতীয় আরও দুটি ঘটনা

(১) এক মজলিসে কয়েক বন্ধু আলোচনারত ছিল। আর আমি কিছুটা দূরে বসে তাদের সূক্ষ্ম শরীর অবলোকন করছিলাম। কোনো এককথায় একজন খুব অট্টহাসি দিল। পরপরই আরেকজন একটি উপমা দিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, তার সূক্ষ্ম শরীরে গাঢ় ধোঁয়াটে রঙের একটি জাল জড়িয়ে গেল। এটা দেখে আমার খুবই খারাপ লাগছিল।

(২) পাদ্রী রেডবেটার এক ব্যক্তির সুস্থ শরীরে অগণিত ফোঁড়া এবং ফুস্কুড়ি দেখতে পেলেন। সেগুলি থেকে পুঁজের ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছিল। পাদ্রী তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসলেন এবং তাকে যাবুরের কয়েকটি আয়াত পড়তে দিলেন এবং প্রায় দু'মাস পর তার শরীরে ফুস্কুরি ও ফোঁড়া একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল।

ঐশী শব্দসমূহ এবং আল্লাহ তা'আলার নামসমূহে রয়েছে অপূর্ব শক্তি, নিয়মিত এগুলির যিকির করলে আমাদের সকল পেরেশানী ও রোগ-ব্যাধি দূর হয়ে যায়। এ হিসেবে মুসলমানদের ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হয়। কারণ, তাদের নিকট রয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিরান্নব্বইটি সিফাতী বা গুণবাচক

নাম। যেমন : রাহীম (দয়ালু), কারীম (সখানী), গাফুর (ক্ষমাকারী), খাবীর (সর্বজ্ঞ) ইত্যাদি। সকল নাম ধরে প্রয়োজন মাফিক তাকে ডাকা যায়। কিন্তু এ বিরাট সুযোগটি অন্যান্য ধর্মে নেই। খ্রিষ্টানদের নিকট রয়েছে শুধু "গড্" শব্দ। আর হিন্দুদের রয়েছে "ওম" অথবা "রাম"।

শব্দের এ শক্তি মূলত অক্ষরের ভিতর সুপ্ত থাকে। কিন্তু শব্দটির অনুবাদ করে তা জপ করা হলে সে গুণটি আর অবশিষ্ট থাকে না। তার প্রভাবও বিনষ্ট হয়ে যায়। "ইয়া রাহমানু" এর ভিতর যে শক্তি রয়েছে, "হে দয়াময়" এর ভিতরে তা নেই। কেননা শক্তির যে সকল ভাণ্ডার ইলাহী শব্দাবলি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনাকৃত দু'আসমূহে রয়েছে, তা আমাদের শব্দসমূহে থাকতে পারে না।

প্রতিটি শব্দই একটি ইউনিট বা এটম। যা মানুষের আত্মিক আবেগের বিদ্যুৎ দ্বারা তরঙ্গায়িত হয় এবং তার প্রভাব নিখিল জগৎ ও পরজগৎ উভয় স্থানেই প্রতিফলিত হয়। তার একটি সামান্য উদাহরণ হল 'গালি'। গালি কোন তরবারি বা তোপ-কামানের নাম নয় বরং কয়েকটি অক্ষর বা শব্দের সমষ্টি মাত্র, কিন্তু তা মুখ থেকে বের হতেই সম্বোধিত ব্যক্তির গায়ে আগুন ধরে যায়। এ অগ্নি কোত্থেকে আসে? শব্দের এ সমষ্টি হতেই।

এর আরেকটি উদাহরণ হল, কোনো দুঃখী ব্যক্তির মুখের চিৎকার, পুরো পরিবেশকে অস্থির করে তোলে। একটি জ্বালাময়ী ভাষণ, যা কোনো জেনারেল তার নিষ্প্রাণ সৈন্যদের সম্মুখে প্রদান করেন, তা প্রতিটি সিপাহীর ভিতর তুমুল যুদ্ধের দাবনল প্রজ্জ্বলিত করে দেয়। মৃত্যুর বিভৎসতা যাকে নিভাতে পারে না।

বাইবেলে রয়েছে,

By the word of the lord were the heavens made.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলরা একটি শব্দ দ্বারাই আকাশ সৃষ্টি হয়েছে।

বাইবেলে সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, "প্রথমে আল্লাহ তা'আলা জমিন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন। তখন জমিন ছিল বিরাণভূমি। আর সমুদ্র ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং আল্লাহ তা'আলার তখ্‌ত ছিল পানিতে ভাসমান

তারপর– God said let "there be light", and there was light.

আল্লাহ তা'আলা বললেন, আলোকিত হয়ে যাও! তারপর সঙ্গে সঙ্গে তা আলোকিত হয়ে গেল। (পয়দা ১ : ৩)

মোটকথা, এটাই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার সেই শব্দ, যার দ্বারা কোটি কোটি চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং পৃথিবীর প্রতিটি স্থান আলোতে ঝলমল করে উঠেছে।

## ব্যভিচার সকল রোগের মূল

✪ হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, চক্ষুর যেনা হল (কামভাব নিয়ে) দৃষ্টিপাত করা, কর্ণদ্বয়ের যেনা হল (কামভাব) নিয়ে কথা শ্রবণ করা, মুখের যেনা হল (কামভাব নিয়ে) কথা বলা, হাতের যেনা হল (কামভাব নিয়ে) কাউকে স্পর্শ করা, পায়ের যেনা হল (কামভাব নিয়ে) সে ইচ্ছাও লালসায় পথ চলা। (পরিশেষে যেনা হয়েই যায়, যা অবৈধ বা হারাম।) মুসলিম

ইসলাম একটি স্বভাবজাত ধর্ম। ইসলামের অনুসারী অর্থাৎ মুসলমান গণ ইসলামের আদর্শে স্থিতিশীল থাকলে সর্বদা প্রশান্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করে। আর যখন এ মুসলমানরাই কাফির ও ইহুদি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের সীমানা লঙ্ঘন করে অগ্রসর হতে থাকে, তখনি অধঃপতন ও গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকে।

বিয়ে-শাদী করা, বিশেষত প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর বিবাহ করা মানবীয় আবেগ ও রিপুর পূর্ণতা দানের শামিল। কিন্তু কেউ যদি এ বিয়ে-শাদী করতে অক্ষম হয়, ইসলাম তখন দৃষ্টিকে সংযত রাখা, প্রবৃত্তি দমনে রোযা রাখা এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করার নির্দেশ দিয়েছে। উদ্দেশ্য হল মানুষ যাতে যেনা হতে নিজেকে রক্ষা করে। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ভালোভাবেই জানে যে, যখন সে সৃষ্টিগত নীতিমালা থেকে দূরে সরে যাবে, তখন সে মসিবত ও বিপদাপদের শিকার হবে। রোগ-ব্যাধি, পেরেশানী এবং সামাজিক লাঞ্ছনাই হবে তার নিয়তি।

ইউরোপিয়ান একজন প্রসিদ্ধ সামাজিক নেতা পাভেল স্টিফেন খুব সুন্দর কথা বলেছেন, "ইউরোপ শুধু যেনা (ব্যভিচার) থেকে বেঁচে গেলে আমি তার সকল সমস্যা সমাধান করে দেব।" মুসলমান একটি শান্তিপূর্ণ জাতির নাম। বর্তমানে তারা কেন অশান্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে? এর একমাত্র কারণ তারা ইসলামি রীতিনীতিকে উপহাসের বস্তু মনে করেছে এবং স্বভাবজাত চালচলনকে হীন মনে করে ছুঁড়ে ফেলেছে। তারপর হল

কি? ইসলামও তাকে অপমানিত করেছে, ছুঁড়ে ফেলেছে। তারপর সে আর কোনো কাজেরই থাকল না। মুসলমানগণ যে সকল কওমকে নিজেদের মুর্শিদ এবং পথপ্রদর্শক মনে করেছে, তারা যখন নিজস্ব চাল-চলনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তখন তাদের অবস্থা কি হয়েছে? তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে নিজেদের সংশোধন করা দরকার।

## ইউরোপে যেনার ধ্বংসাত্মক পরিণাম

ইসলামের দুশমন ইউরোপ এখন অস্থির, পেরেশান ও উম্মাদ হয়ে গেছে। তাদের জীবনে আজ এ কি হল? কিভাবে হল? আর তারপরই বা কি হবে? ইত্যাদি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। নিম্নে তাদের বড় বড় ব্যক্তিবর্গের কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল।

## আমেরিকা

জজ বেন লিন্ডসে (Ben lindsey) যিনি ডেনভার (Denver) এর আদালতে শিশু অপরাধের (Juveline Court) এর প্রধান বিচপরপতি হওয়ার সুবাদে উঠতি বয়সের যুবকদের চারিত্রিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন। তিনি স্বরচিত (Revolt of Modern Youth) এ লিখেন, আমেরিকায় শিশুরা নির্ধারিত বয়সের পূর্বেই সাবালক (প্রাপ্ত বয়স্ক) হয়ে যায় এবং খুব অল্প বয়সেই তাদের ভিতর যৌন অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায়। তিনি পরীক্ষা হিসেবে ৩১২ জন মেয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে জানতে পারলেন যে, তাদের ২৫৫ জন মেয়েই ১১ থেকে ১৩ বৎসর বয়সেই পরিণত বয়সে পদার্পণ করেছে এবং তাদের ভিতর শারীরিক চাহিদার এরূপ নিদর্শন পাওয়া গেছে, যা একজন ১৮ বছর বয়স্ক বা তদুর্ধ্ব বয়সের রমণীর ভিতর থাকা উচিত।

ডা. এডিশ হুকার (Edith Hooker) স্বরচিত Law of Sex এ (৩২৮ পৃষ্ঠায়) লিখেন, "সভ্য ধনী পরিবারেও এটা কোনো অসাধারণ ব্যাপার নয় যে, ৭/৮ বৎসরের মেয়েরা তাদের সমবয়সীদের সাথে প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক রাখবে এবং কখনো কখনো তাদের সঙ্গে দৈহিক মিলনেও লিপ্ত হবে।" তিনি আরও লিখেন, খুবই ভদ্র পরিবারের ৭ বৎসরের একটি ছোট্ট মেয়ে তার বড় ভাই ও কয়েকজন ছেলে বন্ধুর সঙ্গে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। তদ্রূপ আরেকটি ঘটনায় পাঁচটি বাচ্চার একটি দল, যাদের দুজন ছিল মেয়ে

ও তিনজন ছিল ছেলে এবং তাদের আবাসগৃহও ছিল খুব কাছাকাছি। তারা এরূপ যৌনাচারে লিপ্ত ছিল। তারা তাদের সমবয়সী অন্যান্য বাচ্চাদেরকেও যৌনাচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করত। কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাচ্চাটির বয়স ছিল মাত্র দশ বৎসর। এরূপ আরেকটি ঘটনা ৯ বৎসরের একটি মেয়ের জীবনে ঘটে, যাকে সাবধানতার সাথে লালন-পালন করা হত। সে মেয়েটি গর্ব করে বলত, কয়েকজন ছেলে বন্ধু তার প্রেমের ভিখারী।

হল্টিমোর (Haltimor) এর একজন ডাক্তার রিপোর্ট দিয়েছেন, এক বছরে এক হাজারেরও বেশি এরূপ মামলা দায়ের করা হয়েছে, যেগুলোতে ১২ বছরের কম বয়সী মেয়েদের সঙ্গে যৌনাচারের অভিযোগ রয়েছে।

(ল' অফ সেক্স : ১৭৭)

এটিই হল কামোদ্দীপক পরিবেশের সর্বপ্রথম কুফল। আমেরিকার একজন সাহিত্যিক লিখেন, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই চরম স্বভাব চরিত্রহীন জীবনযাপন করছে। ফলে ছেলে-মেয়েরা ১০/১৫ বৎসর বয়সেই প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ে। এর পরিণতি খুবই মারাত্মক। এরূপ অসময়ে যৌনাচারের ফলে অনেক মারাত্মক কুফল দেখা দেয় এবং দিচ্ছে। তার সর্বনিম্ন কুফল হল, উঠতি বয়সের মেয়েরা তাদের ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে উধাও হয়ে যায় অথবা অল্প বয়সেই বিয়ে-শাদী করে ফেলে। আর যদি প্রেম-ভালবাসায় ব্যর্থ হয়, তা হলে আত্মহত্যা করে বসে।

## শিক্ষা জীবন

এমনিভাবে যে সকল বাচ্চাদের মধ্যে অসময়েই উত্তেজনা জাগ্রত হয়, তাদের জন্য প্রথম অনুশীলনকেন্দ্র হল স্কুলসমূহ। স্কুল দু'ধরনের। এক ধরনের স্কুলে শুধু ছেলে অথবা শুধু মেয়েরা পড়ে। দ্বিতীয় প্রকার স্কুলগুলোতে রয়েছে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা। প্রথম প্রকার স্কুলে সমকামিতা (Homosexuality) এবং স্বমেহন (Masturbation) এর মতো মারাত্মক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। কেননা যে উত্তেজনাকে শৈশবেই প্রজ্জ্বলিত করে দেওয়া হয়েছে এবং উত্তেজিত করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে রাখা হয়েছে, সেখানে ওই উত্তেজনা প্রশমিত করার যে কোনো উপায় সে খুঁজে নেবেই।

ডাক্তার হোকর লিখেন, এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কলেজে ও নার্স ট্রেনিং স্কুলে এরূপ ঘটনা ঘটতেই থাকে। সেগুলির মধ্যে একই লিঙ্গের দুজনকে যৌনাচারে লিপ্ত হতে দেখা যায়। ফলে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি

তাদের আকর্ষণ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে তিনি এরূপ অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং এর ফলে মেয়েরা ভয়াবহ পরিণামের শিকার হয়েছে। আরও বিভিন্ন বই পড়লে অনুমান করা যায় যে, এ সমকামিতার দুরারোগ্য ব্যাধি সমাজে কি পরিমাণ ছড়িয়ে পড়েছে।

ডা. লোরী (Dr. Lowry) তার রচিত "herself" বইয়ে (১৭৯) লিখেন, একবার এক স্কুলের হেডমাস্টার ৪০ টি পরিবারকে গোপনে জানিয়ে দিয়েছে, তাদের ছেলেদেরকে এখন স্কুলে রাখা যাবে না। কারণ, তাদের চরিত্রহীনতার পরিস্থিতি খুব ভয়াবহ।

এখন দ্বিতীয় প্রকারের স্কুলসমূহের আলোচনায় আসুন, যেগুলিতে সহশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এ ধরনের স্কুলগুলোতে যেমনি উত্তেজনা সৃষ্টির উপকরণ রয়েছে, আবার তা প্রশমিত করার উপকরণও বিদ্যমান আছে। শৈশবে যে উত্তেজনার সূচনা ছিল, এখানে পৌঁছে তা পূর্ণতা পেয়েছে। এসব স্কুল-কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে থাকে কুরুচিপূর্ণ পত্র-পত্রিকা, উপন্যাস, অশ্লীল ছবির বই, যৌন বিজ্ঞানের বিভিন্ন অশ্লীল বই এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী। এগুলি যৌবনের প্রারম্ভেই স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রসিদ্ধ আমেরিকান লেখক হ্যান্ড্রিচ ভনলুন (Handrich Von Loain) বলেন : আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোতে সে সকল অশ্লীল পত্র-পত্রিকাগুলির চাহিদা অনেক বেশি, যেগুলিকে অশ্লীলতা আর নোংরামীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সমাহার বলা যেতে পারে। যা কোনো যুগেই এরূপ খোলাখুলিভাবে সর্বসাধরণের সামনে আসার সুযোগ পায় নি। এ সকল পত্র-পত্রিকার বিষয়গুলি যুবক-যুবতীরা নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে আলোচনা করে। তারপর বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য তারা অগ্রসর হয় এবং যুবক-যুবতীরা মিলে Petting Parties এর জন্য বের হয়। সেখানে তারা নির্বিঘ্নে মদপান, ধুমপান, নাচ-গান ও আনন্দ-আহলাদে মত্ত থাকে।

ডা. লিন্ডসের ধারণা মতে হাইস্কুলের কমপক্ষে ৪৫% মেয়ে হাইস্কুল ছাড়ার পূর্বেই পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী শিক্ষাস্তরগুলোতে এ হার আরও অনেক বেশি হয়। তিনি লিখেন, হাই স্কুলের ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় যৌন উত্তেজনার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। সাধারণত মেয়েরাই বিভিন্ন কলাকৌশলে অগ্রসর হয় আর ছেলেরা তাদের ইশারায় নাচে।

## তিনটি মারাত্মক উত্তেজনা সৃষ্টিকারক জিনিস

স্কুল কলেজগুলোতে যদি কিছুটা হলেও নিয়ম-কানুন থাকে, যা স্বাধীন ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু একটি যুবক যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অপ্রতিরোধ্য উত্তেজনা, বিকৃত মন-মেজাজ ও কু-অভ্যাস নিয়ে উন্মুক্ত জীবনে পদার্পণ করে, তখন তার কার্যকলাপ সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তখন তার যৌবনের অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করার জন্য অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত থাকে এবং তার উন্মুক্ত পাশবিকতাকে শান্ত করার জন্য সকল প্রকারের উপকরণ জুটিয়ে নেওয়া ইচ্ছার ব্যাপার মাত্র।

একটি আমেরিকান বইতে চরিত্রহীনতা অসাধারণভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণসমূহ তুলে ধরে লিখা হয়েছে, তিনটি শয়তানী শক্তির ত্রিমুখী আক্রমণ আমাদের সমাজকে অধঃপতনের গহ্বরে পৌছে দিয়েছে এবং এ তিনটি শক্তি একটি জাহান্নাম তৈরির কাজে লিপ্ত রয়েছে।

(১) অশ্লীল পত্র-পত্রিকার অধিক প্রকাশনা।

(২) অশ্লীল চলচ্চিত্র, যা শুধু অবৈধ প্রেমের আকর্ষণকেই বাড়ায় না বরং তার বাস্তব জ্ঞানও দান করে।

(৩) নারীদের অধঃপতিত চারিত্রিক অবস্থা, যা তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, উলঙ্গপনা, ধূমপান এবং পুরুষদের সঙ্গে অনভিপ্রেত মেলামেশার দ্বারা প্রকাশ পায়। এ তিনটি জিনিস আমাদের সমাজে মারাত্মক হারে বেড়ে চলেছে। যার কুফলে আজ 'মসীহী সভ্যতা' ও সংস্কৃতি বিদায় হতে হতে অবশেষে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যদি এগুলোকে প্রতিরোধ না করা হয়, তবে আমাদের ইতিহাসও রোম এবং অন্যান্য জাতির মতো হয়ে যাবে, যাদেরকে প্রবৃত্তি পূঁজা, পাশবিকতা, মদ্যপান, নারীভোগ এবং নাচ গানের কারণে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

এ তিনটি কারণ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজের সকল স্তরে পৌছে গেছে। যার শরীরে বিন্দুমাত্র রক্ত আছে, এরূপ প্রতিটি নারী-পুরুষের মাঝে সার্বক্ষণিক যৌন অস্থিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। আর অশ্লীলতার সয়লাবে অস্থিরতাই অনিবার্য ফল।

## অশ্লীলতার সয়লাব

আমেরিকায় যে সমস্ত মহিলারা দেহব্যবসাকে তাদের মূল পেশা বানিয়ে নিয়েছে, তাদের সংখ্যাও আনুমানিক চার থেকে পাঁচ লক্ষ হবে। কিন্তু তাই

বলে আমেরিকার দেহব্যবসাকে হিন্দুস্তানের দেহব্যবসার উপর অনুমান করা যাবে না। কারণ, আমেরিকানদের ব্যবসা বংশানুক্রমিক ব্যবসা নয় বরং একজন মহিলা যে হয়তো গতকাল পর্যন্তও ভালো পেশায় জড়িত ছিল, তারপর খারাপ সংশ্রবের ফলে চরিত্রহীনা হয়ে পড়েছে এবং পতিতালয়ে এসে ঢুকেছে। কয়েক বৎসর পতিতালয়ে কাটাবে, তারপর এ কাজ ছেড়ে কোনো অফিস অথবা কারখানায় কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হয়ে যাবে। বিভিন্ন তদন্ত রিপোর্টে জানা যায়, আমেরিকার ৫০ শতাংশ বেশ্যা গৃহ পরিচারিকার (Domestic servant) কাজ ছেড়ে বেশ্যাবৃত্তিতে যোগ দেয় এবং অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ হাসপাতাল, অফিস এবং দোকানের চাকরি ছেড়ে আসে। সাধারণত ১৫ থেকে ২০ বৎসর বয়সে তাদের এ ঘৃণ্য পেশা শুরু হয় এবং ২৫ থেকে ৩০ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়ার পর দেহব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো সম্ভ্রান্ত পেশায় যোগ দেয়। এ থেকেই অনুমান করা যায়, আমেরিকায় চার পাঁচ লক্ষ বেশ্যার উপস্থিতির কারণ কি?

পূর্বেও বলা হয়েছে, পশ্চিমা দেশগুলোতে দেহব্যবসার একটি সুসংহত আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক রয়েছে। আমেরিকায় নিউইয়র্ক এবং বুয়েন্স আয়ারস এ ব্যবসার সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। নিউইয়র্কের সবচেয়ে বড় দুটি দেহব্যবসা কেন্দ্রের প্রত্যেকটির এক একটি করে পরিচালনা পরিষদ আছে, যার সভাপতি ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়। প্রত্যেকের আলাদাভাবে আইনবিদ নিযুক্ত করা আছে। যেন কোনো মামলায় ফেঁসে গেলে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে।

যুবতীদের লোভ দেখিয়ে এবং তাদেরকে অপহরণ করে আনার জন্য হাজারো দালাল নিযুক্ত রয়েছে, যারা প্রতিটি স্থানে এদের তালাশে ঘুরতে থাকে। এ শিকারীদের শক্তিশালী নেটওয়ার্কের ক্ষমতার অনুমান এ রিপোর্ট থেকেও করা যেতে পারে যে, শিকাগোতে আগমনকারী অভিবেশন সমিতির সভাপতি একবার ১৫ মাসের একটি রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন। তাতে উল্লেখ ছিল ১৫ মাস সময়ের ভিতর লীগের অফিসে ৭,২০০ মেয়ের চিঠি এসে পৌঁছেছে। চিঠিগুলোতে লেখা ছিল, তারা শিকাগোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ১,৭০০ মেয়েই তার গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যদের কোনো সন্ধান মিলে নি, তারা কোথায়

গিয়েছে।

পতিতালয় ছাড়াও অভিসার কক্ষ Assignation Houses ও Call Houses রয়েছে। (যেগুলিকে শুধু ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবক-যুবতীদের অভিসার পূরণের জন্যেই সুসজ্জিত রাখা হয়।) এগুলোর খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে, এক শহরে এরূপ ৭৮ টি বাড়ি আছে এবং আরেকটি শহরে ৪৩টি, অন্য এক শহরে ৩৩টি বাড়ি রয়েছে। এ বাড়িগুলোতে শুধু অবিবাহিতা নারীরাই যেত না বরং বিবাহিতা নারীরাও যাতায়াত করত। একজন প্রসিদ্ধ রিপোর্টার লিখেন,

নিউইয়র্কের বিবাহিত জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের অবস্থা এরূপ, যারা তার চরিত্র ও শারীরিক দিক থেকে পারিবারিক জীবনের দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে বিশ্বস্ত নয় এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা এর থেকে খুব একটা ভিন্ন নয়।

আমেরিকায় Committee of Fourteen নামে চরিত্র সংশোধনকারী একটি গ্রুপ আছে। এ গ্রুপের পক্ষ থেকে চরিত্রহীনতার মূল কারণ অনুসন্ধান, দেশের চারিত্রিক পরিস্থিতির খোঁজ-খবর নেওয়া ও চরিত্র সংশোধনের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের কাজ খুবই দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে করা হয়ে থাকে। তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, আমেরিকায় যত নৃত্য প্রতিষ্ঠান, নাইট ক্লাব, রূপচর্চা প্রতিষ্ঠান (Beanuty Salloons), ম্যাসেজ রুম (Massage Rooms) এবং কেশ পরিচর্যার দোকান (Hair Dressings) রয়েছে, সবগুলোই এখন পতিতালয়ের মতো হয়ে গেছে বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ, ওই সব স্থানে অবর্ণনীয় অনেক ঘৃণ্য কাজও হয়ে থাকে।

## ঘৃণ্য রোগ-ব্যাধি

অধিক পরিমাণ অশ্লীলতার অপরিহার্য ফলাফল হল ঘৃণ্য রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়া। অনুমান করা হয় যে, আমেরিকার প্রায় ৯০ শতাংশ বসতিই ঘৃণ্য রোগসমূহে প্রভাবিত। এনসাইক্লোপেডিয়া বিট্রানিকা (৩৩/৪৫পৃঃ) থেকে জানা যায়, সেখানকার সরকারী হাসপাতালসমূহে প্রতি বছর দুই লক্ষ মেহ-প্রমেহ রোগীর এবং এক লক্ষ ষাট হাজার গণোরিয়া, সিফিলিস রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং ৬৫ টি হাসপাতালে শুধু এ

রোগগুলিরই চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির চেয়ে প্রাইভেট ডাক্তারদের নিকট এসব রোগীরা বেশি ভিড় জমায়। তাদের নিকট ৬১ শতাংশই আসে মেহ-প্রমেহ রোগী এবং ৮৯ শতাংশ গণোরিয়া বা সিফিলিস রোগী।

বছরে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাজার শিশু বংশানুক্রমিক মেহ প্রমেহ রোগে মারা যায়। ক্ষয়জ্বর ব্যতীত অন্যান্য রোগের কারণে যে পরিমাণ মৃত্যু ঘটে, তন্মধ্যে বেশির ভাগ মৃত্যুর কারণই মেহ-প্রমেহ। সিফিলিস স্পেশালিস্টদের ধারণা মতে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ যুবকই এ রোগে আক্রান্ত। যাদের মধ্যে বিবাহিত-অবিবাহিত সকলেই শামিল। স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞদের বর্ণনা মতে নারীদের যে পরিমাণ যৌনাঙ্গ অপারেশন হয়, তার মধ্যে ৭৫ শতাংশ রোগীর মধ্যেই গণোরিয়া, সিফিলিসের চিহ্ন পাওয়া যায়।

## তালাক ও বিচ্ছেদ

এরূপ পরিস্থিতিতে পারিবারিক শৃঙ্খলা ও বৈবাহিক জীবনের পবিত্র সম্পর্ক কিভাবে টিকে থাকতে পারে? স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জনকারী সে সকল নারীরা বিবাহকে নিষ্প্রয়োজন মনে করে। তারা নিজেদের মানবীয় চাহিদা ছাড়া জীবনের কোনো স্তরেই পুরুষদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না এবং বিবাহ-শাদী ছাড়া সহজেই পুরুষ পাওয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞান এবং জড়-জগতের পূঁজার তাদের অন্তর থেকে এ অনুভূতিও দূর করে দিয়েছে যে, বিবাহ-শাদী ব্যতীত কোনো পুরুষের সহিত দৈহিক সম্পর্ক রাখা একটি জঘন্য অপরাধ। এ ঘৃণ্য পরিবেশের কারণে আজকের নিষ্প্রাণ সমাজ এরূপ মহিলাকে ঘৃণা বা তিরস্কারের পাত্র বলেও মনে করে না।

জজ লিণ্ডসে আমেরিকার সাধারণ মেয়েদের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে লিখেন: "আমি বিবাহ কেন করব? গত দুই বছরে আমার সাথীদের মধ্যে যারা বিয়ে করেছে, তাদের প্রতি দশ জনের মধ্যে পাঁচ জনেরই বিয়ের পর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আমি মনে করি, এ যুগের প্রতিটি মেয়ের ভালবাসার ক্ষেত্রে মুক্তভাবে যে কোনো কাজ করার মানবিক অধিকার রয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমাদের অনেক কৌশল জানা আছে। সুতরাং এর দ্বারা আকস্মিক কোনো হারামী বাচ্চা জন্ম নেওয়ার ভয় থেকেও রক্ষা পাওয়া

পাল্টে দেওয়া দরকার।" এ ধ্যান-ধারণার নির্লজ্জ নারীদেরকে বিয়ের ব্যাপারে কোনো জিনিস যদি উদ্বুদ্ধ করে, তবে তা হল ভালবাসার তাগিদ। কিন্তু এ ভালবাসাও হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে না বরং এটি একটি সাময়িক আকর্ষণ হয় মাত্র। তার জৈবিক চাহিদা মিটে যাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসার লেশ মাত্র বাকি থাকে না। মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণার সামান্যতম অমিল তাদের মাঝে ঘৃণা ও দূরত্বের সৃষ্টি করে দেয়। অবশেষে কোর্টে গিয়ে তালাক অথবা বিচ্ছেদের মামলা দায়ের হয়ে যায়।

লিণ্ডসে লিখেন, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে ডেনভারের প্রতিটি বিয়ের সঙ্গে একটি করে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে এবং প্রতি দুটি বিয়ের একটিতে তালাকের মামলা দায়ের হয়েছে। এ পরিস্থিতি শুধু ডেনভারেই নয় বরং আমেরিকার সবগুলো শহরের অবস্থা প্রায় এরকমই। তারপর তিনি লিখেন, তালাক এবং বিচ্ছেদের ঘটনা বেড়েই চলেছে। যদি এ অবস্থা চলতে থাকে, যেমন আশঙ্কাও করা হচ্ছে, তাহলে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই যতগুলি বিয়ের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, ততগুলি তালাকের মামলা দায়ের হবে।

অধিক হারে তালাক এবং বিচ্ছেদ প্রতিরোধের চিকিৎসা হিসেবে (Compassinate Marriage) পরীক্ষামূলক বিয়ের প্রথা চালু করা হয়েছে। কিন্তু এ চিকিৎসা মূল রোগের চেয়েও মারাত্মক এবং ঘৃণ্য। পরীক্ষামূলক বিবাহের অর্থ হল, নারী-পুরুষ পুরাতন সিস্টেমে বিয়ে না করে কিছু দিন পরস্পর ঘর বেঁধে থাকবে। যদি এ ঘর বাঁধায় পরস্পরের মনের মিল হয়ে যায়, তা হলে বিবাহ করবে। অন্যথায় দুজন আলাদা হয়ে আবার ভাগ্য পরীক্ষায় নেমে পড়বে। এ পরীক্ষামূলক বিয়ে অবস্থায় সন্তান জন্ম দেওয়া থেকে উভয়কেই বেঁচে থাকতে হবে। অন্যথায় সন্তানের জন্ম হয়ে গেলে অবশ্যই তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। বস্তুত এ পদ্ধতি এবং রাশিয়ার Free Love বা মুক্ত ভালবাসা একই জিনিস।

## জাতীয় আত্মহত্যা

প্রবৃত্তি পূজা, বৈবাহিক জীবনের দায়িত্বসমূহের প্রতি ঘৃণা, পারিবারিক জীবনের প্রতি অনাগ্রহ, বৈবাহিক জীবনে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা নারীদের খোদাপ্রদত্ত মাতৃত্বের আবেগকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। যা নারীসুলভ আবেগের মাঝে সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রূহানী আবেগ, যার

অস্তিত্বের উপর শুধু সভ্যতা-সংস্কৃতিই নয় বরং মানবজাতির অস্তিত্বও নির্ভর করে। জন্ম নিরোধ, গর্ভপাত, সন্তান হত্যার মতো জঘন্য অপরাধের জন্ম হয়েছে মা হওয়ার আবেগের মৃত্যু থেকেই। জন্ম নিরোধ জ্ঞান সকল প্রকার আইনের গণ্ডির ভিতর থাকা সত্ত্বেও আমেরিকায় প্রতিটি যুবক-যুবতী তা সংগ্রহ করতে পারে। জন্মনিরোধক ঔষধপত্রাদি স্বাধীনভাবে দোকানে ক্রয়-বিক্রয় হয়। সাধারণ মহিলাদের কথা বাদই দিলাম। স্কুল-কলেজের মেয়েরাও এসব ব্যবস্থা সর্বদা নিজেদের সাথে রাখে। যেন কোনো ছেলে বন্ধু জন্ম নিরোধক আনতে ভুলে গেলেও একটি সুন্দর সন্ধ্যা বিনষ্ট না হয়ে যায়। জজ লিণ্ডসে লিখেন,

হাই স্কুলের ৪৯৫ জন অল্প বয়সী তরুণী আমার কাছে এসে স্বীকার করেছে, তারা ছেলেদের সঙ্গে মিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। তাদের মধ্যে মাত্র ১২৫ জন এর গর্ভসঞ্চার হয়ে গিয়ে ছিল। অবশিষ্টদের মধ্যে কেউ কেউ ঘটনাচক্রে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু অধিকাংশেরই জন্মনিরোধের কার্যকরী পন্থার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। এ জ্ঞান তাদের জন্য এত সাধরণ হয়ে গিয়েছে যে, মানুষ তার অনুমানও করতে পারে না।

কুমারী মেয়েরা এ সকল পদ্ধতি এজন্য ব্যবহার করে, যাতে তাদের স্বাধীনতায় কোনো প্রভাব না পড়ে। বিবাহিতা মেয়েরা এজন্য নিরোধ ব্যবহার করে, যেন সন্তান হলে তার লালন-পালন, লেখাপড়া শিখানোর ঝামেলা এবং স্বামীকে তালাক দেওয়ার স্বাধীনতায় বাঁধা এসে পড়ে। নারীদের মাতৃত্বের প্রতি অনীহার কারণ হল, বৈবাহিক জীবনের পূর্ণ স্বাদ অনুভব করতে হলে এ সকল ঝুট-ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে হবে। তাছাড়া তাদের মতে বাচ্চা হলে সৌন্দর্যে ভাটা পড়ে যাবে।

মোটকথা, কারণ যাই হোক ৯৫ শতাংশ নারী-পুরুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্কের ফলাফলকে প্রতিরোধ করে থাকে। অবশিষ্ট ৫ শতাংশের যদিও ঘটনাচক্রে গর্ভসঞ্চার হয়, তাদের জন্যও রয়েছে গর্ভপাত এবং শিশু হত্যার পদ্ধতি। তাছাড়া হাজারো সন্তানকে জন্মের সাথে সাথেই হত্যা করে ফেলা হয়। (পৃঃ ২২০)

## ইংল্যাণ্ডের অবস্থা

আমি এ দুঃখজনক অবস্থার বর্ণনাকে আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না।

ইতিহাস A History of Prostitution বইয়ের কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ না করে শেষ করাটা ভাল মনে করি না। উক্ত বইয়ের লেখক একজন ইংরেজ। তিনি তাঁর দেশেরই অবস্থা তুলে ধরে লিখেছেন:

যে সকল মহিলাদের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় হল দেহ-ব্যবসা করে পয়সা উপার্জন করা, তারা ছাড়াও এমন মহিলাদেরও বিরাট একটি সংখ্যা আছে (যাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে), যারা অন্য উপায়েও পয়সা উপার্জন করতে পারে কিন্তু তবুও উপার্জনের অতিরিক্ত পন্থা হিসেবে দেহ বিক্রি করে বেড়ায়। এরা পেশাদার বেশ্যাদের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। আমরা এদেরকে হয়তো পেশাদার বেশ্যা বলব না, তবে অপেশাদার বেশ্যা (Ametear Prostanutes) অবশ্যই বলা যেতে পারে।

বর্তমানে এরূপ অপেশাদার দেহ ব্যবসায়ীদের সংখ্যা যেরূপ বাড়ছে, এরূপ কখনো দেখা যায় নি। সমাজের নিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে এরূপ বহু নারী দেখা যায়। যদি এ সকল ভদ্র মহিলাদেরকে কোথাও ইশারা ইঙ্গিতেও বেশ্যা বা দেহপসারিণী বলা যায়, তখন ক্রোধে তাদের শরীর থেকে আগুন ঠিকরে পড়ে। কিন্তু তাদের এ ক্রোধের কারণে বাস্তবতা পরিবর্তিত হতে পারে না।

বাস্তবে এদের মধ্যে আর পতিতালয়ের বেশ্যার মধ্যে চারিত্রিক দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। বর্তমানে যুবতী নারীদের নির্ভীক চালচলন, বল্গাহীন বেহায়াপনা এবং বাজারী চাল-চলন তাদের ফ্যাশন হয়ে গিয়েছে। সিগারেট পান করা, পঁচা মদ সেবন, যৌন বিজ্ঞান ও জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নিজ জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো, অশ্লীল পত্র-পত্রিকার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ইত্যাদি সব কিছু তাদের বিনোদন বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরূপ মেয়েদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এরা বিয়ের পূর্বেই দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয়। আর এরূপ মেয়ে আজ কোথাও নাই বললেই চলে, যারা গীর্জার সম্মুখে বিয়ের অঙ্গীকার পূর্ণ করার সময় বাস্তবিকই কুমারী থাকে।"

তারপর এ লেখক সে সকল কারণ বিশ্লেষণ করেন, যেসব কারণে বর্তমান সমাজ এ করুণ পরিস্থিতির আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিশ্লেষণটি উক্ত লেখকের ভাষায়ই উল্লেখ করা ভালো মনে করি।

প্রথমে তাদের শৌখিনতা ও আরাম আয়েশের কথা ধরুন। এর ফলে প্রতিটি মেয়ের মধ্যে ফ্যাশনের মূল্যমান, পোশাকাদি এবং রূপচর্চার নানা ধরনের সামগ্রীর প্রতি লোভ সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। এটি হল লাগামহীন বেহায়াপনার একটি বিরাট কারণ। প্রতিটি দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই দেখেন, তার সামনে দিয়ে প্রতিদিন শত শত মেয়ে যাতায়াত করে। যাদের প্রায়ই এরূপ মূল্যবান কাপড় পরিধান করে, যা তাদের বৈধ আয়-উপার্জনে কখনো যোগানো সম্ভব নয়।

সুতরাং আজও এরূপ বলা যায়, যেরূপ অর্ধশত বছর পূর্বে বলা যেত অর্থাৎ তাদের জন্য কাপড় ক্রয় করে পুরুষরাই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, পূর্বে যে সকল পুরুষগণ তাদের জন্য কাপড় ক্রয় করতেন, তারা ছিলেন তাদের স্বামী, পিতা অথবা ভাই। আর বর্তমানে তাদের স্থলে অন্যরা ক্রয় করে দেয়। এ নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পিছনে নারী স্বাধীনতারও বিরাট একটি প্রভাব রয়েছে। গত কয়েক বছরে মেয়েদের প্রতি মা-বাবার খোঁজ খবর নেওয়া দারুণ কমে গেছে। বিগত ৩০/৪০ বছর পূর্বে ছেলেদেরও এত স্বাধীনতা ছিল না।

সমাজে বেহায়াপনা এরূপ বিস্তৃতি লাভ করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, নারীরা দিন দিন প্রচুর পরিমাণে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে, অফিসে কল-কারখানাসহ বিভিন্ন পেশায় নির্বিঘ্নে যোগ দিচ্ছে। যেখানে নিবারাত্র তারা পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা ও উঠাবসার সুযোগ পায়। এ নারী পুরুষের চারিত্রিক অবকাঠামোকে অনেক নিচে নামিয়ে দিয়েছে এবং উভয় শ্রেণীর পাশবিক সম্পর্ককে সকল চারিত্রিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। বর্তমানে যুবতীদের বিয়ে করে পবিত্র জীবন যাপনের ধারণাও মাথায় আসে না। আগে বখাটেরা মুক্তভাবে ফূর্তি করে সময় কাটানোর সুযোগ সন্ধানে থাকত আর আজ সমাজের প্রতিটি নারীই এ সুযোগ খুঁজে বেড়ায়।

বর্তমানে কুমারীত্বকে একটি অতি প্রাচীন জিনিস মনে করা হয়। আধুনিক যুগের মেয়েরা একে একটি বিপদ মনে করে। তাদের মতে প্রাণ খুলে আনন্দ-ফূর্তি ও প্রবৃত্তি পূঁজা করতে পারলেই জীবন-যৌবন সার্থক হয়। এরই অনুসন্ধানে তারা নাচের আসরে, নাইট ক্লাবে, আড্ডাখানায় এবং আবাসিক এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। এজন্যই তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষের সাথে মোটর ভ্রমণে বের হতেও দ্বিধা করে না। অন্য কথায় তারা

জেনেশুনেই নিজেকে স্বেচ্ছায় এমন পরিবেশে নিয়ে যায়, যেখানে তাদের জৈবিক চাহিদা আরও উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তারপর এর ভয়াবহ অনিষ্টের জন্য তারা মোটেও ভীত নয় বরং সাদরে বরণ করে নেয়।

(মুসলমান আওরত আওর এহমাত)

## মাড় লাগানো কাপড় ও আধুনিক বিজ্ঞান

### সুন্নতে রাসূল

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুতী কাপড় পরিধান করতেন। সুতী কাপড়ের উপকারিতা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ফ্যাশন জগৎ সুতী কাপড়ের উপকারিতাকে বিগড়ে দিয়েছে। উপকারী জিনিসকে অনুপকারীতে রূপান্তরিত করেছে। মাড় লাগানো কাপড় শরীরের জন্য কতটুকু উপকারী, তা আলোচনা করার পূর্বে মাড় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছি। এটা মূলত স্টার্চ জোয়ার অথবা গমের ময়দা। যাকে পানি দিয়ে জাল করে তারপর পানিতে মিশিয়ে কাপড়ে লাগানো হয়।

✪ মাড় লাগানো কাপড় শরীরে বিলাসিতা আনে। আর বিলাসিতার ফলে অহংকার আসে। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ফ্রাইড বলেন, অহংকার শরীরের রোগ আর মগজের ঘুণ। এর ফলে মানুষ অনেক রোগের শিকার হয়ে যায়।

✪ মাড় লাগানো কাপড় পরিধান করলে শরীরের চামড়ায় ঘর্ষণ লাগে আর চামড়া ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে না। যার ফলে শরীরে বিভিন্ন রকমের রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

✪ মাড় লাগানো কাপড়ের মধ্যে বাতাস যাতায়াত করতে পারে না। ফলে ঘাম শুকায় না। এ কাপড়ও ঘাম চুষে নিতে পারে না।

✪ ঘামের কারণে স্টার্চ অথবা মাড়ের অংশ শরীরে আটকে যায়। ফলে লোমকূপ বন্ধ হয়ে শরীরে ফোস্কা পড়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে।

### ব্রেসিয়ারের ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহার

ফ্যাশনজগৎ স্বাভাবিক নিয়ম-পদ্ধতি পাল্টে মন-মস্তিষ্কও পাল্টে দিয়েছে। নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে স্তন যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। স্তনের সুরক্ষা এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ফ্যাশন জগৎ ব্রেসিয়ারের ব্যবহার

শিখিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এর ব্যবহার ছিল না। কিন্তু এখন এর ব্যবহার নারীদের জন্য অপরিহার্য। আমি ব্রেসিয়ার, গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি প্রস্তুতকারক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি এবং ব্রেসিয়ারের উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি :

**১. ফোম :** ব্রেসিয়ারকে সমুন্নত রাখা এবং নরম রাখার জন্য ফোমের আস্তর লাগানো হয়। ফোম চামড়ার গ্রন্থি বিশেষত চর্বির গ্রন্থির উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে এবং ফোমের আস্তরের কারণে বাতাসের যাতায়াত বন্ধ হয়ে ভাঁপিয়ে যায়। কেননা স্তন খুবই সংবেদনশীল; অল্পতেই প্রভাবিত হয়ে থাকে।

**২. পলিয়েস্টার বা নাইলন কাপড় :** সাধারণত ব্রেসিয়ারে ব্যবহৃত কাপড় পলিয়েস্টার অথবা নাইলনের হয়ে থাকে। যা ঘামও চুষে নেয় না এবং বাতাসও যাতায়াত করতে পারে না।

**৩. ব্রেসিয়ারের গঠন :** ব্রেসিয়ারের উদ্দেশ্য যেহেতু স্তনকে ঝুলে পড়া থেকে রক্ষা করা, এজন্য ব্রেসিয়ার এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে স্তনকে টেনে রাখে। ব্রেসিয়ার শরীরের উপর একটি টাইট আস্তরণ হিসেবে অসংখ্য রোগের কারণ হয়ে যায় এবং বাঁধনকে আরও টাইট করার জন্য এর বেল্ট জ্বলন্ত আগুনের উপর তেলের কাজ করে।

**৪. ব্রেসিয়ার এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার :** ক্যান্সার স্পেশালিস্ট ডা. খালেদা ওসমানী লাহোরে জানিয়েছেন, আমার নিকট স্তন ক্যান্সারের অধিকাংশ রোগীই শুধু ব্রেসিয়ার ব্যবহারের কারণেই ক্যান্সার হয়েছে।

## মায়েদের দুধ কমে যাওয়া

তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশেই সাদা বিষ অর্থাৎ পাউডার দুধের চাহিদা যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। এমনকি যেসব দুধকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোতে অবৈধ এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, সে সকল দুধ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে খোলা বাজারে বিক্রয় হয়ে থাকে।

কিছুদিন পূর্বেও কি এত সব দুধের অস্তিত্ব ছিল? বাচ্চাদেরকে কি এ সব দুধ খাওয়ানো হত? মায়েরা কি এ সব দুধের কথা জানত? ড. আল্লামা

ইকবাল কি ডিব্বার দুধে লালিত-পালিত হয়েছেন? মাওলানা জাফর আলী খান কি ডিব্বার দুধ খেয়ে বড় হয়েছেন? কায়েদে আযম খান কি ডিব্বার দুধ খেয়ে বড় হয়েছেন? নেপোলিয়ান কি ডিব্বার দুধ খেয়েছেন? আবরাহাম লিংকন কি ডিব্বার দুধে লালিত-পালিত হয়েছেন? ইংল্যাণ্ডের রাণীমাতা কোন্ কোম্পানির ডিব্বার দুধ খেয়েছিলেন?

আমার নিকট চিকিৎসার উদ্দেশ্যে অনেক ভদ্র মহিলা আগমন করেন। তাদের অধিকাংশই অভিযোগ করেন, আমার দুধ শুকিয়ে গেছে। আমাকে ডাক্তার সাহেব সন্তানের জন্য অমুক ডিব্বার দুধ ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন।

১) সম্পদের লোভ কতিপয় স্বার্থান্বেষীদের চোখে জুলুমের চশমা পরিয়ে দিয়েছে। কোম্পনীরা কতিপয় স্বার্থপর ডাক্তারদেরকে টিভি, ডিশ, ফ্রিজ, এসি দিয়ে বলে, আপনি শুধু আমাদের কোম্পানীর ঔষধ প্রেসক্রিপশনে লিখবেন। বর্তমানে ডিব্বার দুধের অবস্থাও অনুরূপ। অনেক চিকিৎসক জেনে শুনেও বাচ্চাদেরকে ডিব্বার দুধ খাওয়ানোর পরামর্শ দেন।

২) কোনো কোনো মহিলা স্তনের সৌন্দর্য ঠিক রাখার জন্য দুধ খাওয়ায় না। কারণ, এতে স্তন ঝুলে পড়তে পারে।

৩) অধিকাংশ মহিলাদেরই কোনো রোগ অথবা বাইরের কোনো কারণে যেমন ব্রেসিয়ার ব্যবহার করায় দুধ শুকিয়ে যায়। যার ফলে বাচ্চা বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং ভালোভাবে স্মরণে রাখতে হবে, ব্রেসিয়ারের ব্যবহার মহিলাদের দুধকে কমিয়ে বরং নিঃশেষ করে দেয়।

**চরম অনুভূতি :** ব্রেসিয়ারের ব্যবহার যেহেতু স্তন ঢেকে রাখে এবং চেপে থাকে, এজন্য তাদের ভিতর অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায়। তাছাড়া সারাদিন কাজকর্মে উপর নিচ হতে হয়। ফলে স্তনে ব্রেসিয়ারের ঘষা লাগে। ঘষার ফলে এলার্জি হয়, বিভিন্ন জীবাণু এবং ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে। এভাবে একজিমা, ঘা, ফোঁড়া, ফুস্কুরি ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়।

## সুবিবেচনার জন্য একটি উদাহরণ

আপনি মাঝখানে ফোম আর উপরে নিচে পলিয়েস্টার এর আস্তরণ

বিশিষ্ট একটি ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে ব্যাগটির মুখ বন্ধ করে দিন। এভাবে হাত ব্যাগের ভিতর মাত্র ছয় ঘণ্টা রাখুন। ছয় ঘণ্টা পর হাত খুলে হাতের অবস্থা বরং পুরো শরীরের অবস্থাটাই একবার দেখুন।

এবার চিন্তা করুন! হাত হল একটি শক্ত অঙ্গ আর স্তন হল একটি নরম, সংবেদনশীল ও নাজুক অঙ্গ। সুতরাং এর অবস্থাটা কিরূপ হবে?

একজন ফিজিওথেরাপিস্ট-এর মতে, ব্রেসিয়ার নারীদের যৌন চাহিদা প্রয়োজনের চেয়ে আরও অনেক বাড়িয়ে দেয়। ফলে যেনার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

## স্নায়ুবিক রোগসমূহ

গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, স্তনের উপর ব্রেসিয়ারের প্রভাব শরীরের সকল স্নায়ুবিক শৃঙ্খলায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। এরূপ নারী সর্বদা নিম্নের পরিস্থিতিগুলোর শিকার হতে পারে।

- এ ধরনের নারী খুবই অনুভূতিপ্রবণ হয়ে থাকে এবং ছোট ছোট কথায়ও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে।
- মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়।
- কোমর এবং ঘাড় ব্যথার রোগে আক্রান্ত হয়।
- মাথা ভারী এবং হৃদকম্পন রোগ হয়ে যায়।

বি. দ্র. অধম হাদীসের কিতাব এবং হাদীস বিশারদদের নিকট তথ্য অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ব্রেসিয়ারের ব্যবহার মোটেও ছিল না। আপনি যদি বাস্তবিকই ব্রেসিয়ার ব্যবহারে অভ্যস্ত থাকেন, তবে সুতী কাপড়ের ব্রেসিয়ার ব্যবহার করতে পারেন।

## নখপালিশ ও আধুনিক বিজ্ঞান

শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো নখেও জীবন আছে। সুতরাং তারও অক্সিজেন এবং হাওয়ার প্রয়োজন আছে। নখ পানির জন্য উন্মুখ থাকে। যদি নখে কোনো আঘাত লাগে, তবে এতে পুরো শরীর প্রভাবিত হয়। এক ভদ্রমহিলার হাতে খোস-পাঁচড়া, ঘা এবং পুঁজ ভরা ফোঁড়া ছিল। তিনি অনেক চিকিৎসা করিয়েছেন, কিন্তু কোনো কাজ হয় নি। তারপর একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হলেন। সংশ্লিষ্ট ডাক্তার বয়স্ক ছিলেন

এবং তাকে এ বিষয়ে খুব অভিজ্ঞ মনে করা হত। ডাক্তার সাহেব রোগিণীর অবস্থা পরীক্ষা করে বললেন- আপনি কতদিন ধরে নখপালিশ ব্যবহার করছেন। রোগিণী বলল, গত সাড়ে পাঁচ বছর যাবৎ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন- আপনার রোগ কতদিন ধরে? রোগিণী উত্তর দিলেন, পাঁচ বৎসর যাবৎ। ডাক্তার সাহেব বললেন, আপনি নখপালিশ লাগানো ছেড়ে দিন। এরপর তাকে সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা দিয়ে দিলেন। রোগিণী বলেন, মাত্র তিন সপ্তাহের মাথায় পূর্ণ সুস্থতা লাভ করলেন।

**রাসায়নিক চিকিৎসা পদ্ধতি**

রং প্রস্তুতকারক বিশেষজ্ঞদের মতে রং মানুষের জীবনের উপর খুবই খারাপ প্রভাব ফেলে এবং মানুষ যে রংটি বার বার দেখে, সে রংয়ের প্রভাব তার জীবনের উপরও পতিত হয়। যেহেতু অধিকাংশ পালিশ লাল রংয়ের হয়ে থকে এবং এ রং রাগ, ক্রোধ এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি করে, তাই পূর্ব হতেই এ রোগে আক্রান্ত লোকদের রোগ তাৎক্ষণিকভাবে বৃদ্ধি পায়। আর সুস্থ লোকেরাও ধীরে ধীরে এ সকল রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়।

মানুষের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উপর প্রতিটি রংয়ের আলাদা একটি প্রভাব থাকে। বর্তমান আধুনিক ফ্যাশন বিভিন্ন রংয়ের নখ পালিশ ব্যহারের পরামর্শ দেয় এবং বিভিন্ন রংয়ের এলার্জি সাধারণ মানুষের জন্যও অসহনীয়। তাহলে একজন রোগী কি তা সহ্য করতে পারে? নখ পালিশ নখের বায়ুকূপ বন্ধ করে দেয়। তাছাড়া নখপালিশে বিভিন্ন রংয়ের কেমিক্যাল থাকে। এজন্য এ কেমিক্যাল অসংখ্য রোগের কারণ হয়। বিশেষত তার প্রভাব শরীরের হরমোনারী সিস্টেমে মারাত্মকভাবে আঘাত হানে। যার ফলে কঠিন কঠিন স্ত্রীরোগ সৃষ্টি হয়।

## মেকআপ ও আধুনিক বিজ্ঞান

**সুন্নাতে রাসূল**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে বর্তমান স্টাইলের মেকআপ ছিল না। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে মেকআপ করার পর নিজস্ব প্রকৃতিতে ফিরে আসা মানে ফ্যাশনের হার মানা। এ ফ্যাশন সারা বিশ্বকে ঘিরে ধরেছে। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ এক পশ্চিমা চিন্তাবিদ এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের ভাষ্য তারই ভাষায় শুনুন।

ডেলকার্ণেগীর তথ্য

আমার জীবন দীর্ঘদিন প্রকৃতির অধ্যয়নে কেটেছে। আমি এ ব্যাপারটি গভীরভাবে ভেবে দেখেছি যে, আমরা প্রকৃতির কাছাকাছি অবস্থান করেও দূরে সরে যাচ্ছি কিনা?

ফ্যাশন এবং প্রথার জগৎ আমাদেরকে শুধু ধোঁকাই দিয়েছে। মেকআপ ছিল নারীর সৌন্দর্যের জন্য। কিন্তু এ মেকআপ নারীর সৌন্দর্যের যে পরিমাণ ক্ষতি করেছে, সম্ভবত আর কোনো জিনিস এরূপ ক্ষতি করে নি। যুদ্ধ সমাজের পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বারুদ ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর শেষ সীমায় পৌঁছেছে। কিন্তু আমি মনে করি, এর ক্ষতি সে তুলনায় অনেক কম, যে পরিমাণ ক্ষতি এ মেকআপের ফলে হয়েছে।

আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, মেকআপ তৈরির উপাদানসমূহে কি কি কেমিক্যাল ব্যবহার হয় আর তার ক্ষতিই বা কি পরিমাণ? উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে তার ক্ষতির কিছু নমুনা দেওয়া হল:

চেহারার ব্রণ (Acne Vougaris), চেহারায় কালো আচিল (Black Head), আঠাযুক্ত পানিবাহী ব্রণ (Cyst), পুঁজযুক্ত মুখের কালো দাগ (Acne Rosacea), নাসারন্ধ্রে গোটা হওয়া (Rhinophyma), সাধারণ ফোঁড়া ব্যাধি (Falliculitis), দাদ (Ring warm Tinca Corporis) এর কালো তিলক থেকে সৃষ্ট রোগ-ব্যাধি (Rungal ingactions) ইত্যাদি।

এ সকল রোগ-ব্যাধিই আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান (?) অর্থাৎ মেকআপের কারণে এ সকল রোগ-ব্যাধি জন্ম নেয়। সমাজে এরূপ বহু ঘটনা থেকে বুঝা যায়, এতে নারীদের সুশ্রী-সুন্দর চেহারা বিশ্রী-কদাকার হয়ে যায়।

একজন বিয়ের উপযুক্ত মহিলাকে আমার নিকট চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আনা হল। তার চেহারায় কালো দাগ এবং হালকা হালকা ব্রণ ছিল। পুরো পরিবারের মানুষ এতে পেরেশান ছিল। জানা গেল, এটা মেকআপেরই ফল। একজন অবিবাহিতা মহিলা তার ভাইয়ের বিয়েতে মেকআপ ব্যবহার করেছিল। কিছু দিন পর তার চেহারায় কালো কালো দাগ পড়ে গেল। এমনকি দাড়ি ও গোঁফ গজিয়ে উঠল।

ইসলাম নারীদেরকে ঘরে রূপচর্চা (শুধু আপন স্বামীর জন্য) করতে নিষেধ করে নি। কিন্তু এর জন্য কৃত্রিম এবং বিষাক্ত উপাদান দ্বারা তৈরি

ম্যাকআপ ব্যবহার করা অবশ্যই ক্ষতিকর। বর্তমানে আধুনিক নারীরা এবং শিক্ষিত সমাজ মেকআপ থেকে বিমুখ হয়ে পুনরায় সাধারণ সাজ-গোজের প্রতি ফিরে আসছে।

### হায়েয ও নেফাসের সময় সহবাস থেকে বিরত থাকা

শরী'অতে বন্দিত্ব নেই। তবে নিয়মানুবর্তিতা অবশ্যই আছে। কোনো কোনো সময় দেখা যায়, হালাল খাদ্যই হারাম হয়ে যায়। যেমন, রোযা অবস্থায়। অনুরূপভাবেই পুরুষের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা সম্পূর্ণ বৈধ; তবে হায়েয এবং নেফাসের দিনগুলোতে এ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু কেন?

আধুনিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধান মোতাবেক হায়েয এবং নেফাসের সময়ে নির্গত রক্ত বিষাক্ত, দূষিত এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। কারণ, তা নারীদের শরীরের অংশ নয়। তাই তা বের হয়ে যাওয়া খুবই জরুরি।

এক মহিলা ঘন ঘন বেহুঁশ হয়ে পড়ত। অনেক চিকিৎসা করার পরও অবস্থার কোনো উন্নতি হল না। তিনি চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসলেন। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল, তিনি হায়েয অবস্থায় সহবাস করতেন। যেদিন থেকে তিনি এরূপ করতে আরম্ভ করেন, সেদিন থেকেই তাঁর এ অবস্থা।

এক মহিলার গর্দানের আশেপাশে গোটা, ফোঁড়া এবং খুব জ্বালাপোড়া ছিল। মহিলার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর স্বামী উক্ত সহবাসের কথা বললেন। এক ব্যক্তির মূত্রনালী বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নল দ্বারা পেশাব বের করলে বের হত নতুবা পেশাব বের হত না। অনুসন্ধান নিয়ে জানা গেল, তিনি হায়েযের দিনগুলোতে সহবাস করতেন। ইসলাম একটি নিরাপদ, শান্তি এবং সুস্থ বিবেকের ধর্ম। এর বিরোধিতা অসুস্থ বিবেক এবং অশান্তিরই নামান্তর। হায়েয এবং নেফাসের সময় সহবাসের ফলে সৃষ্ট রোগগুলোর কয়েকটি নিম্নে প্রদান করা হল:

সিফিলিস (Syphilis), গণোরিয়া (Gonorihoea), প্রশ্রাবে জ্বালাপোড়া ও প্রশ্রাব ক্রিয়ার না হওয়া। প্রশ্রাবের রাস্তার মাংসগ্রন্থি ফুলে যাওয়া ও জ্বালাপোড়া করা। পাথরী রোগ। নিয়মিত মাসিক না হওয়া। নারীদের লজ্জাস্থানে ঘা হওয়া। জরায়ু ফুলে যাওয়া।

এ সকল রোগের কথা মেডিকেল সায়েন্সের নির্ভরযোগ্য পর্যবেক্ষণে উল্লেখ রয়েছে। আর এগুলি তখনই হয়, যখন মানুষ তার স্বভাবজাত নিয়ম ভঙ্গ করে প্রবৃত্তি পূঁজায় নিয়োজিত হয়।

## জুতা-মোজা ঝেড়ে পরা

✪ হাদীস শরীফে জুতা-মোজা ঝেড়ে পরিধান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (বাযলুল মা'আদ)

✪ অনেক সময় জুতায় কোনো বিষাক্ত পোকা-মাকড় প্রবেশ করে বসে থাকে। সুতরাং জুতা না ঝেড়ে পরলে সেই পোকা-মাকড় দংশন করতে পারে; প্রাণনাশেরও ভয় থাকে।

✪ এক ব্যক্তি একটি খাওয়া-দাওয়ার মজলিস থেকে উঠল এবং জুতা পরিধান করেই চিৎকার দিল। তার পা রক্তাক্ত হয়ে গেল। কারণ, খানা খাওয়ার সময় কে যেন ধারাল হাড্ডি নিক্ষেপ করেছিল আর সেটি তার জুতার ভিতর ঢুকে গিয়েছিল। ফলে পায়ে বিদ্ধ হয়ে লোকটি জখম হয়ে গেল।

✪ জুতা ঝাড়ার সময় দৃষ্টি থাকবে জুতার প্রতি। ফলে জুতার ভিতরের অবস্থাও তখন অনুমান হয়ে যাবে। কেননা অনেক দুর্গন্ধযুক্ত জুতা এমনও আছে, যেগুলি পরিবেশকে দূষিত করে এবং পায়েরও ক্ষতি করে।

# তাওয়াক্কুল ও আধুনিক বিজ্ঞান

## সুন্নাতে রাসূল

তাওয়াক্কুল এমন একটি মানসিক অবস্থার নাম, যে অবস্থায় কোনো মুসলমান প্রতিটি কাজেই আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে মাথা নত করে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উপর ধৈর্য ধরে এবং শুকরিয়া আদায় করে। এ ধৈর্যধারণ ও শুকরিয়া আদায়ের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে, তার অনুভূতি বর্তমান মুসলমানদের নেই।

বর্তমানে ইউরোপ জাতি বহু ধরনের মানসিক রোগে আক্রান্ত। এর মৌলিক কারণ হল, তাওয়াক্কুলের জীবন না থাকা। যদি তাদের কোনো ক্ষতি সাধিত হয়, তা হলে তারা ওই ক্ষতির কারণগুলো তালাশ করে। যদি কারণ পেয়ে যায়, তা হলে তারা নিজেকে নিজে তিরস্কার করে আর যদি

কোনো কারণ খুঁজে না পায়, তবুও নিজেকে নিজে তিরস্কার করে। এমনকি অনেক সময় অধৈর্য্য হয়ে আত্মহত্যাও করে বসে।

এ অবস্থা একজন নারীর উপরও আবর্তিত হয়। কেননা ঘরে থাকা অবস্থায় অনেক সময় তাকে ঘরোয়া সমস্যাবলির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সেখানে ইসলাম তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করার শিক্ষা দিয়েছে। অথচ ইউরোপীয় জীবনে সবর ও তাওয়াক্কুল নামের কোনো জিনিস নেই। তাই সেখানে তালাকের আধিক্য দেখা যায়।

ইসলাম নিজেকে সংযত রাখার শিক্ষা দেয়। দৃষ্টির হেফাযত, কানের হেফাযত, পায়ের হেফাযত, অন্তরের হেফাযত ইত্যাদি নিজেকে সংযত রাখারই একটি অংশ। কিন্তু ইউরোপ জাতি সম্পূর্ণ এর বিপরীত। তারা নিজেকে সংযত রাখার সীমানা লঙ্ঘন করে যেনায় লিপ্ত হয়ে যায়। ফলে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞগণ বলেন, তাওয়াক্কুল মানুষকে অগণিত মানসিক রোগ থেকে পরিত্রাণ দেয়। এ তাওয়াক্কুলের কারণে মানুষ সমাজে একজন শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম মানুষের আসনে আসীন হতে পারে।

## খেজুর চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেওয়া

✪ হযরত আসমা বিনতে আবুবকর রাযি. বর্ণনা করেন, মক্কা শরীফ থেকে কুবায় আসার পর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যোবায়ের রাযি. জন্মগ্রহণ করলেন। আমি বাচ্চাটিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গেলাম এবং তাঁর কোলে দিলাম। তিনি খেজুর আনালেন এবং নিজ মুখে চিবিয়ে তাঁর লালা এবং চিবানো খেজুর বাচ্চার মুখে দিয়ে দিলেন। তারপর বাচ্চার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। ওনিই হলেন (মদীনাতে) সর্বপ্রথম বাচ্চা যে মুসলমানদের ঘরে জন্ম নেয়। (বুখারী,)

✪ হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাযি.) বর্ণনা করেন– আমার ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম নিলে আমি ওকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

মায়ের গর্ভে বাচ্চা যে খাদ্য পায়, তা এবং এ খেজুর প্রায় একই রকম। এমনকি শিশু বিশেষজ্ঞদের মতে খাদ্য হিসাবে মাতৃগর্ভে যে খাদ্য

ঘুট্টী (বাচ্চার জন্মের পর দুধ খাওয়ানোর আগে যে খাদ্য মুখে দেওয়া হয়) অথবা নুতন ধরনের কোন খাদ্য মুখে দেওয়া হয়, সেগুলি দ্বারা শিশুর পাকস্থলী পরিষ্কার হয়ে যায়। সুতরাং পাকস্থলী পরিষ্কার করার জন্য খেজুরই সর্বশ্রেষ্ঠ। অধিকাংশ বাচ্চা জন্মগতভাবে দুর্বল থাকে। যদি জন্মের পরপরই দুধ, পানি অথবা অন্য কোনো জিনিস মুখে দেওয়া হয়, তখন বাচ্চার পাতলা পায়খানা হওয়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলটি কিয়ামত পর্যন্তই উপকারী।

## সুগন্ধি ও আধুনিক বিজ্ঞান

(PERRUME AND MODERN SCIENCE)

### সুন্নাতে রাসূল

✪ হযরত আনাস রাযি. বলেন– হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোশবু ফিরিয়ে দিতেন না। (তিরমিযী শরীফ)

✪ হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পুরুষদের খোশবু সেটিই, যেটি সুগন্ধি ছড়ায় এবং রং বুঝা না যায়। আর নারীদের খোশবু হল, যার রং প্রকাশ পায় এবং সুগন্ধি বুঝা যায় না।

✪ নবীজী রায়হান ফুলের সুগন্ধি বেশি পছন্দ করতেন এবং তা ফেরৎ দিতে নিষেধ করতেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

✪ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেশক এবং উদ (এক প্রকার সুগন্ধি কাঠ) এর সুগন্ধি সকল সুগন্ধির চেয়ে বেশি ভালবাসতেন। (যাদুল মা'আদ)

### নেচারাল থেরাপি

(NATURAL THERAPY)

কেমিক্যাল এবং কৃত্রিম জিনিস তৈরির চেয়ে সায়েন্স পুনরায় তার সৃষ্টিগত ধ্যান-ধারণার দিকে ফিরে যাচ্ছে। সৃষ্টিগত নিয়ম-কানুনের একটি কাজ হল সাদাসিধে পদ্ধতিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে চালু করা এবং সৃষ্টিগত নিয়ম-কানুন দ্বারা উপকৃত হওয়া। এর বিভিন্ন প্রকার আছে। তন্মধ্যে একটি হল পারফিউম থেরাপি।

## পারফিউম থেরাপি
(PERFUME THERAPY)

জার্মানীর ডাক্তার এল্‌ফ্ এ পদ্ধতিতে ব্যাপক চিকিৎসা করেছেন। এতে হাজার হাজার লোক সুস্থতা লাভ করেছে। ডাক্তার এলফের মতে সুগন্ধি একটি সূক্ষ্ম বস্তু আর রূহ বা আত্মাও সূক্ষ্ম। এজন্য যখন কোনো ব্যক্তি সুগন্ধি ব্যবহার করে, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রভাব রূহের ওপর পড়ে এবং রূহের কারণে শরীর সুস্থ এবং সজীব হয়ে উঠে।

শাহী মহলগুলোতে বিভিন্ন প্রকারের সুগন্ধি কাঠের ধুনী দিতে দেখা যেত। আবার যখন মহলে কেউ অসুস্থ হয়ে যেত, তখনও সুগন্ধি কাঠের ধুনী দেওয়া হত। মনে করা হত, এ সুগন্ধির প্রভাবে রোগী তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রায়হানের খোশবু পছন্দ করতেন। রায়হানের খোশবু পুরাতন ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ ঔষধ। যে সকল রোগীদের ব্লাডপ্রেসার সর্বদা হাই থাকে, তাদের জন্য এটা খুবই উপকারী। সুগন্ধি মানুষের উত্তেজনাকে স্বাভাবিক করে। যে সকল রোগীদের পেটে আলসার এবং এসিড হয়, তাদের জন্য খুবই উপকারী।

স্মরণে রাখবেন! সুগন্ধি মানুষের জীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। আপনি যদি এমন কোনো স্থানে যান, যেখানে চতুর্দিকে সুগন্ধির ছড়াছড়ি, তখন আপনার মন-মেজাজ কেমন লাগবে সেটা আপনিই ভালো বুঝেন। কিন্তু আপনি যদি কোনো দুর্গন্ধময় স্থানে গমন করেন, তখন আপনার মন-মেজাজ বিরক্তি, অস্থিরতা ও ঘৃণায় ভরে যাবে। অনেকের তো বমিও এসে পড়ে। বুঝা গেল, সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধের প্রভাব পুরো জীবনের উপর পড়ে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষভাবে জুম'আর দিন খোশবু ব্যবহারের জন্য তাগিদ করেছেন। কারণ, জুম'আর নামাযের জন্য দূর-দূড়ান্ত থেকে মানুষ একত্র হয়। খোশবু তখন উপস্থিত লোকদের শরীর ও মনে প্রফুল্লতা আনে।

এমনিভাবে উদ এবং মেশকের খোশবুও স্নায়ুতে প্রফুল্লতা ও সজীবতা সৃষ্টি করে। এ খোশবু ব্যবহারকারী সর্বদা চঞ্চল এবং উপস্থিত জ্ঞানের অধিকারী হয়। (ফিতরী এলাজ)

# নবীজীর জুতা ও আধুনিক বিজ্ঞান

## হাদীসে রাসূল

✪ হযরত ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নাজ্জাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে দুটি কালো রঙের মোজা পাঠালেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা পরিধান করলেন। (ইবনে মাজা)

✪ হযরত ইবনে ওমর রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরূপ দুটি জুতা পরিহিত অবস্থায় দেখেছি, যেগুলির উপর পশম ছিল না (অর্থাৎ পাকানো চামড়ার ছিল)। (বুখারী)

✪ একজন সাহাবী বলেন, আমি হযরত আনাস রাযি.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা মোবারক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তখন তিনি বললেন, প্রতিটি জুতা মোবারকে দুটি করে ফিতা ছিল।
(তিরমিযী)

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুতা মোবারক চামড়ার ছিল এবং একেবারে সমান ছিল। বর্তমান যুগে বেড়ীওয়ালা এবং রাবার ও প্লাস্টিকের জুতা কিরূপ ক্ষতিকর, তা বলাই বাহুল্য। একজন ফিজিও থেরাপিস্টের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, বেড়ীওয়ালা জুতা ইহুদিদের চক্রান্ত। এটা নারী-পুরুষের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত যৌন সুড়সুড়ি এবং ব্যভিচারের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। আজও যদি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুতার মতো জুতা তৈরি করি এবং শুধু চামড়ার জুতা তৈরি করে পরিধান করি, তা হলে অগণিত রোগ-ব্যাধি হতে বেঁচে যেতে পারি।

## আশ্চর্য অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চামড়ার জুতা ব্যবহার করতেন। যেদিন থেকে মুসলমান তা ছেড়ে দিয়েছে, সেদিন থেকেই অহরহ পেরেশানীতে পতিত হয়েছে। সুতরাং সুন্নত এবং ফ্যাশনের পার্থক্য আপনিই করুন। মানব প্রকৃতি সুন্দর ও সৌন্দর্যের প্রতি সর্বদা দুর্বল। মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ তার আত্মা ও শরীরের জন্য সহজসাধ্য ও সাবলীল জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আসছে। বিভিন্ন যুগে মানুষ তার

শারীরিক প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে আসছে। প্রস্তর যুগের মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করত, সেটা সকলেরই জানা আছে। তাদের শরীরে কোনো পোশাক ছিল না। পায়ে জুতা ছিল না। দিন-রাত এভাবেই কেটে যেত তাদের ।

এখন প্রশ্ন জাগে, বর্তমান যুগ কি আমাদেরকে উন্নতির পথে অগ্রসর করছে? যে যুগে সবদিকেই শুধু ফ্যাশনের ছড়াছড়ি! সুতরাং নিজের সুস্থতা এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য জুতা নির্বাচনেও ভেবেচিন্তে করা দরকার।

অবশ্যই জুতা নরম, সুন্দর এবং ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সোনায় সোহাগা হতে হবে। কিন্তু এ জুতাটা কি সুস্থতা ও জীবন যাপনের সহযোগী? এ প্রশ্নটির প্রতি খুব কম লোকই খেয়াল করেন।

এক ব্যক্তি বলছিলেন, আমার পেশাবের সময় কষ্ট হয়। বার বার চিকিৎসা করার পরও রোগ কমছে না বরং বেড়েই চলছে। ইতোমধ্যে একদিন একটি অনুষ্ঠানে গেলাম। সেখানে এক বন্ধুর সাথে দেখা হল। তিনি বলতে লাগলেন, আরে ইউসুফ সাহেব! আপনি এত জ্ঞানী মানুষ হয়েও কেন এরূপ জুতা ব্যবহার করছেন? এর ফলে তো অনেক স্নায়ু রোগ এবং মূত্রথলির রোগ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে! তাঁর কথা শুনে আপনাআপনিই আমার রোগের প্রতি খেয়াল চলে গেল। আমি জুতা পরিবর্তন করে ফেললাম এবং খাঁটি চামড়ার জুতা ব্যবহার করতে শুরু করলাম। আমার পূর্বের জুতা ছিল রাবারের। এখন চামড়ার জুতা ব্যবহারের ফলে আমার রোগ কমতে আরম্ভ করল। আমি একসময় সুস্থতা লাভ করলাম।

এক যুবক হাসপাতালে অভিযোগ নিয়ে এল যে, আমার শিরা-উপশিরার খিঁচুনি, মস্তিষ্কের দুর্বলতা এবং সার্বক্ষণিক পেরেশানী থাকে। এ পেরেশানী ও বোঝা আমার জন্য আযাবের চেয়ে কম নয়। এর ফলে আমি বেশ কয়েক বছর ধরে পরীক্ষায় সাফল্য থেকে অনেক দূরে থেকে যাচ্ছি। মোটকথা, রোগীর অস্থিরতা ছিল অবর্ণনীয় এবং সে অনেক মানসিকরোগ বিশেষজ্ঞের অধীনে চিকিৎসাধীনও ছিল। তার রোগের কারণ নির্ণয় করার পর বুঝা গেল, এর কারণ ছিল তার জুতা। কেননা মূলত এসব জুতা সে সকল দেশে ব্যবহৃত হয়, যেখানে বরফ পড়ে। এরকম ইংলিশ জুতা আমাদের মেজাজ ও মৌসুমের পরিপন্থী। যখন তার জুতা

পরিবর্তন করিয়ে সামান্য চিকিৎসা দেওয়া হল, তখন আলহামদুলিল্লাহ রোগী সুস্থতা লাভ করল।

## ব্রেনের উপর জুতার প্রভাব

যখন পায়ে চোট লাগে, তখন পায়ে তো এর প্রভাব পড়েই। কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক প্রভাব পড়ে ব্রেনের ওপর। অনেক সময় মস্তিষ্কের রোগের কারণে পায়ের জখম তাড়াতাড়ি ভালো হয় না। সুতরাং বুঝা গেল, পায়ের আরামের সঙ্গে ব্রেনের এবং ব্রেনের আরামের সঙ্গে পায়ের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী নিউটন যখন মস্তিষ্কের চাপ এবং অবসন্নতার শিকার হলেন, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে জুতার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে জুতা পাল্টাতে লাগলেন। অবশেষে তিনি এক জোড়া জুতায় আরাম পেলেন। তারপর তিনি ওই জোড়াই ব্যবহার করতে থাকেন। জার্মানীর বিশেষজ্ঞগণ আবিষ্কার করেছেন, জুতা ভালো হলে ব্রেনও ভাল থাকে। জুতা শক্ত হলে ব্রেন শক্ত, জুতা নরম হলে ব্রেন নরম : এ কথাগুলো মূলত রূপক হলেও চিন্তা-ভাবনা করলে বেশ তথ্য পাওয়া যাবে।

## শিরা-উপশিরার খিঁচুনি

কিছু কাল পূর্বেও শুধু বুড়োরাই শিরা-উপশিরার রোগে আক্রান্ত হত। এর কারণ যাই থাকুক। কিন্তু আধুনিক গবেষণা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে, নতুন প্রজন্ম মানসিক রোগে খুব বেশি আক্রান্ত হচ্ছে এবং এর অগণিত কারণ রয়েছে। কিন্তু সর্বজন স্বীকৃত মতে জুতা স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য যথেষ্ট সহায়ক; এর অপব্যবহার শিরা-উপশিরায় রোগের কারণ হতে পারে।

## হিন্দুস্তানের বাদশাহদের পছন্দ

হিন্দুস্তানের বাদশাহগণ সেলিমশাহী জুতা পছন্দ করতেন। বংশগতভাবে তারা এ জুতাই ব্যবহার করতেন। এ জুতার নমুনার প্রতি গভীর চিন্তা-ভাবনা করার পর সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তারা জুতা ব্যবহারে নিজেদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষার কায়দা জানতেন। বাদশাহ বাবর বলেন : আমি যখন হিন্দুস্তানের মাটিতে পা রাখলাম, তখন এখানকার মাটি, পরিবেশ ও সৌ[illegible]শাহী জোড়াই আমার পছন্দ ছিল।

হাসপাতালে একজন ৮ বৎসরের পুরাতন মাথাব্যথার মহিলা রোগী আসলেন। অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেল, তিনি সর্বদা উঁচু হিল জুতা পরতেন। যখন তার জুতা পরিবর্তন করা হল, তখন তার অবস্থারও পরিবর্তন হয়ে গেল।

একজন গ্রাম্য ব্যক্তি তার চামড়ার তৈরি দেশী জুতা সর্বদা তৈলে ভিজিয়ে রাখত আর বলত আমার বয়স আশি বছর থেকেও বেশি। অথচ আমার দৃষ্টিশক্তি একটুও কম নয়। দাঁত পড়ে নি, স্নায়ুবিক দুর্বলতা নেই। আমি মনে করি, এর একমাত্র কারণ হল তৈলে ভিজানো জুতা।

মোটকথা, আপনি উপযুক্ত জুতা নির্বাচন করতে চাইলে সর্বদা চামড়ার জুতা ব্যবহার করুন। সঙ্কীর্ণ জুতা পরিহার করুন। অনেক রোগ থেকে বেঁচে যাবেন। বর্তমান যুগের আধুনিক পাম সু লং সু আমাদের আঞ্চলিক মেজাজ ও মৌসুমের বিপরীত। সর্বদা পায়ে জুতা রাখবেন না। মাঝে মাঝে জুতা ছাড়াও চলাফেরা করবেন। উঁচু হিল এবং (স্থিতিস্থাপক) জুতা বুঝেশুনে পরবেন। আমরা যখন চলাফেরা করি, তখন জুতাও পায়ের ঘর্ষণে একপ্রকার উষ্ণতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং জুতা যদি চামড়ার হয়, তাহলে সে উষ্ণতা নিঃশেষ হয়ে যায় আর যদি রাবার প্লাস্টিক ইত্যাদির হয়, তখন এ উষ্ণতা অগণিত রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

## ক্যানভাসের জুতা বাচ্চাদের জন্য ক্ষতিকর

বাচ্চাদের পায়ের জন্য সাধারণ জুতার চেয়ে টেনিস অথবা ক্যানভাসের জুতা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্ভবত কোনো কোনো চিকিৎসক মাতা-পিতাকে পরামর্শ দেন, যেন তারা তাদের বাচ্চাদেরকে সাধারণ জুতা না পরিয়ে এ ধরনের জুতা পরিধান করান। এরূপ পরামর্শ দানের দ্বারা বাচ্চাদের পায়ের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা শতগুণে বেড়ে যায়। আমেরিকায় স্বাস্থ্যসম্মত জুতা প্রস্তুতকারী সমিতি এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এর বাস্তব নমুনা তুলে ধরেছে। এ সমিতির ভাস্য ছিল বাচ্চাদেরকে ক্যানভাস সু ব্যবহার করানোর যে পরামর্শ বিশেষভাবে শিশু বিশেষজ্ঞগণ এবং কোনো কোনো স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য রোগ বিশেষজ্ঞগণও দিয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে ডাক্তার রই বাচ্চাদেরকে এ জুতা পরানোর কুফল সম্পর্কে গবেষণা করে দেখেছেন।

বাস্তবে এ জুতা ব্যবহার করলে সাধারণ জুতার চেয়ে বাচ্চাদের গরম বেশি লাগে এবং প্রচুর ঘাম বের হয়। যার সবচেয়ে বড় কারণ হল, সাধারণ জুতার চেয়ে এ জুতাগুলির ভিতর পায়ে ঘষা লাগে বেশি। রাবার সোলে সঙ্কীর্ণতা বেশি থাকে। এর ভিতর থেকে লাগানো থাকে আঠা। ফলে রাবার সোল জমীনের উপর আটকে যায়। ক্যানভাস সু প্রভৃতি কদমে আটকে যায়। কিন্তু এর ভিতর পা সামনের দিকে পিছলে যায়। আর এটা যদি সামান্য ঢিলা হয়, তাহলে আরো দ্রুত বেগে পিছলাতে থাকে। ফলে জুতার ভিতর বাচ্চাদের শরীর গরম হয়ে যায়, ঘাম বের হয়। সুতরাং জুতা খোলার পর দেখা যায়, তাদের মোজা ভিজে গেছে। অপর দিকে উভয় পায়ে প্রায় দুই লক্ষ লোমকূপ থাকে। সেগুলো থেকে শরীরের বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে যায়। এ পদার্থটি পায়ের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এর দ্বারা পায়ে জ্বালা-পোড়া সৃষ্টি হয়।

টেনিস অথবা ক্যানভাস জুতার ভিতর পায়ে ঘষা লাগলে শরীরে উষ্ণতা সৃষ্টির পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। চামড়ার সাধারণ উষ্ণতা থাকে ৯০° ডিগ্রী। আর গরমের মৌসুমে পরিশ্রম বেশি করলে পায়ের উষ্ণতা ৯৫° ডিগ্রী থেকে ১০০° ডিগ্রী পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু ক্যানভাস জুতায় এ উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে ১২৫° ডিগ্রী পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

## বাচ্চাদের ঘা অথবা চোট

ক্যানভাস জুতা ব্যবহারকারী বাচ্চাদের এ রোগ প্রায়ই দেখা যায়। এর কারণ হল, এ আঠাল সোল এবং রাবার সোলের উপরের অংশের সঙ্কীর্ণতার ভিতর যখন বাচ্চাদের পা সামনের দিকে পিছলে যায়, তখন সারাদিনে কয়েক হাজার বার অগ্রভাগের সঙ্গে পায়ের ধাক্কা লাগে। চামড়ার জুতায় এ অসুবিধা অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়। কেননা চামড়ার তলা মাটির সাথে আটকে যায় না বরং সামনে দিকে পিছলে যায়।

## সোল নরম হওয়া

সাধারণত এ মনে করা হয়, ক্যানভাস সু এর নিচের সোল যথেষ্ট নরম হয়ে থাকে। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, ছোট বাচ্চাদের ক্যানভাস সু-এর সোল সাধরণত ১" ২ " ইঞ্চি মোটা রাবারের হয়ে থাকে। বাচ্চাদের এ পরিমাণ ওজন হয় না যে, চলার সময় তারা সে সোল মুড়তে পারে

অথবা পা নরম করতে পারে বরং তারা পা নরম করার পরিবর্তে খুব দৃঢ়তার সাথে আগে বাড়ায় আর এভাবে হাঁটলে সোল মুড়তে পারে না।

## উঁচু হিল জুতা

মেয়েদের উঁচু হিল জুতা পরার খুব শখ বা আগ্রহ থাকে। কিন্তু তারা জানে না যে, এতে তাদের পা, পায়ের গিরা, গোড়ালী এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কত ক্ষতি হয়। ইদানীং ফ্যাশনের বশবর্তী হয়ে মেয়েরা উঁচু হিলের জুতা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে। মূলত এরূপ জুতা-স্যাণ্ডেল পরিধান করলে পা ও গোড়ালীর রগগুলো ফুলে যায়। দীর্ঘদিন এরূপ জুতা পরলে হাড়ের মধ্যে ব্যথা শুরু হয়। দুর্বলতা জন্মে। আবার সংকীর্ণ পরলে পা ও গোড়ালীর কিছু অংশে রক্তচলাচলে বাঁধা সৃষ্টি হয়। ফলে পা ও পায়ের গোড়ালীতে এবং কখনো কখনো কোমরে ব্যথা হয়। ফলে শরীর ফুলে উঠে, রগে ব্যথা হয়ে মোটা হয়ে যায় অর্থাৎ গোঁড়ালী বা পায়ের রগের মধ্যে রক্ত জমে গোশত পিণ্ডাকৃতি হয়ে যায়। মহিলারা যদি (বিপজ্জনক) এ জাতীয় জুতা পরা ত্যাগ করত, তবে অতি দ্রুত এমন কষ্টকর বিপজ্জনক অবস্থা হ্রাস পেত। উঁচু হিল জুতার গঠনই এমন যে, তাতে পা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না; চলাফেরার সময় বিশেষভাবে কষ্ট পেতে হয়।

# নবীজীর চলার ধরন ও আধুনিক বিজ্ঞান

## হাদীসে রাসূল

✪ হযরত হাসান রাযি. হতে বর্ণিত আছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ চলার সময় শক্তভাবে পা উঠাতেন এবং রাখার সময় এমনভাবে রাখতেন, যেন সামনে ঝুঁকে গেছেন। এরূপ বিনয়ের সঙ্গে পা বাড়াতেন। চলার সময় তাকে দেখে মনে হত, যেন তিনি উঁচু থেকে নিচে অবতরণ করছেন। (নছরুত্তীব) তাঁর চলার সময় পায়ের পাঞ্জার উপর বেশি ভার পড়ত। এতে অনেক উপকারিতা আছে। ডাক্তার কলীম খান এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তার মতানুসারে—

(১) যে ব্যক্তি এমনভাবে চলবে, তার গিরায় কখনও রোগ হবে।

(২) প্রথমে এমন ভঙ্গিতে চলার অনুশীলন করে পরে চরাফেরা শুরু করলে দীর্ঘ সফরেও ক্লান্তি আসে না।

(৩) ইউরোপের ভ্রমণ ও পর্যটন সংক্রান্ত গাইড বইসমূহে স্পষ্ট লিখা আছে, সফর দীর্ঘ হলে তোমরা পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে পথ চলবে। তা হলে সহজে পথ অতিক্রম করতে পারবে।

(৪) এমন অপরূপ ভঙ্গিতে চলাফেরা করলে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়।

(৫) অস্থির খিঁচুনী ও অস্থিরতা বিদূরিত হয়।

(৬) এমনকি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যাকেই আমি এমন ভঙ্গিমায় চলতে এবং দৌড়াতে শিক্ষা দেই, সে-ই সকল কাজে কামিয়াব হয়ে ফিরে আসে।

(৭) অধিকন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পদব্রজে চলতেন আবার মাঝে মাঝে ঘোড়ার উপরও আরোহণ করতেন। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ লিখেন, কখনও কখনও ঘোড়ার রশি ধরে পায়ে হাঁটা উচিত। এমন অপূর্ব নেয়ামতকে পরিত্যাগ করে আমরা অশান্তির মধ্যে আছি। সমস্ত ইউরোপীয় জাতি পায়ে হেঁটে চলে এবং অধিকন্তু সকলকে পায়ে হেঁটে চলতে খুব উৎসাহিত করে।

## খালি পায়ে হাঁটার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

পায়ে হেঁটে চলা সুন্নত। একটি সুন্নত ছেড়ে দিলে তাতে কি কি ক্ষতি ও অসুবিধা হয়, সে বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান কি বলে তা দেখা যাক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান পায়ে হেঁটে চলাকে অগ্রাধিকার দিতেন। একদিন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে দেখে বললেন, হাকিম সাহেব! আপনাকে পায়ে হেঁটে আসতে দেখলাম। এত দূর থেকে পায়ে হেঁটে আসলেন, এর কারণটা কি? আমার পিতা উত্তরে বললেন, পায়ে হেঁটে চলা স্বাস্থ্যসম্মত।

ওই ব্যক্তি বললেন, হাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমাদের এক বন্ধু হার্টের রোগে ভুগছিলেন। তিনি লাহোরের হাসপাতালে ভর্তি হলেন। সেখানকার হার্ট বিশেষজ্ঞগণ বললেন, আপনি করাচী চলে যান। তিনি সেখানে গিয়ে চিকিৎসা করালেন। কিন্তু সেখানকার বিশেষজ্ঞরাও রোগ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হলেন না বরং বলে দিলেন, আপনি ভাল চিকিৎসার জন্য লণ্ডন চলে যান। তিনি লণ্ডন চলে গেলেন। লণ্ডনের ডাক্তারগণ ভালভাবে মেডিকেল চেকআপের পর বললেন, এ রোগের চিকিৎসা আমেরিকার

কার্ডিফ (বক্ষব্যাধি) হাসপাতালে আছে, সেখানে যান। বাঁচার তাগিদে মানুষ কি না করে? অগত্যা তিনি সেখানে পৌঁছুলেন। তিনি বলেন, তিনি সেখানে চিকিৎসা করতে থাকেন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি সুস্থ হলেন। পরিশেষে বিদায়ের সময় বিশেষজ্ঞগণ তাকে সর্বশেষ ও বিশেষ পরামর্শ দিলেন, আপনি পায়ে হেঁটে চলবেন। এটাই আপনার চিকিৎসা।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, মানুষ আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ার চেয়ে চিকিৎসার প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে এ চিন্তাও করা দরকার যে, আমাদের রোগ-ব্যাধির কারণ কি ? কেন আমরা বিভিন্ন প্রকার মারাত্মক রোগ-ব্যাধিতে ভুগছি? একথা সকলে স্বীকার করবেন যে, এর মূল কারণ হল অলস ও কর্মবিমুখ জীবন। যার মধ্যে পায়ের তৎপরতা অতি অল্প; কিন্তু ভাবের হরকত (ক্রিয়া) অধিক।

জনৈক বাদশাহ সর্বদা সুস্থ ও সবল থাকতেন। একদিন অন্য এক দেশের বাদশাহর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁর সুস্থ-সবল থাকার কারণ কি জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে বাদশাহ বলেন– দু'জন চিকিৎসক আমাকে সর্বদা চিকিৎসা করেন তারা হল আমার দুই পা। আমি যখনই পায়ে হেঁটে চলাফেরা করি, তখন আমার পা সচল ও ক্রিয়াশীল হয়। সেজন্য এর মধ্যে যখন কর্মসচলতা পয়দা হয়, তখন সমস্ত শরীর আরাম ও প্রশান্তিতে থাকে।

## অনিদ্রা

ইদানিং অধিকাংশ মানুষ অনিদ্রার শিকার। ডাক্তারদের ক্লিনিক ও হেকিমদের দাওয়াখানাসমূহ বর্তমানে এরূপ রোগীদের মহাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যতই আধুনিক উপায়-উপকরণ ও পন্থা আবিষ্কৃত হোক, দিন দিন রোগব্যাধি ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি যদি আপনার পরিবেশ-পরিস্থিতি উপর সামান্য চিন্তা করেন, তবে তাৎক্ষণিকভাবে অবগত হবেন যে, এর মূল কারণ অচল ও অলস জীবন। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, যখন এসব রোগে আক্রান্ত রোগীরা ভেউ ভেউ করে কেঁদে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে, তখন তাদের মধ্যে বেশির ভাগ এমন হয় যারা কাজকর্ম থেকে অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন। ফলে তাদের মধ্যে কর্মতৎপরতা হ্রাস পেয়েছে এবং মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এমন লোকদের যখন

দৈনিক পায়ে হেঁটে চলাফেরা করার পরামর্শ দেই এবং সে রোগী কঠোরতার সাথে তা নিয়মিত পালন করে, সে হতাশাজনক অবস্থা থেকে সুস্বাস্থ্যের প্রতি আশাবাদী হয়। ফলে অনিদ্রা তার থেকে বহু দূরে চলে যায়। এমনকি যে রোগীর ঔষধ, পুরিয়া, অনুপান, বটিকা, ও তেজে কোনো ফল হয় না, তখন যদি সে ধারাবাহিকভাবে অবিরাম গতিতে পায়ে চলাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে, তবে পুনরায় সে স্বাভাবিক নিদ্রাসুখ পাবে ইনশাআল্লাহ।

## গ্যাস্ট্রিক

বাস, ট্রেন, স্টেশন, বাজার, অলিতে-গলিতে সর্বত্র ইদানিং আপনি হজমের ঔষধপত্রের বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি দেখবেন অথবা গুলি, বড়ি, দানা, মিকচার ইত্যাদির বিক্রেতা পাবেন। সকলেই দাবি করে, এটা গ্যাস্ট্রিক ইত্যাদি রোগ নিরাময়ের একমাত্র মহৌষধ। বর্তমানে দেশে পাকস্থলীর রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য যত ঔষধপত্র তৈরি হচ্ছে এবং অন্যান্য রোগের জন্য হবে, তন্মধ্যে গ্যাস্ট্রিকের অন্যতম চিকিৎসা হল, পায়ে হাঁটা এবং চলাফেরা করা। আমরা যখন ঘি দিয়ে পাকানো সুস্বাদু খাদ্য খেয়ে চেয়ারে বসে থাকি এবং চলাফেরা করি না, তখন উক্ত খাদ্য পঁচে যায়। ফলে তা রোগ প্রতিষেধক হওয়ার পরিবর্তে রোগজীবাণুতে পরিণত হয়।

## কোষ্ঠকাঠিন্য

এটি একটি কঠিন সমস্যা। ঔষধপত্র, বটিকা, ফাইল ইত্যাদি খেলে যদি এর উপশম হয়, তবে তো ভালো। অন্যথায় রোগী চিকিৎসার সাথে সাথে যদি পায়ে হেঁটে চলাফেরা শুরু করে দেয়, তবে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে ইনশাআল্লাহ পরিত্রাণ পাবে।

## হৃৎপিণ্ডের রোগব্যাধি

হৃৎপিণ্ড একটি ক্রিয়াশীল অঙ্গ। এটা গতিশীলতাকে পছন্দ করে। কিন্তু হৃৎপিণ্ড বাহক মানুষ অধিক অলসতা করে এবং কাজ থেকে বিরত থাকে। সুতরাং মানুষ যদি হৃৎপিণ্ডের মতো সচল ও সক্রিয় না হয়, তবে হৃৎপিণ্ড অকেজো হয়ে যায়। তারপর একে সক্রিয় ও সচল করার জন্য চিকিৎসার নিমিত্তে বিভিন্ন উপায়-উপকরণ ও পন্থা অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু তাও অকেজো হলে অনেক জটিলতা দেখা দেয় এবং পরে এর চিকিৎসার একমাত্র উপায় হচ্ছে হাঁটা।

## মেদভুঁড়ি

মেদভুঁড়ি কি অপ্রতিরোধ্য? আদৌ নয়। এর যথাযথ চিকিৎসা রয়েছে। একবার এক পুলিশ অফিসার আমার নিকট এসেছিল তার মেদভুঁড়ি কমানোর জন্য। আমি তাকে কিছু ঔষধপত্র দেই এবং প্রত্যহ ৫ কিলোমিটার পথ পায়ে হাঁটতে বলি। সে এর প্রতি মনোনিবেশ করে এবং নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করে। ফলে মাত্র ৪০ দিন পর তার পেট ও শরীর স্বাভাবিক হয়ে যায়। এমনকি পরিশেষে তার জামা-পায়জামা ছোট করার প্রয়োজন হয়।

## অর্শ্বরোগ

কোন কোন ভাষায় অর্শ্বরোগকে "বসা রোগ" বলা হয়। কেননা পায়ে চলাফেরা করে এমন ব্যক্তিদের অর্শ্বরোগ কম হয়। এ রোগের চিকিৎসা যদি পায়ে চলা দ্বারা করা হয়, তবে বহু উপকার হয়। বাত আক্রান্ত অর্শ্বরোগী অবশ্য চলতে পারে না। কিন্তু তবু তারা যখন পায়ে চলা শুরু করে দেয় এবং বিরতিহীনভাবে নিজস্ব ভঙ্গিতে চলতে থাকে, তখন রোগ চিরদিনের জন্য তাকে সালাম দিয়ে চলে যাবে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল, যদি এটা সুন্নত মনে করে করা হয়, তবে সাওয়াব তো আদৌ কম হবে না। উপরন্তু দুনিয়ার লাভও অনায়াসে অর্জিত হবে।

# চোখে সুরমা ব্যবহার ও আধুনিক বিজ্ঞান

## হাদীসে রাসূল

✪ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি সুরমাদানী ছিল। তা থেকে তিনি প্রতি রাতে তিন শলাকা করে সুরমা উভয় চোখে ব্যবহার করতেন। (তিরমিযী)

সুরমা ব্যবহার করা যদিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত। তথাপি পার্থিব দিক দিয়ে এর মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে।

(১) সুরমা শক্তিশালী জীবাণুনাশক।

(২) আধুনিক গবেষণা মতে চোখে সুরমা ব্যবহার করলে সূর্যের প্রখর কিরণ চোখের রেটিনার ক্ষতি করতে পারে না। পক্ষান্তরে এর ব্যতিক্রম

করলে (সুরমা গ্রহণ না করলে) আল্ট্রাভাইওলেট রশ্মি চোখের রেটিনার যথেষ্ট ক্ষতি করে।

(৩) সুরমা দিলে চোখের উপর বিন্দুমাত্র লেড ইনফেকশন হয় না।

(৪) চক্ষুরোগীর জন্য সুরমা অত্যাধিক উপকারী। যে ব্যক্তি সর্বদা সুরমা ব্যবহার করে, তার চোখে জ্বালাপোড়া রোগ কম হয়।

(৫) চক্ষু বিশেষজ্ঞগণের মতে সুরমা চোখকে এমন রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করে, যার চিকিৎসা আধুনিক বিজ্ঞানে অসম্ভব।

(৬) চোখের জখম, আঁচড়, জ্বালাপোড়া ইত্যাদির জন্য সুরমা অত্যন্ত উপকারী। এটা সর্বপ্রকার ছোঁয়াছে রোগ-জীবাণুকে ধ্বংস করে দেয়।

## দৃষ্টিশক্তি রক্ষা

চোখের দৃষ্টিকে সতেজ ও সুন্দর রাখার জন্য অজু করার সময় চোখের পাতা খুলে চেহারার উপর পানি ছিটিয়ে দেওয়া উচিত। এটা চোখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার এবং চোখের রোগব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য অত্যন্ত সহজ ও সুব্যবস্থা। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও একটি অত্যন্ত উপকারী ও ফলপ্রসূ কাজের কথা বলেছেন। তা হল, শয়নকালে সুরমা ব্যবহার করো। (তিরমিযী)

তিনি আরও বলেন, আসমুদ নামক সুরমা ব্যবহার করো। কেননা এর দ্বারা চোখের পশম গজায় এবং চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়মিত অভ্যাস ছিল। যার ফলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিশক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি। অনেক বয়স্ক লোককে দেখেছি, তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকনির্দেশনার উপর বাস্তবে আমল করে নিজের দৃষ্টিশক্তিকে অটুট রেখেছেন। ৭০/৮০ বা ততধিক বয়সের বৃদ্ধও কেরোসিন তেলের বাতির আলোতে রাতে লেখাপড়া করেন। এমনকি এর চেয়ে সূক্ষ্ম কাজ সেলাই ইত্যাদিও করে।

রাতে সুরমা ব্যবহার করলে সারাদিন যে সমস্ত ধুলাবালি চোখে প্রবেশ করে তা সুরমার সাথে মিশ্রিত হয়ে চোখের কিনারা দিয়ে বের হয়ে যায়। আবার সকালে চোখ ধৌত করলে চেহারার উপর সুরমার কোন কালো দাগও থাকে না।

লেখাপড়া বা এর চেয়ে সূক্ষ্ম ও কঠিন কাজে যারা, রত আছে, তাদের জন্য সুরমা ব্যাহার করা অতি জরুরি। নিয়মিত সুরমা ব্যবহার করলে চোখের দুর্বলতা, প্রতিবন্ধকতা ও রোগ-ব্যাধি দূর হয়ে যায়। হামানদিস্তায় উত্তমরূপে চূর্ণ করা সাধারণ সুরমা অত্যাধিক উপকারী।

বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতায় সুরমা ব্যবহারের প্রচলন কম। আল্লাহ তা'আলা কুদরতীভাবে যে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, তা হ্রাস পেলে নব আবিষ্কৃত বস্তুর মাধ্যমে যেমন চশমা, কাঁচ ইত্যাদি ব্যবহার করে ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করা হয়। অথচ সহজে, স্বল্প খরচে, কল্যাণকর উপায় অবলম্বন করা হয় না।

জাতিসংঘের (U.N.O) অধীনস্থ ইউনেস্কোর একটি প্রতিবেদন ও পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গোটা বিশ্বে আশি লক্ষ অন্ধ রয়েছে। তন্মধ্যে ৮০ ভাগ এশিয়া ও আফ্রিকায়। এমনকি এ দুই মহাদেশে দৃষ্টিশক্তি সংরক্ষণের ব্যাপারে উদাসীনতা ও অনাগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## চোখ থেকে অশ্রু নির্গমন

অশ্রু নির্গমন স্বাস্থ্যসম্মত না রোগ? বর্তমানে এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণা মতে অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার মধ্যে উপকারিতাও আছে এবং অপকারিতাও আছে। যদি আকর্ষণ, আবেগ, জিদ বা রাগ-অভিমান, প্রতিশোধ এবং পাগলামী বশত অশ্রু নির্গত হয়, তবে তা অবশ্যই ক্ষতিকর। পক্ষান্তরে যদি ভালবাসা, মহব্বত, সহযোগিতা, সহমর্মিতায় অশ্রু নির্গত হয়, তবে তা উপকারী।

সার্জারী বিশেষজ্ঞ একজন বড় প্রফেসর চোখের সার্জারী করার পর এ ফলাফল পেয়েছেন যে, চোখের উপর আবেগ ও উদ্দীপনার যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। অশ্রু যদি আবেগ, প্রেম ভালবাসা, সহমর্মিতার কারণে প্রবাহিত হয়, তবে তা নারী-পুরুষের মুখের স্পট, গর্ত, দাগ, চিহ্ন, ক্ষত, এলার্জি ইত্যাদি দূর করে। পক্ষান্তরে উক্ত অশ্রু যদি ঘৃণা, প্রতিশোধ, টেনশনে প্রবাহিত হয়, তবে তা মস্তিষ্ক ও অস্থিতে ব্যাধি সৃষ্টি করে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যাদের চোখে দূরারোগ্য রোগ দেখা যায়, তারা খুব আবেগপ্রবণ ও প্রতিশোধ পরায়ণ হয়।

## গোঁফ ছাঁটা

○ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– গোঁফ ছোট (খাট) কর; দাড়ি লম্বা করো। (আল-হাদীস)

ইদানিং লোকদের মুখে গোঁফ অনেক বড় দেখা যায়। কিন্তু দাড়ির কোনো চিহ্নও পাওয়া যায় না। বাস্তবে এতে কি কি ক্ষতি হয় এবং কোনো কোনো রোগের সম্মুখীন হতে হয়, তা আমাদের জানা নেই। তাই এ বিষয়ে নিম্নে একটি বিশেষ প্রতিবেদন উল্লেখ করা হল।

কিউল ফাদার একজন পর্তুগীজ বিজ্ঞানী। তাঁর প্রদত্ত তথ্যানুসারে "মানুষের ঠোঁট খুব অনুভূতিপ্রবণ অঙ্গ। তার সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক গভীর। এ অনুভূতি নারী-পুরুষের পৃথক সম্পর্কের মধ্যে আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। উপরের ঠোঁটের মধ্যে এমন হরমোন সৃষ্টি হয়, যার জন্য বাহ্যিক প্রভাব ও পানি অতি জরুরি। গোঁফ বড় থাকলে এসব প্রভাব পড়তে পারে না। অপরপক্ষে গোঁফ না থাকলে উপরের ঠোঁটে পানি লাগতে পারে এবং বাহ্যিক বায়বীয় প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে তা স্বাভাবিক ও আরামদায়ক হয়। আর ঘন ও লম্বা গোঁফ থাকলে পানি, বায়ু ইত্যাদি প্রবেশ করতে পারে না। সুতরাং গোঁফ ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

যদি উক্ত গ্লান্ডসমূহে পানি, বায়ু ইত্যাদি স্পর্শ না করে, তবে সর্বদা সর্দি কাশি, দাঁতের মাড়ী ফোলা, অস্থি খিচুনী ইত্যাদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অধিকন্তু গোঁফ বড় হলে তাতে রোগজীবাণু আটকে যায় এবং খাওয়ার সময় তা পেটের মধ্যে চলে যায়। নিচের ঠোঁটের অবস্থা উপরের ঠোঁটের সম্পূর্ণ বিপরীত। এজন্য ইসলাম গোঁফ ছোট করা এবং দাড়ি লম্বা করার হুকুম দিয়েছে। (হাইজিন এণ্ড হিউম্যান)

# যিকির, অযীফা ও আধুনিক বিজ্ঞান

## সুন্নাতে রাসূল

যিকির ও অযীফা একজন বিবেকবান ব্যক্তির মনের প্রশান্তি ও ভালবাসার কারণ হতে পারে আবার নির্বোধ বিবেকহীন ব্যক্তির নিকট ঘৃণা ও অপছন্দের কারণ হতে পারে।

জনৈক নাস্তিক এক বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনার অযীফা ও আয়াতে কি আছে ... যায়। তখন বুযুর্গ রাগান্বিত

হয়ে তাকে গালি দিলেন। সেও রাগত স্বরে বলল, আমি আপনাকে প্রশ্ন করলাম কী আর আপনি দিলেন আমাকে গালি! তখন বুযুর্গ বললেন, গালিও তো শব্দ। অথচ এ শব্দ শোনামাত্র আপনার গায়ে কেমন আগুন ধরে উঠল। অযীফার আসরও অনুরূপ।

যিকির ও অযীফার মধ্যে কি শক্তি আছে, তার আলোচনা "নাম ও আধুনিক বিজ্ঞান" শিরোনামে পিছনে বর্ণিত হয়েছে। তা মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। কিছু কিছু অজিফা আছে, যেগুলো পড়লে মানুষ এত শক্তি-ক্ষমতা লাভ করে যে, মানুষ তখন অস্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হয়।

ডাক্তার লিউল পাউল (জ্যোতির্বিদ) একজন অমুসলিম হয়েও বলতেন, কুরআন কেবল শব্দের সমষ্টি নয় বরং তা একটি বিশেষ শক্তির উৎস। এ শক্তি শুধু পাঠকের নিকটে সঞ্চারিত হয় না বরং তার নিকটে উপবিষ্টদেরকেও পরিবেষ্টন করে নেয়।

আমি তিন মাস ব্যাপী কুরআনের কিছু দু'আ-কালাম পড়েছিলাম। চোখ বন্ধ করে যখন উক্ত শব্দসমূহ পড়তাম, তখন আমি অসংখ্য বিষয়ের উপকার উপলব্ধি করতাম। আমার রোগীদেরও সেসব দু'আ-কালাম শিক্ষা দিয়েছি। ফলে তারাও রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান কুরআনের আয়াতের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, দু'আ-কালামের মধ্যে যে শক্তি আছে, প্রকৃতপক্ষে তার উৎস কুরআনের শব্দ ভাণ্ডার। যদিও সাধারণ শব্দ ব্যবহারে ততটা শক্তি থাকে না; কিন্তু কুরআনের প্রতিটি শব্দ যথেষ্ট শক্তি রাখে।

(ডাক্তার লিউল পাউল ও জিন্দেগী)।

নিম্নে কুরআনের আয়াত ও শব্দের চাক্ষুস দেখা অভূতপূর্ব কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করা হল :

হৃৎপিণ্ডে আগত রক্ত বিভিন্ন শিরা-উপশিরায় বাঁধাপ্রাপ্ত হলে স্পন্দনেও চাপ পড়ে। তখন শ্বাসনালী বন্ধ হয় এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এ দুটি সমস্যাই বক্ষের মধ্যে প্রয়োজনীয় শক্তির ঘাটতির কারণে উৎপত্তি হয়। এ বিষয়ে আল-কুরআন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছে :

قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

"তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরের মধ্যস্থিত রোগ-ব্যাধির নিরাময়ক।"

উক্ত বরকতময় আয়াতকে রোগী যদি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পড়ে নিজের উপর ফুঁক দেয়, তবে এসব রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

জনৈক বুযুর্গের ছেলের হৃৎপিণ্ডে চাপ পড়েছিল। তিনি তাকে ডাক্তারের নিকট নিয়ে ফেরৎ আনার পরিবর্তে কুরআন মজীদের এ আয়াত পড়ে ছেলের শরীরের উপর দম করে দেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ওই যুবক সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ؛ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ ؛ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"আমরা জানি, তাদের কথায় আপনার বক্ষ সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠে। আপনি তাদের মুখাপেক্ষী না হয়ে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করুন এবং নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত হন। এমন একীন ও এখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন, যেন আপনার পরিপূর্ণ একীন থাকে।"

উক্ত বুযুর্গের ঘটনা জ্ঞাত হওয়ার পর আমরা হৃৎপিণ্ড রোগীদের গত ১০ বৎসর ধরে এ বরকতময় আয়াত পড়ার তাগিদ করে আসছি। দরূদ শরীফসহ উক্ত বরকতময় আয়াত সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পড়ায় এবং ঠিকমত নামায পড়ায় এ রোগে আক্রান্ত একজন রোগীও মারা যায় নি। এটা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ ও কুরআনের বরকত।

দুই বৎসরের এক বাচ্চা কঠিন হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তাকে ঔষধপত্র দেওয়ার পরিবর্তে কুরআন মজীদের উক্ত আয়াত সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পড়ে ফুঁক দেওয়ার পরামর্শ দেই এবং গরম পানিতে মধু মিশ্রিত করে পান করাতে বলি। এরপর গত দুই মাসে ওই বাচ্চার একবারও হাঁপানী দেখা দেয় নি। আলহামদুলিল্লাহ্!

## জনৈক পাইলটের ঈমান

পাকিস্তানী বিমানের বোম্বাইর পাইলটের হৃদপিণ্ডে অধিকাংশ সময় ব্যথা অনুভূত হত। চিকিৎসকদের নিকট গেলে তারা তাকে বার বার অপারেশন করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু সে-সময় দেশ জুড়ে বৃষ্টির মতো গোলাগুলি হচ্ছিল। ফলে সেই সংকটময় মুহূর্তে অপারেশন থেকে তিনি বিরত থাকেন। অবশেষে ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর শত্রু বাহিনী পাকিস্তানের উপর আক্রমণ করে বসে। এদিকে বিমান বাহিনীর অফিসারগণ জানতেন,

অমুক পাইলট হৃদপিণ্ডের ব্যথায় কাবু হয়ে আছে। সুতরাং এমন অনিশ্চিত পাইলটের সঙ্গে কোনো বিমান-সৈনিক যেতে প্রস্তুত ছিল না। তথাপি তার প্রবল আগ্রহ দেখে একজন নবীন সৈনিক প্রস্তুত হয় এবং ভারতীয় সেনা শিবিরকে লক্ষ্য করে বোম্বিং করতে চলে যায়। পাইলট তখন হৃদপিণ্ডের ব্যথা থেকে বাঁচার জন্য বিমান নিয়ে যাত্রাকালে এবং প্রত্যাবর্তনের সময় কুরআন মজীদের এ আয়াত পড়েন :

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - (النور: ٣٥)

ফলে ১৭ দিন ব্যাপী যুদ্ধের মধ্যে তার হৃদপিণ্ডে আর একবারও ব্যথা অনুভব হয় নি। এভাবে যখন ব্যথা সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়, তখন অপারেশন করে এবং চিকিৎসকরা পিত্তথলি থেকে ১৯টি পাথর বের করে দেন। মূলত ডাক্তারদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল পিত্তথলিতে ১৯টি পাথর বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অচল এবং অকেজো। তাকে দিয়ে শারীরিক যে কোনো কাজ করানো একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহর কালামের বরকতে উক্ত ব্যক্তি অন্যদের সাথে সক্রিয় ও তৎপর থাকে এবং সুস্থ অন্য সৈনিকদের মতো প্রতিপক্ষদের উপর আক্রমণের কাজে পুরোপুরি শরিক থাকে।

## দু'আর প্রভাব

ডাক্তার নূর আহমাদ নূর সাহেব বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আমার এক ছেলে খুব আহত হয়েছিল। মাথার অর্ধেক পিষে গিয়েছিল। মুরগীর মতো ছটফট করছিল সে। চিকিৎসকরা মস্তিষ্ক অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন আমি একটু পরেই হাসপাতাল থেকে বের হয়ে সদকা করলাম এবং দুই রাকাআত নামাজ পড়ে দু'আ করলাম। এসব করতে করতে আমার প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লেগে গেল। তারপর হাসপাতালে ফিরে এসে দেখি, ছটফট করা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অপারেশনও স্থগিত করা হয়েছে। এভাবে আল্লাহপাক অপারেশন ব্যতীত আমার ছেলেকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে দিয়েছেন।

## বরকতময় আয়াতের প্রভাব

আমাদের এক প্রফেসরের বোন ছয় মাস ধরে জ্বরে ভুগছিল। গত ছয় মাসে দুনিয়ার যত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা ছিল, সবই একে

একে শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোনোভাবেই তার জ্বর উপশম হচ্ছিল না। মহিলা আমার চিকিৎসালয় ওয়ার্ডে আসল। আমি তাকে বলে দিলাম, অমুক আয়াতে কারীমা পড়তে থাকুন! আল্লাহর হুকুম না হওয়া পর্যন্ত ঔষধে কোনো কাজ হবে না। রোগের উপরও প্রভাব পড়বে না। সুতরাং আল্লাহ্ অভিমুখী হয়ে তাঁর সুদৃষ্টি কামনা করাই আসল পন্থা। প্রথমে তো মহিলা আয়াত পড়তে অনাগ্রহী ছিলেন; কিন্তু যখন জ্বর কমতে শুরু করে, তখন রাত-দিন সর্বদা

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

(লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্‌তু মিনায যোয়ালিমীন)

আয়াতে কারীমাটি পড়তে থাকেন। মাত্র ৭ দিনের মধ্যে আল্লাহ্ তাঁর কালামের বরকতে মহিলাকে আরোগ্য দান করেন।

## জনৈক প্রফেসরের আরোগ্য লাভ

আমাদের এক সহযোগী অধ্যাপক মারাত্মক পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হয়ে আমার চিকিৎসাধীনে আসেন। হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ড তাকে আর কোনো চিকিৎসার উপায় নেই বলে রিলিজ করে দিয়েছিল। কেউ তাঁর নিকট এ সংবাদ পৌছালে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি শুরু করে দেন।

আসরের নামাযের পর ওয়ার্ডের এক নার্স এসে আমাকে বলল, নিরুপায় হয়ে তিনি এখন কান্নাকাটি করছেন। ফলে আমি তার নিকট উপস্থিত হলাম। কেননা তিনি কুরআনে হাফেয ছিলেন। তাঁকে সূরা ইয়াসীন এবং বিভিন্ন আয়াতে কারীমার ফযীলত ও গুনাগুণ শুনিয়ে বললাম– আল্লাহর উপর আমার বিশ্বাস আছে। আপনি এ কালামে পাক একীনের সাথে পড়লে আপনার শেফা হবে।

প্রফেসর সাহেব আমার কথা স্বীকার করলেন এবং রাতদিন সর্বদা সূরা ইয়াসীন ও সেসব আয়াতে কারীমার অযীফা পড়তে থাকেন। আল্লাহর কি কুদরত! দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি পরিপূর্ণ সুস্থতা লাভ করেন। অথচ এ জাতীয় পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা দুনিয়ার কোথাও নেই।

## সূরা ইয়াসীনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন কিতাবপত্রে অনেকবার পড়েছি, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পড়বে সে পরিতৃপ্ত হবে। পথভোলা ব্যক্তি পড়লে পথ পেয়ে যাবে। খাদ্য কম হয়ে যাওয়ার ভয়ে যে পড়ে, সে যথেষ্ট খাদ্য পাবে। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর ব্যক্তির নিকট পড়লে মৃত্যুকষ্ট লাঘব হয়। প্রসব কষ্টে পতিত মহিলার নিকট পড়লে সহজে বাচ্চা প্রসব হয়। উল্লেখিত সকল সমস্যায় আমি সূরা ইয়াসীন পড়েছি এবং হুবহু উপরিউক্ত উপকারই পেয়েছি।

## জনৈক রোগীর করুণ কাহিনী

আমার এক রোগী মৃত্যু কষ্টে পতিত হয়েছিল। চেহারার রং পীতবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। চোখ বসে গিয়েছিল এবং চরম ছটফট করছিল। এমতাবস্থায় আমি আস্তে আস্তে সূরা ইয়াসীন পড়া শুরু করলাম এবং চিকিৎসকদেরকে চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ দিলাম। আমি যখন সূরা ইয়াসীন পড়া সমাপ্ত করলাম, তখন তার চেহারা হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে গেল এবং শ্বাস বন্ধ হয়ে সে আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেল। দেখলাম উভয় চোখ থেকে পানি তার চোয়ালের উপর গড়িয়ে পড়ল। সূরা ইয়াসীন পড়ার পূর্বে বেচারা খুব কঠিন ও সংকটপূর্ণ অবস্থায় ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামের বরকতে মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণা সহজ করেছেন।

## আরও একটি ঘটনা

কয়েক বৎসর পূর্বে মুলতান থেকে আমি ফোকার বিমানে যাত্রা করি। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের চলন্ত বিমানটি প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ে। ফোকার বিমান হালকা-পাতলা হওয়ার কারণে তখন খুব নড়াচড়া করছিল। যাত্রীরা তো দুশ্চিন্তায় অস্থির। আমি সূরা ইয়াসীন পড়া শুরু করলাম। এরই মধ্যে প্রবল ঝড় বিমানকে ভারতে নিয়ে গেল। সেখানে সতর্ক সংকেত পাওয়ার পর পাইলট প্রত্যাবর্তনের দিক ঠিক করল এবং আমরা নিরাপদে মুলতান পৌঁছলাম। মুহূর্তের মধ্যে যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। কিন্তু তা থেকে আল্লাহ তা'আলা তার কালামের বরকতে আমাদেরকে ভালয় ভালয় ঘরে পৌঁছে দিলেন।

## কষ্টকর সফর

একবার আমরা পাহাড়ের উপর সফর করছিলাম। হঠাৎ গাড়ী নষ্ট হয়ে গেল। ইফতারীর সময়ও ছিল খুব নিকটবর্তী। কিন্তু সাথে এক বিন্দু পানিও ছিল না। সবাই ভেঙ্গে পড়েছিল। কারণ, চারিদিকে পাহাড়-পর্বত ব্যতীত কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমাদের ডাক্তার সাহেব ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়-ভীতি ইত্যাদি অবস্থায় সূরা ইয়াসীন পড়তে বলেছিলেন। দুশ্চিন্তার মধ্যে সকল সঙ্গীসাথী সূরা ইয়াসীন পড়া শুরু করলাম। হঠাৎ কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই একটি খালী গাড়ি আমাদের নিকট এসে থেমে গেল এবং আমাদেরকে গাড়িতে আরোহণ করতে বলা হল। আমরা সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম, কিভাবে আল্লাহ্ তাআলা মরুভূমির মধ্যে আমাদের জন্য সহজে সুন্দর ব্যবস্থা করে দিলেন। গাড়ীর চালককে জিজ্ঞাসা করা হলে আশ্চর্যজনক কথা শুনিয়ে বলল, সে অন্য কোনো দিকে যাচ্ছিল; কিন্তু ভুলক্রমে এদিকে এসে পড়েছে। সুতরাং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে সকল বন্ধু নিরাপদে ঘরে পৌঁছলাম।

## জনৈক অলিআল্লাহর ঘটনা

১৯৫২ সালে আমি এম.বি.বি.এস এর ছাত্র ছিলাম। মুলতানের এক বাগানে রাতে সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারী মরহুমের মাহ্ফিল ছিল। আমার আব্বা আমাকে সাথে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। মাওলানা বুখারী রহ. এশার নামাযের পর ওয়ায শুরু করেন এবং ফজরের আযান শেষ হওয়ার পর সমাপ্ত করেন। আনুমানিক রাত একটার সময় লোকজন নিদ্রাবিষ্ট হতে শুরু করলে তিনি সূরা ইয়াসীন পড়া আরম্ভ করলেন। আল্লাহ্ তার মুখে এত প্রভাব রেখেছিলেন যে, ঘুমন্ত লোকজন জেগে উঠল।

এ সময় সমস্ত লোকদের মধ্যে সাদা রংয়ের মেঘ গাছের উপর ছেয়ে গেল। সে মেঘের মধ্যে সাদা রশ্মি দেখা গেল। আমি আমার আব্বাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও সে দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান। একে একে সবাই এ দৃশ্য অবলোকন করল। প্রায় একঘণ্টা মেঘ মালাটি সবাইকে ছায়া দিয়ে রাখে। অবশেষে যখন বুখারী সাহেবের সূরা ইয়াসীন সমাপ্ত হয়, তখন মেঘ খণ্ডটি একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর বুখারী সাহেব বলেন, আল্লাহর অন্য মাখলুকাত আল্লাহর কালাম শুনতে এসেছিল অর্থাৎ

ফেরেশতা। আমার আব্বা বলেন, ১৯৪২ সালে রাজনপুরে শুদ্ধি আন্দোলনে ধরপাকড় হয়। হিন্দুরা জোরপূর্বক মুসলমানদেরকে ধরে হিন্দু বানাচ্ছিল। ফলে ছয় সাতটি পরিবার হিন্দুও হয়ে গেল। মাথার উপর চুলের খোপা রাখল এবং মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তিপূজাও করা শুরু করল। মুসলমানদের মধ্যে খুব অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। সেখানকার ডাক্তার, ও.সি, পুলিশ সকলেই ছিল হিন্দু। মুসলমানরা কিছুই করতে সক্ষম হল না। অবশেষে মুসলমানদের মিটিং হল। আমার আব্বাকে পাঠানো হল আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারীকে নিয়ে আসার জন্য।

শাহ্জী রহ. রাজনপুর এলে অসংখ্য লোক তার বক্তব্য শ্রবণের জন্য একত্র হল। তিনি অভ্যাস মতো সূরা ইয়াসীন পড়লেন। ফলে আল্লাহর কালামের এত প্রভাব পড়ল যে, কেবল মুরতাদ মুসলমানরাই ইসলামে দাখেল হল না বরং তাদের সাথে অনেক হিন্দুও কুরআন শ্রবণ করে মুসলমান হয়ে গেল। ১৯৪৫ সালেও এরূপ আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। রাজনপুরের মুসলমানরাও পুনরায় শাহ্জী রহ. কে আহ্বান করল, তখন হিন্দুরা আত্মগোপন করল। ফলে শুদ্ধি অভিযান শেষ হয়ে গেল।

### প্রসব কষ্ট লাঘবে ইয়াসীনের প্রভাব

সূরা ইয়াসীনের বরকত ইতোপূর্বে বহুবার পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হয়েছে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমার এক বোন সন্তান প্রসব সমস্যায় পড়ে ক্লিনিকে ভর্তি হন। মহিলা ডাক্তার চেকআপ করে বলল, বাচ্চা উল্টা অবস্থায় আছে। প্রসব হতে আনুমানিক ১২ ঘন্টা সময় লাগবে। তখনও যেহেতু যথেষ্ট সময় ছিল, তাই আমি সূরা ইয়াসীন পড়ে ফুঁ দিয়ে মহিলাকে পানি পান করিয়ে দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আধ ঘণ্টার মধ্যে সন্তান প্রসব করে মহিলা ঘরে ফিরে গেল। তারপর মহিলা-ডাক্তার রোগীকে লেবার রুমে আনার জন্য নার্সকে যখন টেলিফোন করে, তখন উত্তরে বলেন– তিনি সন্তান প্রসব করে ঘরে চলে গেছেন। কোনো প্রকার সমস্যাও দেখা দেয় নি। এতশ্রবণে মহিলা ডাক্তার আমাকে ফোন করে বললেন, এটা কিভাবে সম্ভব হল? আমি বললাম, সূরা ইয়াসীনের বদৌলতে; আল্লাহর মেহেরবানীতে। তখন ডাক্তার হতবাক হয়ে গেলেন।

এর কয়েক মাস পর আমার এক মহিলা ভক্তের সন্তান প্রসবের কথা ছিল। মহিলা ডাক্তার ১২ ঘণ্টা পরে প্রসব হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু সূরা ইয়াসীনের বরকতে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে নিরাপদে গর্ভ খালাস হয়ে গেল। ক্লিনিকের সকলে ঘটনা শুনে অবাক হয়ে যায়। আমি তাদেরকে সূরা ইয়াসীনের বরকত ও ফযীলতের কথা শুনালে আরও বিস্মিত হয়। মোটকথা, আমাদের ও দীনের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ আমাদের মধ্যে তাঁর কালামের একীন পয়দা করার তাওফীক দান করুন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আসলাম মরহুম নাশতার কলেজ মসজিদের খতীব ছিলেন। একদিন তাঁর সাক্ষাতে গিয়ে দেখলাম, একজন গরীব লোক বসে কাঁদছে। তাকে বলছে, আমার স্ত্রী দুদিন যাবৎ ক্লিনিকে পড়ে আছে। তার সন্তান প্রসব হবে। কিন্তু অনেক বিলম্ব হচ্ছে। ডাক্তাররা অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইতোপূর্বে ঔষধপত্র ও চিকিৎসায় বেশ টাকা খরচ করা হয়েছে। দুই ব্যাগ রক্ত কেনার টাকাও প্রয়োজন।

তখন উক্ত মাওলানা মরহুম একটি পাত্রে কিছু পানি চাইলেন। ইয়াসীন সূরা পড়ে পানিতে দম করে রোগীকে পান করানোর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। আল্লাহর কি অপূর্ব শান! উক্ত পানি পান করানোর সাথে সাথে মহিলার সন্তান প্রসব হয়ে গেল এবং অপারেশনের বিরাট প্রোগ্রাম খতম হয়ে গেল।

## সুন্নত তরীকায় সফর করার কতিপয় ঘটনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মুসলমানদেরকে দীনের উপর চলা অতি সহজ করে দিয়েছেন। তাঁর এক একটি তরীকা অর্থাৎ সুন্নত গোটা বিশ্ব থেকে অধিক মূল্যবান। প্রতিটি মানুষ সফর করে। সুতরাং আমরা যদি রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকায় সফর করি, তবে সর্বপ্রকার বিপদাপদ ও দুর্ঘটনা থেকে নিরাপদ থাকব ইনশাআল্লাহ ।

কয়েক বছর পূর্বে Pia তে কয়েকবার দুর্ঘটনা ঘটেছিল। PIA কর্তৃপক্ষকে সুন্নত তরীকায় সফর করার পরামর্শ দেওয়া হয়। সুতরাং যখন থেকে দু'আ পড়ে সুন্নত তরীকায় সফর শুরু করে, তখন দুর্ঘটনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করা হল।

## দুর্ঘটনায় আমার জনৈক বন্ধুর নিরাপদ থাকা

একবার আমার এক বন্ধু বাসযোগে রাজনপুর থেকে ডেরাগাজী খান যাচ্ছিলেন। সফরের পূর্বে তিনি সুন্নাত মতো দু'আ-দরূদ পড়ে নেন। পথিমধ্যে সীটে বসে ঘুমিয়ে যান এবং বাসটি দুর্ঘটনায় পড়ে উল্টে যায়। আহত যাত্রীদের চীৎকারে তার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি ব্যতীত সকল যাত্রী আহত হয়। গাড়ি থেকে বের হয়ে অন্যান্য যাত্রীদের সাহায্য করেন এবং আহতদের হাসপাতালে পৌছান। আমরা যদি সকল চালক ও কন্ট্রাক্টর, হেলপার ও সংশ্লিষ্টদের সুন্নত তরীকায় চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করতাম এবং এ নুরানী তরীকাকে ট্রেনিংকোর্সের অন্তর্ভুক্ত করতাম, তবে দৈনন্দিন দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি পেতাম।

মূলকথা হল, আমাদের উচিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রদর্শিত সুন্নত তরীকাকে আমাদের জান, মাল, ও ইজ্জতের চেয়ে অধিক প্রিয় মনে করা।

### ফয়সালাবাদ সফর

আমি একবার মুলতান থেকে কার যোগে ফয়সালাবাদ এক রোগী দেখার জন্য গিয়েছিলাম। আমাকে সামনের সীটে চালকের সাথে বসানো হল। গাড়ি যাত্রা শুরু করল। ঝঙ্গের নিকট বৃষ্টি হওয়ার কারণে সেখানে পানি জমে গিয়েছিল। রাস্তা কর্দমাক্ত হওয়ায় গাড়ি প্রায় দুর্ঘটনার শিকার হতে যাচ্ছিল। সেখানে একটি পুল ছিল। তার চারপাশ পানিতে ভরপুর ছিল। কয়েকটি বাস-গাড়িও পুল থেকে ছিটকে পড়েছিল পানিতে। আমাদের গাড়ী সেখানে পৌছলে পিছলাতে শুরু করে। আমি জিজ্ঞাসা করলে চালক বলল, গাড়ী পিছলে যাচ্ছে। কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না। সম্মুখের দোকানদার ও লোকেরা 'মারল', 'মারল' বলে চিৎকার করে উঠল। গাড়ি পানিতে পরিপূর্ণ একটি গর্তের দিকে যাচ্ছিল। একেবারে গর্তের মুখের কাছাকাছি হলে হঠাৎ পিছনে সরে এসে পুলের উপরে উঠে গেল এবং বিপদমুক্ত হয়ে গাড়ি থেমে গেল। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে গাড়িসহ আমরা দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলাম। অনেক লোকের ভিড় জমে গেল। বুঝে আসছিল না যে, কে এ গাড়ি পিছনে নিয়ে গেল আবার কে-ই বা

পুলের উপর উঠিয়ে দিল? আমাদের সকলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সুন্নত তরীকায় সফর করার কারণে আমরা বড় ধরনের বিপদ থেকে বেঁচে গিয়েছি। আল্লাহ্ আমাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার উপর চলে উভয় জগতের সফলতা অর্জন করার পাকাপোক্ত একীন দান করুন। আমীন।

## রাত্রিকালীন সফর

১৯৮০ সালে আমি ভাওয়ালপুরে চাকরি করতাম। একরাতে সংবাদ পেলাম, রাজনপুরে আমার আব্বা গুরুতর অসুস্থ। সেখানে আমার এখনই যেতে হবে। সুতরাং আমি পরিবার-পরিজন নিয়ে রাতের গাড়িতে যাত্রা করলাম। তৎপূর্বে দু'আ-দরূদ পড়ে নিলাম। খানপুর পৌঁছে দেখলাম, রাস্তা ভেঙে খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছে। কোনো রকমে একটি একটি করে গাড়ি পার হচ্ছে। এক স্থানে এসে আমার গাড়ি, বাস ও ট্রাকের মাঝখানে আটকা পড়ে গেল। আমি চালকদের নিকট অনুরোধ করলাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে? ট্রাক চালক আমার গাড়ির এক পাশে ধাক্কা দিল। ফলে কার প্রচণ্ড বেগে কেঁপে উঠল। ভিতরে বাচ্চারা উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। এ অবস্থা দেখে বাস ও ট্রাক চালক পালিয়ে গেল।

আমি নিচে অবতরণ করে পরীক্ষা করে দেখলাম, গাড়ীতে একটু আঁচড় লাগা ব্যতীত আর কিছুই হয় নি। আর গাড়ি টান দিলে ঠিকমতো চলা আরম্ভ করে। এভাবে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম। এত বড় মারাত্মক দুর্ঘটনা থেকে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নতের উপর আমল করার কারণে রক্ষা করলেন।

## দুর্গম পাহাড় সফর

কয়েক বৎসর পূর্বে এক সফরে পাহাড়ের উপর আরোহণ করেছিলাম। প্রতি কদমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রদর্শিত তরীকায় আল্লাহু আকবর বলে চলছিলাম। এ সফর ছিল ভয়ংকর বিপজ্জনক। কেননা পাহাড়ের নিচে ছিল সিন্ধু সাগর। বৃষ্টির কারণে রাস্তা ছিল পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত। আমাদের সঙ্গে জনৈক পাঠান বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি চিৎকার দিয়ে আল্লাহু আকবার পড়তে পড়তে এগিয়ে চলছিলেন।

এরই মধ্যে বৃদ্ধ পাঠানের পা ফসকে যায় এবং পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। আমরা সবাই গড়িয়ে যেতে দেখলাম। ভাবলাম আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ তাকে সিন্ধু সমুদ্র থেকে বাঁচাতে পারবে না। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম, তিনি ইট পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছেন এবং ঝোপ-ঝাড় ধরে রেখেছেন। তখন আমরা একটি রশি ঝুলিয়ে দিলাম এবং তাকে নিরাপদে টেনে উপরে উঠালাম। অথচ নিচে সোজাসুজি সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। বৃদ্ধ পাঠানকে উদ্ধার করার পর তার সমস্ত শরীর স্বচক্ষে পরীক্ষা করে দেখলাম, দুটি স্থানে অতি সাধারণ আঁচড় ব্যতীত আর কোনো অসুবিধা হয় নি বরং সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ আছেন। আমাদের মতো চলাফেরা ও পায়চারী করছেন। তাঁর আত্মরক্ষার কারণ কি? জিজ্ঞাসা করলে তিনি তৎক্ষণাত উত্তর দিলেন, আমি নবীজীর সুন্নত অনুসরণ করে উপরে উঠছিলাম, সেজন্য দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করেছেন।

### মসজিদে আসা-যাওয়ার আদব

মসজিদ যেহেতু আল্লাহ্র ঘর সেহেতু খুব আদবের সঙ্গে মসজিদে প্রবেশ করা উচিত। ভিতরে অবস্থানের সময়ও আদবের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। বাইরে বের হওয়ার সময়ও সুন্নত তরীকা অনুসরণ করবে। গরমের দিন আমি একদিন মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। বাম পা জুতার উপর রাখতেই একটু চাপ পড়ল। তখন বুঝলাম। ভিতরে কিছু একটা ছিল। পদপিষ্ট হয়ে সেটি মারা গিয়েছে। জুতা খুলে দেখি, একটি বিষাক্ত বিচ্ছু মরে পড়ে আছে। যদি সুন্নতের পরিপন্থী ডান পা আগে রাখতাম, তবে উক্ত বিচ্ছুটি আমাকে দংশন করত। সুন্নতের বরকতে আল্লাহ্ পাক এ অনিবার্য দুর্ঘটনা থেকে আমাকে রক্ষা করলেন।

### কাপড় পরিধান করার তরীকা

মুরব্বীদের নিকট শুনেছি, কাপড় পরিধান করার সময় তা ভালো করে ঝেড়ে নিও। তদ্রূপ শোয়ার সময় বিছানাপত্র উত্তমরূপে পরিষ্কার কর ও ঝাড়া দাও। তারপর গরমের সময় একদিন কাপড় পরিবর্তন করছিলাম, মনে হল কাপড়টা প্রথমে ঝাড়া দেই। যখনই সেলোয়ার ঝাড়া দিলাম, দেখলাম- একটি বিচ্ছু টপ করে নিচে পড়েছে। সাথে সাথেই বিচ্ছুটিকে মেরে ফেললাম। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন।

## একটি সুন্নতের বরকত

আগের কালে দাড়ি রাখাটা বড়ই কষ্টকর ছিল। বিশেষ করে সরকারী চাকরি জীবীদের জন্য। ১৯৫৭ সালে আমি কমিশনের সাক্ষাৎকার বোর্ডে গেজেটেড পোষ্ট মেডিকেল অফিসারের জন্য উপস্থিত হই। এম.বি.বি.এস রেকর্ডপত্র মোতাবেক আমি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ছিলাম। এছাড়া আমার কাছে অনেক সনদপত্র ছিল। কিন্তু সুন্নত সম্মত দাঁড়ির কারণে আমাকে বলা হল, আমরা একজন অফিসার চাচ্ছি; মসজিদের ইমাম নয়। এভাবে আমাকে বাছাই বোর্ড থেকে বাদ দেওয়া হল। আমি ধৈর্য ধরলাম। পরবর্তীসময়ে দ্বিতীয় বাছাইতে মনোনীত হয়েছি, তবে ১৫০ জন অফিসারের জুনিয়ার হিসেবে। পরবর্তীসময়ে আল্লাহ তা'আলা তার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নত অনুযায়ী চলার কারণে খুব সম্মান ও মর্যাদা দান করলেন। আমি অন্যান্যদের চেয়ে অতিরিক্ত দুটি উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করায় অতি দ্রুত প্রফেসর হয়ে ১৫০ জনের সিনিয়র হয়ে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নতের উপর আমল করলে কোনো কোনো সময় পরীক্ষা আসে বটে। কিন্তু ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এর প্রতিদান দেন।

# যইতুন তেলের মালিশ ও আধুনিক বিজ্ঞান

## হাদীসে রাসূল

✪ হযরত আমর ও হযরত আবু উসায়েদ রাযি. হতে বর্ণিত। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যইতুনের তেল খাও এবং মালিশের কাজে ব্যবহার করো। কারণ, তা বরকতময় বৃক্ষ থেকে তৈরি হয়। (শামায়েলে তিরমিযী)

✪ হযরত আলকামা বিন আমির বর্ণনা করেন, নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের জন্য যয়তুনের তেল আছে, তা খাও এবং শরীরে মালিশ করো। তা হলে অর্শ রোগ প্রতিরোধে খুব ফল পাবে। (আবু নাঈম)

✪ যয়তুনের তেল দ্বারা চিকিৎসা করো, তা খাও এবং শরীরে লাগাও। কেননা তা (যয়তুন) এক বরকতময় বৃক্ষ। (কানযুল উম্মাল)

✪ যয়তুনের তেল খাও এবং শরীরে লাগাও কারণ এর মধ্যে সত্তরটি রোগের শেফা আছে। তন্মধ্যে একটি হল কুষ্ঠরোগ। (ইবনে মাজা, হাকেম)

মানব জাতির ইতিহাস যত পুরাতন, মালিশ বা ম্যাসেজের ইতিহাসও তত পুরানো। সহস্র বৎসর পূর্বে চীনের বাদশাহ্ ফু এর লেখাতে এর আলোচনা পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রিসেও চিকিৎসা হিসেবে ম্যাসেজ ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে নিয়মিত ম্যাসেজ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে আমেরিকান হেলথ একাডেমী ম্যাসেজের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি ফুটিয়ে তুলেছে।

আজকের যুগেও ম্যাসেজ মালিশের মতো উত্তম কোনো পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নি। কয়েক মাস পূর্বে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ফিজিওথেরাপিস্টের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি বললেন, আমাদের দলটি নিয়মিত ম্যাসেজ করে। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয়, কেবল কুস্তিগিরই নয়, পুরো আধুনিক খেলোওয়াড়রাও মালিশের উপর নির্ভরশীল।

অনেক সময় এমন রোগী আসে, যাদের চিকিৎসা কেবল ম্যাসেজ বা মালীশ দ্বারাই সম্ভব হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কারও হাই ব্লাড প্রেসার হলে, চোট লেগে ব্যাথা পেলে বা এধরনের কোনো সমস্যা দেখা দিলে, তাকে গরম ঔষধপত্র দেওয়া যায় না। এর পরিপূরক একমাত্র মালিশ। তবে মালিশ সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিকে দিয়ে করানো উচিত। মালিশকারীর হাত সাবান দ্বারা ধৌত করাতে হবে এবং নরম হতে হবে। হালকাভাবে মালিশ করবে। সমস্ত শরীর মালিশ করবে। বিশেষ করে কোমর, হাত, গর্দান, পিঠ ইত্যাদির উপর মালিশ করা জরুরি।

জনৈক ব্যক্তি মুমূর্ষ প্রায় ছিল। তিনি ছিলেন নেককার ও দীনদার মানুষ। সংবাদ পেয়ে আমি তার নিকট গেলাম। তিনি খুব দুর্বল এবং মৃত্যু পথযাত্রী ছিলেন। তখন আমি মালিশ করতে বললাম এবং নিয়মকানুন শিখিয়ে দিলাম। তারা এক মাস যাবৎ মালিশ করল। তিনি এমনভাবে সুস্থ হলেন যে, সবাই অবাক হয়ে গেল।

আমার কাছে, অস্থিগত দুর্বলতা, খিঁচুনী, মস্তিষ্কের অবসন্নতা, মানসিক অস্থিরতার শিকার যে-সব রোগী আসে, তাদের যাকেই মালিশ করতে বলি আর ঠিক মতো মালিশ করে, তার অনেক উপকার হয়। খেলোয়াড়দের জন্য এর উপকারিতা পরীক্ষিত। মুষ্ঠিযোদ্ধাদের খাদ্য কম হতে হবে এবং যয়তুন তেলের মালিশ তাদের জন্যে বেশি উপকারী।

এক ব্যক্তির ঘোড়া দৌড়ের শখ ছিল। তার অভ্যাস ছিল প্রথমে ঘোড়াকে হালকা যয়তুন তেল লাগিয়ে খুব মালিশ করত। তারপর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ফেলত। ফলে তার ঘোড়ার স্বাস্থ্য ঈর্ষণীয় হত। মানুষ আশ্চর্য হয়ে ভাবত, কি ঔষধ খাওয়ায়ে সে ঘোড়াকে এত মোটা তাজা করেছে। অথচ এ সুস্বাস্থ্যের রহস্য ছিল একমাত্র মালিশ। আপনি যদি মালিশের গোপন রহস্য পেয়ে যান, তবে বিশ্বের সব রকম চিকিৎসা ভুলে গিয়ে একমাত্র মালিশকেই বেছে নিবেন।

এক ব্যক্তি বলছিল, আমার অস্থির দুর্বলতা এত মারাত্মক ও কষ্টকর যে, চার হাজার টাকা খরচ করে একটি টীকা নিয়েছিলাম। কিন্তু একমাত্র মালিশ আমাকে পূর্ণ মাত্রায় উপশম করেছে।

✪ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তেল ব্যবহার কর এমন ব্যথায়, যা ঔষধে দূর হয় না। বিশেষ করে আঘাতের ব্যথায় যয়তুনের তেল অধিক উপকারী। ফিজিওথেরাপিষ্টরা পক্ষাঘাত, পোলিও, খিঁচুনী ইত্যাদি রোগীদেরকে যয়তুন তেলের মালিশ করতে দেন।

## মালিশ ও বিশেষজ্ঞগণ

"শরীর মালিশ করলে শক্তি বৃদ্ধি পায়"—এ একটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা এ বিষয়ে অবগত আছে। মুষ্টিযোদ্ধাদেরও শরীরে তেল মালিশ করা এবং ঘরের বয়োবৃদ্ধাদের বিশেষত কচি বাচ্চাদের শরীরে ঘি অথবা শুধু তেল মালিশ করা এ কথাই প্রমাণ করে যে, আজ সাধারণ মানুষও মালিশের উপকারিতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। শিশুর দুর্বল বুকের উপর মালিশ করলে বক্ষ দ্রুত শক্তিশালী হয়। দুর্বল বাচ্চাদের জন্য মালিশ একটি নিয়ামত। যেসব শিশুর বুক দুর্বল দৈনিক তাদের বুক মালিশ করতে হবে। পরিষ্কার হাতের তালু দিয়ে আস্তে আস্তে মালিশ করতে হবে। বুকের উপর বেশি চাপ দিবে না। দুর্বল বাচ্চাদের জন্য মাছের তেল বা যয়তুনের তেল বেশি উপকারী। মালিশ করলে রুক্ষতা দূর হয়। শরীর স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন হয়। মাথায় তেল মালিশ করলে চুল বৃদ্ধি পায়, চোখ ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি পায়। পা ও হাতের তালুতে মালিশ করলে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়। মালিশের জন্য গাভীর ঘি, বাদাম, যয়তুন ও সরিষার তৈল বিশেষ করে ঘানীর তেল অধিক উপকারী।

মালিশে ঠাণ্ডা, গরম, শ্লেষ্মা ইত্যাদির উপশম হয় এবং ক্লান্তি-শ্রান্তি ও অবসন্নতা দূর হয়। শরীর সুশ্রী ও শক্তিশালী হয়। মাথায় তেল মালিশ করলে মস্তিষ্ক ও চোখে সতেজতা আসে। সুনিদ্রা হয়। হাত ও তালুতে মালিশ করলে স্বপ্নদোষ হয় না।

সারা শরীরে মালিশ করা উচিত। বিশেষ করে মাথা, নাভী, হাত-পায়ের তালুতে মালিশ করা খুব উপকারী। নাক ও কানের মধ্যে তেল ঢেলে দেওয়া সীমাহীন উপকারী। অবশ্য জ্বর, কাশি, এলার্জি, বমি ইত্যাদি রোগীকে মালিশ করা নিষেধ। মনে রাখতে হবে, মালিশের পরপরই গোসল করা যাবে না। কমপক্ষে এক ঘণ্টা বিরতি দিতে হবে।

## ডাক্তার লেকসারের মতবাদ

ডাক্তার লেকসার মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লাস্টিক সার্জারী বিভাগের দায়িত্বে আছেন। তিনি একবার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানের বক্তব্যে বলেছিলেন, "দুনিয়ায় কুশ্রী লোকদের জীবিত থাকার অধিকার নেই। যখনই সৃষ্টিগত ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তখনই সে ঘাটতিকে পূর্ণ করা বিজ্ঞানের কাজ।" প্লাস্টিক সার্জারীর মাধ্যমে মানুষের শারীরিক ত্রুটি-বিচ্যুতি, ঘাটতি ইত্যাদি দূর করা যায়। আর মালিশ দ্বারা সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করা যায়। সুতরাং বলা যায়, সার্জারী হল মালিশের প্রকৃত বোন। ডাক্তার লেক্সার প্লাষ্টিক সার্জারীর মাধ্যমে অভিজাত রমণী, অভিনেত্রী ও কদাকার লোকদেরকে সুশ্রী ও সুদর্শন করে দিয়েছেন। তিনি মালিশ সম্পর্কে নিজের বিশাল অভিজ্ঞতা ও গবেষণা বর্ণনা করে বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদিগকে হতবাক করে দিয়েছেন।

## ডা. স্যার ওলিয়াম এর অভিজ্ঞতা

বিশ্ব মেডিকেল কনফারেন্সের সভাপতি অনানারেবল ডা. স্যার ওলিয়াম ওলসার তার বক্তব্যে মালিশ সম্পর্কে বলেন, "মালিশ বিজ্ঞান জগতের একটি পৃথক শাখা। এটা চিকিৎসা ও ব্যক্তির মূল নির্দেশনা মোতাবেক বাস্তবোপযোগী। অন্যান্য চিকিৎসার মতো এতে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবন্ধকতা নেই। সেজন্য এর ক্ষতির আশঙ্কা নেই। মালিশে অবশ্যই সুস্থ মানুষ সৌন্দর্য ও যৌবন লাভ করে আর অসুস্থ মানুষ লাভ করে সুস্থতা।

## শক্তি বৃদ্ধিতে মালিশের আশ্চর্য ক্ষমতা

জ্বালাপোড়া, আঘাত, আহত, মচকানো ইত্যাদির চিকিৎসা মালিশ দ্বারাই করা হয়। ইউনানী, আয়ুর্বেদিক এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাতে মালিশের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার রোগে বিভিন্ন উপায়ে মালিশ করতে হয়। রক্ত, শিরা ইত্যাদির উপর মালিশের খুব প্রভাব পড়ে। দুর্বল শরীর ও অবশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মালিশ করলে তৃপ্তি ও প্রশান্তি পাওয়া যায়। শরীরের যে অংশে সর্বদা তেল মালিশ করা হয়, সে স্থান সতেজ ও শক্তিশালী হয়। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোকই জানে, বিশেষ অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে মালিশ করলে তাতে রক্তপ্রবাহ গতিশীল এবং সতেজ হয়ে ওঠে। যৌনশক্তি বৃদ্ধিতে মালিশ অত্যন্ত কার্যকরি ভূমিকা পালন করে।

(১) রানের ভিতরের অংশ, (২) নাভীর পেছনের অংশ, (৩) মাথার পিছনের অংশ ও (৪) কানের উপরের পাশের অংশ। শরীরে এ চারটি অংশ বিশেষ অঙ্গের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে। এজন্য উক্ত চার অংশে খুব সতর্কতার সাথে উত্তমরূপে মালিশ করতে হবে। কারও কানের উপরে রগ কেটে দেওয়া হলে সে কাপুরুষ হয়ে যাবে। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এ অংশের শিরার সম্পর্ক সরাসরি বিশেষ অঙ্গের সাথে। অতএব এ অংশে মালিশ করা শক্তি বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত উপকারী। তদ্রুপ কানের উপরের অংশে দিনে দু-চার বার আস্তে আস্তে মালিশ করা শক্তি লাভের জন্য উপকারী।

## সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধির সর্বোত্তম উপায়

গ্রিস ও রোমের প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, এ দেশের মহিলারা মালিশ দ্বারা নিজেদের শরীরকে সুদর্শন করত। তাদের বিয়ের সময় পাত্রী পক্ষ থেকে পাত্রীর সাথে যে সেবিকা পাঠানো হত, তাকে মালিশ সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হত। গ্রিস রমণীদের ধারণা ছিল, শরীর মালিশ করায় বিশেষ করে কান, রান ও কোমর মালিশ দ্বারা সৌন্দর্য ও তারুণ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। সাম্প্রতিক কালেও সেখানকার মহিলারা শারীরিক সৌন্দর্য ও সুস্থতার জন্য মালিশ করে। প্রাচীন রোমের প্রত্যেক অভিজাত পরিবারে মালিশে অভিজ্ঞ সেবিকা থাকত। তারা প্রতিদিন ঘরের মহিলাদেরকে মালিশ করত।

বর্তমানেও তুরস্ক, ইতালী, গ্রিস, পারস্য, আরব, রোম প্রভৃতি দেশে মালিশের জন্য হাম্মামের প্রচলন আছে। এসব স্থানে বৈজ্ঞানিক পন্থায় শরীরের বিভিন্ন অংশে মালিশ করা হয়।

উপমহাদেশে মোগল আমলেও মহিলারা চন্দন, দুধের সর ইত্যাদি একত্রে পিষে তা দিয়ে মালিশ করত। ধনবতী রমণীরা পেস্তা, বাদাম, জাফরান, মোম, কুসুম, ফুল ইত্যাদি দুধের সাথে পেষণ করে চেহারার উপর মালিশ করত। মিসরের রমণীরা সরাসরি দুধ মালিশ করে। মিসরের বিশ্ব সুন্দরী ক্লিওপেট্টরার দুধে গোসল করা প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত। তার সেবিকারা দুধের সঙ্গে সুঘ্রাণযুক্ত তেল মিশ্রিত করে তার শরীরে মালিশ করত। ফলে তার শরীর সর্বদা সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আকর্ষণীয় থাকত। বর্তমানেও মিসরীয় রমণীরা পেস্তা, পাম ও যয়তুনের তেল শরীরে মালিশ করে। রোমের বাদশাহ নীরুর প্রেমিকা দুধে গোসল করত। হাত ও চেহারার উপর বেগুনী (ঔষধ বিশেষ) তেল মালিশের মাধ্যমে শরীর মসৃণ ও কোমল রাখত। আমার আপা স্কটল্যাণ্ডের পুতিবাদামের তেলের সাথে খোশবু মিশ্রিত করে শরীর মালিশ করিয়ে নিত। প্রখ্যাত নর্তকী সার ব্যানার্ড ফিটকড়ি, বাদামের তেল ও গোলাপের রস ইত্যাদি মালিশ করে নিজের দৈহিক সৌন্দর্য অটুট রাখত।

প্রাচীনকালে আফ্রিকার জঙ্গলের হাবশীদের নিয়ম ছিল, বিয়ের এক মাস পূর্ব থেকে পাত্রীকে দৈনিক মালিশ করা হত। তাদের বিশ্বাস ছিল এতে শরীরের সৌন্দর্য ও লাবণ্য ফিরে আসে। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়, শরীরের সুস্থতা, শ্রী ও লাবণ্য ধরে রাখার জন্য মালিশ অত্যন্ত জরুরি। মালিশের ফলে রক্তের মধ্যে ঘর্ষণ ও উষ্ণতা সৃষ্টি হয়। এতে রক্তের প্রবাহ গতিশীল হয়। রক্তের দূষিত ও বিষাক্ত পদার্থ পৃথক হয়ে যায়। লোমকূপের মাধ্যমে ঘামের সাথে দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায়। মোটকথা, মালিশ করলে শরীরে তেজ, শক্তি, চাঞ্চল্য ও উষ্ণতা সৃষ্টি হয়। ফলে শরীর সুস্থ ও সুশ্রী হয়ে ওঠে। (মেডিকেল সার্ভে অব ক্যাঙ্গ)

# আংটির পাথর ও আধুনিক বিজ্ঞান

## হাদীসে রাসূল

✪ হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি ছিল রূপার। নগীনা (পাথর) ছিল হাবশার। (শামায়েল তিরমিযি)

✪ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূপার আংটি পরিধান করতেন। নগীনা রূপার ছিল। কখনো কখনো আকীক পাথরের নগীনাও পরতেন। কখনো ডান হাতে আবার কখনো বাম হাতে পরিধান করতেন। তবে অধিকাংশ সময় তা ডান হাতে পরতেন এবং নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন। ( তানবীরুল আযহার)

✪ হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকীক পাথরের নগীনা ব্যবহার করেছেন। তবে নিঃসন্দেহে তিনি যাবতীয় সমস্যা ও বিপদাপদ দূর হবে এমন নিয়তে আদৌ নগীনা ব্যবহার করেন নি বরং হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিকাশের জন্য নগীনা ব্যবহার করেছেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সূর্যের রশ্মি পাথরের উপর পড়লে আরেক প্রকার রশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটায়। এ দ্বিতীয় রশ্মি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা দ্বিতীয় রশ্মি স্নায়ুবিক শৃঙ্খলায় খুব খারাপ প্রভাব ফেলে।

তবে তা ঠাণ্ডা হলে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ব্যতিক্রম হলে শরীরের উপর সর্বদা ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। পাথর সর্ম্পকে সাধারণ লোকেরা যা বলে, তা গুজব ছাড়া কিছুই নয়। আধুনিক বিজ্ঞান এর উপকারিতা সর্ম্পকে অধিক অবগত। তবে উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও রোগের উপকারিতা পর্যন্ত এর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া ভাগ্য পরিবর্তন, মামলায় জেতা, রাতারাতি কোটিপতি হওয়া ইত্যাদি ধ্যান-ধারণা, কাল্পনিক, মিথ্যা ও প্রতারণা বৈ আর কিছুই নয়। পণ্ডিৎ অমর নাথ তার বিশ্বাস অনুযায়ী আকীক সর্ম্পকে এরূপ কিছু মন্তব্য করেছেন, যে এগুলোকে ইসলামি আকীদা সম্মত (বৈধ) মনে করা যাবে না।

## আকীক পাথর

আকীক সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট বিখ্যাত একটি পাথরি মুক্তা। ইংরেজিতে একে এগেট (Agate) ও কাইলিন বলে। ফার্সী ও আরবিতে আকীক বলে। ইয়ামানী ও সংস্কৃতে হলীক বলে। এটা লাল, সাদা দুধ, হলুদ ও ঈষৎ লাল রংয়ের চকচকে পাথর। বিশ্বজুড়ে সর্বোৎকৃষ্ট পাথর হিসেবে ইয়ামানী পাথর সর্বজন স্বীকৃত। এর রং কলিজার মতো হয়।

## প্রাপ্তিস্থান

আকীক পাথর কংকরময় ভূমিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের তলদেশেও পাওয়া যায়।আকীক পাথর কংকরময় মরুভূমির সংযুক্ত মাটির এক পাতলা স্তরে খোঁজা হয়। সে জন্য তা অতি সহজে পৃথক করা যায়। এটা আকারে যবের দানার মতো হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আকীক পাথরের খনি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে জার্মানী, আরব, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, ইয়ামান, আমেরিকা, ভারতের গুজরাট, হায়দারাবাদ ও দাক্ষিণাত্য উল্লেখযোগ্য।

## আকীকের পরিচয়

আকীকের রং লাল সাদা, কাল, ঈষৎ লাল, হলুদ কাচের রংয়ের মতো প্রকার হয়। আকীক গোলাকারও হয়। এর রং রেখার মতো ছড়ানো ও বিক্ষিপ্ত হয়। আকীক ঘর্ষণ করলে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়।

## আকীক পাথরের প্রকারভেদ

মণিমুক্তা বিশেষজ্ঞগণ রঙের দিক দিয়ে আকীক পাথরকে নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত করেছেন।

(১) **রেবেণী আকীক :** অর্থাৎ রেশমী ফিতা আকীক এর মধ্যে একাধিক রঙের ভাজ থাকে। এ ভাজ পরস্পরকে অতিক্রম করে।

(২) **উন্ন আকীক :** একে সুলায়মানী আকীকও বলা হয়। এর উপর বিভিন্ন প্রকার রেখা থাকে।

(৪) **সারকদার আকীক :** এর রেখাগুলি গোলাকার হয়। তাই একে গোলাকার আকীক বলা হয়।

(৫) **আই আকীক :** এ আকীক চোখের আকৃতির মতো হয় অর্থাৎ এরূপ আকীকের রেখা কেন্দ্রে এবং রঙের রেখা বৃত্তের মধ্যে হয়।

(৬) রংধনু আকীক (ধনুক) : এ আকীকের রেখা বিনিত হয়ে ধনুকের আকৃতি ধারণ করে। একে সূর্যের সম্মুখীন করলে রংধনু বা প্রকাশ করে। পাথর যত পাতলা হয় এর গুণ তত বৃদ্ধি পায়।

(৭) রেবন আকীক : এ আকীক সাইবেরিয়া ও সিসিলী দ্বীপে পাওয়া যায়।

(৮) বরীশীজ আকীক : এ আকীকে রেবন আকীকের টুকরা সংমিশ্রিত থাকে।

(৯) ফার্টি ফিশন আকীক : এটা কয়েক প্রকারের হয়। কাটার সময় এর সমান্তরাল লাইনসমূহ ঘরের আকৃতির মত দেখায়। এতে এলইটি ও ভেকমকীটের টুকরা দেখা যায়।

(১০) মাস আকীক : একে উদ্ভিদসরূপ আকীক বলে। এটা বাদ সাহুনী ও লাল পাথর ইত্যাদি নামে পরিচিত। এর রং ঈষৎ লাল মিশ্রিত কালো ও হলুদ বর্ণের হয়।

(১১) পেলাসামা আকীক : এটা সবুজ ঘাসের রংয়ের মতো অর্ধ স্বচ্ছ হলুদ ও সাদা দাগ বিশিষ্ট আকীক।

(১২) সারু আনিস্ক আকীক : উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার আকীক ব্যতীত পারস্যের মণিমুক্তা বিশেষজ্ঞগণ নিম্নলিখিত আকীকসমূহের কথা উল্লেখ করেছেনঃ

(১) লাল ও কলিজী : এর ভিতরের রং বাহিরের রং অপেক্ষা অধিক লাল।

(২) বাবাগীরী : এরূপ আকীককে সুলায়মানী আকীকও বলে। এতে গোলাকার নিশানা হয়।

(৩) আবলাকী : এটা কিছু সাদা ও কিছু কালো রংয়ের হয়।

(৪) হাকাক আকীক : এটা খুব স্বচ্ছ নয় এবং আয়নার মতো প্রতিবিম্ব ধারণের শক্তি রাখে না।

(৫) শাজারী : এটা আকৃতিতে বৃক্ষ বা পাহাড়ের সাদৃশ হয় অর্থাৎ গাছের শাখা-প্রশাখার মতো দেখায়।

(৬) যু-তবকাতী : একে জওয়াজও বলে। এটা অভ্রের মতো ভাঁজ ভাঁজ হয়।

(৭) স্বচ্ছ আকীক : এটা খুব পরিষ্কার এবং এতে আয়নার মতো প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়।

এছাড়া উৎকৃষ্ট ও উন্নত মানের পাথরকে পাশ্চাত্য আকীক এবং সস্তা ও নিম্নমানের আকীককে প্রাচ্য আকীকও বলে। তবে মিসরে সবুজ রংয়ের আকীককে এন্টাস, কাল রংয়ে আকীককে সুলাইমানী আর মেটে রংয়ের আকীককে গৌরি আকীক বলে। সর্বোৎকৃষ্ট ও উন্নতমানের আকীক বলতে ইয়ামানী আকীককে বুঝায়।

## আকীকের রহস্যজনক বৈশিষ্ট্য

আকীক পাথর ব্যবহার করলে রাগ-গোস্বা দূর হয়। শত্রুর মনে ভীতি সৃষ্টি হয় এবং তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ হয়। বুকের মধ্যে কখনও ব্যথা হয় না। যে আকীক ব্যবহার করে বিষাক্ত পোকা-মাকড় তার কাছে আসতে পারে না, এটা হার্টকে (হৃৎপিণ্ডকে) শক্তিশালী করে। আকীক ব্যবহার করলে তা আলো থেকে উত্তাপ সঞ্চয় করে শরীরে সরবরাহ করে, ফলে ভাল ও ইতিবাচক ফল দেখা যায় এবং স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ন থাকে।

এ আকীক পাথর ব্যবহার করলে খিট খিটে মেজাজ ও বিরক্তি দূর হয়। হৃৎপিণ্ডের কম্পন সচল রাখে এবং মনের অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যতাকে দূর করে। আকীকের আরেকটি রহস্যজনক বৈশিষ্ট্য হল অন্তরের নেফাকী (কপটতা) দূর করে এবং ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

মোটকথা, আকীক পাথর সকল নর-নারীর জন্য উপকারী ও কল্যাণকর। দার্শনিক প্লেটো বলেন, সাদা আকীক পরলে মানুষের মান-মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তদ্রুপ হলুদ আকীক ব্যবহার করলে তাড়াতাড়ি মনের আশা পূরণ হয়।

এ পাথর পরিধান করলে সফরেও বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বলা হয়, যে ব্যক্তি কর্পূর, আম্বর ও আকীকের চূর্ণ মিশ্রিত করে মাথার উপর রেখে বিচারকের নিকট যাবে বিচারক তার প্রতি সদয় হবে।

## চিকিৎসা বিজ্ঞানে আকীকের বৈশিষ্ট্য

আকীক ব্যবহারে মেজাজ ঠাণ্ডা ও শুষ্ক থাকে। নিয়মানুযায়ী এর সুরমা ব্যবহার করলে চোখের রোগ-ব্যাধিতে উপকার হয়। দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। তা মাজনের মতো দাঁতে ব্যবহার করলে পাইরিয়া (ক্ষয়) দূর হয়। দাঁত দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। দাঁত শক্ত, ঝকঝকে সাদা ও স্বচ্ছ হয়। তদ্রুপ মুখ ভরে রক্ত আসা, আঘাত পেলে রক্ত পড়া ইত্যাদিও বন্ধ হয়। এর

কুশতা (উত্তেজক ঔষধ) হৃৎপিণ্ডের কম্পন রোধ করে। মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে এর ব্যবহার খুবই উপকারী হয়। পুরাতন জখমের চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য আকীকের কুশ্‌তা মলমের মতো উপকার দেয়। মেয়েদের আভ্যন্তরীণ জটিল রোগ-ব্যাধিতেও এর উপকারিতা প্রমাণিত। ফুসফুস থেকে রক্ত আসা বন্ধ করে দেয়। মূত্রথলী ও পেশাবের নলের কার্যকারিতা সচল রাখে।

## তালবীনা ও আধুনিক বিজ্ঞান

### হাদীসে রাসূল

✪ হযরত আয়শা সিদ্দীকা রাযি. রোগের জন্য তালবীনা তৈরি করার হুকুম দিতেন। বলতেন, রোগী যদিও এটা অপছন্দ করে কিন্তু রোগের জন্য তা অত্যন্ত উপকারী। (বুখারী)

✪ হযরত আয়শা সিদ্দীকা রাযি.থেকে আরও বর্ণিত আছে, যখন কেউ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ক্ষুধা-কষ্টের অভিযোগ করত, তখন তিনি তাকে তালবীনা খাওয়ার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন, আল্লাহর কসম! যার হাতে আমার জীবন! এটা তোমার পেটের অসুখ এমনভাবে দূর করবে, যেমন : তোমাদের মধ্যে কেউ পানি দ্বারা চেহারাকে ধৌত করলে ময়লা দূর হয়।

### পরীক্ষিত ঔষধ

তালবীনা দুধ, বার্লির গুড়া ও মধু মিশিয়ে করা হয়, যা অত্যন্ত সুস্বাদু। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবারে যখন কেউ অসুস্থ হত, তখন তিঁনি তালবীনা তৈরি করার নির্দেশ দিতেন। বলতেন, এটা শরীরের দুর্বলতা ও দুশ্চিন্তা দূর করে। যেমন, পানি দ্বারা মুখ ধৌত করলে মুখের ময়লা দূর হয়।

অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত যে, তালবীনা নিম্নলিখিত রোগের জন্য পরীক্ষিত ও অদ্বিতীয় ঔষধ

(১) হৃৎপিণ্ডের কম্পন ও উচ্চ রক্তচাপ।

(২) রক্তে চর্বি ও ঘনত্ব বৃদ্ধি।

(৩) হৃৎপিণ্ডের ভাল্বের জটিলতা।

(৪) পাকস্থলীর শুষ্কতা ও উষ্ণতা।

(৫) পাকস্থলীর এসিড ক্ষরণ।

(৬) দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা।

(৭) ক্ষুধার কষ্ট।

(৮) অসুস্থতার পর দুর্বলতা।

(৯) সার্বক্ষণিক কোষ্ঠ-কাঠিন্য।

(১০) গর্ভবতী মহিলার জন্য উপকারী।

(১১) বাচ্চাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট টনিক।

(১২) কুমন্ত্রণা ও মনের ভয়ভীতি দূর করার জন্য অদ্বিতীয়।

(১৩) পেশাবজনিত রোগ-ব্যাধির বিশেষ জ্বালাপোড়ায় খুব উপকারী।

(১৪) যকৃতের ইনফেকশন (পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া) ও এর অকৃতকার্যতায় ব্যবহার করলে খুব উপকার পাওয়া যায়। যাদের যকৃতের মধ্যে বারবার পাথর হয়, তারা সর্বদা ব্যবহার করলে ঘনঘন পাথর হওয়াকে রোধ করে।

(১৫) কোনো কোনো রোগে পেশাবের রাস্তা দিয়ে পুঁজ ইত্যাদি আসলে সে অবস্থায়ও তালবিনা উপকারী ও পরীক্ষিত।

(১৬) যারা মস্তিষ্কের পরিশ্রমজনিত কাজে জড়িত থাকে, তাদের জন্য এটি আশার আলো ও শান্তিদায়ক।

## মায়ের দুধ ও আধুনিক বিজ্ঞান

### বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞগণের মতে মা যখন তার শিশুকে দুধ পান করান, তখন (দুধের) সাথে অনুভূতিহীন তরঙ্গ ও স্পন্দন তার (শিশুর) মধ্যে চলে যেতে থাকে। ফলে এই স্পন্দন ও তরঙ্গই শিশু ও মায়ের মধ্যে ভালবাসা, স্নেহ-মমতা, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাবোধের কারণ হয়। চিন্তা করুন, যে মা শিশুকে তার বুকের দুধ পান করান না রবং কৃত্রিম ডিব্বার দুধ (সাদা বিষ) পান করান এবং সেবিকা ও আয়া দিয়ে লালন-পালন করান, এবং এভাবেই একদিন সে বড় ও যুবক হয়ে যায়, তারা মায়ের মিষ্টি দুধ পান না করার দরুন তার মায়া-মমতা লাভ করে না, তার কোলের উষ্ণতা পায় না। এমন সন্তানের কাছ থেকে মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের আশা কিভাবে করা যায়?

ইউরোপের ছেলেরা বস্তা ঝুলিয়ে বাজার থেকে বার্গার এনে খায়। তারপর স্কুলে দৌড়ায়। বর্তমানে আমাদের দেশের অভিজাত পরিবারের

বাচ্চাদেরও ওই একই অবস্থা। এতে মায়ের স্বহস্তে নাস্তা তৈরি করে বাচ্চাকে খাওয়ানোর সৌভাগ্য হয় না। যে মা ছেলে-মেয়েদের নাস্তা তৈরি করে খাওয়ালে এর মাধ্যমে মায়া-মমতা, আবেগ, উদ্দীপনা, স্নেহশীলতা ইত্যাদির স্পন্দন ও শিহরণ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে স্থানান্তরিত হত। তথাপি এসব না করেই উক্ত মা তার ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে কিভাবে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সেবা ও উপকার আশা করতে পারেন?

যাই হোক, মায়ের দুধ বাচ্চাদের সুস্থতা জন্য বড় নেয়ামত। বর্তমানে তো রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদিও চিৎকার করে ওই দুধের অপকারিতা বর্ণনা করছে। কিন্তু মনে রাখবেন, সুস্থ ও সামর্থ্যবতী মায়েরাই শুধু দুধ পান করাতে পারেন। হাজার হাজার মা এমন আছেন, যার দুধ হয় না বা কম হয়।

দুই একজনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলেও বাস্তবে সে সকল মাকে চিকিৎসা করলে সব কিছু ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু তবুও অনেক মা বাচ্চাকে দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেন। বস্তুত এটাও একটি মারাত্মক ভুল। আবার অনেক সুশ্রী, রূপসী নারী নিজের সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য চলে যাওয়ার ভয়ে শিশুদেরকে দুধ দেয় না। এমন নিষ্ঠুরতাকে ও প্রতারণার পরিণামে আল্লাহর কুদরত তাদের সীনার মধ্যে ক্যান্সার ঢুকিয়ে দেন।

## মায়ের দুধ ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

প্রকৃতপক্ষে দুগ্ধপোষ্য শিশুর সুস্থতা, অসুস্থতা, দুর্বলতা, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির ভিত্তি মায়ের উদর। শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তার বিশুদ্ধ খাবার। এতে অলসতা বা উদাসীনতা দেখালে সারা জীবন শিশুর উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। বাস্তবে জন্মের সময় মাটির কীট-পতঙ্গ ও আরও কয়েক প্রজাতির প্রাণী ব্যতীত মানব শিশু সবেচেয়ে বেশি দুর্বল হয়। দুই এক প্রজাতির প্রাণী ব্যতীত শিশুদের এই দুর্বলতা এত দীর্ঘ হয় যে, অন্য কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় না। সুতরাং উক্ত সময় শিশুর এমন বিশুদ্ধ খাদ্য প্রয়োজন, যা কুদরতীভাবেই তার দুর্বলতার জন্য উপযুক্ত ও পরিমিত হবে; তা গ্রহণের ব্যবস্থাও হবে সুন্দর, মনোরম ও সহজতর বরং সীমাহীন দুর্বলতার সময় বিশুদ্ধ খাদ্য কুদরতী ব্যবস্থাপনায় বর্তমান থাকতে হবে।

দুনিয়ায় যত প্রকার খাদ্য আছে, তন্মধ্যে আল্লাহ পাক দুধকে সবচেয়ে উপকারী, শক্তিবর্ধক, স্বাস্থ্যসম্মত ও সহজপাচ্য হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। দুগ্ধ দানকারী সকল প্রাণীর দুধের মধ্যে তাদের বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধি ও গঠনের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান ও উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এ বিষয়ে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দুগ্ধ পানকালে মায়ের দুধ ব্যতীত শিশুর জন্য আর কোনো উৎকৃষ্ট, উপযোগী ও বিশুদ্ধ খাদ্য নেই। হয়ও না।

ভেরা ও বকরির বাচ্চার জন্য গাভী ও মহিষের দুধ ততটা উপযোগী নয়, যতটা উপযোগী স্ব স্ব শ্রেণীর মায়ের দুধ। অনুরূপ মানুষের বাচ্চার জন্য মায়ের দুধে শক্তি, উপকরণ, পরিমাণ ইত্যাদি ঠিকমত থাকে। অন্য কোন দুধ এমনকি অন্য কোনো মহিলার স্তনের দুধেও তদানুরূপ থাকে না। প্রাণীর দুধে পানি, ঔষধ ইত্যাদি মিশিয়ে দুগ্ধ আমিষ থেকে যে কৃত্রিম দুধ তৈরি করা হয়, তা মায়ের দুধের মতো হতে পারে কিছুতেই মানা যায় না।

হাজার চেষ্টা গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যতই করা হোক না কেন, কৃত্রিম দুধ মায়ের কুদরতী দুধের মতো হয় না, হতে পারেই না। তা যদি সম্ভব হত, তবে আল্লাহ তা'আলা মায়ের স্তনের মধ্যে দুধ সৃষ্টি করতেন না বরং ডিম পারা পাখির মত মায়ের শরীরের পরিবর্তে পৃথকভাবে কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক কোনো খাদ্যের দিকে বাচ্চাকে মুখাপেক্ষী করে দিতেন। মায়ের শরীরের সাথে শিশুর খাদ্যের সম্পর্ক করে দেওয়ায় স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট, মূল্যবান ও উপযোগী কোনো খাদ্য দুনিয়াতে বাচ্চাদের জন্য নেই। শিশু তার মায়ের শরীরের গোশত ও রক্ত থেকে গঠিত হয়।

এতে প্রমাণিত হয় যে, বাস্তবে শিশু যেহেতু মায়ের রক্তের কুদরতী রাসায়নিক পরিবর্তন ও সংযোগে প্রথমে ভ্রূণ ও পরে পূর্ণ আকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তখন প্রাথমিক দুর্বলতার সময় চিকিৎসার দৃষ্টিতে মায়ের দুধই শিশুর জন্য উপকারী ও সুবিধাজনক। অন্য মহিলার দুধ থেকে ও তা অতি উত্তম। যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে দুধ যেমন উপকারী ও উপযোগী তেমনি নরম, সহজপাচ্য ও তাৎক্ষণিকভাবে সক্রিয়। সুঘ্রাণ জাতীয় খাদ্য এর সাথে রাখলে তা সঙ্গে সঙ্গে ফলপ্রসূ হয়।

স্বাস্থ্য রক্ষায় পারদর্শী ব্যক্তিরা বলেন, স্তন থেকে দুধ বের হওয়ার সাথে সাথে বাইরের পরিবেশ দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল হতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর

মাত্র এক বর্গ ইঞ্চির মধ্যে ছয় লক্ষ জীবাণু সৃষ্টি হয়। আগুনে জ্বালালে উক্ত জীবাণু নষ্ট হয় বটে কিন্তু ঠাণ্ডা হলে আবার জীবাণু জন্মাতে শুরু করে। বোম্বে শহরে এক বাজারের দুধ একবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। এতে অনেক রোগ জীবাণু পাওয়া যায়। প্রত্যেক বড় শহরে-বাজারগুলোর দুধের একই অবস্থা। কুরআন মজীদে দুধের কোমলতা, সুস্বাদ ও উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত আছে।

ইসলামী শরী'অতের কাণ্ডারী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও দুধের কোমলতা এবং বাইরের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত ছিলেন। একবার তিনি বলেন, দুধ গরম করে নাও, যদিও তা এক টুকরা কাঠ জ্বালিয়েই হয়। স্তন থেকে বের হলেই দুধের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আরম্ভ হয়ে যায়। স্তনের ভিতরের দুধ ও স্তনদ্বয় হতে সদ্য নির্গত দুধের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে।

এমনকি উভয়ের স্বাদ, গন্ধ, কার্যকারিতা, সতেজতা সব মিলেয়ে লাখও প্রকার পার্থক্য থাকে। তাই স্বাস্থ্য রক্ষা বিধি মতে প্রাণীর দুধ যদি স্তন বা বোটায় মুখ দিয়ে পান করানো হয়, তবে তা অতিউত্তম পন্থা। সরাসরি পানকৃত দুধ সংরক্ষিত নিরাপদ ও সতেজ হওয়ার কারণে খুব উপকারী হয়।

পাঞ্জাব ও কোনো কোনো অঞ্চলে এরূপ সঠিক পন্থায় গাভী, মহিষ ইত্যাদির দুধ পান করানোর প্রথা আছে। এভাবে পানকৃত বাচ্চা বেশ স্বাস্থ্যবান, সুস্থ ও শক্তিশালী হয়।

কোনো কোনো গ্রাম্য অভিজ্ঞ লোক সাধারণত শারীরিক দুর্বলতা ও কতিপয় রোগের চিকিৎসায় উক্ত পন্থায় দুধ পান করাতে বলেন। ক্ষয়-জ্বরের চিকিৎসায় বলা হয় যে, মহিষের দুধ তার বোটা থেকে মুখ দ্বারা পান করবে। তদ্রূপ মানব শিশুর জন্য মায়ের স্তন থেকে মুখ দিয়ে দুধ পান করা অন্যান্য প্রাণীর নির্গত দুধ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত দুধ থেকে অতি উত্তম এবং অধিক শক্তি যোগায়।

মানুষের দুধের সঙ্গে মিশ্রিত অন্য দুধ চিকিৎসা গবেষণায় যে অবগত, তার দৃষ্টিতে তা গাধার দুধ সমতুল্য। এছাড়া যখন আল্লাহ তা'আলার কুদরত বাচ্চাদের কাছেই সর্বোৎকৃষ্ট ও সুবিধামত দুধের ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছেন, তখন কোনো কারণ ও প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্রিম

খাদ্য-বস্তু অনুসন্ধান করা মূলত কুদরতী নেয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করা। এর বিরোধিতা করা বাচ্চার স্বাস্থ্যের প্রতি অবিচার করারই নামান্তর।

ইদানীং দুধ ভরা ডিব্বা হাকডাকের সাথে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এসব ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে করা হয়। তারা প্রচার করে, হাত না লাগিয়ে, স্বাস্থ্য রক্ষা বিধি মেনে চলে বিশেষ সতর্কতা সাথে দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাদের উপযোগী ও নিরাপদ করে তৈরি করা হয়েছে। যাই হোক না কেন, আমরা পঞ্চইন্দ্রিয় ও কুদরতী এ অবস্থা কিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও প্রত্যাখান করতে পারি?

তদ্রুপ টিনজাত মাছ, তরি তরকারি, ফল-ফলাদি ইত্যাদির খুব প্রশংসা করা হয়, ঢাকঢোল পিটানো হয়। অথচ আমাদের দেশে এসব কিছু টাটকা পাওয়া যায়। যার ফলে সাধারণভাবে এসব পছন্দ করা হয় না। এ জাতীয় মাছ গোশত ইত্যাদি দস্তরখানে পরিবেশিত হলে, গন্ধে আমাদের অনেকের জীবন বের হয়ে যেতে চায়, অনেকে বমিও করে। মূলত এ থেকে একপ্রকার দুর্গন্ধ বের হয়। আমরা তা সহ্য করতে পারি না। কিন্তু তারপরও আমাদের অনুভূতি আসে না। ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ডের টিনজাত পনীর যখন কাটা হয়, তখন কখনো কখনো কীট পাওয়া যায়। কিন্তু তারপরও অনেকে খায়।

পক্ষান্তরে যেসব ডাক্তার ও চিকিৎসক ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন না, তারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বলেন, এ জাতীয় টিনজাত খাদ্য, দুধ, মাছ, গোশত, ফল ইত্যাদির স্থলে টাটকা জিনিসপত্র সর্বাধিক উপকারী ও স্বাস্থ্যসম্মত। তারা আরও বলেন, টিনজাত দ্রব্য অনেক সময় রোগ-ব্যাধি বিশেষ করে ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কুদরতী খাদ্য পরিহার করলে বাচ্চার শক্তি বৃদ্ধি ও গঠনে কু-প্রতিক্রিয়া পড়ে।

মোটকথা, আমরা বলতে পারি, মায়ের দুধ পানকারী শিশু ভালোভাবে লালিত-পালিত হলে সে অন্য দুধ পানকারী বাচ্চার তুলনায় ক্ষয় জ্বর ইত্যাদি মারাত্মক রোগে খুব কম আক্রান্ত হবে এবং এসব মাতৃদুগ্ধ পানকারী শিশুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি প্রতিহত করার শক্তি মজুদ থাকে। কতিপয় অভিজাত মায়েরা বলেন, মায়ের দুধ না খাওয়ালে বাচ্চর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়া ব্যতীত আরও একটি ঘাটতি ও শূন্যতা সৃষ্টি হয়। তা হল মায়ের সাথে সংযোগ ও সম্পৃক্ততা অনেক কম হয় এবং মাতা পিতার

স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য স্বল্পই পায়। মায়ের দুধ না খাওয়ানোর অপর একটি বড় মারাত্মক ক্ষতি হল, এ বাচ্চার স্বাস্থ্য হৃদপিণ্ডের সম্পূর্ণীন হয়। একতারফার দরিদ্র ও মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর পরিবারের উচিত দুষ্প্রাপ্য বাচ্চার জন্য সর্বদা বিশুদ্ধ ও ভালো দুধ সরবরাহ করা। গ্রীষ্ম ও শীত প্রধান দেশে যেখানে দুধ ২/১ ঘন্টাও নিরাপদ থাকে না, সেখানে বিষয়টি আরও জটিল ও সমস্যাবহুল।

আল্লাহ্ তা'আলা মায়ের শারীরিক গঠনকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, সে নিজে যে-কোনো খাদ্য পরিবারের প্রথা ও সামর্থ্য মতো খেলেও এর এক ভাগ তার শারীরিক শক্তি বজায় রাখার কাজে এবং আরেক ভাগ বাচ্চার জন্য উপযোগী দুধ তৈরি করার কাজে ব্যয় হয়। সুতরাং কি দরকার আছে ঘরের খরচের খাত বৃদ্ধি করার? বাচ্চার প্রাপ্য দুধ মায়ের বুকে আটকে রাখার কি দরকার? তাছাড়া কুদরতীভাবে প্রস্তুত প্রক্রিয়া থেকে উপকার না নিয়ে লাভ কি?

সুতরাং মা ডাল, ভাত, শুষ্ক রুটি ইত্যাদি যাই ভক্ষণ করুক না কেন দুধ দিতে থাকলে তাতে বাচ্চা কখনও অভুক্ত থাকবে না। পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ দুধ কখনও না পাওয়া গেলে, নষ্ট দুধ পাওয়া গেলে বা দুধ নষ্ট হয়ে গেলে ইত্যাদি কারণে বাচ্চা মারা যেতে পারে অথবা রোগাক্রান্ত হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, গরমে দুধ নষ্ট হয়ে গিয়েছে আর মা অজান্তে তা বাচ্চাকে পান করাচ্ছে। ফলে বাচ্চা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। শীত প্রধান দেশসমূহে প্রতিবার দুধ পান করানোর সময় গরম করে পান করানো প্রয়োজন।

গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে কোনো কোনো বিজ্ঞ চিকিৎসক ও আধুনিক শিক্ষিতরা রেফ্রিজারেটরের পরামর্শ দেন। কিন্তু এতে মূলত দুনিয়ার সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করে হয় না। ধনী লোকেরা তো এর ব্যবস্থা করতে পারবে কিন্তু যারা ভাত-রুটিই খেতে পায় না, তারা হাজার হাজার টাকার রেফ্রিজারেটর ক্রয় করবে কিভাবে? এখানেই শেষ নয়। ফ্রিজের মধ্যে গরম দুধ রাখলেও তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তবে তা ঠাণ্ডা করে বরফ দিয়ে রাখলে কাজে আসে। মাতৃদুগ্ধ পান না করলে দাঁতও দুর্বল হয়ে যায়। পরবর্তী সময় এসব লোক দাঁতের বিভিন্ন প্রকার জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। এভাবে দাঁতের রোগ থেকে আরও রোগের উৎপত্তি হয়

এবং কষ্ট ও দুর্ভোগ বৃদ্ধি পায়। যখন মাতৃজঠরে (রেহেমে) নুতফা (বীর্য) স্থিতিশীল হয়ে যায়, তখন থেকে নাড়ীর মাধ্যমে বাচ্চার খাদ্য শুরু হয়ে যায়। ধীরে ধীরে ভিতরে ভিতের নয় মাস পর্যন্ত সে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় বাচ্চা যে-খাদ্য খায়, তা মায়ের শরীরের একটি অংশ থেকে হয়। সুতরাং বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হতেই তাকে বিকল্প খাদ্য দিলে নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যের উপর মন্দ প্রতিক্রিয়া পড়বে।

এ সময় বাচ্চা তো খুবই পাতলা ও দুর্বল হয়। একজন সুস্থ যুবককেও তো তার অভ্যস্থ খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দিলে সেও অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হয়ে যাবে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন এখানকার লোকেরা চির অভ্যস্থ ভাতের পরিবর্তে বাধ্য হয়ে সকাল সন্ধ্যা রুটিই খেয়েছে। পরিণামে, আমাশয় এবং অন্যান্য মারাত্মক রোগ মহামারী আকার ধারণ করে। এতে বহু লোকও মারা যায়।

বর্তমান কালে তো, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকারের জন্য একটি দেশ অপর দেশের প্রতি মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল। এক দেশ তার তরকারি শাক-সজি, ফল-ফলাদি ইত্যাদি উৎপাদন করে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে অতিরিক্ত জিনিস বিদেশে রপ্তানি করে। আবার অন্য দেশ গোশত, কলকজা ইত্যাদির জন্য আরেক দেশের নিকট হাত পাতে। বর্তমান বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উন্নত ও সহজতর যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রী ও যাবতীয় জীবনোপকরণ অতি দ্রুত আমদানি-রফতানী করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ইউরোপের ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে দুধ, গোশত ইত্যাদি আমদানী করত। কারণ, তারা বিত্তশালী জার্মান অবরোধের কঠিন সমস্যায় ফেঁসে গিয়েছিল। হাজারও অসহায় মা ক্ষুধায় কাতর হয়ে যেত। দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাদেরকে কোলে করে প্লেট হাতে নিয়ে কঠিন ঠাণ্ডা বা তুষারপাতের মধ্যে সারিবদ্ধ হয়ে দুধের কৌটার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত দৈনিকই। সে করুন অবস্থা সহ্য করা যেত না। কিন্তু এ সমস্যা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে, যখন পরিবহন সমিতি তথা রেল, বাস সার্ভিস, নৌ জাহাজ ইত্যাদির শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে হরতালের ডাক দেয়। একে তো শত্রুদের অবরোধে বিদেশী আমদানী ও সাহায্য বন্ধ হয়েছে। তদুপরি দেশের আভ্যন্তরীণ

হরতালের কারণে এখন কেবল উৎপাদনই বন্ধ হয় নি বরং দেশীয় পণ্যসামগ্রী একস্থান থেকে অন্য স্থানে পৌছানোও সম্ভব ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ছোট বড় সকল দেশ অনুরূপ হরতালের কবলে পড়ে যাবো মধ্যেই। লণ্ডন, নিউইয়র্কেও এমতাবস্থায় দুধের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লাখ লাখ শিশু ক্ষুধার যাতনায় কাতরাতে থাকে। অথচ দুধ এমন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যা অগ্রগণ্য এবং সব বিষয়ে প্রাধান্য রাখে।

বর্তমানে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার হয়েছে এবং দিনের পর দিন বিশ্ব এক্ষেত্রে উন্নতির চরম স্তরে পৌঁছে যাচ্ছে। গত বিশ্ব যুদ্ধে ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ডের মতো ছোট ছোট দেশ মাত্র কয়েক ঘণ্টায় জয়ী হয়। কিন্তু বর্তমানে রাশিয়া ও আমেরিকার মতো বিরাট পরাশক্তি সম্পন্ন দেশের অস্তিত্ব এক ঝাপটায় শেষ হয়ে যাবে। তাদের রাষ্ট্রীয় শান্তি শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যাবে। না খাদ্য-সামগ্রী থাকবে, না জীবন উপকরণ। দুধের কৌটা ও কৌটার মালিক উৎপাদকরা থাকবে জীবিত। মায়েরা তার কলিজার টুকরা দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে ক্ষুধার কষ্টে কাতরাতে দেখে একেবারে বেহুঁশ হয়ে যাবে এবং শিশুর জন্য কুদরতের সৃষ্টি করা মিষ্টি ঝর্ণা (দুধের উৎস) বন্ধ করে দেওয়ার কষ্টদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

ইউরোপীয় সভ্যতার ভক্ত এশিয়া ও আফ্রিকার লোকেরাও পাশ্চাত্যের ব্যবসায়ীদের ব্যাপক প্রপাগাণ্ডায় প্রভাবিত হয়ে কুদরতী খাদ্য (দুধ) ত্যাগ করে আমদানীকৃত ডিব্বার দুধ শিশুদের পান করানো আরম্ভ করে দিয়েছে। মাথায় তুলে নিয়েছে অহেতুক কষ্ট, ভোগান্তি ও সমস্যা। নিঃসন্দেহে প্রাচীনকালে সামর্থবান লোকেরা শিশুকে কিছু দিন মাতৃদুগ্ধ পান করানোর পর তাকে অন্য মায়ের দুধ পান করিয়ে বাঁচিয়ে রাখত।

পক্ষান্তরে দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা সর্বদা মায়ের দুধই পান করাত। শিশুর মা মারা গেলে বা অসুস্থ হলে অন্য মহিলার দুধ পান করানোর পরিবর্তে কোনো গাভী বা বকরির দুধ পান করাত। অবশ্য তখন মায়ের দুধ পান করানোর পরিবর্তে সর্বক্ষণ অন্য মহিলার দুধ পান করানোকে প্রাধান্য দেওয়া হত। কিন্তু আজকের বিশ্বে প্রথম দিন থেকেই কোনো কারণ ও প্রয়োজন ব্যতীত টিনজাত কৌটার দুধ পান করানো শুরু করে দেওয়া হয়।

অনেকে আবার দাবি করেন, শিশুকে দুধ পান করালে মায়ের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত কি এ বিষয়ে অবগত ছিল না? তিনি তবে শরীরে অহেতুক এ ব্যবস্থা কেন করে দিলেন? লক্ষণীয় যে, মানুষের শরীরের কোনো অঙ্গ, কোনো বিন্যাস, কোনো গঠন ইত্যাদি বিনা কারণে সৃষ্টি করা হয় নি। কোনো অঙ্গ অকেজো হলে তার প্রভাব অন্য অঙ্গের উপর পড়ে। যেমন : কিছু হিন্দু সন্ন্যাসী নিজের বাহুকে খাঁড়া রেখে শুষ্ক করে পূর্ণ রূপে বেকার ও অকেজো করে দিত।

ফলে এর প্রভাব শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্য ও শক্তির উপর পড়ত। তদ্রুপ কুদরতের প্রবাহকৃত দুধের স্রোতধারা বন্ধ করে দিলে স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব না পড়ে পারে না। কোনো রমণী এ নেয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করে যদি স্বপ্নবিলাসী হয়ে থাকতে চায়, তবে তা কেবল ৩/৪ বৎসর। এরপর তার স্তন ঢিলেঢালা হতে শুরু করে। যার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না (নিঃসন্তান হয়), সেও একদিন তার তারুণ্য হারাতে বসে।

অনুরূপ কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ্যাত্ব গ্রহণকারিণী মহিলা বার্ধক্যে যৌবনের মোহনীয় রূপ-লাবণ্য ও স্বাস্থ্য হারায়। উল্লিখিত সাধারণ অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, মধ্যমপন্থায় জীবন যাপনকারী এবং শিশুকে দুধ দানকারিণী মায়েদের জীবন দীর্ঘস্থায়ী ও স্বাস্থ্যসম্মত হয়। প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তার বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহর জ্ঞানে সমস্ত যুগে মানুষের মধ্যে যেসব সমস্যা, বিপদাপদ ও জটিলতা আসবে, তার সবই ভালোভাবেই আছে। তিনি তার সুদৃঢ় কিতাব আল-কুরআনের মধ্যে ইরশাদ করেন, "যে সন্তানকে কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে কষ্টে প্রসব করে, কষ্টে প্রতিপালন করে, এবং দুধ পানের সময়কাল ত্রিশ মাস।"

অর্থাৎ যে সময়কাল শিশু মায়ের গোশত ও রক্ত দ্বারা প্রতিপালিত হয়। এর মেয়াদ ৩০ মাস বা আড়াই বৎসর। গর্ভধারণের সময় ৮/৯ মাস এবং অন্য সময় সব মিলিয়ে আনুমানিক ২ বৎসর হয়। যেমন : অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন, মায়েরা স্বীয় শিশুদের দুই বৎসর পর্যন্ত দুধ পান করাবে।

উক্ত সময়কালের মধ্যে বা পরে শিশু অন্যান্য খাদ্য খাওয়া শুরু করে দেয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কুরআনিক শিক্ষার উপর আমল করলে অনেক পারিবারিক বিষয় যেমন অর্থনীতি ও অন্যান্য সমস্যা সমাধান হয়। শিশুটিও কুদরতী খাদ্য খেয়ে প্রতিপালিত হয়ে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপন

করে। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিকল্প দুধের পরিবর্তে যদি মায়ের দুধ পান করানো হয়, তবে মায়ের স্বাস্থ্যের উপর সুপ্রভাব পড়ে। পক্ষান্তরে শিশুও প্রাকৃতিক বা বাইরের দুধের দিকের প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সকল বিশেষজ্ঞগণ টিনজাত দুধকে 'সাদা বিষ' নামে অভিহিত করে থাকেন।

## ব্যবসা ও আধুনিক বিজ্ঞান

### হাদীসে রাসূল

✿ হযরত মুয়াজ রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– ওই ব্যবসায়ীরা সর্বোত্তম পেশায় নিয়োজিত যারা কথা বললে সত্য বলে, আমানত রাখলে খেয়ানত করে না, ওয়াদা করলে কখনও খেলাফ করে না, কিছু বিক্রির সময় (এর) সীমাহীন প্রশংসা করে না, কখনও কিছু ক্রয় করলে তার মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করে না, তারা কাউকে ঋণ দিলে তার সঙ্গে কঠোরতা করে না। (বায়হাকী)

আমার জনৈক বন্ধু ব্যবসায় শাস্ত্রে মাস্টার ডিগ্রী করে (এম.বি.এ) আসার পর আমি তাকে বাণিজ্যিতত্ত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। সে উত্তরে বলল, ইদানিং গোটা ইউরোপ অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করে বলছে, গ্রাহকের উপকার কর এবং প্রয়োজনে বিক্রীত পণ্য ফেরৎ নাও। গ্রাহককে নিজের পণ্যের ত্রুটিগুলো বলে দাও, গ্রাহকের সঙ্গে বিনয়, কোমলতা ও মহব্বতের সাথে কথা বল। তাকে নিজের বন্ধু বানাও এবং তার মান-মর্যাদার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখ।

চিন্তার বিষয় হল, এটা ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার না আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত বাণী? এর উপর আমল করার কারণে তারা আজ উন্নতির শীর্ষে উঠে গিয়েছে আর আমরা অবনতি ও ধ্বংসের অতল গহবরে হাবুডুবু খাচ্ছি। উলামা ও মুফাসসিরগণ এ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, গোলাম ও কর্মচারীকে ক্ষমা করে দিবে। তাদের সব কাজে সহযোগিতা করবে। তাদেরকে তিরস্কার করার পরিবর্তে প্রশংসা ও বাহবা দিবে। আমরা বাস্তবে কি এরূপ করি?

আমরা কি চাকর-বাকর এবং অধীনস্থদের প্রশংসা ও দু'আ করি? বস্তুত ইউরোপীয়রা এ পন্থা অবলম্বন করেছে। তারা এ বিষয়টির উপর

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সাফল্য অর্জন করেছে। তাই গভীরভাবে চিন্তা করুন এবং সামনের ঘটনাটি মনোযোগের সাথে পড়ুন।

ইউরোপের কোনো এক কোম্পানীর লভ্যাংশ মূলত পণ্য উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু মালিক কঠিন অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তায় পরে যায়। কেননা অর্ডার ও চাহিদামতো উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছিল না। অথচ বাস্তবে তার মেশিনপত্র সাজ-সরঞ্জাম অত্যাধুনিক ও অধিক ছিল। কিন্তু কর্মচারী ও অফিসার একের পর এক পরিবর্তন করা হচ্ছিল বলে উৎপাদনে তেমন গতি সৃষ্টি হচ্ছিল না। তাই মালিক কোম্পানীর প্রধান দক্ষ প্রকৌশলীদের শরণাপন্ন হন। তারা পরীক্ষা করে প্রতিবেদন ও পরামর্শ দেন।

তারা তদন্ত করতে এসে জানতে পারেন, কোম্পানী-প্রধান সাজ-সরঞ্জাম ও মেশিনারীর উপর খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। জাতীয়-আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রশংসাপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করার চেষ্টাও করা হচ্ছে কিন্তু উৎপাদন নেই। পক্ষান্তরে শ্রমিকদের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না। এরা মেশিন চালায়, সাজ-সরঞ্জাম সব কিছু ঠিক রাখে। অথচ এদেরকে উপযুক্ত মূল্যায়ণ করা তো হতই না বরং উল্টো তাদের উপর জুলুম-শোষণ চালানো হত। সে জন্যই কাজে অগ্রগতি হত না।

তারা কোম্পানীর প্রধানকে পরামর্শ দিলেন, ঘন ঘন শ্রমিক পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। এ মুহূর্তে একমাত্র প্রয়োজন আপনি শ্রমিকদের খুশি করুন। তাদেরকে প্রশংসা ও উৎসাহ দিয়ে কাজ করান। তাদের সমস্যা দূর করুন এবং সুযোগ-সুবিধা ও বেতন ঠিকমতো দিন। আপনি ইনচার্জদের (দায়িত্বশীল) প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। অফিসাররাও আপনার ব্যবহারে শ্রমিকদের কাছে প্রশংসা করবে এবং তাদের কাজ সমাধা করবে। প্রয়োজনে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বাবাধন বলে খুশি করে অধিক কাজ নিন। এরূপ করলে দৃঢ়বিশ্বাস আপনার কোম্পানীর উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

"শ্রমিকের মন করলে খুশি কাজ হবে বেশি" কর্মীদের প্রত্যেকের প্রতি এমন কিছু করা দরকার, যেন তাদের কাজের প্রতি আগ্রহ ও সাহস বৃদ্ধি পায়। প্রতিবেদক ও উপদেষ্টাগণ ব্রীফকেস থেকে একটি সুন্দর মূল্যবান পোস্টার বের করে তার সম্মুখে মেলে ধরে বললেন, এটাকে প্রত্যেক শাখা

ও বিভাগের ইনচার্জের টেবিলের উপর লাগিয়ে দিলেন; এক গ্রাম উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মনজয় এককিলো গালমন্দ থেকে বেশি ভারি।

কোম্পানী প্রধান উক্ত পরামর্শ ও প্রতিবেদন মোতাবেক কাজ করে। কাজের দ্রুত অগ্রগতি দেখে খুশি হন। অল্প দিনের মধ্যে উৎপাদনের জোয়ার বয়ে গেল। তাঁর কাছে এর বাস্তবতা খুলে যায়। তিনি বুঝতে পাবেন, প্রশংসা উৎসাহ প্রদান, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, বাধা করা ইত্যাদির চেয়ে অধিক ফলপ্রসূ ও কার্যকর। নতুন টেকনিক (কৌশল) অবলম্বনে শ্রমিকদের মধ্যেও সহযোগিতা ও আন্তরিকতায় অগ্রগতি হয়।

প্রত্যেক শ্রমিক অপর শ্রমিক থেকে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা করতে লাগল। কেননা সে জানে, এতে প্রশংসা, বাহবা ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। শ্রমের মূল্যায়ণ করা, উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করা এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো কোনো লোকের মধ্যে এ যোগ্যতা অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে। যেমন : কিছু লোক সংগীত, কবিতা, প্রবন্ধ, রচনা ইত্যাদিতে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক প্রশংসা ও খ্যাতি অর্জন করে।

আমার জানামতে এমন এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা প্রশংসা ও বাহবা পাওয়ার কাঙ্গাল। প্রশংসায় কে না খুশি হয়? আমি এক ইমাম সাহেবকে দেখেছিলাম, তার চোখে এত উজ্জ্বলতা ছিল যে, তেমন আর কারও চোখে আমি দেখি নি। মুচকি হাসি ও মোসাফাহার সময়ও অনুরূপ আবেগ-উদ্দীপনা ও মমতার ছাপ ফুটে উঠত। সম্ভবত অনেক লোক তার নিকট মসজিদে এ উদ্দেশ্যে আসত যে, তার চারিত্রিক গুণ, বৈশিষ্ট্য এবং তার প্রতি তার সুদৃষ্টি পতিত হবে। সুতরাং তখন তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বৈঠক থেকে কিছু না কিছু বরকত নিয়ে যেতে পারবে।

একবার জনৈক ইমাম সাহেব আমার একটি লেখার প্রাণ খোলা অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন। এটা কোনো (কৃত্রিমতাপূর্ণ) রাজনৈতিক প্রশংসা ও অভিনন্দন ছিল না। সাধারণত প্রত্যেকে অন্যের প্রশংসা ও গুণ বর্ণনায় পারদর্শী হয় না। সুতরাং অনুশীলন ও চর্চার দ্বারা এটা অর্জন করতে হয়, কিন্তু এ কাজে সফলতা লাভের প্রধান শর্ত হল একনিষ্ঠতা ও আন্তরিককতা। হয়তো একসময় যুগের স্রোত ও বাকপটুতার রত্ন শেষ হয়ে

যায়। কিন্তু আন্তরিকতার মধ্যে যে প্রভাব (শক্তি) থাকে উদাসীনতা ও কপটতার মধ্যে তা থাকে না। অন্যের মনোকষ্ট ও জ্বালা ব্যথাভারাক্রান্ত হয়ে শ্রবণ করলে তার মনজয় করা যায়। এতে দুঃখিত ও ব্যথিতদের মনে সাড়া ও সন্তুষ্টি সঞ্চার করা সম্ভব। অন্যকে কিছু ভালো পরামর্শ দেওয়াও আন্তরিকতা ও শুভাকাঙ্ক্ষার দাবি কৃতজ্ঞ ও দয়াবান ব্যক্তি প্রাণীকুলকেও নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। এমন মানুষ বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখলে কৃতজ্ঞতার আবেগে বিমূর্ষ ও ব্যথিত হয়।

আমার জনৈক প্রবীণ বন্ধু একবার কয়েক মাস ধরে অসুস্থ ছিল। সে খুব ব্যথিত ছিল। কেননা তার আত্মীয়-সজন বন্ধু-বান্ধব তার খোঁজ-খবর নিত না। কিন্তু দীর্ঘদিন পর তার প্রবাসী পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনরা বিদেশ থেকে তার জন্য হাদিয়া, তোহফা ইত্যাদি প্রেরণ করল। তন্মধ্যে মূল্যবান পোশাকও ছিল। মোটা অংকের টাকাও প্রেরণ করেছিল। এ সব কিছু পেয়ে সে আরাম-আয়েশেই জীবনযাপন করতে থাকে। আমি লক্ষ করলাম, বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, হঠাৎ সে চিন্তামুক্ত হয়ে সুস্থ সুন্দর স্বাস্থ্যবান হয়ে গেল এবং সুখ-শান্তিতে বসবাব করতে লাগল।

প্রথা ও অভ্যাসগতভাবে স্নেহ ও বিনয়পূর্ণ কথা বললেও তা প্রভাবশূন্য হয় না। শোকর, মেহেরবানী, ঠাণ্ডা ও নম্রভাবে কথা বলতে সময়ও লাগে না আবার খরচও হয় না। কিন্তু এরূপ মনভোলানো কথায় ভালো প্রভাব পড়ে। শিশুদের মিষ্টি বা খাওয়ার বস্তুর লোভ দেখিয়ে, বিনয় কৃতজ্ঞতা ও মনভোলানো কথা শিখালে মাতা-পিতার নিকট খুব ভালো লাগে। মাতাপিতার মন খুশিতে ভরে যায়। মুচকি হাসির সাথে কথা বলে ও অন্যের মন খুশিতে মুগ্ধ হয়ে যায়। অনেক সময় খুশি ও মনভোলানো কথা শুনে মনমরা মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও বেদনাগুলোও ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

মোটকথা, শব্দমালার মধ্যে বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক জাদু আছে। অনেক মানুষ এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র অবগত নয়। আবার অনেকেই এর ব্যবহারে উদাসীনতা ও অলসতার পরিচয় দেয়। (আমীন এও বিজনেস)

**ব্যবসায়ী ও ব্যবসার ভূমিকা**

আল্লাহ্ তা'আলা তার সৃষ্টিজীবের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছেন যে, তিনি

ভূ-পৃষ্ঠের উপর বিচরণকারী সকল প্রাণীর জীবিকার জিম্মাদার। উল্লেখ্য, কেবলমাত্র জিনিসপত্রই রিযিক নয়। আমাদের চারিত্রিক গুণাবলী, রিযিকের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দৃষ্টিশক্তি ভাষা, বাক্যচাতুর্য ইত্যাদিও রিযিক। আমাদের অস্তিত্বে আমাদের নম্রতা ও ভদ্রতা একপ্রকার রিযিক। মানবের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ এমন উত্তম রিযিকদাতা যে, শিশুজন্মের অনেক পূর্ব থেকেই তার জীবিকার ব্যবস্থা করেন। আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত অংশটুকু অর্জন করার জন্য আমরা চাকরি-বাকরি ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাকার হাজারও কাজকর্ম ও পেশায় জড়িত হয়ে পড়ি। আজকের উন্নতি ও অগ্রগতির যুগে আমরা ইউরোপের উন্নতি-অগ্রগতির নীতি, পদ্ধতি ও অনুসরণের করার চেষ্টা করি। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পদ্ধতি আমরা এত বেশি প্রভাবিত যে, পুরাতন ব্যবসায়িক রেকর্ডপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ি। কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সেগুলি খুব গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয়। দেশী-বিদেশী ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষকরা বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশনের ছাত্র- ছাত্রীদেরকে খুব গর্বের সাথে কারবার পদ্ধতি পড়ান এবং শিখান।

লোকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ছেলে-মেয়েদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জ্ঞান শিখানোর জন্য আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে পাঠায়। অথচ এসব ছেলে মেয়েরাই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করেন না। সে জন্য সন্তানের কাছে বিন্দুমাত্র কৈফিয়ৎ তলব করেন না তার পিতামাতা। অন্তত আমরা যদি সীরাতুন্নবী এবং কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করি, তবে সকল কাজ-কারবারের তরীকা আমরা শিখতে পারি। আমাদের ইসলাম আমাদেরকে সব কিছু বিস্তারিত শিক্ষা দেয়। অধ্যয়ন করলেই অনায়াসে সব কিছু আমদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়ে যায়।

## ব্যবসার প্রতি ইউরোপীয়ান বিশেষজ্ঞদের মনোভাব

মুর "Moore" তার গ্রন্থে ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগতি ও সফলতা লাভের জন্য প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রতি এবং নিয়মানুবর্তিতা ও ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে কারবার করার প্রতি অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করেন। তিনি লিখেন- ব্যবসায়ীর উন্নতি ও সফলতা লাভের জন্য অতি জরুরি হল, প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ হওয়া। তাহলে তার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

গ্রাহকরা তার প্রতি সন্তুষ্ট ও আন্তরিক হয়ে বেশি বেশি কারবার করবে। লাভের ব্যাপারে কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ন্যায়নুগ মীমাংসা করবে। তাতে আপনার হাতে স্বর্ণের খনি এসে যাবে। মানুষ আপনার প্রতি গভীরভাবে আস্থা ও নির্ভরশীল হবে।

## ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

✪ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : 'নিজের পণ্যসমাগ্রী বিক্রির জন্য বেশি বেশি কসম করা থেকে বিরত থাকো। এটা তো বাস্তবে বিক্রয়ের সময় প্রকাশ হয়ে যায়। কিন্তু পরিশেষে ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

✪ অপর হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে। (তিরমিযী)

✪ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর রাযি. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।

✪ হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত আছে , রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি কিয়ামত দিবসে তিন ব্যক্তির উকিল হব। আর আমি যার শত্রু হব, তার উপর আমি সেদিন (কিয়ামতে) বিজয়ী হব।

(১) যে ব্যক্তি আমার নাম নিয়ে অঙ্গীকার ও স্বীকার করে। অথচ পরে তা ভঙ্গ করে।

(২) যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন মানুষকে গোলাম (দাস) বানিয়ে বিক্রি করে এবং উক্ত বিক্রীত মূল্য নিজে ভক্ষণ করে।

(৩) যে ব্যক্তি শ্রমিককে শ্রমে নিয়োগ করে। তারপর সে কাজপূর্ণ করে কিন্তু তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করে না। (ইবনে মাজা)

উল্লিখিত বরকতময় হাদীসসমূহে শ্রমিকের পারিশ্রমিক অতি দ্রুত তথা গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই পরিশোধ করতে নির্দেশ দেওয়া করা হয়েছে। শ্রমিক তার পারিশ্রমিক চাওয়ার পূর্বেই অতিদ্রুত পেয়ে গেলে কেন মন দিয়ে কাজ করবে না? তার মধ্যে যখন আস্থা জাগবে যে, তার নিয়োগদাতা

তার মূল্য তার ন্যায্য পারিশ্রমিক ঘাম শুকানোর পূর্বেই দিয়ে দিচ্ছে এবং সব কিছু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে, তখন সে তার কাজটি আরও অধিক পরিশ্রম ও মনোযোগের সাথে করবে।

শ্রমিক ও কর্মজীবিদের জীবিকা তাদের দুই হাতে বিদ্যমান। শারীরিক শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার কুদরতের দান। তবে জীবিকা মাধ্যম। পেট চলে তো হাত চলে। উপার্জনকারীর জীবিকা হল উপার্জন। উপার্জনকারী ধনী বা গরীব যেই হোক না কেন সে আল্লাহর বন্ধু। কোনো কোনো দেশে নাগরিকত্ব জীবিকার একটি অংশ। বিভ্রান্ত-পাপী হলেও জীবিকা পায় অর্থাৎ তার জীবিকার মাধ্যম হল নাগরিকত্ব।

সর্বাবস্থায় ধর্ম মানুষকে দিকনির্দেশনা দেয়। ধর্ম বলে দেয় হালাল কি জিনিস এবং হারাম কি জিনিস। বৈধ কি এবং অবৈধ কি? পুণ্য কি, শাস্তি কি, অনুগ্রহ কি, অত্যাচার কি? বাস্তবে শ্বাস-প্রশ্বাসের করাত (মানব) জীবনের অস্তিত্বের বৃক্ষকে কর্তন করে জীবিকার যাবতীয় প্রয়োজনীয়তা চিরকালের জন্য খতম হয়ে যায়। বৈধ প্রয়োজন ও চাহিদাকে পূর্ণ করার জন্য অবৈধ পন্থায় উপার্জন করা নির্বুদ্ধিতা আর গোনাহও বটে। হারাম উপার্জনে লালিত-পালিত ছেলে-মেয়েরা অবশ্যই বিদ্রোহী, বেঈমান ও অভদ্র হয়। মোটকথা, হারাম অর্থ সম্পদে বিমুখী আযাব। পরিণামে নিজেও বরবাদ; শেষে ছেলে-মেয়েরাও বরবাদ।

## প্রতিশ্রুতি

ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মেরুদণ্ডের হাড়ের মতো। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক বিশেষজ্ঞ "Perry" (পেরী) তার গ্রন্থে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে লিখেছেন— আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষের প্রতিশ্রুতি ঠিক রাখার অভ্যাস তাকে অল্প সময়ে অন্যদের সাথে ঘনিষ্ঠ এবং তাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট করে তোলে। এ কুঞ্জির মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের অধিকতর অগ্রগতি ও সফলতার দরজা খুলে যায়। কুরআন মজীদে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার ব্যাপারে কঠোরভাবে তাগিদ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

হে ঈমানদারগণ! অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।

وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

"এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিঃসন্দেহে অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

যে-ধর্মে অঙ্গীকার রক্ষা করার ব্যাপারে এত কঠিন নির্দেশ রয়েছে, সেখানে এর উপর আমল করে জীবনযাপন না করলে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে এর প্রতিফলন না ঘটালে মানুষ কতই না কঠিন সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হবে। সাধরণত ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীকে আদালতে নানাভাবে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে দেখা যায়। এ আইন ভঙ্গকারীদের জন্য পৃথকভাবে বিশেষ শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছে। আর বরকতময় হাদীস সমূহে মুনাফিকের সব আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাও একটি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জীবদ্দশায় সদাসর্বদা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন।

এ বিষয়ে একটি ছোট ঘটনা বদর যুদ্ধের পেক্ষাপটে দেখা যায়। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা শত্রুদের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশেরও কম ছিল। দুজন সাহাবী মক্কা থেকে মদীনায় আসছিলেন। পথিমধ্যে কাফিররা তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে এবং এ প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছেড়ে দেয় যে, এরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না। উভয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, তোমরা ফিরে যাও! সর্বাবস্থায় আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। আমরা একমাত্র আল্লাহর সাহায্য চাই।

**ঋণ গ্রহণ**

বিভিন্ন সময় মানুষ নিজের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বা সমস্যার কারণে অন্যের থেকে করজ গ্রহণ করে। এভাবে দুজন মানুষের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠে। ইসলাম ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়ের হকের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। একদিকে ঋণদাতাকে নির্দেশ দিয়েছে ঋণগ্রহীতা অসহায় দরিদ্র হলে এবং নির্ধারিত সময় ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে তাকে অতিরিক্ত সময় দিবে। আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ক্ষমা করে দাও, তবে তো যারপরনাই লাভ। অপরদিকে ঋণগ্রহীতাকে বলেছে : যখন ঋণ গ্রহণ করবে, তখন ঠিকমতো আদায়

করার নিয়তে নিবে। আল-কুরআনের নির্দেশ হল, যদি তোমাদের ঋণ গ্রহীতা অস্বচ্ছল হয়, তবে তাকে আরও সুযোগ দাও। যদি দান করে দাও তথা ঋণ ক্ষমা করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম।

(সূরা বাকারাহ : ২৮০)

✪ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোনো ঋণগ্রহীতাকে সুযোগ দিবে বা ঋণ ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামত দিবসে নিজের ছায়ার মধ্যে স্থান দিবেন। (মুসলিম)

✪ আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেছেন, ধনীর করজ পরিশোধে তালবাহানা করা অবিচার। (বুখারী)

## ক্ষতিকর ঔষধ ও আধুনিক বিজ্ঞান

✪ ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এমন ঔষধপত্র খেতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। (নাসাঈ)

বস্তুত যে চিকিৎসা করাবে সে শিফার নিয়্যতে করবে। অনেক ঔষধপত্র ও চিকিৎসা ক্ষতিকর প্রভাব ছড়ায়। নির্ভরযোগ্য চিকিৎসক অবশ্য ক্ষতিকর ঔষধ সম্পর্কে অবগত থাকেন। রোগীকে ক্ষতিকর ঔষধ দিতে বাধ্য হলে এর সাথে প্রতিষেধক ঔষধও দিয়ে দেন। ফলে রোগী ঔষধের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকে। কিন্তু কিছু ঔষধ আছে সর্বদা ক্ষতিকর। যেমন : চীন দেশের চিকিৎসায় Methorexate- এর গুলি (বটিকা) অথবা এলার্জিতে Cortisone এর মিশ্রণ। শরাব চিকিৎসায় হুবহু এ অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। অন্য কথায় এটা শুধু ঔষধরূপে ব্যবহার করা ক্ষতিকর। তদ্রুপ আধুনিক বিজ্ঞান পেনিসিলিনের ব্যবহার বর্জন করেছে। কেননা এতে উপকারিতার চেয়ে অপকারিতা অনেক বেশি।

## হারাম বস্তুতে শেফা নাই

ইসলাম হালাল ও হারামের শ্রেণীবিভাগ করে উম্মতকে বিরাট রহমত ও বরকত দ্বারা ধন্য করেছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান হারামকৃত বস্তুসমূহ পরীক্ষা করে হালালের দিকে ফিরে এসেছে। ইউরোপ শরাব ও সুদকে পছন্দ করে। আধুনিক গবেষণায়তে দুটি বস্তু মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য ঘাতক বিষ থেকে কম নয়। বর্তমানকালে ঔষধপত্রে আরোগ্য নেই কেননা মূলত ঔষধপত্র ইউরোপ ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ হতে প্রস্তুত হয়ে আসে।

এতে মিশ্রিত আছে হারাম বস্তু। তাই এতে আল্লাহর থেকে কোনো শেফা নেই বরং ধমক ও শাস্তি রয়েছে। বিশ্ব জগতে এলোপ্যাথিক ঔষধপত্রে যত হারাম, অপছন্দনীয় বস্তু মিশ্রিত আছে, সম্ভবত অন্য কোনো বস্তুতে এতটা নেই।

আধুনিককালে আমরা দিনের পর দিন নতুন নতুন ঔষধপত্র আবিষ্কার করছি। কিন্তু রোগের অবসান হচ্ছে না। জনৈক কামেল বুযুর্গ বলেন : আমরা বর্তমানে হারাম মাল দ্বারা হারাম ঔষধপত্র ক্রয় করে সুস্থ, স্বাস্থ্যবান হতে চাই। এটা অসম্ভব। তিনি আরও বলেন : আমাদের লেবাস-পোশাক, বিছানাপত্র, ঘরবাড়ি, পানীয় দ্রব্য ইত্যাদি সবই হারাম। আর এ যাবতীয় হারামের মধ্যে কোনো শান্তি নেই। তবুও শান্তি ও স্বস্তির জন্য আমরা হারাম ঔষধপত্রের সহযোগিতা চাই। শান্তি বাস্তবে হালালের মধ্যেই নিহিত।

● হযরত উম্মে দারদা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করেছেন এবং এর সাথে তার চিকিৎসাও (ঔষধ) সৃষ্টি করেছেন।

এজন্য চিকিৎসা করা উচিত। তবে অবশ্য হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করবে না। হযরত তারিক বিন সোয়েদ রাযি. আঙ্গুরের শরাবের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন, হারাম বস্তুর মধ্যে কোনো শেফা (আরোগ্য) নেই।

মোটকথা, হারাম প্রাণীর গোশত, রক্ত, শরাব ইত্যাদি থেকে প্রস্তুতকৃত বিষাক্ত ঔষধপত্রে কোনো শেফা নেই। কয়েক বৎসর পূর্বে চিকিৎসকরা নিউমোনিয়া রোগীদের চিকিৎসায় BRANDY এক প্রকার উত্তেজক ইংরেজি শরাব পান করাতেন। কিন্তু আজ প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। রোগীর জন্য এটা উপকারের বদলে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য ইদানিং অমুসলিম চিকিৎসকরাও ব্রান্ডি ত্যাগ করেছেন। তদ্রুপ শূকরের লালা থেকে প্রস্তুতকৃত ইনসুলিন ডায়াবেটিস উপশম করে না জেনে আজ তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

## হারাম বস্তুর বৈজ্ঞানিক অবস্থান

স্বাভাবিক নিয়মে মৃত প্রাণীর গোশত খেতে আল-কুরআন নিষেধ করেছে। বাস্তবিকই রোগগ্রস্ত হয়ে কোনো প্রাণী মারা গেলে তার গোশত

যারা ভক্ষণ করবে, তাদের রোগাক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। প্রাণীদের অধিকাংশ রোগ-ব্যাধি জীবাণু বা ভাইরাস জনিত জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে হয়। প্রথমত মৃত প্রাণীর গোশত থেকে জীবাণুগুলো গোশত ভক্ষণকারীর শরীরে চলে যায়। ফলে সে রোগাক্রান্ত হয়। এ রোগ ভয়ানক হওয়ার প্রমাণ হল রোগ বহনকারী প্রাণীটির মৃত্যু। প্রাণীদের কিছু কিছু রোগের জীবাণু মানুষের জন্য ততটা বিপদজনক নয়। কিন্তু এর থেকে এত অসহনীয় দুর্গন্ধ থাকে, যা সুস্থ ব্যক্তিকে রোগাক্রান্ত করে দেয়।

পোস্টমর্টেম করে প্রাণীর মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করা হয়। এরপর পরীক্ষা করা হয়, এটা রোগীরা খেলে ক্রিয়াশীল হয় কি না? যেমন, মুরগী: আপনার মুরগী মারা গেলে তাকে আপনি পশু চিকিৎসকের নিকট পোস্টমর্টেম করতে নিয়ে যান। তারপর তার শরীরের কিছু অংশের পরীক্ষা স্বচক্ষে দেখবেন। এ সময় সজাগ দৃষ্টি রাখলে সহজেই বোঝা যাবে, কোনো প্রাণী রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তার গোশত খাওয়া কতটুকু নিরাপদ! মৃত প্রাণীর গোশতের আরেকটি সমস্যা হল রক্ত। জীবিত প্রাণী যবাই করলে তার শরীরের প্রবহমান সমস্ত রক্ত বের হয়ে যায়। কিন্তু মৃত প্রাণীর রক্ত বের হয় না বরং গোস্তের মধ্যে আটকে থাকে। সে জন্য গোশত দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিষাক্ত জীবাণু সৃষ্টি হয়। তাই মৃত প্রাণীর গোশত সুস্থ সবল মানুষের স্বাস্থ্যের পরিপন্থী।

### রক্ত

কুরআনে কারীম রক্তকে হারাম ঘোষণা করেছে। এক স্থানে স্পষ্ট বলেছে, রক্ত দ্বারা উদ্দেশ্য প্রবাহিত রক্ত। কোনো জীবিত প্রাণীর দেহ থেকে নির্গত হওয়ার পরই রক্ত জমাট হয়ে যায়। জমাট হওয়ার পর যে উফর্ম (লোথড়া) প্রস্তুত হয়, তা হজম করার শক্তি সকল মানুষের পাকস্থলীর থাকে না। বিড়াল, কুকুর, বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ ইত্যাদি রক্ত পিপাসু প্রাণীর শরীরেও সে শক্তি থাকে না। সেজন্য কোনো মানুষ রক্ত পান করলে তা তার পাকস্থলীর হজমশক্তিকে অকেজো করে দেয়। তা ছাড়া রক্ত কেবল নিজেই হজম অযোগ্য নয় বরং তার পরে ভুক্ত খানাকেও হজমের অযোগ্য করে দেয়। এভাবে তা পরিপাতক্রিয়াকে নষ্ট ও বিকল করার পর অবশেষে শরীর থেকে রক্তকে বের করে দেয়। ফলে শূলবেদনা সৃষ্টি হতে পারে।

বিশেষজ্ঞগণ মাত্র ক'দিন আগেই স্পষ্ট অবগত হয়েছেন যে, মানব শরীরে রক্ত পরিপাক করার মতো শক্তি নেই। কিন্তু হাজার বছর পূর্বে আল-কুরআন ঘোষণা দিয়েছে, রক্ত পান করা হারাম। এতে চিকিৎসা ও রাসায়নিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত হল যে, প্রাণীর রক্ত শরীরে আটকা পড়লে দেহের গোশত দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। কেননা মাত্র এক দিনে রক্তে হাজার হাজার জীবাণু সৃষ্টি হয়। যখন রোগজীবাণুর সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পায়, তখন তা সনাক্ত করা সহজ নয় বরং খুব কঠিন হয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন প্রকার ঔষধ দিয়ে দেখতে হয়, উক্ত জীবাণু কিসে কিভাবে বিনাশ হয়। গবেষণার পরই কেবল জানা যায়, রক্তের জীবাণু কোথায়, কিভাবে, কেমন আছে? কাজেই রক্ত ব্যবহার করা বহুবিধ বিপদের কারণ হতে পারে।

## শূকরের গোশত

আল-কুরআন স্পষ্টভাবে পাঁচ স্থানে শূকুরের গোশত হারাম বলে ঘোষণা করেছে। হিন্দুরা গাভী এবং শিখেরা ময়ূরের গোশত না খেলেও বরকতময় মনে করে। অপবিত্র হওয়ার কারণে ইসলাম শূকরের গোশতকে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। যেহেতু ইসলামের কোনো কাজ প্রজ্ঞাশূন্য নয়, তাই ঈমান ও একীনের দাবি অনুযায়ী এটা নির্দ্বিধায় পরিত্যাজ্য হওয়াই উচিত। কিন্তু যারা কারণ জানতে ইচ্ছুক বা যারা ইসলাম মানে না (অমুসলিম) তারা অবাক হয়ে বলেন, ডাক্তার তো গোশত পরীক্ষা করেই খাওয়ার অনুমতি দেন। তা ক্ষতিকর হয় কিভাবে? সাধারণত মানুষ যেসব রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, শূকরও সেসব রোগে আক্রান্ত হয়। যেমন : তার রক্তনালী দিয়ে চর্বি বের হয়। হৃৎপিণ্ডে কম্পন পড়ে। ব্লাডপ্রেসার (রক্তচাপ) হয়। যে-ঘরে শূকর বসবাস করে বা যে গোশত খায় তার অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখীন হয়। কেননা এগুলো চলাফেরা করার সময় বাইর থেকে বিভিন্ন প্রকার রোগজীবাণু বয়ে নিয়ে আসে।

এ সব রোগ-জীবাণুই পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তবে গাভী, মহিষ, বকরি, কবুতর, মুরগী ইত্যাদির মধ্যে কমবেশি যাই হোক, এদের রোগ-ব্যাধি মানুষের মধ্যে ততটা ক্ষতিকর প্রভাব ছড়ায় না। যেমন : আমার মুরগীগুলো 'রাণীখেত' সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। কিন্তু এর কারণে আমার পরিবারের লোকদের মধ্যে তেমন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে নি। পক্ষান্তরে এ জাতীয় কোনো রোগ শূকরের মধ্যে ছড়িয়ে

গেলে তার পালন-পোষণকারী এবং ভক্ষণকারী কেউই নিরাপদ থাকতে পারে না। শূকরের কলেরা রোগ হয়। বসন্ত হয়। কুষ্ঠ রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এর অন্ত্রে পরজীবী রোগ-ব্যাধি পালিত হয়। এর ত্রিন নাড়ির মাধ্যমে আশপাশের লোকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

খাদ্যের দিক দিয়ে শূকর সর্বভুক অর্থাৎ সব কিছু খায়। পরগাছা ক্রিমি শূকর ব্যতীত গাভীর দেহেও হতে দেখা যায়। এ পরগাছা খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে মানুষের শরীরে অধিক প্রবেশ করে। তবে যেহেতু গাভীর গোশত সিদ্ধ-ভূনা করে খাওয়া হয়, তাই খাদ্যের সাথে শরীরে প্রবেশ করার সম্ভাবনা খুব একটা থাকে না। রাহবারে কামিল রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত ক্ষতি ও সমস্যাসমূহ অনুভব করেছিলেন। তাই গাভীর দুধ ও মাখন পছন্দ করা সত্ত্বেও এর গোশতকে রোগের কারণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের জন্য গাভীর দুধ ভাল। কেননা এর দুধ ও মাখন খুব উপকারী ঔষধও বটে। অবশ্য এর গোশতে রোগ জীবাণু আছে। সুতরাং এ থেকে বাঁচ।

সম্ভবত এ কথাই মুহাম্মদ আহম্মাদ জাহ্‌বী হযরত মুহায়ের রাযি. হতে বর্ণনা করেছেন। যেমন : হযরত মুলায়কা বিনতে আমরা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : গাভীর দুধের মধ্যে শেফা (উপশম) আছে। এর মাখনও একটি উত্তম ঔষধ (প্রতিষেধক)। তবে এর গোশত রোগ-ব্যাধির কারণ। উল্লেখ্য যে, এখানে গাভীর গোশতকে হারাম বলা হয় নি বরং পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, এটা খেতে পার নিশ্চয়। তবে তাতে তোমরা রোগাক্রান্ত হয়ে যেতে পার। গাভীর গোশত সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ কয়েকটি ক্ষতিকর অবস্থার কথা বলেছেন।

এর বিস্তারিত বিবরণ গোস্তের উপকারিতা অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে। তবে অবশ্য আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. একে রোগের কারণ বলে সনাক্ত করেছেন। যেমন, শরীরের কোনো কোনো অঙ্গ ফুলে যাওয়া। এ ফোলা কতিপয় পরগাছা ক্রিমির কারণে হয়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হল Wuchería Banerofti Guinea। আফ্রিকা ও মিসরে একটি ক্ষতিকর পোকা (ক্রিমি) গাভীর গোস্তে পাওয়া যায়। অপর একটি পরগাছা ক্রিমি অন্যান্য প্রাণীদের

তুলনায় শূকরের গোস্তে বেশি হতে দেখা যায়। অনুরূপ নাড়ীভুঁড়ি ও যকৃতে প্রতিপালিত হয়, এমন একটি ভয়ঙ্কর পোকা হল Fascio lopsis Baski.। এটা শূকর ও কুকুরের শরীরে বেশি পাওয়া যায়। এর বিষক্রিয়ায় দাস্ত, পেট ব্যথা এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। কুকুর ও শূকরের কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষের মধ্যে এ রোগ ছড়ালে সারা জীবন সীমাহীন কষ্ট ও ভোগান্তির কারণ হতে পারে। ইউরোপে প্রাণীর প্রতিপালন ও উৎপাদন কম হওয়ায় প্রতি বৎসর তাদের খাদ্য ঘাটতি দেখা দিত। এজন্য তারা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, চিলি, আর্জেন্টিনা, কেনিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে সেই ঘাটতি পূরণ করত। বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আর্জেন্টিনা থেকে শূকরের গোশত জার্মানীতে আমদানি করা হত।

যখন দেখা গেল ওখানকার শূকরের গোশতের কারণে জার্মানীদের মধ্যে অস্থি-সন্ধির রোগ-ব্যাধি দেখা দিচ্ছে। তখন জার্মান সরকার গোস্তের টুকরা পাঠানোর পূর্বে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করে। যদিও এটা কষ্টকর কাজ ছিল; কিন্তু উক্ত মারাত্মক রোগ থেকে বাঁচার জন্য এই একটি মাত্র ব্যবস্থাই ছিল। যার ফলে জার্মানীতে আমদানিকৃত গোশতের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা সরবরাহ ও আমদানির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট সংযুক্ত করে সাক্ষাৎকার দেয় যে, এতে পরজীবী পোকা নেই। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল, এত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও পোকা বাহিত রোগ-ব্যাধি পূর্বের মতোই বহাল আছে। তাই আজ অধিকাংশ দেশে শূকরের গোশত খুব গবেষণা ও পরীক্ষা-নীরিক্ষার পরই বাজারজাত করা হয়।

যদিও উক্ত পন্থা অবলম্বনের মধ্যে আনন্দিত হওয়ার তেমন কিছু নেই, তথাপি ধরুন স্বীকার করে নিলাম, এ জাতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণার পর এতে আর রোগ-জীবাণু থাকে না। কিন্তু তারপরও দেখা যাবে, গোশতের সঙ্গে জড়িত চর্বির কোষের মধ্যে মিশ্রিত জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করছে এবং খাদ্যকে অনুপযুক্ত ও ক্ষতিকর করে দিচ্ছে। দুর্বল শূকরের গোশত থেকেও তাপ উৎপাদিত হয়। তবে বকরির গোশতে উক্ত তাপ মাত্রা ২৪৫। অবশ্য বেশ কিছু পন্থায় উক্ত গোশতের ক্ষতিকর ক্রিয়া কিছুটা হ্রাস করা যায়। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, যখন উক্ত গোশত সাধারণ অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায় না, তখন এমন কী আর বিশেষ ব্যবস্থা

... ... ...ভাবার উপযুক্ত করা যাবে? সবচেয়ে বড় কথা হল, ভক্ষণকারী সর্বদা নির্লজ্জ হয়ে থাকে। এজন্য সমগ্র ইউরোপ লজ্জাশীলতা থেকে বঞ্চিত।

## গলা টিপে মারা প্রাণী

যে প্রাণী গলায় চাপা খেয়ে মারা যায়, তার শরীরের সমস্ত রক্ত দেহের মধ্যে থেকে যায়। এ কারণে তার গোশত দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। গোশ্তের রং গাঢ় লাল হয়ে যায়। ফলে তা কুশ্রী ও বিস্বাদ হয়ে যায়। শ্বাস আসা-যাওয়া বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ হওয়ার কারণে রক্তে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়। যদ্দরুন গোশ্তের মধ্যে এমন পরিবর্তন আসে, যার পরে তা খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বিরাট ক্ষতিকর। আঘাত যে প্রকারের হোক না কেন, এতে হিস্টামিনের উৎপত্তি হয়। এর দুর্গন্ধ গোশ্তে মিশে যায়। হিস্টামিনের প্রভাব ও তার ক্ষতি পৃথক শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে।

## আঘাতপ্রাপ্ত প্রাণী

উপর থেকে পতিত কোনো বস্তুর আঘাতে যে প্রাণী মারা যায় বা মানুষের দেহে যখন আঘাত লাগে, তখন এর ভয় ও ব্যথার কারণে শরীরে পরিবর্তন আসে। ধরুন! কেউ মোটর থেকে পড়ে গেল। তার শরীরে আঘাত লাগল। এতে তার হাড় ভাঙল না বা শরীরের কোনো অংশ মচকালও না। তবুও আঘাতের প্রচণ্ডতায় এবং ব্যথা-যন্ত্রণায় তার রং পরিবর্তন হয়ে যায়। নাড়ী দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে যায়। ঠাণ্ডা ঘাম নির্গত হয়। মুখ শুকিয়ে যায় এবং ঠাণ্ডা লেগে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে একে Surgical Shock বলে। রোগীর রক্তচাপ হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে তার চোখের পাতা স্ফীত হয়ে যায়। সে অনুভব করতে পারে, সে মৃত্যু পথের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আঘাত মারাত্মক না হলেও এ থেকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর অবস্থা দাঁড়াতে পারে।

মোটকথা, এ সকল অবস্থা আঘাতের প্রচণ্ডতা ও শরীরের অস্থি মচকে যাওয়ার কারণে হয় না। অন্যথায় আমরা কাশ্মীর মুক্তি আন্দোলনে হাজার হাজার আহতকে দেখেছি, গুলি লাগলেও তারা কষ্ট অনুভব করে নি। কারণ, তা দ্রুত বের হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কারও পায়ের গোঁড়ালীর নিচের অংশ মচকে গেলেও তা বেশ কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক হয়। আঘাত পাওয়ার পর ক্ষতস্থানটি প্রথমে লাল হয়ে যায়। তারপর ফুলে যায়। পরিশেষে উক্ত স্থান

নীল রং ধারণ করে। ঝিল্লির মধ্যে রক্তের শিরা ফেটে গেলে বা মুচড়ে গেলে এমন হয়। সুতরাং এরূপ আঘাত প্রাপ্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে উত্তপ্ত পানি বা গরম মাটি দ্বারা সেক দেওয়া হলে ফোলা বৃদ্ধি পায়।

কেননা উত্তপ্ত করার কারণে রক্তের আবর্তন (চাপ) বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এর বিপরীতে যদি ঠাণ্ডা পানি বা বরফ লাগানো যায়, তবে ফোলা ও যন্ত্রণা হ্রাস পেতে থাকে। আর ২৪ ঘন্টা পরে সেক দিলে উক্ত জমাট রক্ত শিরার মধ্যে ফিরে যায়। কথিত আছে, আঘাতের ব্যাপারে এ দৃষ্টিভঙ্গি চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি ঐতিহ্যময় কৃতিত্ব। প্রাচীনকালে আঘাত প্রাপ্তির পরপর উত্তপ্ত দুধ পান বা সেক দেওয়ার প্রথা ছিল। আঘাতের উপর একপ্রকার প্রলেপ দেওয়া হত। ফলে রক্তপ্রবাহ আরও বৃদ্ধি পেত।

পক্ষান্তরে উহুদ যুদ্ধের সময় রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভোতা অস্ত্র ও পাথরে আহত হন। এর চিকিৎসায় সর্বপ্রথম আঘাতের স্থানটি ধৌত করান এবং পানি ঢালেন। ফলে রক্ত জমাট হয় নি। এ প্রাথমিক চিকিৎসার সুফলে আঘাতে যন্ত্রণা হল না, ফুলে গেল না বা শঙ্কার কোনো চিহ্নও পাওয়া গেল না। আঘাতপ্রাপ্তি ও ভীতির কারণে শারীরিক গঠনের মধ্যে একপ্রকার রাসায়নিক উপকরণ হিস্টামিন জন্ম নেয়। আঘাত থেকে উদ্ভূত যাবতীয় আলামত হিস্টামিনের প্রতিক্রিয়া। এমনকি 'হোসূনাসিয়াত' থেকে উৎপন্ন চর্মরোগ হিস্টামিনের কারণে হয়।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে মানুষ হিংস্র জীবজন্তু দেখলে ভীত হয়ে যায়। পরে হিস্টামিন জন্ম নেয়। ফলে জীবজন্তু অনেক দূর থেকে এর (হিস্টামিনের) গন্ধ পায়। বাঘ বনের কোনো অংশে হিস্টামিনের ঘ্রাণ পেলে বুঝতে পারে, আশপাশে কোথাও এমন প্রাণী আছে, যে তার (বাঘের) ভয়ে ভীত। বাঘ তখন ঐ ঘ্রাণ শুঁকে অগ্রসর হতে হতে শেষ পর্যন্ত তাকে শিকার করে বসে। অথচ বাস্তবে উক্ত প্রাণী তার দৃষ্টিসীমার বহু দূরে ছিল। প্রাণী আঘাত প্রাপ্ত হলে অথবা বিশেষ করে ভোতা অস্ত্রে আহত হলে হিস্টামিন সৃষ্টির কারণে রক্তের শিরাগুলো বিস্তৃত ও ঢিলা হয়ে যায় এবং হিস্টামিনের গন্ধ এতে মিশে যায়।

কুরআন মজীদ উপর থেকে নিচে পতিত, লাঠি দ্বারা প্রহৃত এবং আঘাত বা ধাক্কা খেয়ে পড়ে নিহত প্রাণীর গোশত খাওয়াকে হারাম করে দিয়েছে। ইসলামের বিধান ও কানুন পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার উপর

প্রতিষ্ঠিত। হিস্টামিন কখন, কোথায় কিভাবে সৃষ্টি হয়, এর কার্যকারিতা ও ক্রিয়াশীলতা ইত্যাদির যাবতীয় লক্ষণ ও অবস্থা উল্লেখ পূর্বক বর্ণনা করে দিয়েছে।

উল্লিখিত সকল অবস্থায় নিহত হওয়ার পর হিস্টামিন সৃষ্টি হয়ে গোশত স্বাদহীন, রংহীন এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়। বর্তমান আধুনিক চিকিৎসার ভাষায় Blunt Injuries এ ধরনের নিহত প্রাণীর গোশত নিষিদ্ধ করে মুসলমানদের রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচার এক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ পেশ করেছে। উল্লিখিত আলোচনা ও অবস্থা পাঠে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে, সুস্পষ্ট কারণে নিহত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই উক্ত প্রাণীসমূহের গোশত মানুষের ভক্ষণ উপযোগী নয়। ইসলাম এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের উপর এক বিরাট অনুগ্রহ করেছে।

## হিংস্র প্রাণীর ভুক্তপ্রাণী

হিংস্র প্রাণী কোনো প্রাণীকে খেয়ে ফেললে উক্ত প্রাণীর (ভুক্ত) প্রাণীর গোশত খাওয়াকে ইসলাম হারাম করেছে। চাই তা মেরে ফেলুক বা জীবিত থাকুক। উদাহরণস্বরূপ নেকড়ে বাঘ ভেড়াকে খাওয়া শুরু করলে লোকেরা তাকে উদ্ধার করে নিল। এ ক্ষেত্রে ভেড়া জীবিত থাকলেও নেকড়ে বাঘ যদি তার গায়ে দাঁত বসিয়ে থাকে, তবে উক্ত ভেড়ার গোশত ইসলামি শরী'অত মোতাবেক হারাম। হিংস্র জন্তু কোনো প্রাণীর উপর আক্রমণ করলে উক্ত প্রাণী পূর্ণ মাত্রায় ভীত-প্রকম্পিত হয়। এভাবে প্রাণীর দেহে হিস্টামিনের উপস্থিতি তাকে মানুষের খাওয়ার অনুপযোগী করে দেয়। হিংস্র জন্তুর মুখের মধ্যে পাগলা রোগের জীবাণু থাকে।

শহরের কুকুরের দেহে উক্ত রোগের জীবাণু বনের হিংস্র জন্তুর মাধ্যমে প্রবেশ করে। চিতা বাঘ, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল, খেঁকশিয়াল, বন বিড়াল, সিংহ ইত্যাদি কোনো প্রাণীর উপর মুখ দিয়ে থাবা মারলে সেখানে দাঁত বসে যায় এবং এর সাথে পাগলা রোগের জীবাণু ঢুকে যায়। জলাতঙ্ক (Rabies) এমন একটি মারাত্মক রোগ, এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি আজ পর্যন্ত একজনও প্রাণে বাঁচে নি। যে ব্যক্তি এ রোগের শিকার হয়, কোনো চিকিৎসাতেই তার জীবন বাঁচানো যায় না।

ইসলাম পূর্ব থেকেই অবগত ছিল, হিংস্র জন্তুর মাধ্যমে পাগলা রোগ ছড়িয়ে পড়লে এর চিকিৎসা আদৌ সম্ভব হবে না। এ জন্য ইসলাম মুসলমানদেরকে পাগলা রোগ থেকে বাঁচার জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে।

(১) কখনও ঘরের মধ্যে কুকুরকে স্থান দিবে না। লম্পট কুকুর (টো টো করে ঘুরে বেড়ায় এমন কুকুর) মেরে ফেলবে।

(২) কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে উক্ত পাত্র সাতবার ধৌত করবে। তন্মধ্যে একবার মাটি দ্বারা উত্তমরূপে পরিষ্কার করবে।

(৩) যে প্রাণীর শরীরে কুকুর বা কুকুরের মতো জীবজন্তুর মুখের লালা প্রবেশ করেছে, সে প্রাণীর গোশতও খাবে না।

○ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জরুরী নির্দেশের মাধ্যমে একবার মদীনার সমস্ত কুকুর নিধন করেন। তারপর ইরশাদ করেন : যে ঘরের মধ্যে কুকুর থাকবে, সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করবে না। তারপর এক বাণীতে বলেন, কুকুর পরিবারের সদস্যদের জন্য সর্বদা শাস্তি ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লাহোর সেনানিবাসে আধুনিক ফ্যামিলি "নীশি" নামক এক জাতীয় রাশিয়ান কুকুর পালত। সারা দিন শিশুরা তার সাথে খেলাধুলা করত। এর মধ্যে ক্রোধান্বিত হওয়ার অভ্যাস ছিল না। হঠাৎ একদিন উক্ত ঘরের এক শিশুর খিচুনী (পেশী-সঙ্কোচন) দেখা দেয়। চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্রেও সন্দেহ ও জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। পরে শিশুটি সেখানেই মারা যায়। কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর অনুরূপ আলামত অপর শিশুর মধ্যে দেখা দেয়। তাকে সাথে সাথে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

কিন্তু এ শিশুটিও অবশেষে মারা যায়। মূলত কুকুরটি উক্ত ঘরে প্রতিপালিত হচ্ছিল। এর রোগজীবাণু ও পাগলারোগ থেকে বাঁচার জন্য টীকাও (ইনজেকশন) দেওয়া হয়েছিল। কুকুরটি ঘর থেকে বাইরে যেত না। ফলে অন্যান্য কুকুর থেকে রোগজীবাণুও বহন করত না। এটি বাইরের কাউকে দংশনও করে নি। সুতরাং আমরা একে বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলাম।

এর দাঁত এত বড় ও সুদৃঢ় ছিল না যে, কাউকে ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু মূলত তার সাথে সহাবস্থানের কারণে শিশু দুটি মারা যায়। তাই

মানুষকে বুঝানোর জন্য কুকুরটি নিধন করে পোস্টমার্টেম করা হয়। ফলে চাক্ষুস দেখা যায়, এর শরীরে পাগলা রোগের জীবাণু ছিল এবং অন্যান্যদের উক্ত রোগে আক্রান্ত করার শক্তিও তার মধ্যে প্রবল ছিল। জীবাণু বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের ধারণা মতে এ রোগ জীবজন্তুর মধ্যে তখন হয় যখন তাদের শরীরে অন্য কোনো মাধ্যমে জীবাণু প্রবেশ করে। জীবাণু প্রবেশের ১০ দিনের মধ্যে উক্ত প্রাণী মারা যায়।

জীবাণু শরীরে প্রবেশ করেছে, অথচ জীবজন্তু রোগাক্রান্ত হয় নি –এটা একেবারেই অসম্ভব। তবে আমেরিকায় নাকি এক জাতীয় বাঁদুড় আবিষ্কার হয়েছে, যা আক্রান্ত হওয়া ব্যতীত পাগলা রোগের জীবাণু অন্য প্রাণীদের মধ্যে ছড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের শূকর, কুকুর ইত্যাদির স্টোর (খামার) করার প্রতি তেমন সমর্থন নেই। তবে লাহোর সেনানিবাসে কুকুরই নেই। আমাদের জানা মতে এত বড় ঘটনা অর্থাৎ কোনো জীবজন্তু নিজে আক্রান্ত হওয়া ব্যতীত রোগজীবাণু অন্য প্রাণীর মধ্যে ছড়িয়ে সুস্থ থাকতে পারে তা জানা নেই।

উল্লেখ্য যে, ফ্লোরা নামে আমেরিকার এক মহিলার লজ্জাকর ঘটনা চিকিৎসা শাস্ত্রের বহু বই-পত্রে পাওয়া যায়। কুকুরের সংস্পর্শে থাকার কারণে উক্ত মহিলা পাগলা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। অথচ তার কুকুরকে রোগমুক্ত করা হয়েছিল। অন্য কুকুরদের সংমিশ্রণ থেকেও দূরে রাখা হয়েছিল। উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, হিংস্র জীবজন্তুর লালা কেবল পাগলা রোগ নয় বরং অন্য যে কোনো মারাত্মক রোগ-ব্যাধিরও কারণ হতে পারে। সে জন্য যে প্রাণীর শরীরে হিংস্র জন্তুর লালা পড়েছে, সে প্রাণীর গোশত খাওয়া মানুষের জন্য ক্ষতিকর। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়টি স্বাস্থ্যসম্মত বিধিতে পরিণত করতে গিয়ে বলেন– অভদ্র, দুষ্টু ও নিকৃষ্ট জীবজন্তুর গোশত খাওয়া হারাম। হাদীসে খেঁকশিয়াল ও চিতা বাঘের কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

## হারাম বস্তুর আসলরূপ

প্রকাশ থাকে যে, ইসলাম কেবল সে সমস্ত বস্তু নিষিদ্ধ করেছে, যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক। এ বিষয়ে কুরআন আইন প্রণয়ন করে দিয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে

আরও স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। ফিক্‌হের কিতাব "তুহ্‌ফাতুল আওয়াম"-এর মধ্যে হারাম বস্তুগুলোর একটি সুন্দর তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। এতে সামান্য মতানৈক্য থাকতে পারে। সেগুলো নিম্নরূপ:

(১) কুকুর (২) শূকর (৩) বিড়াল (৪) ইঁদুর (৫) গোসাপ (৬) জোঁক (৭) শাহীন (৮) কচ্ছপ (৯) সিংহ (১০) চিতা বাঘ (১১) নেকড়ে বাঘ (১২) গণ্ডার (১৩) হাতি (১৪) ভল্লুক (১৫) শিয়াল (১৬) বাজপাখী (১৭) হায়েনা (১৮) খেঁকশিয়াল (১৯) চিল (২০) বাজ (২১) বাঁদুড় (২২) সাপ (২৩) মাকড়সা (২৪) বিচ্ছুত(২৫) কাঁকড়া (২৬) মশা (২৭) মাছি।

দুর্গন্ধ ভক্ষণকারী যাবতীয় প্রাণী হারাম। তদ্রূপ যদি হালাল প্রাণীও দুর্গন্ধ বস্তু ভক্ষণ করে, তবে তাও হারাম। একে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যোপযোগী করা হয়, তাকে ইসতিবরা বলে। নিময় হল, ময়লা-আবর্জনা ভক্ষণকারী প্রাণীকে কিছু দিনের জন্য নিরাপদ সংরক্ষিত স্থানে রেখে পাক-পবিত্র খাদ্যদ্রব্য খাওয়াতে হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে পূর্বে ভক্ষণ করা খাদ্য থেকে কোনো রোগজীবাণু প্রবেশ করে থাকলে, তার লক্ষণ প্রকাশ পাবে।

এটা একটি বিজ্ঞানসম্মত, আইনসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য পন্থা। এ পন্থায় উটকে ৪০ দিন, গাভীকে ২০ দিন, ভেড়া-বকরিকে ১০দিন এবং গৃহপালিত মুরগী ইত্যাদিকে তিন দিন পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। এ নির্ধারিত সময়-সীমা প্রাণীটি সুস্থাবস্থায় অতিবাহিত করলে এর গোশত ভক্ষণ করা বৈধ। অন্যথায় একে যবাহ্ করে বিনাশ করে দিতে হবে। কেননা তা মানুষের ভক্ষণ অনুপযোগী।

## যবাই ও আধুনিক বিজ্ঞান

### সুন্নাতে রাসূল

কোনো প্রাণী খাদ্যোপযোগী করার জন্য একে যবাই অতি জরুরি। ইসলামে জীবন্ত প্রাণীর দেহ থেকে গোশতের কোনো টুকরা কর্তন করা নির্দয়, নিষ্ঠুরতা ও ক্ষতিকর (কাজ)। কেননা কর্তনের পর ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত তাকে কষ্ট দিয়ে নিহত করতে পারে। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে কোন প্রকারে ক্ষতস্থানের ও পোড়া-ঘা চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করা হয়। তবু সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত প্রাণীর স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে না। এটি

মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলেও পরবর্তীকালে কোনো কাজের যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখে না। সুতরাং এর অবশিষ্ট গোশতও অকেজো হয়ে যায়। এ বিষয়ে আসমানী কিতাবসমূহে সুস্পষ্ট কোনো ঘোষণা নেই। তবে ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য হল, প্রাণীর জীবন। সুতরাং ইসলাম যবাইয়ের পর গোশতকে মানুষের খাদ্যের উপযোগী করার জন্য সহজসাধ্য ও বিধিবদ্ধ করার উপযুক্ত পন্থা শিক্ষা দিয়েছে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার পর এক দিনকার ঘটনায় হযরত আবু ওয়াকেদ লাইছী রাযি. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা শরীফে শুভাগমন করেন, তখন সেখানকার লোকেরা উষ্ট্রের ঝুঁটি কর্তন করত।

✪ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব কিছু জানার পর ইরশাদ করেন : জীবন্ত প্রাণীর দেহ থেকে যদি কোনো গোশতের টুকরা কর্তন করা হয়, তবে উক্ত গোশতও মৃত হয়ে যায়। (ইবনে মাজাহ)

মোটকথা, প্রাণীর উপর অন্যায়-অবিচার রোধ করতে এবং খাদ্যকে উত্তম, উন্নত ও বৈধ করতে ইসলাম কিছু বিধিবদ্ধ পন্থা অবলম্বন করেছে। এভাবে ইসলাম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছে। প্রাণীকে খাদ্যোপযোগী করার জন্য প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। প্রাচীন কালে মানুষ প্রাণীদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে ঘায়েল করে বধ করত। বড় বড় প্রাণীদের শিকার করা খুব কষ্টকর হত।

এ প্রক্রিয়ার ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পক্ষ থেকে অভিযোগ ছিল, প্রাণীটি আহত, ক্ষত-বিক্ষত ও রক্ত থেকে যাওয়ার কারণে অর্থাৎ ব্যথা ও আঘাতের কারণে প্রাণীর দেহ থেকে হিস্টামিন সৃষ্টি হত। ফলে রক্তনালীকে বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করে দিত। এমতাবস্থায় ভীতির কারণে দেহ থেকে রক্ত পরিপূর্ণ বের হত না। যার কারণে গোশত বিস্বাদ ও দ্রুত নষ্ট হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলার পৃথিবী আবাদ করার প্রথম যুগে আল্লাহ তা'আলার প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করার পরিবর্তে যবাই করার বৈধ পন্থা শিখিয়েছেন। যেমন : ইবরাহীম আ. হাত সম্প্রসারিত করে ছুরি গ্রহণ করেন এবং নিজ পুত্রকে যবাই করেন।

পবিত্র তাওরাত গ্রন্থে ইবরাহীম আ.-এর দিকে সম্বন্ধ করে বলা হয়েছে, যখন তিনি কুরবানি করার জন্য বের হন, তখন রীতিমতো ছুরি সঙ্গে নেন। অনুরূপ ইউসুফ আ.-এর রক্তকে গুম করার ব্যাপারে লেখা হয়েছে, একটি বকরি যবাই করে ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা এবং তাঁর জামাকে উক্ত বকরির রক্তে ভিজায়। তদ্রূপ আহবার গ্রন্থে জাদুকরদেরকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন দগ্ধীভূত কুরবানির প্রাণীকে যবাই করে পাক করে। আল-কুরআন যবাই বুঝাতে "যাকিয়া" শব্দ ব্যবহার করেছে। এর অর্থ, পাক-পবিত্র করা। সুতরাং যবাই প্রাণীর গোশতকে অপবিত্র ও ময়লা থেকে পাক করে। খাদ্যের উপযোগী করে। এভাবে বৈধ ও স্বাস্থ্যসম্মত পন্থায় যবাই করে গোশত পাক পবিত্র করা পবিত্র তাওরাত ও কুরআন মজীদের শিক্ষা।

● বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. হতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বের একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। কোনো এক দাওয়াতে গোশত পাকানো হয়েছিল। সেখানে তাওরাতের আলিম যায়েদ বিন আমর বিন নোফায়েল উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন– আল্লাহর নামে যবাই না করলে সে গোশত আমি খাবই না। তদ্রূপ প্রতিমার স্থানে যবাইকৃত প্রাণীর গোশতও খাব না। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, হযরত ঈসা আ. তাঁর যুগে যবাই করার এ পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। যার প্রচলন স্বয়ং ইসলাম করেছে। লাঠি, পাথর, ছুরি ইত্যাদি দ্বারা প্রাণীকে আহত করার পর ঘাড়ে মারার নতুন একটি পন্থাও আবিষ্কৃত হয়েছে।

## ইহুদিদের জন্য হালাল প্রাণী তৈরি

মুসলমান ছাড়াও ইহুদি এমন এক জাতি, যারা নিজেদের আসমানী গ্রন্থের উপর পুরোপুরি ঈমান রাখে এবং সে দিকনির্দেশনা অনুযায়ী হালাল হারাম পুরোপুরিভাবেই মেনে চলে। অবশ্য তাওরাতের উপর খ্রিস্টানরাও ঈমান এনেছে। কিন্তু তারা হারাম জিনিসও ভক্ষণ করে। অথচ পোলোস এবং সেন্টপাল (খ্রিস্টানদের ধর্ম যাজক) হারাম প্রাণীর একটি লম্বা ফিরিস্তি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টানদের বাস্তব জীবনে তার কোনো প্রভাব পড়ে নি। যেভাবে মুসলমানগণ প্রাণী যবাই করে ইহুদিরাও সেভাবেই প্রাণী যবাই করে বরং ইহুদিরা অধিকতর সতর্কতা হিসেবে হারাম দ্রব্য ও

যবাইকৃত প্রাণী নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রতিটি এলাকায় একটি ইহুদি পদ্ধতির যবাই কাউন্সিল Vad Kashruth রয়েছে। তাদের ভাষায় একে কাশরুথ অথবা কাফরুথ বলা হয়। যার অর্থ হল, শাল্য নাকশী মূসা আ.-এর শরী'অত অনুযায়ী ব্যবস্থা করা। এ পরিষদ বিশ্বস্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইহুদিদেরকে সার্টিফিকেট দিয়ে শুদ্ধভাবে যবাইকৃত প্রাণীর গোশত বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ করে। দোকানসমূহে হালাল গোশত বিক্রয়ের উপর কড়া নজর রাখার জন্য একজন ইনস্পেক্টরও নির্ধারণ করে। তাকে Mashgihim বলা হয়।

পবিত্র তাওরাতের শিক্ষার আলোকে হালাল প্রাণী যবাই করার ক্ষেত্রে কসাইখানায় নিম্নোক্ত শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়।

(১) প্রাণী চতুষ্পদ হতে হবে, তার ক্ষুর দ্বি-খণ্ড হতে হবে এবং জাবর কাটিতে হবে।

(২) প্রাণীটি হারাম প্রাণী বা পাখীদের তালিকাভুক্ত হতে পারবে না।

(৩) যবাইয়ে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধর্মগুরুর হাতে যবাই করাতে হবে। এরূপ ধর্মগুরুকে Sohet বলে।

(৫) যবাইকারীর ছুরিটা যেন ক্ষুরের মতো ধারালো হয়; কাঁচি বা করাতের মতো দাঁতবিশিষ্ট নয়।

(৬) প্রাণীটিকে শুইয়ে মাথার নিম্নাংশে গর্দানের উপর একবার একদিকেই ছুরি চালাতে হবে। একবারে রগগুলো কাটিতে না পারলে গোশত হারাম হয়ে যাবে।

(৭) যবাইকারী যবাইকালে ইবরানী ভাষায় বিশেষ দু'আটি পড়বেন।

(৮) যবাইয়ের পর প্রাণীর শরীরে লবণ লাগাতে হবে। যাতে শরীরের সমস্ত রক্ত বেরিয়ে আসে।

(৯) প্রাণীটি যবাই করার পর সঠিকভাবে যবাই হয়েছে কিনা পরিদর্শন করে দেখা হবে। গ্রাহ্য হলে তখন তার পায়ের সাথে একটি নিদর্শন লাগানো হবে। যাতে ইবরানী ভাষায় Koshcher lapesach (খাওয়ার উপযোগী) শব্দটি লেখা থাকবে। তাছাড়া ছবির মতো একটি মার্কা লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং যবাইকারীর নাম যবাইয়ের তারিখ ও স্থানের নাম লিখা থাকবে।

(১০) এ পবিত্র গোশতের পিছনের পা থেকে Lschialic Narve টেনে বের করে দিতে হয়। কারণ তা হারাম।

(১১) এ পবিত্র গোশতকে এরূপ কোনো পাত্রে রান্না করা যাবে না, যে পাত্রে কখনো হারাম জিনিস রান্না করা হয়েছে। তাছাড়া গোশত রান্না করার সময় যেন দুধ না দেওয়া হয়।

লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ড অঞ্চলে আব্দুল্লাহ্ নামক একজন ইহুদি কসাইয়ের গোশতের বিরাট ব্যবসা ছিল। শুধু ইহুদিরাই নয়, তার কাছ থেকে মুসলমানরাও গোশত খরিদ করত। একবার তার দোকান থেকে মুরগী খরিদ করা হল। তাতে দেখা গেল, মুরগীর পায়ের সঙ্গে যবাইকৃত প্রাণীর পবিত্রতা এবং যবাইকারীর নামের ফিতা ঝুলে আছে।

ইহুদিদের যবাইকৃত প্রাণীর উপর ইউরোপের অনেক খ্রিস্টানদের আপত্তি ছিল। মানবাধিকার গ্রুপগুলো এ যবাইকে জুলুম আখ্যা দিয়েছিল। তাই কয়েকবার এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডেও একবার এরূপ আন্দোলন হয়েছিল এবং সংবাদপত্রে বিভিন্ন কলাম ছাপা হয়েছিল। একে কেন্দ্র করেই একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক এবং বৃটেনের রাণীর সরকারী ডাক্তার লর্ড বর্ডার লিখেছেন, আমি ইহুদিদের যবাই পদ্ধতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। এতে কোনো কষ্ট যাতনা ছাড়াই প্রাণীর মৃত্যু এত সহজেই হয় যে, আমিও খোদার কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাকেও এরূপ সহজ মৃত্যু দান করেন।

মূলত সুন্নতে ইবরাহীমী ধর্ম অনুযায়ী যবাই করলে প্রাণীর প্রধান প্রধান রগগুলি সহজেই কেটে যায় এবং প্রাণীটি সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ হয়ে যায়। সামান্য লাফালাফি করলেও তা হুঁশ থাকাবস্থায় হয় না। এজন্য প্রাণীকে খাদ্য উপযোগী করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি এটাই।

## যবাই করার ইসলামী নিয়ম

যবাই করার মৌলিক উদ্দেশ্য হল, হালাল প্রাণীর গোশত এমন উপায়ে সংগ্রহ করা, যাতে তার কষ্ট না হয়। তার রং-স্বাদ যেন রুচিসম্মত থাকে এবং ঐ গোশত কিছু সময় খাবার উপযোগী থাকে। প্রাণীকে যদি কষ্ট দেওয়া হয় বা তার শরীর থেকে যদি পুরো রক্ত বের না হয়, তা হলে তাতে ভিটামিনের জন্ম হতে পারে। শরীরে রক্ত অবশিষ্ট থেকে গেলে এরূপ

গোশত মানুষের জন্য খাওয়া উচিত নয়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন, যবাইয়ের ছুরিটা ভালোভাবে ধার দিয়ে নিবে এবং প্রাণীর সম্মুখে লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে যাবে। যবাই করার সময় তাড়াতাড়ি যবাই করে ফেলবে।

(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

এ বিষয়ে হযরত আওফ বিন শাদ্দাদ রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইরশাদ নকল করেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের সাথে সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি তোমরা কাউকে হত্যা কর, তবে তা দ্রুত সম্পাদন করে ফেল আর যদি যবাই কর, তা হলে খুব তাড়াতাড়ি করে ফেল। ছুরিটা খুব ভালোভাবে ধার দিয়ে নাও এবং প্রাণীকে আরাম দাও। (মুসলিম)

✪ হযরত আবু হুরাইরা রাযি. ইরশাদ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুদাইল বিন ওয়ারাকা খুযায়ীকে একটি ছাই রংয়ের উটের উপর সাওয়ার করে মিনায় পাঠালেন। যেন তিনি তথায় গিয়ে অলিতে গলিতে ঘোষণা করে দেন যে, প্রাণীর যবাই হবে গলা এবং থুতনীর মধ্যবর্তী স্থানে আর তার প্রাণীর চামড়া ছাড়ানোর ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করবে না। মিনায় অবস্থান খাওয়া-দাওয়া এবং আনন্দফূর্তির জন্য। (দারা কুতনী)

এখানেও যবাইকে পবিত্র করার মাধ্যম বলা হয়েছে। যবাইকারীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রাণী ঠাণ্ডা-নিস্তেজ না হওয়া পর্যন্ত যেন তার চামড়া ছাড়ানো না হয়। যাতে আরামের সাথে তার প্রাণ বেরিয়ে যায়।

যবাই করার অন্যান্য পদ্ধতির ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মুহাম্মদ বিন সফওয়ান বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন দুটি খরগোশ আমার হাতে ঝুলানো ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এ দুটি পেয়েছি এবং এগুলি যবাই করার জন্য লোহার কোনো জিনিস হাতের কাছে পেলাম না, তখন একটি ধারলো সাদা পাথর দিয়ে এগুলিকে যবাই করে ফেললাম। এখন আমি কি এগুলি খেতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, খাও।

✪ কা'ব ইবনে মালিক রাযি. বর্ণনা করেন, আমার বকরিগুলো সিলা পাহাড়ের উপর চরত। আমার বাঁদী হঠাৎ দেখল, একটি বকরি মরে যাচ্ছে।

সে একটি পাথর ভেঙে তার দ্বারা যবাই করে ফেলল। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হল। তিনি তা খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী)

○ আদী ইবনে হাতেম রাযি. বর্ণনা করেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম– হে আল্লাহর রাসূল! বলুন, যদি আমরা কোনো শিকার পাই এবং আমাদের নিকট ছুরি না থাকে, তা হলে কি আমরা পাথর অথবা লাকড়ির টুকরো দিয়ে যবাই করে ফেলব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, যেটা দিয়ে মনে চায় যবাই করে নিবে এবং আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করবে।

## যবাইকৃত প্রাণী ও আধুনিক বিজ্ঞান

### ইসলামের অবদান

ইসলাম প্রাণীসমূহকে খাওয়ার উপযোগী বানানোর জন্য মৌলিক শর্ত দিয়েছে তার শরীরের সমস্ত রক্ত বের হয়ে যাওয়া। কাজেই স্বাভাবিকভাবে ঘাড়ের সামনের দিকটায় রক্ত প্রবাহের চারটি প্রধান রগ JUgur Veins Carotid Arteries এবং তার সঙ্গে কণ্ঠনালীও কাটতে হবে। এতে প্রাণী সঙ্গে সঙ্গেই বেহুঁশ হয়ে যায়। কলিজা থেকে মাথায় যাওয়ার বড় রগ ও ধমনী দুটি কেটে গেলে তীরবেগে রক্ত বের হতে থাকে। প্রাণীও কাতরাতে থাকে। কেননা মস্তিষ্কের সাথে শরীরের সম্পর্ক হারাম মগজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর তখন প্রাণীটি জোরে জোরে হাত পা নাড়ার ফলে শরীরের শেষ প্রান্তে আটকে থাকা রক্তও বের হয়ে আসে।

ভারত উপমহাদেশে শুধু শিখ জাতি গোশত খেত এবং তারা প্রাণীটিকে দাঁড় করিয়ে তার ঘাড়ে তরবারির আঘাত করে শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলত। তাদের ভাষায় একে ঝটকা বলা হয় আর এরূপ গোশতকে বলা হয় মহাপ্রসাদ। ঝটকা করলে প্রাণীর মেরুদণ্ড কেটে যাওয়ার দরুন মস্তিষ্কের সাথে শরীরের সম্পর্ক নিঃশেষ হয়ে যায় এবং শরীরের রক্ত নিস্তেজ হয়ে যায়। ফলে তার কাটা থেকে ঐ পরিমাণ রক্তই বের হয়, যা কাটা স্থানের আশপাশে থাকে। এরূপ প্রাণীর যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত শরীরের ভিতরে থেকে যায়। তাই গোশতের রং বিকৃত এবং স্বাদ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তা রান্না করার সময় একপ্রকার দুর্গন্ধ ছড়ায়।

ইউরোপের দেশগুলোতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাটনা করে প্রাণী বধ করা হত। এরপর তারা একে নতুন রূপদান করে বানাল Goillatin অর্থাৎ প্রাণীকে কাঠের ফ্রেমে দাঁড় করিয়ে উপর থেকে একটি ভারি ছোরা ফেলে শরীর থেকে মাথা আলাদা করে ফেলত। অভিজ্ঞতা জানা গেছে, এভাবে মেশিনে কাটা গোশত খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু তার ভিতরে রক্ত থেকে যায়, ফলে রান্না করার সময় এ থেকে একপ্রকার দুর্গন্ধ বের হয়। পশু যবাইয়ের আধুনিক কেন্দ্রকে Gleoteire বলে। এতে পশুটিকে ভিতরে নিয়ে মাথায় একটি ভারি হাতুড়ি মারা হয়

অথবা মস্তিষ্কে বিদ্যুতের শক দেওয়া হয়। পশুটি যখন বেহুঁশ হয়ে যায়, তখন তার পায়ে শিকল লাগিয়ে উল্টো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ঐ বেহুঁশ প্রাণীর গলায় মেশিন দ্বারা করাতের মতো একটি ধারালো ছুরি চালিয়ে ইসলামি পদ্ধতির অনুসরণে গলার অর্ধেক পরিমাণ কেটে দেওয়া হয়। যবাইয়ের এ আধুনিক নিয়মের উদ্দেশ্য হল যেন রক্ত পুরাপুরি বের হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মেশিনের সাহায্য থাকা সত্ত্বেও চার পাঁচ মিনিট লেগে যায়। লাহোরের কসাইখানায় ইসলামি পদ্ধতিতে হাতে যবাই করলে ভেড়া বকরির এক মিনিট এবং গাভী-মহিষের জন্য তিন চার মিনিট ব্যয় হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে যবাই করার ক্ষেত্রে পশুকে বেহুঁশ করার জন্য মস্তিষ্কে যে আঘাত করা হয় অথবা বৈদ্যুতিক শক Surgical Shock দেওয়া হয়, এর কারণে হিস্টামিন সৃষ্টির কারণ হয়ে যায় এবং আঘাত পেয়ে মৃত প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

এ সকল প্রাণীর গোশত একেবারে অরুচিকর হয়। স্বাদ অনুভব করতে পারে এরূপ কয়েকজন ইউরোপীয় বন্ধুকে খুব কৌশলে একদিন তাজা যবাই করা গোশত এবং একদিন মেশিনে যবাই করা গোশত খাওয়ানো হল। তারা সকলে একমত হল, যবাই করা গোশতে যে স্বাদ রয়েছে, তা অন্য কোনো গোশতে নেই। যবাই করার ইসলামি পদ্ধতি প্রাণীর জন্য আরামদায়ক এবং ভক্ষণকারীদের জন্য অধিক নিরাপদ।

(তিব্বে নববী আওর জাদীদ সায়েন্স)

# রোগীর সেবা ও আধুনিক বিজ্ঞান

একবার এক ব্যক্তি বলছিলেন, আমি অসুস্থ ছিলাম আর তখন আমি বিদেশে ছিলাম বলে খুব পেরেশান ছিলাম। কিন্তু কিছু দিন পর বন্ধুগণ জানতে পেরে সেবা করার জন্য আসলেন। অন্যান্য সকল বন্ধুবান্ধবও আসলেন। আস্তে আস্তে আমার স্বাস্থ্য ভালো হতে লাগল। আমি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থতা লাভ করলাম।

বর্তমানে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞগণ খুবই তাগিদ দিয়ে বলছেন, তোমরা নিজ নিজ রোগীর চিকিৎসা সেবার দ্বারা করো। কারণ, তোমাদের সেবা রোগীকে দ্রুত সুস্থতা দান করবে।

## আমেরিকার কেনেডী হাসপাতালের কার্যবিধি

(THE METHOD OF AMERICAN KENNEDY HOSPITAL)

এক ব্যক্তি চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সেখানে গেলেন। তিনি বলেন, প্রতিদিন দু'বার প্রত্যেক রোগীর নিকট তাদের পাদ্রী ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ এসে হাসিমুখে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। রোগীকে সান্ত্বনা দেন। সুস্থতার জন্য দু'আ করেন। এরপর অন্য রোগীর কাছে যান। আমি এ অবস্থা দেখে, অবাক-বিস্ময়ে ভাবতে লাগলাম, রোগীর সেবা করার এ শিক্ষাই তো ইসলাম মুসলমানদেরকে দিয়েছে।

আমি আমেরিকান ঐ হাসপাতালে ভালোভাবে লক্ষ্য করেছি, তাদের এ সেবার কারণে অভিভাবকগণ তাদের রোগীকে ঐ হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর চেষ্টা করেন। কারণ, সেখানকার রোগীরা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থতা লাভ করে।

## আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা

নিউইয়র্কের হাসপাতালসমূহে একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে, যে সকল রোগী হাসপাতালে বেওয়ারিশ হয়ে একাকী পড়ে থাকত, তাদেরকে উন্নত চিকিৎসা দান এবং তাদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও পুরোপুরি ফায়দা হচ্ছিল না। অথচ যে সকল রোগীদের আত্মীয়স্বজন ও সেবাকারী আসা যাওয়া করত, তাদের মধ্যে সুস্থতা অন্যদের তুলনায় দ্রুত আসত। এ পর্যবেক্ষণের পর নিউইয়র্কের পাদ্রীগণ হাসপাতালে যাওয়া শুরু করলেন। তারা রোগীদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তাদের কাছ থেকে অসুস্থতার

বিবরণ শুনতেন। অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে তাদের সুস্থতার জন্য দু'আ করতেন। অনেক রোগী চিকিৎসা ছাড়াই পাদ্রীদের সুদৃষ্টি পেয়েই ভালো হয়ে যেত। "Readers Digest" নামক একটি আমেরিকান পত্রিকায় এ ব্যাপারটিকে রূহানিয়াত বা আত্মিক ব্যাপার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাদের বক্তব্য হল, পাদ্রীদের দু'আয় তাদের উপকার হয়েছে।

কিন্তু আসল কথা হল, অসুস্থতার সময় রোগীর মন থাকে বিষণ্ন। সে তার রোগের দুশ্চিন্তায় যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে তৈরি থাকে। সংবাদপত্রে প্রতিদিন অনেক ঘটনা পাওয়া যায়, নিঃসন্তান মহিলারা রাতের অন্ধকারে কবরস্থান গিয়ে মৃতদের হাড্ডি উঠিয়ে তার উপর গোসল করে। কোথাও কোথাও কোনো পড়শীর শিশুকে হত্যা করে তার লাশের উপর নিরর্থক ও বেহুদা মন্ত্র পাঠ করে। নিজের সন্তানহীনতা অথবা রোগের অসহ্য যাতনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সে যে কোনো অনর্থক বা শরী'অতের খেলাপ কাজ করতেও দ্বিধা করে না। ইসলাম সর্বপ্রথম রোগীর মানসিক অবস্থাকে অনুভব করেছে। সেইসঙ্গে এ ব্যাপারে এমন কার্যকরী পরামর্শ দিয়েছে, যা রোগীর মন-মানসিকতায় প্রশান্তি আনে।

✪ হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এক মুসলমানের অপর মুসলমানের উপর পাঁচটি হক রয়েছে। (১) সালামের উত্তর দেওয়া। (২) রোগীর সেবা করা। (৩) জানাজার সঙ্গে যাওয়া। (৪) দাওয়াত কবুল করা। (৫) হাঁচির উত্তর দেওয়া। (বুখারী)

✪ ইমাম মুসলিম রহ. এরূপ একটি রেওয়ায়েতে ছয়টি হকের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ষষ্ঠ নম্বর হক হল, মুসলমান ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করা।

✪ হযরত আবু মূসা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াও। রোগীর সেবা করো। বন্দীকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করো। (বুখারী)

এ বিষয়েই হযরত বারা ইবনে আযেব রাযি. বর্ণনা করেন, "আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, আমরা যেন রোগীর সেবা করি এবং জানাযার সঙ্গে যাই।" (বুখারী, মুসলিম)

## রোগীর সেবা করার উপকারিতা

○ হযরত সাওবান রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ দান করেছেন, যখন কোনো মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়ের রোগে সেবা করার জন্য যায়, তখন সেখান থেকে সে ফেরার পথে জান্নাতের ফলমূল খাওয়ায় ব্যস্ত থাকে। (মুসলিম)

○ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য এক হাদীসে বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন : হে বনী আদম! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা করতে আসলে না কেন? সে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি তো রাব্বুল আলামীন! আমরা কিভাবে আপনার সেবা করতে পারি? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তো তার সেবা করলে না। তুমি কি জানতে না? তুমি যদি তার সেবা করতে, তবে আমাকে তার নিকটেই পেতে। (মুসলিম)

রোগীর সেবাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, হাশরের দিন আমলনামার হিসাব-নিকাশের সময় এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। আল্লাহ তা'আলা সেবাকারীদের উৎসাহ দানের জন্য রোগীর নিকটেই তাঁর উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন।

○ একবার হযরত যায়েদ ইবনে আকরাম রাযি.-এর চোখ উঠল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সেবার জন্য গেলেন। (আহমাদ, আবু দাউদ)

○ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন— যখন কোনো ব্যক্তি রোগীর সেবা করার জন্য যায়, তখন সে ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে রহমতের সাগরে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সেখানে থাকে বরং সে সময়ের মধ্যে সে রহমতের সাগরে ডুব দিতে থাকে। সুবহানাল্লাহ! (মালেক, আহমদ)

রোগীর সেবা মূলত প্রশান্তি ও উৎসাহদায়ক একটি কাজ। রোগ তার গুনাহসমূহকে কমিয়ে দেয় এবং অন্যের তুলনায় তার দু'আ অধিক কবুল হয়।

○ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যখন তুমি রোগীর সেবা করার

জন্য যাবে, তখন তার দ্বারা নিজের জন্য দু'আ করাও। কেননা তার দু'আ ফিরিস্তাদেরই দু'আ। (ইবনে মাজাহ)

✪ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. রোগীর সেবা সম্পর্কে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করেন। অন্য এক হাদীসে বলেন,

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন গ্রাম্য লোকের সেবা করার জন্য গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি কোনো রোগীর সেবা করতে যেতেন, তখন সর্বদা বলতেন, কোনো ক্ষতি নেই তুমি ইনশাআল্লাহ পবিত্র হয়ে যাবে। (তাকেও নবীজী তা-ই বললেন।) সে বলল, কখনো নয় বরং জ্বরের তীব্রতা আরও বাড়ছে এবং এ বৃদ্ধের শরীরের এ জ্বর তাকে কবর পর্যন্ত পৌছে দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ! এরূপই হবে। (বুখারী)

এ ব্যক্তির ইন্তেকাল হয় গেল। সে আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নৈরাশ্য প্রকাশ করেছে। সরাসরি মৃত্যুর কথা না বললেও প্রকারান্তরে মৃত্যুর অকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে। আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাধ্য করেছে, তিনিও যেন তার আকাঙ্ক্ষার সাথে একামতা প্রকাশ করেন (নাউযুবিল্লাহ)।

## ইসলাম ও অনাড়ম্বর জীবন
(ISLAM AND PRINCIPLE OF SIMPLICITY)

ইসলাম অনাড়ম্বরতা ও সরলতার ধর্ম। এর প্রতিটি দিকেই রয়েছে শান্তি ও সরলতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনকে সরল ও সাদামাটা বানিয়ে আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন।

✪ কাঠের ও মাটির পাত্র অনাড়ম্বরতারই পরিচায়ক। আজ চীনের ইয়াং শহরের মানুষ পুনরায় মাটির পাত্র ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কারণ, ধাতব জাতীয় প্রতিটি পাত্রেই ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

✪ চাক্কী এবং কূয়ার পানি ব্যবহার করা যেদিন থেকে বন্ধ হয়েছে, সেদিন থেকেই নারীদের মধ্যে মেদ, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, শিরা-উপশিরার খিঁচুনি (Muscle Strain), স্ত্রীরোগের (Gyanaecological Disease) মতো কঠিন কঠিন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

○ একজন অভিজ্ঞ সার্জন বলেন, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আপনি গাইনী ওয়ার্ডে গিয়ে জরিপ চালিয়ে দেখুন, জরায়ু ক্যান্সারে সে সকল মহিলারাই বেশি আক্রান্ত হয়, যারা গর্ভপাত করিয়েছে।

○ গর্ভপাত ঘটালে অগণিত স্ত্রীরোগ দেখা দেয়।

○ ইসলামের শিক্ষা হল, অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারীদেরকে তোমরা বিবাহ করো। কিন্তু "বাচ্চা কম মানে পরিবারে শান্তি" এ শ্লোগান নারীদের অসংখ্য রোগের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

○ কাপড় ধোয়া একটি সাংসারিক নিয়ম এবং এর দ্বারা বাহু, বক্ষ এবং বক্ষের মাংসপেশীর যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। এর দ্বারা নারীরা অগণিত স্ত্রীরোগ থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু বর্তমানে এ স্থানকে মেশিন দখল করে নিয়েছে।

○ গাইনী বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা হল, যে সকল মহিলারা তাদের বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান, তাদের পরবর্তী সন্তান প্রসবের মাঝে এমনিতেই দূরত্ব সৃষ্টি হয়। নারীদেরকে সুখী সংসার বানানোর জন্য আর ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না।

○ পূর্বে মহিলারা সুতি কাপড় পরিধান করত। তখন তাদের মধ্যে গোপন স্ত্রীরোগ তেমন বেশি ছিল না। বিশেষত লিকোরিয়া তো ছিলই না। এটা শুধু আমার মুখের কথাই নয়। অসংখ্য অভিজ্ঞতার আলোকে বিজ্ঞানীরা এরূপ মন্তব্য করেছেন।

○ ইতোপূর্বে মেয়েদের বিয়েশাদী খুব তাড়াতাড়িই হয়ে যেত। কারণ, তখন রুসম-রেওয়াজের বাধা ছিল না। বিশেষজ্ঞদের মতে দেরীতে বিবাহ করলে যেরূপ পুরুষদের ক্ষতি হয়, তদ্রূপ ক্ষতি নারীদেরও হয়। তাদের ব্রেষ্ট ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

○ যখন মহিলারা নিজেদের ঘরবাড়ি ঝাড়ু দেওয়া (আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, ঝাড়ু দিলে মহিলারা অসংখ্য রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়), পানি আনা, শিশুদেরকে খাবার খাওয়ানো, খাবার রান্না করা, সেলাই করা, কাপড় বুনানোর কাজ ইত্যাদি করত, তখন মহিলাদের স্ত্রীরোগ, মেদভুঁড়ি, হার্টের রোগ ইত্যাদি কম হত।

○ রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংমিশ্রণে মেকআপ তৈরির সন্ধান কোনো হাদীসেই পাওয়া যায় নি। বর্তমান সমাজের মেয়েরা যখন থেকে এ

মেকআপ ব্যবহার শুরু করেছে, তখ...
এবং কদাকৃতি দূর করার বিভিন্ন ঔষধ ব্যবহারের চক্করে পড়ে গেছে।

এক মহিলার দাড়ির মতো ঘন পশম গজাতে আরম্ভ করেছে। অনেক চিকিৎসা করিয়েছে, ক্রীম ব্যবহার করেছে, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। অবেশেষে আমার কাছে আসে। তার বিবরণ শুনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে পরামর্শ দিলাম, উন্নাব (লাল রংয়ের ফল বিশেষ) ব্যবহার করবেন এবং সকল ক্রীম ব্যবহার ত্যাগ করবেন। কিছুদিন পর রোগিণীর যথেষ্ট উপকার হল।

✪ ঢিলা-ঢালা পোশাক সুস্থতা ও স্বাস্থ্যের জন্য শক্তিশালী খাদ্যের চেয়েও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ জাতীয় পোশাক ছেড়ে দিয়ে আজ আমরা বাস্তবিকই খুব পেরেশান।

✪ ইসলামি জীবন সাদাসিধে কিন্তু আরামদায়ক। পাশ্চাত্যের জীবন জটিল কিন্তু কষ্ট আর কষ্ট। সাদাসিধে জীবনযাপনকারী আধিকাংশ লোকই রোগ-ব্যাধি, অস্থিরতা, অনিদ্রা, আত্মহত্যা ও তালাকের মতো মারাত্মক জটিলতার শিকার খুব কম হয়ে থাকে।

✪ লাল রং অথবা লিপস্টিক, একথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে, প্রথম প্রথম লিপস্টিকে এরূপ চর্বি বহ্যবহার করা হত, যা তাড়াতাড়ি গলত না। অনুসন্ধান করে জানা গেল, শূকরের চর্বি তাড়াতাড়ি গলে না। তারপর লিপস্টিকে শূকরের চর্বি ব্যবহার হতে লাগল। এখনো ভালো এবং দামি লিপস্টিকে শূকরের চর্বি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু লিপস্টিকে সাধারণত রং জাতীয় দ্রব্য এবং চর্বি জাতীয় শক্ত ভ্যাসলিন ব্যবহার করা হয়। তাই এটা খুবই ক্ষতিকর। কেননা রং থেকে রক্তের অগণিত রোগ-ব্যাধি জন্ম নেয়। তার মধ্যে শরীরের মারাত্মক রোগ ক্যান্সারও জন্ম নেয়।

### "ওয়াল বাহ্‌রিল মাসজূর"-এর আশ্চর্যজনক তথ্য

"ওয়াল বাহ্‌রিল মাসজূম" সূরায়ে তূরের একটি আয়াত। মুফাসসিরগণ এর অর্থ করেছেন, আমি সমুদ্রকে উত্তপ্ত অগ্নির উপর রেখেছি।

ফ্রান্সের এক গবেষণা কেন্দ্র এ শব্দটির তত্ত্বানুসন্ধান করেছে। সমুদ্রে ৩০ হাজার মিটার গভীর গর্ত করার পর নিচ থেকে উত্তপ্ত পানি এবং কাদা বের হতে আরম্ভ করে। তারা যখন আরও খোদাই করলেন, তখন আরও

বেশি গরম কাদা বের হতে আরম্ভ করল। এরপর আরও খোদাই করার চেষ্টা করা হলে খোদাই মেশিনটি গলে গেল।

বিজ্ঞানীদের ধারণা হল, সমুদ্রের নিচে আগুন আর আগুন। সে আগুন এত তেজী এবং কঠিন যে, পৃথিবীর আগুনের সাথে তার তুলনা করা যায় না। সুতরাং ভেবে দেখুন! কুরআনে পুণ্যাত্মার ঠিকানা ইল্লিয়্যিনে বলা হয়েছে, যা রয়েছে আসমানে। আর পাপাত্মার ঠিকানা বলা হয়েছে সিজ্জীনে। সুতরাং এটাই কি সিজ্জীন? এ ব্যাপারে ওলামাদের বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে। কিন্তু সবগুলোর সমষ্টি ও সারকথা হল, এ আগুন বাস্তবিকই দুনিয়ার আগুন নয়। (আলবার্ট রিপোর্ট)

## সাহাবায়ে কিরামের ছয় প্রকার ভিটামিন ও আধুনিক বিজ্ঞান

(SIX FOODX OF SAHABA AND MODERN SCIENCE)

### সুন্নাতে রাসূল

সাবাবায়ে কিরামের শক্তি-সামর্থ্য এবং বীরত্বের বর্ণনা শুনে আসছি শত শত বছর ধরে এবং এ বর্ণনা ধারা থাকবেও চিরকাল। সারা পৃথিবী এ অনুসন্ধানে মত্ত যে, তাদের শক্তির রহস্য কি ছিল? অনেক বিজ্ঞজন এ অনুসন্ধানকে অগ্রসর করেছেন। সার্জারীর একজন ডাক্তারের অনুসন্ধান এবং অধমের ব্যাখ্যা পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরছি। স্মরণে রাখবেন! সাহাবায়ে কিরাম খুব কমই অসুস্থ হতেন। তাঁদের স্ত্রী ছিল অনেক এবং সন্তানও ছিল অনেক। এর রহস্য কি? নিম্নের কয়েকটি লাইন মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

(১) দাড়ি রাখা। (২) গোঁফ কাটা। (৩) মাথার চুল সমান রাখা। (৪) নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা। (৫) ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করা। (৬) ঘোড়ার উপর সওয়ার দিগদিগন্ত আল্লাহর দীন প্রচার করা।

**১। দাড়ি রাখা :** দাড়ি সম্পর্কে ইতোপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

**২। গোঁফ কাটা :** গোঁফের ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়েছে।

**৩। মাথার চুল সমান রাখা :** মাথার চুল সমান রাখা সম্পর্কে শুনুন!

একদল অভিজ্ঞ ডাক্তারের বক্তব্য হল, চুল যেহেতু কালো, তাই সূর্যের উত্তপ্ত কিরণ যখন মাথার উপর পড়ে, তখন একপ্রকার রাসায়নিক কাজ

আরম্ভ হয়। যদি চুল অসমান এবং কোনো স্থান দিয়ে উপরের দিক উঠে থাকে, তখন ঐ কিরণ সেখানে অধিক পরিমাণে আবর্তিত হয়। ফলে ঐ জায়গায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এজন্য মাথার চুল সমান থাকা উচিত। তাই ইসলাম চুলকে আঁচড়ানো এবং চুল গুছিয়ে রাখার উপদেশ দিয়েছে।

৪। নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা : কোনো কোনো ধর্মে এ কাজটি নিষিদ্ধ। কিন্তু এর ক্ষতি যে কি পরিমাণ, তা অনুমান করা যায় না।

✪ নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার না করলে অগণিত রোগের জীবাণু সেখানে আটকে একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

✪ আরও বেশি প্রভাব পড়ে সেখানের চর্ম ও গ্রন্থির উপর এবং তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

✪ যদি এ পশম বড়ই থাকে, তাহলে প্রোস্টেট গ্রন্থি ফুলে যায়। যার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে যৌনশক্তির ওপর।

✪ পক্ষান্তরে ইসলামি নিয়ম মাফিক উক্ত পশম পরিষ্কার করলে অগণিত উপকারিতা বয়ে আনে।

৫। ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করা : এর বিশদ আলোচনা পূর্বোক্ত পোশাকের অনুচ্ছেদে করা হয়েছে।

৬। দীনের দাওয়াত এবং মেহনত : এটা বুঝার জন্য একটি ঘটনাই যথেষ্ট। ডাক্তার কস্টোভবহ্ একজন খ্রিষ্টান বিজ্ঞানী। সমুদ্রের উপর রিসার্চ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন,

সৎকাজের প্রচার করা এবং দাওয়াত দেওয়া শরীর সুস্থ থাকার ব্যাপারে কোনো শক্তিশালী পরামর্শ এবং ঔষধ থেকে কম নয়। কেননা শব্দের শক্তি শরীরে স্থানান্তরিত হয় আর নির্দোষ শব্দ যত বেশি বলবে, শরীরে শক্তি তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। (ওহ্ জিন কা জরিয়ায়ে হেদায়াত কুরআন হুয়া)

## সাহাবায়ে কিরামের ছয়টি খাদ্য

(১) উটের গোস্ত : উটের গোশ্‌তে চর্বি জাতীয় পদার্থ কম হয়, যার ফলে ব্লাডে কলেস্টরল তৈরি হয় না এবং তা ভক্ষণে শরীর ফুলে না বরং শরীরের দৃঢ়তা এবং শক্তি বহাল থাকে।

(২) উটনীর দুধ : এ কলিজার সকল প্রকার রোগে উপকারী। এ দুধ সেবনকারী কখনো জণ্ডিসে আক্রান্ত হয় না। এর সেবনকারীর ব্লাডে কখনো চর্বি বা চর্বিজাতীয় পদার্থ তৈরি হয় না। খাদ্য উত্তমরূপে হজম হয়। শরীরে মেদ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

(৩) যবের রুটি : পূর্বোক্ত যবের বর্ণনায় এর আলোচনা গত হয়েছে।

(৪) খেজুর : এব্যাপারেও বিস্তারিত দ্রষ্টব্য এ কিতাবেই রয়েছে।

(৫) মধু : মধুর শক্তি ও এর কার্যকারিতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। পাঠকের খেদমতে এতটুকু আরজ যে, এটি একটি উচ্চ পর্যায়ের শিরাতন্ত্রের শক্তিবর্ধক উপাদেয় মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধিতেও এর যথেষ্ট উপকারিতা রয়েছে। এর কিছু ব্যবহার বিধিও পেশ করছি, যা যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত। দৈনিক তিনবার খাওয়ার পূর্বে এক কাপ গোলাপ জল, দু চামচ মধু মিলিয়ে পান করে নিন। এভাবে নিয়মিত কিছুদিন পান করুন।

হৃদপিণ্ডের সকল রোগ যেমন হাই ব্লাড প্রেসার, হৃদকম্পন, ঘনঘন হুঁশ হারিয়ে ফেলা, পেট গরম হওয়া, কলিজার উত্তাপ বেড়ে যাওয়া এবং শরীরের সাধারণ দুর্বলতায় বিশেষ ফলপ্রদ। কিন্তু এটা গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করবে। কোনো কোনো রোগীদের ক্ষেত্রে ঠাণ্ডার মৌসুমেও উপকারী। মধু, গরম দুধ অথবা গরম পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করলে শিরা রোগ এবং দুর্বলতা জনিত যে কোনো রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

## গরুর গোশত ও আধুনিক বিজ্ঞান

( BEEF AND MODERN SCIENCE )

### হাদীসে রাসূল

○ হাকেম আবু নোয়াইম রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা গাভীর দুধ নিয়মিত পান করো। কেননা এতে শেফা (রোগমুক্তি) রয়েছে আর তার গোশত থেকে বাঁচো (দূরে থাকো), কেননা তাতে রোগ আছে। (মুসনাদে ইমাম আযম)

উলামায়ে কিরাম বলেন, যাচাই করে নিবে অর্থাৎ কোনো রোগী যাতে না খায় অথবা রোগাক্রান্ত গরুর গোশত যেন কেউ না খায়। নতুবা গাভী তো একটি হালাল প্রাণী।

### মেডিক্যাল টেস্ট

মেডিক্যাল পরীক্ষা অনুযায়ী গরুর গোশতে এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া থাকে। যা টি.বি এবং হৃদরোগের মতো কঠিন রোগের কারণ হয়ে যায়। আধুনিক ডাক্তারগণ এ বিষয়ে বেশ ঘাটাঘাটি করে যাচাই করার পর জানতে পারেন, গরুর গোশত খেলে একদিকে কলিজার ঘা হয়, অপরদিকে মস্তিষ্কেও একটি ভয়ানক রোগ হয়। যাকে ম্যাডকাউ ডিজিজ বলে। ইংল্যাণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্টিফেন ডোরাল তার সম্প্রতি এক ভাষণে এ সত্যতা স্বীকার করেছেন যে, গাভীর দ্বারা এমন একটি রোগ আত্মপ্রকাশ করেছে, যার নাম হল সি জে ডি। এ রোগ হলে রোগী পাগল হয়ে যায়। নিজের স্মরণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। এমনকি অনেক রোগীকে আত্মহত্যা করতে আগ্রহী দেখা যায়।

এ কথা তো সর্বজন স্বীকৃত যে, গরুর গোশতে হার্টের রোগ বৃদ্ধি পায়। এমনকি কলিজার গ্রন্থি ঢিলা হয়ে হৃদপিণ্ডের স্পন্দন ধুপধুপানী স্থবির হয়ে আসে। সুইডেনে যক্ষ্মা মারাত্মক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। অনুসন্ধান করে জানা গেছে, এর কারণ হল গরুর গোশত। এরপর যখন গাভীর চিকিৎসা করানো হল তখন আশ্চর্যজনকভাবে অবস্থার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল এবং নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব বন্ধ হয়ে গেল।

অস্ট্রেলিয়ায় গরুর ফার্মে প্রতিমাসে নিয়মিত চেকআপ হয় এবং প্রতিদিন যথাযোগ্য চিকিৎসা করা হয়। খুব জোর দিয়েই বলা হয়, গাভী সুস্থ থাকলে মানুষও সুস্থ থাকবে।

## ছাগলের দুধ ও আধুনিক বিজ্ঞান

( GOATS MILDAND MODERN SCIENCE )

### হাদীসে রাসূল

✪ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে এর সাতটি বকরি দুধ দিত। যেগুলিকে হযরত উম্মে আইমান রাযি. চরাতেন এবং সেগুলির দুধ দোহন করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করতেন। (মাদারেজুন নবুওয়ত)

✪ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাহাবীর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

খেদমতে বকরির দুধ পেশ করলেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পান করলেন। (বুখারী)

বকরির দুধ একটি তৃপ্তিদায়ক পানীয় এবং খাদ্য। এর উপকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় যখন বকরি চরে বেড়ায়। কেননা যে সকল বকরি চরে বেড়ায়, সেগুলি নানা গাছের লতা-পাতা খায়। এসব লতা পাতা হজম হয়ে তার প্রভাব দুধের মাধ্যমে মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে।

গান্ধিজী খদ্দরের পোশাক এবং বকরির দুধ পান করতেন। তিনি বলতেন, নিম গাছের নিচে বাঁধা বকরির দুধ পান করতে পারলে আমি দেশের রাজত্ব চাই না।

আতাতুর্ক সকালে খালি পেটে বকরির দুধ পান করতেন। বকরির দুধ খেয়েই তাঁর জীবন কেটে গেছে।

মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার এবং কায়েদে আযম ও আল্লামা ইকবাল বকরির দুধ খুব পছন্দ করতেন। তাঁদের পছন্দের গল্প ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ রেয়েছে। কেননা কুদরতীভাবেই বকরীর দুধে টি- বি এবং ক্যান্সারের ঔষধ বিদ্যমান রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান বকরির দুধকে মানুষের জন্য শেফা (রোগমুক্তি) সাব্যস্ত করেছে।

বকরির দুধ গাভীও মহিষের দুধের চেয়েও অধিক উপকারী, কিন্তু কেন? শরীরের বলবর্ধক, স্বাস্থ্যরক্ষক ?

আমেরিকার প্রসিদ্ধ খাদ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডুগ্লস থামাস তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে স্পষ্টভাবেই বলেছেন, বকরির দুধ অন্যান্য সকল পানীয় দ্রব্যের তুলনায় উত্তম এবং উপকারী। এর প্রাধান্যের দুটি বিশেষ কারণ আছে। প্রথমত বকরির মধ্যে ক্ষয়জ্বর হয় না, যা সাধারণত গাভীর মধ্যে হয়েই থাকে। দ্বিতীয়ত তুলনামূলক ভাবে এটা দ্রুত হজম হয়।

ডাক্তার মেরিপটের বললেন, যখন গরুর দুধ শিশুর হজম হয়না বরং তাতে বদহজমী এবং পেট খারাপ হয়, তখন এ অবস্থায় বাচ্চাদেরকে বকরির দুধ পান করানো খুবই উপকারী এবং জরুরি। এরূপ বাচ্চারা বকরির দুধ খুব তাড়াতাড়ি হজম করে নেয়। ডাক্তার এল এল ব্যাক তুলনামূলক অবস্থা বুঝার জন্য গাভী এবং বকরির দুধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তিনি বকরির দুধের দ্রুত হজম হওয়ার গুনটি দৃঢ়ভাবেই স্বীকার

করেন। যে সকল শিশুর শরীর বর্ধন বিঘ্নিত হয়ে যায় এবং হজমশক্তি কমে যায়, তাদেরকে বকরির দুধ পান করার প্রতি বিশেষ জোর দেন।

## বকরির দুধ দ্রুত হজম হওয়ার কয়েকটি বিশেষ কারণ

১। চর্বির থলির দেয়ালগুলি খুবই পাতলা হয়। ২। দুধের চর্বি খুব সূক্ষ্ম এবং পাকস্থলীর আর্দ্রতা সহজেই দুধের উপর তার প্রভাব ফেলতে পারে। ৩। তার ক্যারিনের দানাগুলি খুব ছোট ছোট হয়।

বকরির দুধে তৈলাক্ত ও লবণাক্ত পদার্থের অংশ বেশি থাকে। লবণাক্ত পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়ামের লবণ (চুনা)ও থাকে। এ ক্যালসিয়ামের লবণ বকরির দুধের বড় অংশ। ক্যালসিয়াম শরীর বর্ধনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস। তার স্বল্পতায় শরীরে জ্বর ও ক্ষয়জ্বরের আশঙ্কা থাকে।

যদি বকরি ও গাভীর দুধের পার্থক্য খুঁটিয়ে দেখা হয়, তাহলে খুবই চিত্তাকর্ষক পার্থক্য দেখা যাবে। গাভীর দুধ এসিডযুক্ত মনে হয়। হজমশক্তি দুর্বল রোগীদের জন্য এ পার্থক্য জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারে: গাভীর দুধ হজম করার জন্য দু-ঘণ্টা সময় লাগে। আর বকরির দুধ মাত্র আধ ঘণ্টায় হজম হয়ে যায়। গাভী, বকরি ও মানুষের দুধে যে লবণ পাওয়া যায় তা বার ধরনের। তন্মধ্যে নয় প্রকার বকরির দুধে পাওয়া যায়, ছয় প্রকার গাভীর দুধে আর পাঁচ প্রকার মানুষের দুধে পাওয়া যায়।

গাভীর দুধে আয়রণ নাই বললেই চলে। বকরির দুধে এটা সাত থেকে দশগুণ পর্যন্ত থাকে। এমনিভাবে বকরির দুধে পটাশিয়ামের পরিমাণও অনেক বেশি থাকে এবং অক্সিজেনকে পটাশিয়ামই সবচেয়ে বেশি চুষে নেয়। অক্সিজেন যেখানেই থাকুক, পটাশিয়াম তা চুষে নিবে। এখন এর সাথে আয়রণ মিলিয়ে দেখুন। তা হলে বুঝতে পারবেন, দুধ ছাড়া অন্য কোনো জিনিসের মধ্যে অক্সিজেন চুষে নেওয়ার মতো এ পরিমাণ ক্ষমতা থাকে না।

বকরির দুধে ক্লোরিন খুব বেশি থাকে যা হাড্ডিবর্ধক, দাঁত মজবুতকারক এবং চোখের যত্নে খুবই জরুরি। আমাদের ভালোভাবে সুস্থ থাকা মেরুদণ্ড মজবুত থাকার উপর নির্ভর করে। ম্যাগনেশিয়াম মেরুদণ্ডকে মজবুত করে। এ ম্যাগনেশিয়ামও বকরির দুধে বেশি থাকে। শরীরের

বিষাক্ত পদার্থকে নিংরিয়ে কিডনী এবং মূত্রথলির পথে বের করার জন্য সোডিয়াম লবণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সোডিয়াম যদি এ কাজ না করে বটে। তবে লাইম এবং ম্যাগনেশিয়াম শক্ত হয়ে মূত্রাশয়ে পাথর সৃষ্টি হয়। বকরির দুধে সোডিয়ামের পরিমাণ খুব বেশি। এ ছাড়া তার মধ্যে অনেক ভিটামিন আছে।

বকরির দুধ খুব ঠাণ্ডা এবং সুস্বাদু হয় মাঠে প্রান্তরে বিচরণকারী বকরির দুধকে বেশি উপকারী মনে করা হয়। এটা কাশি, দাস্ত, আমাশয়, ক্ষয়জ্বর, হৃদরোগ, পুরাতন জ্বর, জণ্ডিস, অর্শ্বরোগ, মস্তিষ্ক ও ব্লাডের রোগে যথেষ্ট উপকারী। বকরির দুধে বাবলের কাঠি এবং খয়ের মিলিয়ে গড়গড়া করলে মুখের ঘা ভালো হয়ে যায়। বকরির দুধে তুলা ভিজিয়ে রাত্রিবেলা চোখের উপর রেখে পট্টি বেঁধে ঘুমালে চোখের ব্যথায় উপকার পাওয়া যায়।

## গর্ভবতী মহিলাদের জন্য আয়রণ ক্যাপসুল

○ হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার মতে নেফাসওয়ালী মহিলাদের জন্য খেজুরের সমান কোন শেফা (রোগমুক্তি) নেই এবং রোগীর জন্য মধুতুল্য কোনো জিনিস নেই।

○ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নেফাস অবস্থায় নিজ স্ত্রীদেরকে খেজুর খাওয়াও। কেননা যখন হযরত মরিয়ম আ. থেকে হযরত ঈসা আ. জন্মগ্রহণ করলেন, তখন হযরত মরিয়ম আ.-এর খাদ্য ছিল এটাই। যদি আল্লাহ তা'আলার ইলমে এর চেয়েও কোনো উত্তম খাদ্য থাকত, তবে তিনি তার ব্যবস্থাই করতেন।

○ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : নেফাসের মধ্যে নারীদের খাদ্য তালিকায় যদি তাজা খেজুর অথবা শুকনা খেজুর থাকে তাহলে তার সন্তান অত্যন্ত সহনশীল হয়। (নুযাহাতুল মাজালিস)

গর্ভবতী মহিলাদেরকে গর্ভাবস্থায় লৌহের স্বল্পতা পূর্ণ করার জন্য আয়রণ ক্যাপসুল সেবন করানো হয়। বার্লিন ইউনিভার্সিটির ফার্মাকোলোজী বিভাগের ডাক্তার নিক্স ক্লোর খেজুরের উপর ব্যাপক গবেষণা চালানোর পর এ সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, গর্ভবতী মহিলাদেরকে প্রতিদিন একটি করে খেজুর খাওয়ানো উচিত। তাহলে গর্ভবতীর সকল অঙ্গের উপর ইতিবাচক

প্রভাব পড়বে এবং বাচ্চার শরীরেও শক্তি বৃদ্ধি পাবে। যে সকল গর্ভবতী মায়েরা খেজুর খাবেন, তাদের গর্ভজনিত সকল জটিলতা দূর হয়ে যাবে এবং গর্ভপাতের আশঙ্কা কমে যাবে। (নারেল আওর ওয়ার্ল্ড)

খেজুর যেহেতু আয়রণে পরিপূর্ণ এবং শরীরে এর প্রয়োজনীয়তাও অনেক তাই তাদেরকে খেজুর খাওয়ানো জরুরি। সন্তান প্রসবের সময়েও বিশেষজ্ঞগন খেজুর ব্যবহারকে জরুরি মনে করেন। কারণ, এর দ্বারা ডেলিভারী কেসের জটিলতা এবং তৎপরবর্তী বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে মায়েরা নিষ্কৃতি পেয়ে যায়।

এক মহিলার প্রসব সমস্যা খুব জটিল এবং অস্বস্তিকর হতো। অনেক চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয় নি। অবশেষে আমার কাছে এল। আমি পরামর্শ দিলাম, তাকে ডেলিভারীর আগ পর্যন্ত প্রতিদিন এক দুটি করে খেজুর খাওয়াবেন। এতে আশ্চর্যজনকভাবে তার সকল জটিলতা দূর হয়ে গেল।

## এফ. আ. সি. এস ডাক্তারদের প্রতি একটি বিশেষ অনুরোধ

( SPECIAL INSIST FOR F.R.C.S. DOCTORS )

একজন প্রফেসর সার্জন বলছিলেন : যখন আমরা উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদেশে গেলাম তখন অপারেশনের পূর্বে আমাদেরকে "ওয়াশ আপ" হওয়ার জন্য একটি নিয়ম বলে দেওয়া হল। এটা প্রায় ওযুর মতোই ছিল।

সেখানে এ উপদেশ দেওয়া হয়, রোগীকে অপারেশনের জন্য অস্ত্রোপচারের পূর্বে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিবেন। সার্জন যদি জীবাণুযুক্ত হাতে অপারেশন করেন, তবে এ জীবাণুই রোগীর গায়ে লেগে যাবে।

তাতে আরো বলা হয়েছে, অপারেশনের পূর্বে হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করুন এবং বাহুর দিকে পানি প্রবাহিত করুন। তখন হাতটি উপরে এবং কনুই নিচে থাকবে। অন্যথায় কনুই থেকে পানি প্রবাহিত হয়ে যদি হাতের তালুর দিকে আসে, তাহলে জীবাণুসমূহ ধুয়ে হাত পর্যন্ত এসে আটকে যাবে। আর যদি প্রবাহিত পানি হাত থেকে কনুইয়ের দিকে যায়, তখন যদি কোনো জীবাণু কনুইতে আটকে যায়, তবু অপারেশনে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। অযুতে কনুই পর্যন্ত ধোয়ারও একই নিয়ম। বাস্তবিকই ইসলামী আমলের এক একটি অংশ স্বাস্থ্য ও সুস্থতার নিশ্চয়তা বিধায়ক।

# ক্রোধ ও আধুনিক বিজ্ঞান

(DAMAGE FROM ANGER AND MODERN SCIENCE)

## হাদীসে রাসূল

○ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ক্রোধের ঢোক পান করার চেয়ে উত্তম কোনো ঢোক নেই।

(উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম)

সে ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে লোকদেরকে দাবিয়ে পরাজিত করে বরং শক্তিশালী ঐ ব্যক্তি, যে নিজের নফস (প্রবৃত্তি)কে দাবিয়ে পরাজিত করতে পারে। (মা'আরেফুল হাদীস)

○ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে মুসলমানেরা! যদি তোমাদের মধ্যে কারও ক্রোধ আসে, তা হলে তার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে চুপ হয়ে যাওয়া জরুরি। (মা'আরেফুল হাদীস)

## ফ্রাইড এবং ক্রোধ

(FRIAD AND ANGER)

মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ ক্রোধের ব্যাপারে যে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন, তা পাঠকের খেদমতে পেশ করছি। ক্রোধ সমাজের সে সকল মারাত্মক অন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠিত জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। এতে মানুষ সর্বদা এমন সব অবস্থার সম্মুখীন হয়, যার ফলে তার শিরাতন্ত্র এবং ইন্দ্রিয়সমূহ কুঁকড়ে যায়। এতে তার স্মরণশক্তিও প্রভাবিত না হয়ে পারে না। মূলত ক্রোধ ইন্দ্রিয় ও শিরাতন্ত্রের প্রভাব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সহনশীলতা এবং তরিৎ সিদ্ধান্তগ্রহনকারী বলেই প্রমাণ করে। এমনকি এ ধরনের লোকেরা সর্বদা লজ্জা ও অপমানকর অবস্থার সম্মুখীন হয়।

## ক্রোধ জীবন ধ্বংসকারী ব্যধি

ক্রোধ একটি প্রাণনাশক ব্যাধি, মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ক্রোধ আসা অবস্থায় দাঁড়ানো থাকলে বসে যাও। বসা থাকলে শুয়ে পড়। যদি এতে ক্রোধ ঠাণ্ডা না হয়, তবে পানি পান করো । ধর্মাচার বিশেষজ্ঞদের মতে ক্রোধ এবং লোভের কারণে জীবনী-শক্তি ভষ্ম হয়ে যায়। প্রবীন মহিলাগণ স্তন্যদায়িনী মায়েদেরকে ক্রোধের অবস্থায় শিশুদের

দুধপান করাতে নিষেধ করেন। কেননা এর ফলে শিশু জীবনে শিশুশয্যায় থাকে। আমেরিকার ডিউক ইউনিভার্সিটির একজন বিজ্ঞানী ডাক্তার রেড ফোর্ড বি ভিলমজের মতে ক্রোধ, শত্রুতা এবং হিংসাকারী ব্যক্তিরা তাড়াতাড়ি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তাদের মতে এগুলোর দ্বারা মানুষ ঐ পরিমাণই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ধূমপান এবং উচ্চ রক্তচাপের কারণে। আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের সেমিনারে বক্তৃতা দানকালে তিনি বলেন, অনেক লোক শুধু হিংসা-বিদ্বেষে কঠিনভাবে আবেগতাড়িত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যায়। ক্রোধ এবং হিংসা হৃদয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি। এমনিভাবে লোভ-লালসায় লিপ্ত ব্যক্তি এবং অস্থির-অধৈর্য লোক অশা আকাঙ্ক্ষার হাতে নিজের জীবন-বাতি নিভিয়ে দেয়।

পক্ষান্তরে যে সকল লোক নিজেদের শিরাতন্ত্রকে আয়ত্তে রাখে, যাদের মেজাজের মধ্যে সহনশীলতা, হাসিমুখ, অল্পেতুষ্টি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যোগ্যতা থাকে, তারা সুন্দরভাবে জীবনের প্রতিকূল অবস্থাগুলো মোকাবেলা করতে পারে। বিশেষজ্ঞগণ ক্রোধান্ধ, শিরাতন্ত্রের রোগী, অস্থির এবং অতি আশাবাদী ব্যক্তিকে "ক" শ্রেণীতে আর সহনশীল ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ লোকদেরকে "খ" শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এরপর তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "ক" বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সাধারণত হৃদরোগে আক্রান্ত থাকে। তাদের কলেস্টরলের আধিক্য ব্যক্তি, ধূমপান এবং উচ্চ রক্তচাপের রোগীর মতোই হৃদক্রিয়া বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ডাক্তার ভিলমজের বর্ণনায় আমেরিকার বাসিন্দাদের অর্ধেকের সম্পর্ক "ক" বিভাগের সঙ্গে। এ প্রকারের লোকদের বিপজ্জনক অবস্থা সামলানো মনোরোগ কৌশল দ্বারা সহজ ও সম্ভব।

দক্ষিণ কেরোলিনার ডিউক ইউনিভার্সিটির তিনশত পনের জন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ পচিশ বৎসর পূর্বে মেডিক্যাল ছাত্র হিসেবে যে মেডিক্যাল টেস্ট গ্রহণ করেছে, তার তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। তারা বলেন, হিংসা-বিদ্বেষের শিকার শতকরা তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। এসব লোকের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ অন্যদের তুলনায় ৫০ ভাগ কম ছিল। অথচ হিংসা-বিদ্বেষকারীদের মৃত্যুর হার রেকর্ড অনুসারে, পনের শতাংশ এমন যাদের অন্য কোনো রোগও ছিল না।

এ ইউনিভার্সিটির মেডিকেল সেন্টারে অনুষ্ঠিতব্য সভায় ৭ বৎসরের রিপোর্ট অনুযায়ী বিদ্বেষী ও হিংসুকদের রক্তবাহী ধমনীর জটিলতার কারণে মৃত্যু হয়েছে। তাদের মৃত্যুর অন্য কোনো কারণ লক্ষ করা যায় নি।

যদিও ডাক্তার ভিলমস বিদ্বেষপ্রবণ ও হিংসাকারীদের সঠিক মৃত্যুহার নির্ণয় করতে সক্ষম হন নি, তবুও তার রিপোর্ট অনুযায়ী এ সকল লোকদের মধ্যে নিম্নোক্ত কতগুলি অভ্যাস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। যথা– অন্যের প্রতি অনাস্থা, ক্রোধ, সাধারণ কথায়ও উত্তেজিত হয়ে যাওয়া এবং কথায় কথায় নাক সিঁটকানো ইত্যাদি। এ জাতীয় লোক যখনি এরূপ ক্রিয়া কর্মে আক্রান্ত হয়, তাদের রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। তাদের মধ্যে হরমোন এর ভারসাম্য দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু "খ" গ্রুপের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের অবস্থা এরূপ হয় না।

আরও অধিক গবেষণা এবং নিশ্চিত ফলাফল লাভ করা পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী সমীচীন এটাই যে, হৃদরোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য চিকিৎসার পাশাপাশি নিজেকে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, ক্রোধ ইত্যাদি ক্ষতিকর অভ্যাসসমূহ থেকে দূরে রাখবে।

(সাইকোলোজী ইন মেডিক্যাল)

## তৈল ব্যবহার ও আধুনিক বিজ্ঞান

### হাদীসে রাসূল

○ হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র মাথা মুবারকে বেশি বেশি করে তৈল লাগাতেন এবং স্বীয় দাড়ি মুবারক আঁচড়াতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তৈল লাগানোর আমল আমাদের সামনেই রয়েছে। এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করার পর প্রতিভাত হয়েছে, বাস্তবিকই মাথায় তৈল ব্যবহার করা উপকারী।

### স্যার জেমস সাগমের পর্যবেক্ষণ

স্যার জেমস সাগম ক্যানাডার একজন বড় ফিজিওথেরাপিস্ট। মাথায় তেল ব্যবহারের ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতাগুলো, আমি পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরছি। তিনি বলেন, পূর্বে আমি মাথায় তেল লাগানোকে একদিকে সময়ের অপচয় ও ধূলাবালি আটকে থাকার কারণ মনে করতাম। অপরদিকে

নিজের আর্থিক দুর্বলতাও ছিল। কিন্তু একটি ঘটনা আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। আমি কিউটের একটি গ্রামের রোডে মোটর গাড়িতে করে যাচ্ছিলাম। এক জায়গায় এক বৃদ্ধকে আরেক বৃদ্ধের মাথার মালিশ করতে দেখলাম। আমি ভাবলাম, এ কী হতবুদ্ধিতা! আমি গাড়ি থামিয়ে তাদের অবস্থা জানতে চাইলাম। তাদের একজন বলতে লাগল, আমার পিতা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে অনেক দূরে চলে যেতেন। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। কিন্তু কোন ফল হয় নি। তখন আমাকে একজন বলল, তুমি তোমার পিতার মাথায় আমলা মালিশ কর। আমিও মালিশ করতে আরম্ভ করলাম। এভাবে সাতাশ দিন কেটে গেল। এখন আমার পিতা একেবারে সুস্থ।

আমি তার কথা শুনে একেবারে হয়রান হয়ে গেলাম। আমি রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলাম। বাস্তবিকই সে সুস্থ। তার পূর্বের রিপোর্টগুলি পড়ে বুঝলাম, আসলেই সে মানসিক রোগী ছিল। তারপর আমি তার মতো রোগী এবং অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের উপরও এ পদ্ধতি ব্যবহার করলাম। এতে আশাতীত ফল হল। আমি এটাকে মস্তিষ্কের চাপ, শিরা-উপশিরার খিচুনি, মাথাব্যথার পুরাতন রোগী, ঘাড়ের রগের ব্যথা, কাঁধের ব্যথা এবং খিচুনী, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, চেহারার সার্জারীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফলদায়ক পেয়েছি। (সায়েন্স আওর ইনসান)

আঁচড়ানোর দ্বারা একপ্রকার উষ্ণতা এবং এনার্জী সৃষ্টি হয়, যা পশম বা চুলের মাধ্যমে শরীরে শিরাতন্ত্রীকে প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী করে। এমনকি নিয়মিত চুল আঁচড়ালে চুল বৃদ্ধি পায় এবং ঘন হয়। আঁচড়ানোর আরেকটি হেকমত হল, চুল আঁচড়ানো না হলে তাতে জীবাণু আটকে থাকে। যা চুলের ভিতর বৃদ্ধি পেতে থাকে। একসময় তা ভয়াবহ রূপ নেয়। চুল না আঁচড়ালে উকুন বৃদ্ধি পাওয়ারও আশঙ্কা বাড়ে।

## নবীজীর বর্তন ও আধুনিক বিজ্ঞান

### (UTENSILS OF PROPHAT AND MODERN SCIENCE)

**সুন্নাতে রাসূল**

○ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি কাঠের পেয়ালা ছিল। (উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম)

৩ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি কাঁচের পাত্রও ছিল। (উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম)

৩ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটির পাত্রও ব্যবহার করতেন। (মামূলাতে নববী)

## প্লাস্টিকের পাত্র

প্লাস্টিকের পাত্র বর্তমান বিশ্বে সভ্যতার যুগের উৎকৃষ্ট উপহার। তবে এ জাতীয় পাত্রে খাওয়ার জিনিস রাখা এবং এতে খাওয়া-দাওয়া করা খুবই ক্ষতিকর। খাওয়া-দাওয়ার জন্য মাটি, চিনামাটি ও কাঁচের পাত্রই সর্বোত্তম। বর্তমানে প্লাস্টিক এবং কৃত্রিম পদার্থ দ্বারা তৈরি পাত্র ব্যবহার হচ্ছে। এ সবের ক্ষতি কিরূপ? নিম্নে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো।

## কোনেক্টিকাট ইউনিভার্সিটির গবেষণা

কোনেক্টিকাট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞান বিভাগের ডাক্তার মাইক ফিলিপ বলেন : এরূপ (প্লাস্টিকের) পাত্রে গরম জিনিস বিশেষত চা, কফি পান করা খুবই ক্ষতিকর। এ ক্ষতিকর প্রভাব তখন আরও বৃদ্ধি পায়, যখন চায়ের সঙ্গে লেবুর রস দেওয়া হয়। কেননা এ জাতীয় প্লাস্টিকের পাত্রে ভিতরের অংশ গরম হয় এবং এসিডের প্রভাবে তা গলে গলে বের হতে থাকে। এমতাবস্থায় ঐ পাত্রে চা পান করলে যে পলিষ্ট্রিন শরীরে যাবে, সেটি ক্ষতরোগ বা ক্যান্সার হওয়ার কারণ হতে পারে। বহু গবেষণাগারে ইঁদুরের উপর গবেষণা করা হয়েছে। তাতে প্রমাণিত হয়েছে, পাত্র থেকে নিঃসৃত ও গলিত পদার্থ পেটে গিয়ে ক্যান্সারের কারণ হয়ে যায়। ডাক্তার ফিলিপ লোকদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন, তারা যেন প্রচলিত সাধারণ পাত্রেই খাওয়া-দাওয়া করেন। (মাসিক মেডিক্যাল)

একটি সংবাসূত্রে জানা গেছে, চীনের ইয়াং রাজ্যের লোকেরা স্বীকার করেছে যে, মাটির পাত্র একদিকে সকল মৌসুমের উপযোগী। অপরদিকে জীবাণু চুষে নেয়। যদি ঐ পাত্রে জীবাণু প্রবেশ করে, তবে তা চুষে অপর দিক দিয়ে বের করে দেয়।

এ নিয়ে একটু চিন্তা করলেই তবে বাস্তবেই বুঝতে পারবেন যে, এটা জীবনের প্রশান্তি এবং রোগের স্বল্পতাকেই প্রমাণ করে। মাটির পাত্রে পানি পান করার স্বাদ এবং ধাতব পাত্রে পানি পান করার স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন।

অভিজ্ঞতাই এর সাক্ষী। কিন্তু আমরা প্রকৃতিগত স্বভাবের সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি। তাই প্রকৃতিও আমাদেরকে বিদ্রোহের বিনিময়ে পেরেশান করে রেখেছে। অবশেষে আজকাল আমরা পলিথিনের পাত্র ব্যবহার করে নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছি। আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, আমরা পুনরায় আসল জীবনের দিকে ফিরে যাচ্ছি। কারণ, আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারিক পাত্রসমূহে কাঁচ, চিনামাটি এবং পাথরের পাত্র যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকটও পাথরের একটি পাত্র ছিল।

একজন ইউরোপীয়ান ডাক্তার লিখেন– অনেক সময় পাকস্থলীতে খাদ্যের অন্তর্গত কুদরতী বিষ থেকে যায়। কিন্তু পাকস্থলীর মজবুত পর্দার উপর তার কোনো প্রভাব পড়ে না। এ পূর্ণ শক্তি দিয়ে বিষের প্রভাবের সঙ্গে মোকাবেলা করে এবং কোনো ক্ষতিও হয় না। কিন্তু যখন এ্যালুমিনিয়ামের সংমিশ্রণ ঐ পদার্থগুলিকে দুর্বল করে দেয়, তখন ঐ বিষের প্রভাবগুলিই যেগুলি মাইক্রোস্কোপ দ্বারাও অনুভব করা যেত না, সেগুলি ভেসে ওঠে।

এ্যালুমিনিয়াম পাকস্থলীতে পৌঁছে প্রভাব বিস্তার করার পর নিম্নোক্ত অবস্থাগুলি সৃষ্টি করে। কোনো কোনো সময় আমাশয় এবং বমি আরম্ভ হয়। বমি বমি ভাব থাকে। ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়। রক্ত দূষিত হয়ে যায়। পাতলা পায়খানা আরম্ভ হয়।

(১) মিশিগান ইউনির্ভাসিটির ডাক্তার ভিক্টোরনের বলেন, এ্যালুমিনিয়ামের সকল লবণই মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর।

(২) শিকাগো ইউনিভার্সিটির ডাক্তার ভেলস লিখেন, এ্যালুমিনিয়ামযুক্ত কেমিক্যাল পাকস্থলীতে পৌঁছে ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। ভিতরগত অঙ্গের সকল অংশকে দুর্বল করে। লোমকূপে এ্যালুমিনিয়ামের কেমিক্যাল জমে ক্ষতি সাধন করে।

(৩) ডাক্তার এইচ এ শিগান লিখেন, এ্যালুমিনিয়ামের কেমিক্যাল পাকস্থলীতে পৌঁছে ক্ষুধামন্দা সৃষ্টি করে। অনেক সময় পেটে ব্যথা হয়। যার ফলে আমাশয়, বমি, বমি বমি ভাব সৃষ্টি হয়।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রের হেলথ লীগের প্রধান ডাক্তার হিলডের বলেন, এ কেমিক্যালগুলি পাকস্থলীর শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়।

(৫) ডাক্তার ডেভিট নাইট এফ.সি.এস, লিখেছেন: এ্যালুমিনিয়াম পাত্রের ব্যবহার ডাক্তারী দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিকর। নিঃসন্দেহে এ চাকচিক্যময় ধাতব পাত্র নারীদেরকে মোহগ্রস্ত করে ফেলে এবং নানা ধরনের খাদ্য এ ধাতব পাত্রে রান্না করা হয়। কিন্তু তাদের এ সকল পাত্র ব্যবহার না করা উচিত এবং তাতে কোনো জিনিস কখনো পাকাবে না, যেগুলিতে এসিড কিংবা লবণাক্ত পদার্থ থাকে।

## এ্যালুমিনিয়ামের পাত্র স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে ডাক্তারী নিয়ম-কানুনের প্রতি খেয়াল রাখেন। পশ্চিমা দেশগুলোতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ খাদ্যবিষয়ক জ্ঞান অর্জন করে সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা এবং খাদ্যকে বেশি বেশি উপকারী বানানোর জন্য উপদেশ প্রদান করতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে কখনো কেউ ভুলেও এ সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেন নি বা দেন না। আমরা শুধু পশ্চিমা দেশগুলোর অনুকরণ করি। আর নিঃসন্দেহে যেখানে আমরা চলাফেরা ও পোশাক-পরিচ্ছেদে পশ্চিমা দেশগুলোর অনুকরণ করেছি, সেখানে তামা ও পিতলের পাত্র ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে এ্যালুমিনিয়ামের পাত্র ব্যবহার আরম্ভ করেছি। তামা ও পিতলের তুলনায় এ্যালুমিনিয়ামকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হল, এ্যালুমিনিয়ামে মরিচা ধরে না, হাল্কা এবং ঝকঝকে হয়। কিন্তু এটা মানবদেহের জন্য কিরূপ ক্ষতিকর, তা কারোই জানা নেই।

আধুনিক গবেষণা দ্বারা জানা যায়, এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রান্না করা খাবার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অধুনা এ বিষয়ে ডাক্তার জর্জ ডোনেলসন ব্যাপক গবেষণার পর প্রমাণ করেছেন, এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে খানা রান্না করলে তাতে এর কোনো কোনো পদার্থ বিষাক্ত মিশ্রণে পরিবর্তিত হয়ে খাদ্যে মিলে যায় এবং বিভিন্ন অঙ্গের উপর বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে। কতগুলোর প্রকৃতি খুবই নগণ্য এবং ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে। কিন্তু এর প্রতিকার না হওয়ার কারণে প্রভাবটি বাড়তে থাকে। এমনকি মানুষকে মারাত্মক রোগীতে পরিণত করে দেয়।

আরেক বিজ্ঞানী বলেন, "একবার যখন সোডার পানি এ্যালুমিনিয়মের পাত্রে ঢালা হল, তখন সে পানিতে বুদবুদ উঠতে শুরু করল। তরপর ঐ

পানিকেই যখন কাঁচের গ্লাসে রাখা হল, তখন আর বুদ বুদ উঠল না। তাহলে নিশ্চয়ই খাবার রান্না করার সময় এ্যালুমিনিয়াম গলে খাদ্যের সাথে মিশে যায় এবং বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে যায়। এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে আধাঘন্টা পানি জাল দিতে থাকলে তাতে এ্যালুমিনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড (এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ) পানির সঙ্গে মিশে যায়, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

যদি আপনি এ ধাতব পাত্র চাকু দ্বারা চেঁছে এর ঝকঝকে স্থানটি জিহ্বা দ্বারা চাটেন, তবে মুখে এর যে স্বাদ অনুভূত হবে, তাকে ইংরেজিতে ইলাম বলে। কেননা এটা এ্যালুমিনিয়ামেরই একটি লবণ। এ্যালুমিনিয়ামের সকল পদার্থই ক্ষতিকর। কোনোটির মধ্যে বিষাক্ত অংশ বেশি থাকে, কোনোটিতে কম। যখন ঐ সকল পদার্থ খাদ্যের সাথে পাকস্থলীতে পৌঁছে, তখন সে তার কাজ আরম্ভ করে দেয়। তার প্রভাব পাকস্থলীতে পৌঁছার পর কি হয় তার বর্ণনা পরে দেওয়া হচ্ছে। এর পূর্বে আমরা কিছু পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা পাঠকের সম্মুখে পেশ করছি।

মনে করুন, চার প্রকারের বিভিন্ন সবজি মিলিয়ে চার ভাগে ভাগ করা হল। এক ভাগা মাটির পাত্রে রান্না করা হলো। বাকি তিন ভাগ এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রান্না করা হল। মাটির পাত্রে রান্না করা তরকারিতে এ্যালুমিনিয়ামের কোনো অংশ পাওয়া গেল না। কিন্তু বাকি প্রতিটি অংশের তরকারির মধ্যেই এ্যালুমিনিয়ামের কেমিক্যাল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেল। এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে চা তৈরি করে তা ছাঁকনী দ্বারা ছাঁকলে তাতে যথেষ্ট এ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যাবে। গাজর, আজওয়াইন (গন্ধযুক্ত লতার বীজ) এবং অন্যান্য কয়েক প্রকার ক্ষারযুক্ত তরকারি কোনো এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে ত্রিশ মিনিট থাকলে এর কেমিক্যাল থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। যদি এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে কাঁচা আম রান্না করে খাওয়া হয়, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে বমি এবং দাস্ত আরম্ভ হয়ে যাবে। এ্যালুমিনিয়ামের কেমিক্যাল পেটে গিয়ে নাড়ীকে দুর্বল এবং পাকস্থলীর নাজুক পর্দায় ছোট ছোট জখম সৃষ্টি করে।

এ ক্যামিক্যাল খাদ্যের সাথে মিশে খাদ্যের পুষ্টিমান বিনষ্ট করে দেয় এবং খাদ্যের বিভিন্ন অংশ শরীরের বিভিন্ন অংশে শক্তি যোগানোর উপযোগী থাকে না। খাদ্য হজম হয়ে যাওয়ার পর পাকস্থলীতে এ্যালুমিনিয়ামের অংশ

থেকে যায়। যার ফলে রগ এবং পাকস্থলীর নাজুক পর্দাসমূহের উপর প্রভাব পড়ে। মনে রাখবেন, এ্যালুমিনিয়ামের কোনো কোনো পদার্থ মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার জন্য সার্বক্ষণিক ব্যবহৃত হয়।

## দুধের লাচ্ছি ও আধুনিক বিজ্ঞান

### সুন্নাতে রাসূল

○ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো খাঁটি দুধ পান করতেন আবার কখনো পানি মিশিয়ে অর্থাৎ লাচ্ছি পান করতেন। (মাদারেজ)

○ হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর একজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করলেন। এ আনছারী সাহাবী নিজ বাগানে পানি দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, যদি তোমার মশকে রাত্রের বাসী পানি থাকে তাহলে আন। নতুবা আমি মুখে লাগিয়ে পানি পান করে নিচ্ছি। তিনি আরয করলেন, আমার কাছে মশকে রাত্রের বাসী পানি আছে। তিনি তাঁর ছোট কুটিরে গেলেন। পেয়ালায় পানি ঢাললেন। তারপর তাতে বকরির দুধ দোহন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পান করলেন। সাহাবী দ্বিতীয়বার এরূপ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আগমত সাহাবীও পান করলেন। (বুখারী)

## ডলিম কিউর ও দুধের লাচ্ছি

ডাক্তার ডলিম কিউরের মতে যদি আমরা দুধের উপকারিতা বাড়াতে চাই, তা হলে যেন তাতে পানি মিশিয়ে পান করি। এতে উপকারিতা বৃদ্ধি পাবে। ডাক্তার কিউর পানি মিশানোর কয়েকটি স্তর বর্ণনা করেছেন–

এক্স ওয়ান (1 - X) : এক লিটার দুধের সঙ্গে এক লিটার পানি মিশিয়ে পান করুন।

এক্স টু (2 - X) : এক লিটার দুধের সঙ্গে দেড় লিটার পানি মিশিয়ে পান করুন।

এক্স থ্রী (3 - X): এক লিটার দুধের সঙ্গে ৪ লিটার পানি মিশিয়ে পান করুন।

এমন স্ত্রী সবচেয়ে শক্তিশালী এবং উপকারিতায় পরিপূর্ণ। লাচ্ছি এমন রোগীদেরকে পান করান, যাদের মধ্যে টাইফয়েডের জীবাণু বেশি, যাদের পাকস্থলীতে এসিড বেশি জন্ম নেয়। এমনকি আলসার রোগীদের ক্ষেত্রেও আমার অভিজ্ঞতা অনুসারে লাচ্ছি দ্বারা অনেক উপকারিতা পাওয়া গেছে। (হিউম্যান এণ্ড হাইজিন)

অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, প্রস্রাবে নিম্নতা এবং পাথরীর ভাব থাকলে দুধের লাচ্ছি অনেক উপকার করে। যদি গরমে কোনো পানীয় আপনার পিপাসা নিবারণ করতে না পারে, তবে দুধের লাচ্ছিই সর্বোত্তম পানীয়। কেননা বাকি সমস্ত পানীয়ই পূর্ব অথবা পশ্চিমাদের পানীয়। আর এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পানীয়।

**লাচ্ছি**

লাচ্ছির মধ্যে এরূপ জীবাণু রয়েছে, যেগুলির প্রকৃতিগত স্বভাব হল, তা পেটে পৌঁছা মাত্রই রোগ সৃষ্টিকারক জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করে সেগুলিকে পরাজিত করে দেয়। তাই রোগের মোকাবেলা করার জন্য লাচ্ছি একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।

লাচ্ছিতে ল্যাকটিক এ্যাসিড (Lactic Acid) থাকায় পেটে গ্যাস সৃষ্টিকারী জীবাণুর উপর ভালো প্রভাব পড়ে। তাতে গোশ্‌ত বর্ধক প্রোটিনের খুব সূক্ষ্ম অণুকণা থাকে। এ কারণে এটা অন্যান্য জিনিসের মতো হজম হওয়ার ক্ষেত্রে মুশকিল হয় না। এর প্রোটিন খুব তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায় এবং অন্যান্য জিনিসকেও হজম করে। এটি গুরুপাক এবং হজম হতে চায় না এমন খাদ্য তাড়াতাড়ি হজম হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। লাচ্ছিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, প্রোটিন, সোডিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন ইত্যাদির লবণ থাকে আর এগুলির সবকটিই গোশ্‌ত বর্ধক এবং হাড্ডি মজবুতকারক।

অনিয়মিতভাবে বারবার কয়েকটি জিনিস খেলে তা ভালোভাবে হজম হয় না এবং হজম না হওয়া অংশ নাড়ীতে পঁচতে থাকে। কিন্তু লাচ্ছি পান করলে রক্ত চলাচল দ্রুত হতে থাকে এবং তা সমস্ত খারাপ ও ক্ষতিকর পদার্থকে নির্গত করে ফেলে।

লাচ্ছি পান করলে হজমে সহায়তাকারী লালা অধিক হারে সৃষ্টি হয়। ফলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তা ব্যবহারে শরীর শক্তিশলী ও মজবুত হয়ে যায়। লাচ্ছি পানে পায়খানা প্রস্রাবের অঙ্গ তার ক্রিয়া সম্পাদনে অধিক শক্তি পায়। খাদ্য সময় মতো হজম হয় এবং শরীরের অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বের হয়ে যায়। ফ্রান্সের পাসপোর্ট ইনষ্টিটিউটের ডাক্তার সচীন এক গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে, লাচ্ছি পানে বার্ধক্য দেরীতে আসে। শরীর প্রতিপালনে লাচ্ছি একটি উৎকৃষ্টমানের খাদ্য। তাজা এবং মিষ্টি লাচ্ছি পান করলে নাড়ীতে বিষ সৃষ্টিকারী জীবাণু তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায় এবং হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়।

## মোটা আটা ও আধুনিক বিজ্ঞান

### সুন্নাতে রাসূল

সোহায়েল ইবনে সা'আদ রাযি. কে কেউ জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কখনো সাদা ময়দার রুটি খেয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মুখে শেষ বয়স পর্যন্ত কখনো ময়দাই আসেনি। তারপর প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তোমাদের কাছে কি চালনী ছিল? তিনি বললেন– আটায় ফুঁ দিতেন। ফলে মোটা ভুষিগুলো উড়ে যেত আর অবশিষ্ট দ্বারা আটার খামিরা তৈরি করে নিতেন।

(শামায়েলে তিরমিযী)

বর্তমান বিজ্ঞান খাদ্যের উপর বিশেষ জোর দেয়। বিশেজ্ঞদের মতে আমাদের ঔষধ তখনই বিফলে যায়, যখনই আমাদের রোগীরা অসম্পূর্ণ খাদ্য খেয়ে শরীর সুস্থ রাখার নিরর্থক চেষ্টা চালায়। খাদ্যে সবচেয়ে প্রথম ব্যাপারটি হল আটা। কারণ, বাজারী আটা একেবারে ময়দার মতো, আর যারা ঘরে আটা পিষায়, তারাও চিকন করে পিষে। যাতে ভুষি মোটেই থাকে না। আটার মধ্যে ভুষিই হল সবচেয়ে শক্তিশালী জিনিস।

### হৃদরোগ থেকে আত্মরক্ষা

কার্ডিওলজিষ্টগণ হৃদরোগীদেরকে চাল ব্যতীত আটার রুটি খাওয়ান। রোগীদের প্রতি বিশেষ উপদেশ থাকে, যেন তারা এরূপ আটার রুটি খান, যা মোটা এবং ভুষিযুক্ত আটা থেকে তৈরি। কেননা ভুষি রক্তে কলেষ্টরল

বেড়ে যাওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। এর দ্বারা রক্ত গাঢ় হয় না। ভুষিতে এরূপ পদার্থও রয়েছে, যা হার্টের রগ সঙ্কোচনকে হ্রাস করে। এমনকি হার্টের রগগুলি অধিক পরিমাণে ব্যবহারের ফলে অধিক পরিমাণে রক্ত নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

## স্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে আত্মরক্ষা

ভুষি এবং মোটা আটার স্বল্পতার ফলে বর্তমানে প্রায় প্রত্যেকেই পেটের পীড়ায় আক্রান্ত। গ্যাস, বাষ্প, স্থায়ী কোষ্ঠ-কাঠিন্য, পায়খানা ক্রিয়ার না হওয়া ইত্যাদি রোগগুলো মূলত আমাদের খাদ্য থেকেই জন্ম নেয়। এর মৌলিক কারণ হল আটা। কেননা মোটা আটা এবং ভুষি নাড়ীর চলাচলকে শরীর অনুপাতে বৃদ্ধি করে। যার ফলে নাড়ীর শুষ্কতা এবং তার চলাচলের স্বল্পতা নিঃশেষ হয়ে স্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়ে যায়।

সার্বক্ষণিক শ্বাসতন্ত্রের রোগে আক্রান্তদেরকে যখন ভুষিযুক্ত রুটি খাওয়ানো হল, তখন তারা আশ্চর্যজনকভাবে সুস্থতার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। যদি ভুষি সিদ্ধ করে তার পানি, চা এবং কফির মতো পান করা যায়, তবে তা কাশি, স্থায়ী সর্দি, কফ, হাঁপানী এবং পাকস্থলীর গ্যাস ইত্যাদির জন্য খুবই উপকারী হয়। এটা পরীক্ষিত।

## নখ কাটা ঔষধও বটে

নবীজীর নখ কাটার রীতি কোনো কোনো রিওয়ায়েত অনুযায়ী জুমার দিন এবং কোনো কোনো রিওয়ায়েত অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ছিল।

(উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম)

● রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পঞ্চদশ দিবসে নখ কাটতেন। (উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম)

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে পেটের পোকার ডিম মানুষের নখে আটকে থাকে। খানা খাওয়ার সময় এগুলো খাদ্যের সঙ্গে পেটে চলে যায় এবং পেটেই বড় হয় ও বংশ বিস্তার করে।

মেডিক্যাল নিয়ম অনুযায়ী পেটের পোকার ঔষধ হাতে ধরা ঠিক নয় বরং কোনো কাগজ দ্বারা উঠিয়ে মুখে দিব। ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্বে গোসল করে নিবে। রৌদ্রে শুকানো কাপড় পরিধান করবে। বিছানা ধুয়ে নিবে।

ছানার চাদর ধুয়ে নিবে। তারপর ইস্ত্রি করে বিছাবে। রাত্রে ট্যাবলেট খাবে। এরপর সকালে উঠে একই নিয়মে গোসল করে নিবে। বিছানা পরিবর্তন করবে। পোশাক পরিবর্তন করবে এবং কুসুম গরম পানিতে গোসল করবে। কেননা কোনো কোনো সময় পোকার ডিম হাতে শরীরে এবং এবং কাপড়ে লেগে শরীরের ভিতর প্রবেশ করে। আর যদি ঐ পোশাককে পরিষ্কার করে এবং নখ কেটে ফেলে, তবে তা স্বাস্থ্য ও সুস্থতার কারণ হবে। গবেষণা অনুযায়ী যে সমস্ত মহিলা নখ বড় করে রাখে, তারা রক্তস্বল্পতার রোগে আক্রান্ত হয়। এরূপ মহিলারা মনোরোগে অধিক আক্রান্ত হয়ে থাকেন। এমনকি একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বলেন, নখ বড় করা খুব মারাত্মক। তা মানুষকে এরূপ মনোরোগে আক্রান্ত করে, যদ্দরুন তার ভিতর আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যায়।

## সুন্নাতে রাসূল ﷺ ও ফ্যামিলি প্লানিং

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমরা অধিক সন্তান দায়িনী নারীদের বিবাহ করো। কারণ, আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্য উম্মতের উপর গর্ব করব। (যাদুল মা'আদ)

✪ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন : এ উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি বেশি ভালো, যার পরিবার-পরিজন বেশি। (যাদুল মায়াদ)

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক সন্তান প্রসবকারীণীকে বিবাহ করার জন্য উম্মতকে উৎসাহ দিয়েছেন। নবীজী উম্মতের আধিক্যকে পছন্দ করেছেন। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, নিজ সন্তানদেরকে ক্ষুধার ভয়ে হত্যা করো না; আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিযিক দেই।

অথচ আমরা এ ব্যাপারে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করছি যে, কিভাবে সন্তান কম হয় এবং সুখী সংসার গড়ে ওঠে। মূলত এটা মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র। যেন তাদের বংশ শেষ হয়ে যায়, দুনিয়া থেকে তাদের সংখ্যা যেন কমতে থাকে। তাদের নাম নিশানাও যেন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। গবেষণা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, যে সকল মহিলা সন্তান কম হওয়ার ইচ্ছায় ঔষধ ব্যবহার করে, তাদের অবস্থা কিরূপ হয় তার কিছুটা চিত্র নিম্নে প্রত্যক্ষ করুন।

এক মহিলা প্রায়ই বেহুঁশ হয়ে যেত। অনেক চিকিৎসা করিয়েছেন। বহু পীর-ফকিরের দরবারেও ঘুরেছেন কিন্তু কোন সুফল হয় নি। অবশেষে চিকিৎসার জন্য অধমের নিকট আনা হল। উক্ত মহিলা কথা প্রসঙ্গে নিজেই বললেন, তিনি লজ্জাস্থানে 'প্রিভেন্টিভ ক্যাপ' রেখেছেন। যেদিন তা রেখেছেন, সেদিন থেকেই তিনি মাঝে মধ্যে বেহুঁশ হয়ে যান। এখন তিনি নিজেই বুঝতে পেরেছেন, এটি ব্যবহার করা তার জন্য অসমীচীন। যখন রোগ নির্ণয় করা হল এবং সামান্য কিছু পথ্য দেওয়া হল, তখন তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন।

পাগল এক মহিলার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেল, তিনি সুখী সংসার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ২ মাস বড়ি ব্যবহার করেছেন। এভাবে কোনো কোনো মহিলার এ সকল ঔষধে পেট বড় হয়ে যায়। কারও কারও শরীর ফুলে যায়। বিভিন্ন প্রকার জটিল রোগ সৃষ্টি হয়। মূলত যখনি আমরা স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম ভঙ্গ করার চেষ্টা করব, তখন আমাদের দিকে আল্লাহর চাবুক পড়তে থাকবে। আমাদের উচিত তখুনি আল্লাহর কানুনের দিকে ফিরে আসা। কিন্তু আমরা তার বিপরীত এমন চিকিৎসা আরম্ভ করি, যার ফলে তাঁর শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে নেমে আসে।

## গাইনোকোলোজিস্টের ওয়ার্নিং

মেডিকিউন নামের একজন প্রসিদ্ধ গাইনোকোলোজিষ্ট (আমেরিকার মেক্সিকো ইউনিভার্সিটির চীফ) মহিলাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন, খবরদার! যদি সন্তান কম হওয়ার জন্য ঔষধ ব্যবহার কর, তবে অগণিত রোগ তোমাদের জড়িয়ে ধরবে। তুমি শুধু স্থায়ী রোগীই হবে না বরং ক্যান্সারের প্রবল সম্ভবনা তোমার মাথায় দুলতে থাকবে।

## W.H.O. এর উপদেশ

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা মহিলাদের ব্রেষ্ট এবং যোনীপথে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এ সকল ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

যে সকল মহিলা এ সকল ঔষধ নিয়মিত ব্যবহার করেন, রিপোর্ট অনুযায়ী তারা যে কোনো সময় ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন।

## হাদীসে রাসূল

✪ হযরত নাফে রাযি. হতে বর্ণিত, তাঁর নিকট হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে রিওয়ায়েত পৌঁছেছে, নবীজী বলেছেন, জ্বর অথবা জ্বরের তীব্রতা জাহান্নামের গর্জন। কাজেই একে পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করো।

(যাদুল মা'আদ)

✪ হযরত আবু ইমরান ছানয়ী রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ আমার জ্বর উঠল। তিনি বললেন, একে (যমযমের) পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জ্বর জাহান্নামের আগুনের আক্রমণ। একে পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করো।

✪ হযরত হাসান রাযি. থেকে বর্ণিত, জ্বর অগ্নির অংশ। তাই একে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করো।

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যখন জ্বর হত, তখন তিনি এক মশক পানি আনতেন এবং তা মাথার উপর ঢেলে দিয়ে গোসল করতেন। (যাদুল মা'আদ)

জ্বরের ব্যাপারে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষ্যও এটাই, অর্থাৎ জ্বরের রোগীকে পানি দিয়ে গোসল করাবে। তার মাথায় ঠাণ্ডা পানির পট্টি লাগাবে। রোগীকে পানি বেশি পান করাবে। মেডিক্যালের বইতে জ্বরের চিকিৎসা পদ্ধতি ঠিক তাই। যেমনটি ডাক্তার লোহী কোনী অফ জার্মানী হাইড্রোপ্যাথিতে বর্ণনা করেছেন।

## হাইড্রোপ্যাথির (পানি চিকিৎসা) নিয়ম

ডাক্তার লোহী কোণী হাইড্রোপ্যাথির নিয়মে লিখছেন, পানি যেহেতু দুনিয়ার উপাদান চতুষ্টয়ের একটি, এজন্য মানুষের সঙ্গে পানির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আমার দৃষ্টিতে সকল জ্বরের রোগী, প্লেগ, মূত্রাশয় ও শিরা-উপশিরার রোগীদের জন্য পানিই হল ঔষধ। এরূপ রোগীদেরকে পানি পান করানো, মাথায় পানি ঢালা এবং পানিতে গোসল করানো উচিত। আমার অভিজ্ঞতা অনুসারে অনেক রোগী শুধু পাকস্থলী রোগে ভোগেন। যদি তারা অধিক হারে পানি পান করেন, পানিতে গোসল করেন, তাহলে খুব দ্রুত এ রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

# সংক্রামক ব্যাধি ও আধুনিক বিজ্ঞান

## হাদীসে রাসূল

✪ হযরত জাবির রাযি. হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তুমি ফিরে যাও। আমরা তোমাকে বাই'আত করে নিয়েছি।

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন, তোমরা কুষ্ঠরোগী থেকে এমনভাবে দূরে থাক, যেমনি বাঘ থেকে দূরে থাক। (বুখারী)

✪ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুষ্ঠরোগীর দিকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়ে দেখো না। (ইবনে মাজা)

✪ তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, কুষ্ঠরোগীর সাথে এমন দূর থেকে কথা বলো, যেন তোমার ও তার মধ্যে এক-দুই বর্শা পরিমাণ দূরত্ব থাকে। (যাদুল মা'আদ)

তদ্রুপ প্লেগ মহামারীর ব্যাপারে বলেছেন- যখন তা ছড়িয়ে যাবে, তখন যদি তুমি সে শহরে অবস্থান কর, তবে সেখান থেকে দূরে সরে যেও না। আর যদি অন্য কোনো স্থান থেকে সে শহরে প্রবেশ করতে চাও, তবে প্রবেশ করো না। (যাদুল মা'আদ)

আধুনিক বিজ্ঞান সংক্রামক ব্যাধি আবিষ্কারের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাস্তবে অনেক ছোঁয়াচে রোগের আবিষ্কারও করেছে। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, বর্তমানে এমন রোগ-ব্যাধিও আছে, যা সম্পর্কে আমরা জানি না। কিন্তু বাস্তবে তা সংক্রামক রোগ।

## আধুনিক বিজ্ঞানের স্বীকৃতি

প্যাথলজী বিশেষজ্ঞ সাইমন (ক্যামব্রীজ সেন্টার অব শিকাগো, আমেরিকা) স্বীকার করেছেন, পাশ্চাত্যকে ছোঁয়াচে (সংক্রামক) ব্যাধির লক্ষণসমূহ সম্পর্কে ইসলামই অবহিত করেছে। আমি যখনই ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি, তখন পরিষ্কার অনুভব করেছি, বাস্তবিকই ইসলাম একটি সার্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। বর্তমানে সংক্রামক ব্যাধি গোটা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। এর নানা চিকিৎসাও হচ্ছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে বহু পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছেন।

# ইসলামে পানির স্বচ্ছতা ও আধুনিক বিজ্ঞান

## হুসালে রাসূল

আল্লাহ তা'আলা প্রাণীকূল ও উদ্ভিদ জগতের জীবনকে পানির উপর নির্ভরশীল করেছেন। এ পানির বৃদ্ধি ও ঘাটতি কেবল প্রাণীর স্বাস্থ্যের উপরই প্রভাব ফেলে না বরং খাদ্য উৎপাদনের উপরও প্রভাব ফেলে। কোথাও পানি শূন্যতা অথবা পানির অভাব দেখা দিলে প্রাণীকূল ও উদ্ভিদ জগতের জীবন ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কুরআন মজীদে পানির অস্তিত্বকে প্রাণীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে,

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

অর্থাৎ আমি সকল কিছুর জীবন দান করি পানি দ্বারা।

কিছুক্ষণের জন্য বায়ু না থাকলে যেমন জীবিত থাকা অসম্ভব, তেমনিভাবে আদ্রতা ও উপযুক্ত পরিমাণ জলীয় বাষ্প না থাকলেও সব কিছু শুকিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। বায়ু ও সূর্যের কিরণ দূষিত বস্তুকে পরিষ্কার করতে এবং অপবিত্র ও দুর্গন্ধ জিনিসকে খতম করতে যথেষ্ট সহায়তা করে ঠিকই; কিন্তু এর ক্রিয়া অতি ধীরে ধীরে হয় এবং দীর্ঘ সময় লাগে। আর পানি তার প্রতিক্রিয়া ও কার্যকারিতা অতি দ্রুত দেখাতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যে পানি দূষিত ও অপবিত্র জিনিসকে পাক-পবিত্র করে দিতে পারে। কিন্তু বায়ু ও সূর্যের কিরণ তা সুদীর্ঘ সময়েও পারে না।

আগুন তো পানির চেয়েও পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে দেয়, তবে তা জ্বালানো যায় এমন জিনিসকে পবিত্র করে। কিন্তু অন্য কিছু আগুনে দিলে আগুন তাকে নষ্ট করে দেয় অথবা দগ্ধীভূত করে ছাই করে দেয়। পৃথিবীতে পানির মতো পবিত্র পরিচ্ছন্নকারী সহজলভ্য, ক্ষতিহীন ও দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল বস্তু আর নেই। সে নিজে পবিত্র এবং অন্য বস্তুসমূহকে পবিত্রকারী আল্লাহর সৃষ্ট একটি বড় নেয়ামত। পানি স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার জন্য যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি তা দুর্গন্ধযুক্ত ও অপরিচ্ছন্ন হলে ততই ক্ষতিকর হয়। সুতরাং স্বাস্থ্য অটুট রাখার সাথে পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে পানি পরিষ্কার ও জীবাণু মুক্ত হওয়া অতি জরুরি।

মোটকথা, পানির পরিচ্ছন্নতার উপর জনস্বাস্থ্য নির্ভরশীল। কুরআন মজীদে ২০ স্থানে পাক মধু, সুস্বাদু পানির নদী ও ঝর্ণার কথা সুমিষ্ট স্বরে

বর্ণনা করা হয়েছে। তদ্রূপ দূষিত দুর্গন্ধি, নাপাক, বিস্বাদ, লবণাক্ত পানির অপকারিতা ও ক্ষতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে কুরআনে এই পানির সবেচেয়ে বেশি প্রশংসা করা হয়েছে, যা বৃষ্টির আকারে সকল প্রকার ভেজাল ও সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত করে আল্লাহ পাক আসমান থেকে বর্ষণ করেন। তারপর এ মৃত অনুর্বর জমিন, গ্রাম, শহর, উদ্ভিদ ইত্যাদির উপর পতিত হয়ে জীবন্ত করে তোলে।

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যেমন স্বাস্থ্যবিধি ও রীতি-নীতির সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি ইসলামে পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সংক্রান্ত হিদায়েত ও বিধি-বিধানের সম্পর্কও পানিরসাথে রয়েছে পানির সাথে। এ জন্য ইসলামে পানির পাক-পবিত্রতার ব্যাপারে যদি বিস্তারিত জানা না যায়, তবে হিদায়েত ও বিধি-বিধানের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম অনন্য ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

পানির পবিত্রতা ও অপবিত্রতার বিস্তারিত বিবরণ হাদীস ও ফিকহের কিতাবপত্রে বিদ্যমান আছে। এখানে তা বর্ণনা করা দুরূহ। এখানে শুধু পানির অপবিত্রতা ও অনুপযুক্ততার বাহ্যিক লক্ষণগুলো প্রকাশ করে স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর ব্যবহারকারীদের জ্ঞান ও বিবেকের উপর পাক ও নাপাক হওয়ার বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়ম হল পানিতে কোনো দূষিত পদার্থ পড়ে পানির রং, ঘ্রাণ ও স্বাদ পরিবর্তন করে দিলে সে পানি অপবিত্র হয়ে যায়।

ইসলামি ফিকাহ্ শাস্ত্র বিশেষ অনুগ্রহ করে বর্ণনা করেছে, কী পরিমাণ পানিতে কী পরিমাণ দূষিত বস্তু পড়লে পানি নাপাক হয়ে যায়। যেমন, দশ হাত দৈর্ঘ্য দশ হাত প্রস্থ ও দশ হাত গভীর জলাশয় অর্থাৎ এক হাজার বর্গ হাত পানিতে সাধারণ ময়লা বস্তু পড়লে রং, স্বাদ, গন্ধ পরিবর্তন না হলে তা অপবিত্র হবে না। এসব অধ্যায়ে ফিকহ্ শাস্ত্র ছোট ছোট তারতম্য ব্যাখ্যা করেছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, ইসলামে পানির পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা কতই না গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবিক পানির মাসআলা হলো স্বাস্থ্য রক্ষার আসল ও অন্যতম মাসআলা।

স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে আরও লক্ষ্য রাখতে হবে, দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে পানি কমবেশি যাই হোক, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু উন্নতশীল দেশের বিভিন্ন শহরে ও কেন্দ্রে যেখানে

ন্ন প্রকার আধুনিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, সেখানে সাধারণত পানির স্যা সৃষ্টি হয় না।

দুনিয়ার ৭৫ ভাগ এলাকায় তারা জনবসতি স্থাপন করেছে। মরভূমি, , পুরাতন বিধ্বস্ত গ্রাম প্রভৃতি আবাদ করেছে। বসবাসের সকল সমস্যা করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। স্বাস্থ্য রক্ষার্থে পানির পরিমাণ ও রিচ্ছন্নতার উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। সাধারণত পান করার বিশুদ্ধ পানি লা আবর্জনা থেকে রক্ষা করার জন্য উঁচু স্থানে ট্যাংক রাখা হয়। কিন্তু ন্নত দেশেও পানির স্বলপতা দেখা দেয়। তথাপি খেয়াল রাখতে হবে, ন প্রতিদিন প্রয়োজন মতো পানি ট্যাংকে উঠিয়ে পরিশোধিত করা হয় বং পরিষ্কার, বিশুদ্ধ ও সুস্বাধু পানি রাখা হয় স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর না য়।

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইসলামে সুন্দর ফলপ্রসূ নীতিমালা রয়েছে। সবরকম নুষের চাহিদা, সমস্যা, পানির স্বল্পতা,পর্যাপ্ততা ইত্যাদি সব কিছুর প্রতি ল্লাহপাক দৃষ্টি রেখেছেন। তিনিই সুন্দর সমাধান দিয়ে দিয়েছেন। তিনি দৃশ্য থেকে এমন ব্যবস্থা দিয়েছেন, যা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। এ বস্থা দ্বারা সব মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার চাহিদা পূরণ হয়।

পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানিজীবন বাঁচানোর জন্য অপরিহার্য। এর য়োজনীয়তা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা ও বিধি-বিধান ইনশাআল্লাহ পরে ল্লেখ করা হবে। তবে এখানে পানি পবিত্র ও পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে কটি বিধান উল্লেখ করা হচ্ছে। তা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি য়া সাল্লাম কঠোরতার সাথে নিষেধ করেছেন- উন্মুক্ত আবদ্ধ পানিতে যখানে গোসল করা হয়, আসবাবপত্র ধৌত করা হয়, পানি পান করার ন্য নেওয়া হয়, সেখানে ময়লা ও আবর্জনা ফেলবে না; পেশাব-পায়খানা রবে না। এমন কূপের পানি পান করতে এবং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, যা পুরাতন ঘর-বাড়ি বহু প্রাচীনকালে তৈরি হয়েছিল এবং নমালবহীন শূন্য অবস্থায় পরিত্যক্ত পড়েছিল। এরূপ কূপ থেকে াধারণত বিষাক্ত বাষ্প বা গ্যাস নির্গত হয়। এরূপ কূপের মধ্যে নামতেও নিষেধ করেছেন।

## খাদ্য দ্রব্যের উপর ঢাকনা দিয়ে রাখা

বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদ্য-দ্রব্যকে ঢেকে রাখার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। চিন্তা করলে দেখা যায়, এটা স্বাস্থ্য রক্ষার বিধিমতে কতইনা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। কেননা জিনিসপত্র যদি ঢেকে রাখা না হয়, তবে নিম্নলিখিত সমস্যা ও অপকারিতা দেখা দিতে পারে

(১) বিষাক্ত প্রাণী যেমন সাপ, বিচ্ছু, টিকটিক ইত্যাদি উন্মুক্ত খাদ্যের মধ্যে বিষ ঢেলে দিতে পারে। এরূপ অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসের বইপত্র ও সাধারণ জীবনে দেখা যায়।

(২) উন্মুক্ত বাসনপত্রে খাদদ্রব্য থাকলে আর এতে কুকুর মুখ দিলে, তাতে মারাত্মক জীবাণু মিশে যেতে পারে।

(৩) আশেপাশে খোলা স্থানে উন্মুক্ত পরিবেশে অগণিত রোগজীবাণু থাকে। ফলে জিনিসপত্র খোলা থাকলে এতে জীবাণু প্রবেশ করে। এভাবে উক্ত খাদ্য শরীরের জন্য বিষে পরিণত হয়।

(৪) তদ্রুপ খাদ্যদ্রব্য খোলা থাকলে আর এতে কোনো লোকের বদ-নযর পড়লে তার নেতিবাচক প্রভাব এর মধ্যে পড়ে যায়। ফলে খাদ্য রোগজীবাণুতে পরিণত হয়।

## দীনদার লোকদের রোগ-ব্যাধি

দীন হল শান্তি, স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলার নাম। খাদ্য যেমন শরীরের শক্তি বৃদ্ধির জন্য অতি জরুরী, তেমনি অতিরিক্ত খাদ্য খেলে তা রোগ জীবাণুতে পরিণত হয়। তদ্রুপ যখন ধার্মিক ব্যক্তি নিজের অভ্যাসের চেয়ে বেশি আহার করে এবং পরিমিত কর্ম থেকে অধিক পরিমাণে কাজ করে, তখন সে বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযান মাস ব্যতীত একাধারে বেশি রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করে অধিক রোযা রাখে, তা হলে অচীরেই সে দুর্বলতা, খিঁচুনী, মস্তিষ্কের দুর্বলতা, মাথার পর্দার শুষ্কতা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতে পারে। শরী'অতের হুকুম হল খাদ্য কম খাও। আর কেউ যদি হঠাৎ খাদ্য খুব কমিয়ে দেয়, তবে রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে।

দীন-ইসলাম সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করার হুকুম দেয়। কিন্তু শরীরের শক্তির চেয়ে বেশি বেশি যদি যিকির করা হয়, তবে মস্তিষ্ক শুকিয়ে পাগল হয়ে যাবে। মোটকথা, ধর্ম হল সতর্কতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নাম। ধর্মের মধ্যে অনেক সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্নপ্রকার শিথিলতাও আছে। সুতরাং ধর্ম যতটুকু অবকাশ দেয়, ততটুকু অবশ্যই গ্রহণ করা দরকার। তবে মনে রাখতে হবে, আমরা যেন এক শিথিলতার সুযোগ নিতে গিয়ে আরও অধিক শিথিলতা সৃষ্টি করে না ফেলি। কেননা তখন তা আর ধর্মের সীমার মধ্যে থাকবে না।

## ইবাদত বন্দেগী ও শারীরিক সুস্থতা

ইবাদত-বন্দেগীতে সম্ভবত সকল ধর্মে মুক্তি, নাজাত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য জীবনের উপর বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য। অনেক ভারি ভারি বন্দেগী পছন্দ ও মনোনীত করা হয়। নির্জনতা ও সন্ন্যাসবাদের মধ্যেও পুণ্য আছে মনে করা হয়। অথচ এটাও শরীর-স্বাস্থ্যের উপর এক প্রকার কঠোরতা।

অনেক লোককে তো বন্দেগীর নামে শরীরের উপর কঠোরতা করতে দেখলে অবাক হতে হয়। কেউ প্রচণ্ড গরমে খোলা মাঠে অথবা লোহার বড় পাতের উপর ইবাদত-বন্দেগী করে। আমি নিজেও অনেক হিন্দু যোগী-সন্ন্যাসীকে কত সব উদ্ভট পূঁজা-পার্বন করতে দেখেছি। অনেকে দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান থাকে। অনেকে উল্টাভাবে ঝুলন্ত থাকে। আবার অনেকে মাত্র একটি লেংটি পরে লোহার রডের উপর বসে। এই লেংটি পরেই শয়ন করে এবং যাবতীয় কাজ করে।

তারা এভাবে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়। জনৈক যোগী আমাদের শহরে এসেছিল। সে জুনের মাঝামাঝি প্রচণ্ড রৌদ্রে খোলা মাঠে উলঙ্গ হয়ে নামে মাত্র লেংটি পরে বিছানা বিছিয়ে বসে যেতো। একটি কাপড় ভিজিয়ে মুখে বাঁধত এবং নিজের চারিদিকে কয়েক মন কাঠ জমা করে এতে আগুন জ্বালিয়ে বসে থাকত। এভাবে কয়েক ঘণ্টা আগুনের বৃত্তের মধ্যে থেকে নিজেকে উত্তপ্ত করত। সেখান থেকে তখন উঠত, যখন আগুন নিভে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। কয়েক দিন পর্যন্ত সে ধারাবাহিকভাবে এরূপ করত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন তার রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস গ্রন্থে একটি ঘটনা লিখেছে—

ইসলামের অনেক পূর্বে শামদেশে একজন ঈসায়ী যুবক ছিল। সে খোলা মাঠের মধ্যে একটি বাঁশ গেঁড়ে নিজেকে বাঁশের মাথায় বেঁধে নিত এবং হাত দ্বারা নিজের বুকের উপর ক্রুশ চিহ্ন বানিয়ে না খেয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঝুলে থাকত। শেষ পর্যন্ত এভাবে সে ধ্বংস হয়ে (মারা) যায়। তাই সমসাময়িক ঈসায়ী লোকেরা তাকে আল্লাহর ওলী মনে করত।

কিন্তু ইসলাম এ জাতীয় বন্দেগীকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। প্রথমেই বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী হিসেবে আবির্ভাবের পর তাঁকে সারা রাত ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং পরিমিত বিশ্রাম গ্রহণ করার প্রতি কঠোরভাবে তাকিদ করা হয়েছে। যখন ইসলামের প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতার প্রতি সরাসরি এমন নির্দেশ করা হয়েছে, সেখানে প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কাজ হলো এ জাতীয় রিয়াযাত (সাধনা) থেকে বিরত থাকা এবং সর্বদা নিজেদের শরীর ও স্বাস্থ্য ঠিক রাখার ব্যাপারে সচেতন থাকা।

ইসলামী শিক্ষার দৃষ্টিতে উপরিউক্ত কোন প্রকার বন্দেগী, অর্চনা ইত্যাদি অনুমোদিত ও পছন্দনীয় নয়। আর এর বিনিময়ে বিন্দুমাত্র প্রতিদানও নেই। কুরআন মজীদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, নিজে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করো না। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক স্ত্রীর ঘরে রশি ঝুলাতে দেখেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কিসের রশি? উত্তর করলেন, ইবাদত করতে করতে যখন নিদ্রা এসে যায়, তখন এ রশি মাথার চুলের সঙ্গে বাঁধা হয়। ঘুমের ঘোরে যখন রশিতে টান পড়ে তখন ঝটকা (ধাক্কা) লাগতেই ঘুম ভেঙ্গে যায়।

সব কিছু শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ জাতীয় ইবাদত অবৈধ। আমল এমনভাবে করতে হবে, যতটুকু শরীরে সহ্য হয় এবং সহজে স্বাভাবিকভাবে আরামের সাথে করা যায়। কুরআন মজীদে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআনের সকল তাফসীরকারক ও ইসলামের মহান চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নিদ্রাও এক প্রকার নেশা। সুতরাং যখন ঘুম প্রাধান্য পাবে, তখন নামায না পড়া উচিত (কারো কারও মতে)। ইসলাম শরীর, স্বাস্থ্য ও সুস্থতার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে থাকে। যেমন, কেউ নামাযে দণ্ডায়মান হওয়ার পর তার পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হলে সে

নামায ত্যাগ করে উক্ত প্রয়োজন পূর্ণ করবে। তারপর নামায পড়বে। অন্যথায় নামায মাকরূহ হবে। কেননা পায়খানা চেপে রাখতে গিয়ে প্রথমেই তো ইবাদতের প্রতি মনোযোগ থাকবে না। দ্বিতীয়ত তার স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হতে পারে। কোন না কোন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিরক্তিকর দীর্ঘ কিরাতের নামায পড়াও নিষেধ। তদ্রুপ ইমামের জন্য অতি দীর্ঘ কিরাআতের নামায পড়ানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

সারকথা, ইসলাম ইবাদত-বন্দেগীতেও শরী'আতসম্মত ওজর যেমন অসুখ-বিসুখ, ক্লান্তি-শ্রান্তি ইত্যাদিতে সুযোগ দেয়। রোগ বা ক্লান্তিতে নামায দাঁড়িয়ে পড়তে না পারলে বসে, শুয়ে বা ইশারা করে পড়তে হয়। তদ্রুপ সফরে ও রোগে রোযা না রাখলেও চলে। মহিলারা শারীরিক ওজর-আপত্তি ও জটিলতায় যখন ওযু গোসল ইত্যাদি করতে পারে না, তখন তাদের জন্য অনেক ইবাদত মাফ হয়ে যায়। সুতরাং এমতাবস্থায় ইবাদতের নির্ধারিত তরীকার উপর বাড়াবাড়ি করা মানব শরীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

○ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীর ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে এক সাধারণ নিয়ম অনুমোদন করে বলেছেন, ইবাদত-বন্দেগীর কাজে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। আরও বলেছেন, এ (মধ্যমপন্থা) আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয় ও পছন্দনীয়। সর্বদা এ পন্থা অবলম্বন করলে মানুষের শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক থাকে। নবীজী রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং নীরব থাকতেও নিষেধ করেছেন। (রিয়াযুস্ সালিহীন)

## পরিশিষ্ট

### দাড়ির অপরিহার্যতা

আমি ইতোপূর্বে দাড়ি রাখাকে সুন্নাত লিখেছিলাম। এটা মূলত সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়মের ভিত্তিতে লেখা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে শরী'আতের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য কথামতে দাড়ি রাখা ওয়াজিব।

### গাভী একটি বৈধ-হালাল প্রাণী

পেছনের গাভীর ব্যাপারে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। উলামায়ে কিরাম ও মুফতীগণ এতে যে মতামত দিয়েছেন, তা মূলত কৃশ, স্বাস্থ্যহীন, রোগগ্রস্ত প্রভৃতি গাভীর কথা বলেছেন। কেননা গাভীতে এসব রোগ-ব্যাধি

আবিষ্কার হচ্ছে। অবশ্য সকল গাভীতে নয়। তদ্রূপ অপুষ্টিকর, অতৃপ্তিদায় ইত্যাদি খাদ্য-দ্রব্য খেতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং অপকারিতা ভিত্তিতে হাদীসে নিষেধ, অস্বীকৃতি ও অসম্মতির কথা বলা হয়েছে পক্ষান্তরে গাভী যদি কোন প্রকার রোগে আক্রান্ত না হয়, তবে তা সর্ব হালাল ও বৈধ প্রাণী।

## নামায ও ক্ষুধা

ক্ষুধা অধিক হলে তাকওয়ার দাবি হল ক্ষুধা সহ্য করে নামায পড়া উলামায়ে কিরামের মতে কেউ অধিক ক্ষুধার্ত হলে, নামাযে মনোযোগ ন বসলে, মন ক্ষুধা ও খাদ্যের প্রতি ধাবিত হলে আগে খেয়েই নামায পড়বে

## দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

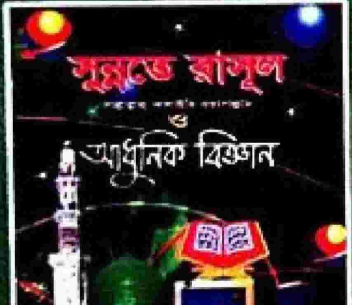


আল কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা

পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা